এ টিয়ারড্রপ অন দ্য চিক অভ্ টাইম

দি স্টোরি অভ্ দ্য তাজমহল

অ্যালেক্স রাদারফোর্ড

অনুবাদ : সাদেকুল আহসান কল্লোল

- 'মনোযোগ আকর্ষণ করে, সুখপাঠ্য... একটা চিত্তাকর্ষক কৃতিত্ব'– গার্ডিয়ান

- 'একটা জটিল পর্বতপ্রমাণ কাহিনী, আমি সন্দিগ্ধ আর কখনও এত সুন্দর করে বর্ণিত হবে'– মেইল অন সানডে

- 'গল্পটা এত সুন্দর করে বিবৃত হয়েছে যে কিছু কিছু অধ্যায় পাঠ করার সময় কোন রোমাঞ্চকর উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত মনে হয়... জনপ্রিয় ঐতিহাসিকের অর্থবহ সেরা ধারণা।'– সানডে টেলিগ্রাফ

- প্রেসটনের লেখা পাঠ করা উচিত। দুর্দান্ত একটা খণ্ডকথা।'– সানডে টাইমস।
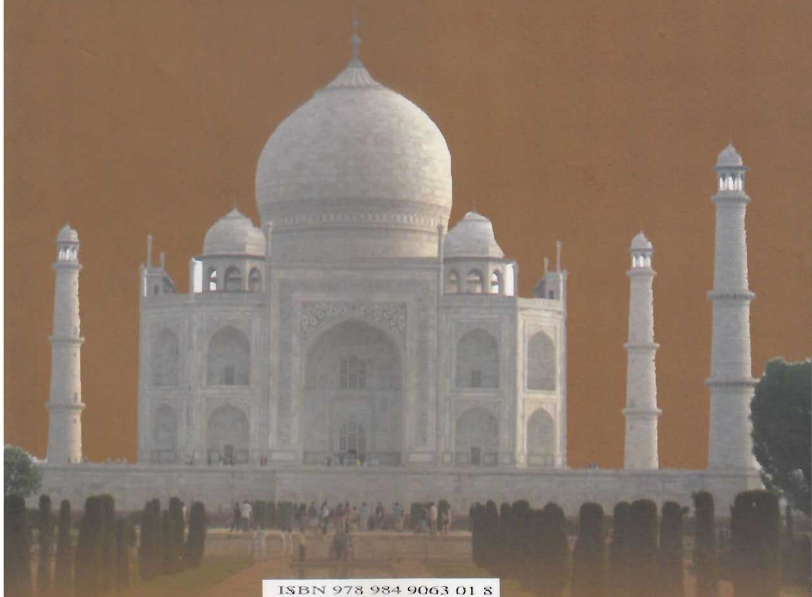
ISBN 978 984 9063 01 8

9 789849 063018

১৬৩১ সাল, ভগ্নহৃদয় মোগল সম্রাট, শাহজাহান, তার প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উজ্জ্বল দীপ্তিময় আর জাঁকজমকপূর্ণ একটা স্মৃতিস্তম্ভ (মকবরা) নির্মাণের আদেশ দেন। তাদের প্রেম অসাধারণ আবেগের এক অপূর্ব কাহিনী: যদিও তিনি প্রায় সবসময়েই সন্তানসম্ভবা থাকতেন তারপরেও মমতাজমহল প্রতিটা সামরিক অভিযানে তার স্বামীর সঙ্গী হয়েছেন, যার একটাই উদ্দেশ্য তারা যেন কখনও একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হন।

কিন্তু মমতাজ সহসাই সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন, শোকে অন্ধ শাহজাহান নদী যমুনার তীরে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটা উদ্ধত কিন্তু অসাধারণ স্থাপত্য কীর্তি সৃষ্টি করেন। ত্রুটিহীন প্রতিসাম্যের দীপ্তিময় একটা মকবরা তাজমহল নির্মাণে সফেদ মর্মর আর গোলাপী বেলেপাথর এবং মূল্যবান রত্নরাজির বৈভবখচিত একটা অলঙ্করণ ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ হাজার শ্রমিকের শ্রম আর মোগল কোষাগারের সম্পদ ম্লান করে মকবরার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে প্রায় বিশ বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু শাহজাহানকে তার এই আবিষ্টতার জন্য আরো বড় মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছিল। আগ্রা দূর্গে নিজের সন্তান কর্তৃক অন্তরীণ অবস্থায়, নদীর অপর তীরে অবস্থিত প্রিয়তমার সমাধিসৌধের দিকে তাকিয়ে, তিনি জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করেন। তাজমহল ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে, পুত্রকে পিতার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেয় যা সতের শতকের সবচেয়ে ক্ষমতাধর সাম্রাজ্যকে অপরিবর্তনীয় অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়।

তাজমহলের অন্তরালের কাহিনীর মাঝে রয়েছে গ্রীক বিষাদের ছন্দোলয়, জ্যাকোবীয় প্রতিশোধস্পৃহার সংহার রূপ এবং গ্রান্ড অপেরার আবেগময়তা। তাদের পূর্ববর্তী কাহিনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথকের দক্ষতা আবেগময় বিবরণমূলক ইতিহাসের এই কাহিনীতে অ্যালেক্স রাদারফোর্ড (ডায়ানা আর মাইকেল প্রেসটন) প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছেন যেখানে মর্মরের খ্যাতিমান স্থাপত্যের সেরা নিদর্শনে তারা মানবিক মুখাবয়ব আরোপ করেছেন।

অ্যালেক্স রাদারফোর্ড আসলে একটি ছদ্মনাম। বাস্তবে পর্দার আড়ালে রয়েছেন দুজন। তারা হলেন ডায়ানা প্রেস্টন এবং মাইকেল প্রেস্টন। এরা স্বামী-স্ত্রী এবং যুক্তরাজ্যের নাগরিক। এম্পায়ার অভ্ দ্য মোগল সিরিজের পাঁচটি বই তাদের সম্মিলিত উদ্যোগে রচিত হয়েছে।

অনুবাদক পরিচিতি:
সাদেকুল আহসান কল্লোল
অনুবাদ সাহিত্য দিয়ে যার যাত্রা শুরু। হিসাববিজ্ঞানে স্নাতক। নিজের আগ্রহেই শুরু করেছেন অনুবাদ। ইচ্ছে ইউরোপের নানা ভাষার উপন্যাস অনুবাদ করে সাহিত্যের একটা বিপণন অবস্থা চালু করা, সবার মতামত সবার কাছে পৌছে দিতে চাই। নরওয়ের লেখিকা- কি লিখছে আমরা জানি না, জানতে কিন্তু চাই তেমনি তাকেও জানাতে চাই আমাদের সাহিত্যের কথা। এই স্বপ্ন নিয়ে অনুবাদে হাত দিয়েছি। দেখা যাক কি হয়!
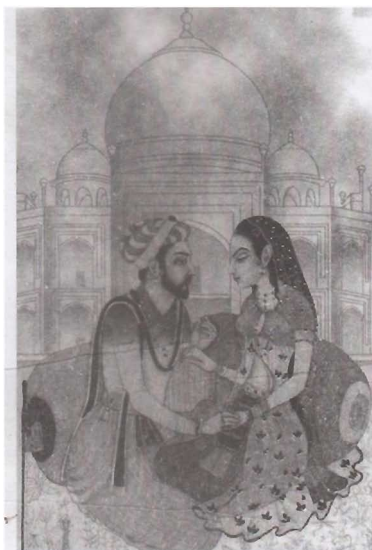
এ টিয়ারড্রপ অন দ্য চিক অভ্ টাইম

দি স্টোরি অভ্ দ্য তাজমহল

এ টিয়ারড্রপ অন দ্য চিক অভ্ টাইম
দি স্টোরি অভ্ দ্য তাজমহল
অ্যালেক্স রাদারফোর্ড
অনুবাদ : সাদেকুল আহসান কল্লোল

এ টিয়ারড্রপ অন দ্য চিক অভ্ টাইম
দি স্টোরি অভ দ্য তাজমহল
মূল : অ্যালেক্স রাদারফোর্ড
অনুবাদ : সাদেকুল আহসান কল্লোল

দ্বিতীয় প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৪২১ এপ্রিল, ২০১৪
প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৩

রোদেলা ২৮৫

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মূল বইয়ের প্রচ্ছদ অবলম্বনে অনন্ত আকাশ

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইনে পরিবেশক
www.rokmari.com

মুদ্রণ
আল-কাদের প্রিন্টিং প্রেস
৫৭ ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র

A Teardrop on the Cheek of Time The Story of the Tajmahal
by Alex Rutherford
Translated by Sadekul Ahsan Kollol
First Published September 2013
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
E-mail : rodela.prokashani@gmail.com
Web : www.rodela prokashani.com

Price : Tk. 400.00 only US $ 10.00
ISBN : 978 984 90630 1 8 Code : 285

অনুবাদকের উৎসর্গ

স্নেহস্পাদেষু রাকিবুল হাসান

সূচি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ভারতবর্ষে দীর্ঘসময় অতিবাহিত না করেই আমরা হয়তো এ বইটা লিখতে পারতাম। কিন্তু ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, বহুবার সেখানে ভ্রমণ করার পরও আজও দেশটা আমাদের অনুভূতিকে উদ্বেলিত করে। নয়াদিল্লিতে অধ্যাপক আর. সি. আগরওয়াল, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার জয়েন্ট ডিরেক্টর জেনারেল তার মূল্যবান সময় আমাদের সাথে উদারভাবে অতিবাহিত করেছেন এবং তাজমহল আর শাহজাহান এবং মমতাজ মহলের কাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত অন্য স্থানসমূহে আমাদের ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আগ্রার তত্ত্বাবধায়ক আর্কিওলজিস্ট ড. ডি. দয়ালান ও তার সহকারী এ. কে. তিওয়ারির বিশেষজ্ঞ পরামর্শের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ এবং ড. আর. কে. দীক্ষিত, যিনি তাজের দক্ষিণ তোরণ দ্বারে অবস্থিত তার বাতাসে আপাত ভাসমান অফিসকক্ষে অধিষ্ঠিত হয়ে সেখানকার সাম্প্রতিক খননকার্য আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। তিনি সেইসাথে তাজমহল প্রাঙ্গণের পুরো এলাকাটা এবং পয়ঃপ্রণালীর খননকার্য ব্যাপকভাবে আমাদের সাথে করে নিয়ে ঘুরে দেখিয়েছেন এবং সব কিছু বাস্তব আর রূপকের নতুন আঙ্গিকে দেখতে আমাদের সাহায্য করেছেন। ড. কে. কে. মাহমুদ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধায়ক আর্কিওলজিস্ট, তার সহায়তার কারণেই আমাদের পক্ষে বুরহানপুরের দুর্গপ্রাসাদ দর্শন করা সম্ভব হয়েছিল, মমতাজ মহল যেখানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং সেই জনশূন্য প্রান্তর যেখানে সাময়িকভাবে তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। ভারতে অসংখ্য মানুষের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। তাদের সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে দিল্লির মোগল স্মৃতিস্তম্ভ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী লুসি পেক, হিন্দু বাস্তুশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির জন্য বিভূতি সচদেব আর মোগল স্থাপত্য সম্বন্ধে পরামর্শ দানের জন্য ড. গাইলস টিলটসনের কাছে আমরা ঋণী।

আলোচ্য কাহিনি অনুধাবনে অসংখ্য মোগল ইতিহাসবিদের ভাষ্য আমাদের সহায়তা করেছে। আমরা অবশ্যই বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই বোদলেয়ান লাইব্রেরি অব দি ইনডিয়ান ইনস্টিটিউটের কর্মচারীদের এবং ব্রিটিশ লাইব্রেরি,

দ্য লন্ডন লাইব্রেরি এবং দ্য স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের সবাইকে, যারা সেই সময় তথ্যসূত্র থেকে তথ্য নিবেশিত করতে সাহায্য করেছিল। আমরা সেইসাথে আরো অনেকের কাছে সমানভাবে ঋণী। *Muqarnas*-এর সম্পাদক আমেরিকার জুলিয়া বেইলি স্থাপত্যরীতির তথ্যসূত্র সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। যুক্তরাজ্যে ফিলিপ্পা ভন মোগল চিত্রকলায় রমণীদের উপস্থাপন সম্বন্ধে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আমাদের পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ভারতবর্ষে গবেষণার খাতিরে আমাদের দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয়েছে, অনেক সময় দুর্গম স্থানেও যেতে হয়েছে। গ্রেভস ট্রাভেলস ইন্টারন্যাশনালের (যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র) মেহেরো ডালটন এবং তানিয়া ডালটন দক্ষতার সাথে আমাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন এবং নয়াদিল্লিতে গ্রেভসের মালা ট্যানডন আমাদের মূল্যবান সহায়তা প্রদান করেছেন। আমরা নয়াদিল্লির ইম্পেরিয়াল হোটেল কর্তৃপক্ষের নিকট ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ আর সেইসাথে মহেশ্বরে অহল্যা দুর্গের প্রিন্স রিচার্ড হোলকারের উদার আতিথিয়তার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি। এক্সপ্লোর লিমিটেড আমাদের উজবেকিস্তানে সৌন্দর্যতাত্ত্বিক মোগল পূর্বপুরুষদের প্রাসাদ আর মকবরা তুলনা করার এবং ইরানে তাজমহল নির্মাণে পারস্যের দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রভাব অনুসরণের সুযোগ দিয়েছে।

বন্ধুদের পরামর্শ ও সমালোচনা ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা রবিন আর জাস্টিনা বিংক, রবার্ট বিনন, চার্লি কোভেল, কিম আর শ্যারন লিউসন ও নেলি মনরোর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমরা উৎসাহ প্রদানের জন্য আমাদের পরিবারকে, বিশেষ করে নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে তার গবেষণা কাজের জন্য লিলি ব্রডি-উলমানকে এবং আমাদের বাবা-মা লেসলি আর মেরি প্রেসটন এবং ভেরা ফেইথকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের প্রকাশকের সাহায্য আর পরামর্শ আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। লন্ডনে ডাবললেডির মিরিয়ানা ভিলমানস আমাদের সম্পাদক মিশেল হাচিনসন আর সেইসাথে শিলা লি আর ডেবোরা অ্যাডামসের কাছে আমরা ভীষণ কৃতজ্ঞ। নিউইয়র্কের ওয়াকার বুকসের জর্জ গিবসন, সাথে পিটার মিলার ও মিশেল অ্যামন্ডসেনসহ তার দলের কাছে আমরা ঋণী। দিল্লিতে র‍্যানডম হাউজ ইন্ডিয়ার বিবেক আউজার আমাদের মেহমানদারি আর উৎসাহ দিয়েছেন আর সাথে দিয়েছেন নতুন অন্তর্দৃষ্টি। সবশেষে আমরা আমাদের এজেন্ট লন্ডনে এ. এম. হিথের বিল হ্যামিলটনকে আর নিউইয়র্কের ইঙ্কওয়েল ম্যানেজমেন্টের মাইকেল কার্লাইসকে পুরোটা সময় তাদের উৎসাহ আর সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

বংশবৃত্তান্ত

মহান মোগল সম্রাটবৃন্দ ১৫২৬-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ

বাবর
১৪৮৩-১৫৩০
রাজত্বকাল
১৫২৬-১৫৩০

হুমায়ুন কামরান আসকারি হিন্দাল

হুমায়ুন
১৫০৮-১৫৫৬
রাজত্বকাল
১৫৩০-১৫৫৬

আকবর হাকিম

আকবর
১৫৪২-১৬০৫
রাজত্বকাল
১৫৫৬-১৬০৫

ইতিমাদ-উদ-দৌলার
পরিবারের সাথে
আন্তর্বিবাহ সম্পর্ক

জাহাঙ্গীর মুরাদ দানিয়েল

জাহাঙ্গীর
(সেলিম)..................................= (২) নূরজাহান=(১) শের আফগান আসফ খান
১৫৬৯-১৬২৭৯
রাজত্বকাল
১৬০৫-১৬২৭

খসরু পারভেজ শাহজাহান শাহরিয়ার=লাডলি বেগম

শাহজাহান
(খুররম)...মমতাজ মহল
১৫৯২-১৬৬৬
রাজত্বকাল ১৬২৭-১৬৫৮

জাহানারা দারা শুকোহ্ শাহ সুজা রোসন্নারা আওরঙ্গজেব মুরাদ বকশ গওহরআরা

দারা শুকোহ্: সুলেইমান শুকোহ্ সিপির শুকোহ্

আওরঙ্গজেব
১৬১৮-১৭০৭
রাজত্বকাল
১৬৫৮-১৭০৭

মুহাম্মদ সুলতান মুয়াজ্জেম (বাহাদুর শাহ) আজম আকবর কাম বকশ

* বিবাহিত
* শাহজাহান আর মমতাজ মহলের সাত সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বেঁচে ছিল
টীকা : সব সম্রাটের একাধিক স্ত্রী ছিল
হুমায়ুনের আম্মিজানের নাম মা'সুমা
আকবরের আম্মিজান হামিদা
জাহাঙ্গীরের আম্মিজান ছিলেন আম্বারের অজ্ঞাতনামা একজন রাজকন্যা আবুল ফজল যার নাম উল্লেখ করেননি

ভারতবর্ষে মোগল
১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যুর সময় মোগল সাম্রাজ্যের এলাকা
১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে মোগল নিয়ন্ত্রনাধীন অতিরিক্ত এলাকা
ফারগানা
বুখারা
সমরকন্দ
ট্রান্সঅক্সোনিয়া
হিন্দুকুশ
কাবুল
পেশোয়ার
কাশ্মির
শ্রীনগর
হেরাত
গজনী
খাইবার গিরিপথ
অ্যাটক
কান্দাহার
লাহোর
হিমালয় পর্বতমালা
যমুনা
পানিপথ
হিসার ফিরোজ
দিল্লি
বেলুচিস্তান
পাঞ্জাব
বিকানীর
মথুরা
মাকরানা
জয়সালমীর
জয়পুর (আম্বর)
ফতেহপুর
খাওয়াজ
যোধপুর (মারওয়ার)
আজমীর
গোয়ালিওর
সিন্ধু
অমরকোট
রাজস্থান
ওরচা
এলাহাবাদ
পাটনা
কচের মরুভূমি
বেনারস
উদয়পুর
বিহার
উজ্জয়িনী
নরমদা
হুগলী
বাংলা
গুজরাট
মালওয়া
মানডু
বেলাঘাট
ক্যালকাটা (কলকাতা)
তাপ্তি
বুরহানপুর
সুরাত
মহানন্দা
দৌলতাবাদ
উড়িষ্যা
মহারাষ্ট্র
আওরঙ্গবাদ
বোম্বে (মুম্বাই)
আহমেদনগর
দাক্ষিণাত্য
আরব মহাসাগর
বিদার
হায়দারাবাদ (গোলকুন্ডা)
বিজাপুর
কৃষ্ণা
গোয়া
বঙ্গোপসাগর
0 Miles 500
0 Kilometers 500
কর্নাটক
মাদ্রাস (চেন্নাই)
কাবেরী
ভারত মহাসাগর
© 2006 Jeffrey L. Ward
N

প্রারম্ভিকা

দাক্ষিণাত্যের উষ্ণ, ভ্যাপসা উপত্যকায় অবস্থিত ধূলিধূসরিত একটি দুর্গে এক সেনা অধিপতি নিজের সুন্দরী সালঙ্কারা আর আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর সাথে বসে শতরঞ্চ খেলার সময় আমাদের কাহিনীর সূত্রপাত। সময়টা ১৬৩১ সাল। মুসলিম দিনপঞ্জি অনুসারে ১০৪০ হিজরি—আর বলার অপেক্ষা রাখে না, তারা উভয়েই মুসলমান। সহসা, গল্পটার প্রচলিত ভাষ্য অনুসারে, একটি তীব্র ব্যথা সেনা অধিপতির সুন্দরী স্ত্রীর তলপেট খামচে ধরে। দুর্গের হেকিমকে দ্রুত ডেকে পাঠানো হয় এবং তাদের ঐকান্তিক প্রয়াস সত্ত্বেও আটত্রিশ বছর বয়সী এই মাতার চতুর্দশতম গর্ভধারণ ক্রমেই ভীষণভাবে জটিল হয়ে ওঠে। রক্তক্ষরণের ফলে দুর্বল, তিনি শেষবারের মতো তার হতবিহ্বল স্বামীকে তাদের চিরস্থায়ী ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে দ্বিতীয়বারের মতো দার পরিগ্রহ করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন। তার শেষ অনুরোধ ছিল তিনি যেন তার স্মৃতির উদ্দেশে এমন একটি মকবরা নির্মাণ করেন, যা পৃথিবীর বুকে যেমনটা তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন বেহেশতের মাত্রা যোগ করবে।

দরবারের রাজকীয় দিনপঞ্জির রচয়িতারা পরবর্তী সময়ে সন্তান জন্ম দেয়ার পর তার মৃত্যুর কথাটা কয়েকটা পঙ্ক্তিতে লিপিবদ্ধ করেছেন :

> 'যখন তিনি শেষ মোতিটা পৃথিবীর আলোয় ভূমিষ্ঠ করেন
> নিজের দেহকে তিনি ঝিনুকের মতো নিঃস্ব করে ফেলেন।

আমাদের সেই সেনা অধিপতি, তার স্বামী মোগল সম্রাট শাহজাহান, তাদের ভাষ্য অনুসারে দুই বছরের জন্য নিজেকে আড়াল করে ফেলেন, পার্থিব ভোগবিলাস এবং দ্যুতিময় রত্ন আর মূল্যবান পরিচ্ছদের পরিবর্তে ধবধবে সাদা রঙের শোকের পোশাক পরিধান করেন। তার দরবারের এক সভাকবির ভাষায়, 'তার চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু মুক্তাবিন্দু হয়ে ঝরে পড়ে।' তার মাথার সব চুল এক রাতের ভেতর সাদা হয়ে যায়। তিনি তার স্ত্রী মমতাজ মহল, 'প্রাসাদের প্রিয় পাত্রী'র আদিষ্ট স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে নিজের সমস্ত সামর্থ্য নিহিত করেন, তিনি এমন একটি মকবরা নির্মাণ করেন, যা কেবল পৃথিবীর বুকে বেহেশতকেই উপস্থাপিত করে না, একই সাথে মৃত্যুর মাঝেও বিলাসিতা আর ভোগাসক্তির একটি স্মারক হিসেবে বিরাজ করে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শাহজাহানের রাজধানী আগ্রায় যমুনা নদীর একটি বাঁকের ওপর

নির্মিত এই মকবরাকে আমরা আজ তাজমহল নামে চিনি, পৃথিবী বিখ্যাত ভালোবাসার স্মৃতিসৌধ।

তাজমহলের স্থপতি কে ছিলেন সেটা আজ আর নিশ্চিতভাবে জানার যেকোনো সুযোগ নেই কিন্তু গবেষকদের অন্তহীন গবেষণার বিষয়বস্তু এই স্থপতি হিন্দু আর মুসলিম বাস্তুশাস্ত্রের সংশ্লেষ ঘটিয়ে, নিখুঁত প্রতিসাম্য আর মার্জিত সৌন্দর্যের একটি আকল্প শ্বেতশুভ্র মর্মর আর গোলাপি বেলে পাথরের মাঝে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাজমহলের বিশাল আকৃতি সত্ত্বেও—প্রধান গম্বুজটা ২৪০ ফিট উঁচু আর এর আলম্ব ১২০০০ টনের অধিক ভার বহন করছে। তাজমহলের মূল মকবরাকে চারপাশের সবুজ উদ্যান আর জলাধারের জলবিম্বের ওপর আপাত নির্ভার হয়ে যেন ভেসে রয়েছে বলে মনে হয়। তাজমহলের সবচেয়ে কট্টর সমালোচকও তাজের রূপকথাতুল্য নাজুক সৌন্দর্যে বিমোহিত হন।

তাজমহলকে সমসাময়িক কালের সবাই একবাক্যে শাশ্বত বিস্ময় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সপ্তদশ শতকের এক ফরাসি পর্যটকের বীক্ষণ অনুসারে এই মকবরার স্থান 'বিশ্বের বিস্ময়ের মাঝে মিশরের পিরামিডের তুলনায় অনেক উঁচুতে হওয়ার দাবিদার।' এক মোগল পণ্ডিত লিখেছেন, 'তাজমহলের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকলে সূর্যের চোখও অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে এবং এর ছায়া যেন পৃথিবীর বুকে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা বয়ে আনে।'

পরবর্তীকালের দর্শকরা তাজের নির্মল, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের কারণে তাদের মাঝে জন্ম নেয়া আবেগ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করতে গিয়ে শব্দের অভাবে রীতিমতো হিমশিম খেয়েছে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি (স্যার) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে তাজমহল 'কালের কপোলে একটি অশ্রুবিন্দু।' রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের কাছে তাজমহল 'গজদন্তের তোরণ, যার ভেতর দিয়ে সমস্ত শুভ স্বপ্নের আবাহন হয়; টেনিসন যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সেই ভোরের দ্যুতিময় পথের উপলব্ধি...যা কিছু পবিত্র, শুদ্ধ এবং অসংগত সব কিছুর মূর্ত প্রকাশ।' এডওয়ার্ড লিয়ার রায় দেন, 'এই অপূর্ব মনোরম স্থানের বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করাই বোকামি কারণ কোনো শব্দের পক্ষে এর সৌন্দর্যকে ধারণ করা সম্ভব নয়। অতএব পৃথিবীর বাসিন্দাদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—একদিকে যারা তাজমহল দর্শন করেছেন আর অন্যদিকে যারা করেননি।' একজন মহিলাই প্রথম ব্যক্তি, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তার স্ত্রী, যিনি যথাযথভাবে ভালোবাসার তীব্রতার ভীষণ সুন্দর রূপটা অনুধাবন করেছেন, যা এই মকবরার নির্মাণকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি তার স্বামীকে সহজ ভাষায় লিখেছেন, 'আমি তোমায় বলতে পারব না আমি কী ভাবছি, কারণ আমি জানি না কীভাবে এমন একটি ইমারতের সমালোচনা করতে হয়, কিন্তু আমি তোমায় অকপটে আমার অনুভূতির কথা বলতে পারি। আমি আগামীকাল বা এখনই মরতে রাজি আছি, যদি কথা দেয়া হয় যে আমার সমাধির ওপর এমন আরেকটা মকবরা নির্মাণ করা হবে।'

আঠারো শতকের শেষ নাগাদ, ব্রিটিশ চিত্রকর টমাস দানিয়েল, যিনি প্রথম তাজমহলের কয়েকটা দারুণ চিত্রকর্ম আর ভূমি বিন্যাসের পরিকল্পনা অঙ্কন

করেছিলেন, তার পরিদর্শন শেষে লিখেছেন : 'তাজমহলকে সব সময় বিবেচনা করা হয়...সর্বোচ্চমাত্রার একটি দর্শনীয় বস্তু...সমস্ত অঞ্চল আর সর্বস্তরের লোকজন এটা দর্শন করতে আসে।' শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে তাজের খ্যাতি কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছে। তাজমহল বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক স্মারক এবং স্ট্যাচু অব লিবার্টি, আইফেল টাওয়ার, পিসার হেলান স্তম্ভ, চিনের প্রাচীর, সিডনির অপেরা হাউসের মতো পৃথিবীর অন্যতম দ্রুত শনাক্তযোগ্য একটি কাঠামো। একটি দখলদার রাজবংশ কর্তৃক নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এবং সেইসাথে সমস্ত পৃথিবীতে এটা ভারতবর্ষের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজকুমারী ডায়ানা তার তৎকালীন স্বামী প্রিন্স চার্লসের সাথে যখন ভারত সফরে আসেন, সেই সময়ে তাজের প্রতিকৃতির ক্ষমতা এমনই যে তিনি যখন একাকী তাজ পরিদর্শন করেন এবং সেখানে তার ছবি তোলার অনুমতি দেন—রাজকীয় প্রেমের একটি চিরস্থায়ী ইমারতের সামনে সাদা মার্বেলের একটি বেঞ্চে উপবিষ্ট, একাকী, শোকার্ত আর বিষণ্ন এক প্রতিমা—তখন কোনো শব্দের আর কোনো প্রয়োজন হয় না।

তাজমহল কেবল পরম ভালোবাসার নয় একই সাথে সে বিশ্বস্ত সামর্থ্য আর প্রবল ক্ষমতার প্রকাশ। তাজমহল এমন একজন সম্রাটের সৃষ্টি, যার সাম্রাজ্য পশ্চিমে সিন্ধু নদ অতিক্রম করে বর্তমান সময়ের পাকিস্তান, আফগানিস্তান, পূর্বে সুবে বাংলা আর দক্ষিণে্য মধ্য ভারতের দাক্ষিণাত্যের অধিত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। শাহজাহানের পূর্বপুরুষ, পূর্ববর্তী চারজন সম্রাট, নাছোড়বান্দার মতো নিজ অভিপ্রায়ে অটল থেকে এই বিশাল—বিপুল সমৃদ্ধ—ভূখণ্ড দখল করেছিলেন। তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী ভূখণ্ড থেকে হিন্দুকুশ পর্বতমালার অন্য পাশে স্থানীয় উপজাতি গোত্রের শাসকদের নিজেদের মধ্যবর্তী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণে বিতাড়িত হয়েছিলেন। বাবরের, প্রথম মোগল সম্রাট, তার নেতৃত্বে তারা খাইবার গিরিপথের ভেতর দিয়ে হিন্দুস্তান—উত্তর ভারত অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। তারা তাদের দখলকৃত ভূখণ্ডে আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হলেও প্রথমদিকে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত ছিল। বাবরের নাতির রাজত্বকালের পূর্বে—শাহজাহানের পিতামহ আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ সময়ে—ভারতবর্ষে মোগল আধিপত্য নিরাপদ ছিল না।

স্থিতিশীলতার হাত ধরে এগিয়ে এসে ধরা দেয়া সমৃদ্ধি মোগলদের সুযোগ করে দেয় তাদের ঐতিহ্যবাহী নান্দনিক আগ্রহ চরিতার্থ করতে। তারা তাদের পেছনে ফেলে আসা শীতল আবহাওয়ার জন্য অতীত বিধূরতায় আক্রান্ত হতেন, ঝরনা আর পানির নহর দ্বারা প্রবাহিত পানির সুন্দর উদ্যানের জন্য এবং সেইসাথে বিশ্রামের জন্য খোলামেলা হাভেলির প্রতি তাদের ভেতরে একটি দুর্বলতা কাজ করেছিল। তাজমহলের আদিরূপের সেটাই ছিল প্রথম অবস্থা এবং আজও সেইসব উদ্যানের অনেকগুলোই দেখতে পাওয়া যায়। একটি সময় সম্রাটও উৎসাহী নির্মাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাদের নতুন ভূখণ্ডে দুর্গ আর প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেন এবং নিজেদের প্রমোদ কাননের ভেতরে নিজের জন্য সুন্দর মকবরা নির্মাণ করেন। তারা তাদের সাথে গম্বুজ

নির্মাণের জ্ঞান নিয়ে এসেছিলেন, যা বহু বছর ধরে তারা ইসলামি আর স্থানীয় বাস্তুরীতির এক অনন্য সংমিশ্রণের ফলে তারা সৃষ্টি করেছিল। মোগল কোষাগারে স্তূপীকৃত হয়ে থাকা, ভারতবর্ষের অবিশ্বাস্য সম্পদরাশি অসাধারণ পরিশীলিত আর চমকপ্রদ মকবরা নির্মাণে তাদের সহায়তা করেছে। শাহজাহান আক্ষরিক অর্থেই তাজমহলকে বহুমূল্য রত্ন দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন, মকবরার সাদা মর্মর পাথরে দীপ্তিময় ফুলের আকৃতি প্রণিহিত করে স্বর্গীয় আদিনিবাসের পার্থিব রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন, যেখানে মমতাজ মহল তার শোকার্ত স্বামীর সাহচর্য পুনরায় লাভ করার জন্য প্রতীক্ষা করেন।

তাজমহল মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শৈল্পিক অভিব্যক্তি—যার সমকক্ষ হবার সাধনা করা হলেও তাকে কখনো অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। তাজমহল নির্মাণের কারণে অবশ্য এর নির্মাতা শাহজাহানকে সর্ব অর্থেই চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। পৃথিবীর বুকে এক টুকরো বেহেশত নির্মাণ করাটা ছিল অর্থনৈতিক আর প্রাকৃতিকভাবে প্রায় অসম্ভব একটি কর্মভার। সমসাময়িক এক ইংরেজ পর্যটক লিখেছেন, 'অত্যাধিক শ্রম আর ব্যয়ের দ্বারা ভবনটা নির্মিত হতে থাকে...সোনা আর রূপার মতো মূল্যবান ধাতুকে মামুলি আটপৌর অবস্থায় নামিয়ে আনা হয় আর মর্মরে পরিণত করা হয় নুড়িপাথরে।' তাজমহলের নির্মাণ আর মমতাজ মহলের আকস্মিক মৃত্যুর আবেগপূর্ণ প্রভাব শাহজাহানের কোষাগারকে প্রায় খালি করে ফেলে এবং রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তাকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত করে দেয়। মাতৃহীন রাজপরিবারে এর ফলে একটি নতুন উত্তেজনা দানা বাঁধে, শাহজাহানের নিজের পতনের ভিত্তিভূমি রচনা করে আর তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর সম্রাটকে আর তার সাম্রাজ্যকে ধর্মীয় মৌলবাদ আর অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়, তাকে সবেগে নিপাতিত করার মাধ্যমে।

শাহজাহান তখনো জীবিত, তিনি তার আর মমতাজ মহলের চার পুত্রকে তার সিংহাসনের জন্য লড়াই করতে দেখে এবং এই লড়াইয়ের বিজয়ী কঠোর গোঁড়া আওরঙ্গজেব নিজের আপন দুই ভাইকে আর শাহজাহানের বেশ কয়েকজন নাতিকে হত্যা করেন। শাহজাহান নিজেও তার জীবনের শেষ বছরগুলো আগ্রা দুর্গে অন্তরীত অবস্থায় কাটাতে বাধ্য হন। বলা হয়ে থাকে, সেখানে তিনি যমুনার ওপারে অবস্থিত তাজমহলের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকে তার দিন অতিবাহিত করতেন এবং আক্ষেপ করতেন, আজ যদি তাজমহলের মালকিন মমতাজ মহল বেঁচে থাকতেন তাহলে কি পরিস্থিতি এমন হতে পারত?

শাহজাহানের তিয়াত্তর বছরের জীবনের ১৫৯২ থেকে ১৬৬৬ সাল অবধি, মোগলদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়কাল। কিন্তু একই সাথে সেটা এমন একটি সময় যখন বাইরের জগতে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে আর যার প্রভাব মোগল সাম্রাজ্যের ওপর ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে। মধ্যপ্রাচ্যে তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্য লেপান্তে ভেনিসীয় আর স্প্যানিশ নৌবাহিনীর হাতে তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরাজয়ের শিকার হবার পরে নিজেদের পুনরায় সংগঠিত করছে। তৃতীয় মেহমেতের অধীনে যিনি ১৫৯৫ সালে ক্ষমতা লাভ করার জন্য নিজের সাতাশজন আপন ভাইকে হত্যা করেছিলেন—একটি সংখ্যা, যা শাহজাহানের রাজত্বকালের অন্তিম পর্বে ভ্রাতৃহত্যার তালিকার সাথে একটি পারম্পর্যের জন্ম

দেয় এবং তার উত্তরসূরিরা বলকানের অধিকাংশ অঞ্চল পুনরায় অধিকার করে। ১৬৩৯ সালে তারা পারস্যের কাছ থেকে, যা বর্তমানে ইরাক সেই অঞ্চল পুনরায় দখল করে নেয় এবং পারস্যের সাথে একটি স্থায়ী সীমান্তের সৃষ্টি করে। পারস্য এরপর যেকোনো ভবিষ্যৎ বিজয়ের জন্য তাদের মনোযোগ পূর্ব দিকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

পারস্য দীর্ঘদিন ধরে মোগলদের মিত্র আর প্রতিপক্ষের ভূমিকায় পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। পারস্য সম্রাট পূর্ববর্তী মোগল সম্রাটদের প্রয়োজনের মুহূর্তে সমর্থন দিয়েছেন কিন্তু অতি সম্প্রতি নতুন সাফাভিদ রাজবংশের অধীনে তারা বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান এবং উৎসাহিত করতে শুরু করেছেন এবং মোগলদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত স্থানান্তরের বিরোধিতা করছেন। মধ্য এশিয়ায় তাদের যাযাবর উৎপত্তি সত্ত্বেও মোগলরা তাদের সাংস্কৃতিক অনুপ্রেরণার জন্য পারস্যের মুখাপেক্ষী ছিল। সম্রাট আকবর দরবারের ভাষা হিসেবে ফার্সিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং রাজপরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি অমাত্যরাও ফার্সিতে গদ্য আর পদ্য রচনায় বেশ দক্ষ ছিল।

মোগলরা পারস্যকে দক্ষ জনশক্তির আধার হিসেবে বিবেচনা করত। অনেক মোগল অমাত্য, সেনাপতি আর চিত্রকর, যারা পারস্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বা পার্সি বংশোদ্ভূত ছিলেন। আমানত খান ছিলেন প্রথমোক্তদের অন্তর্গত, শিরাজ থেকে আগত চারুলিপিকর, শাহজাহান কর্তৃক তাজমহলের কারুকাজে স্বাক্ষরের অনুমতি লাভকারী একমাত্র ব্যক্তি। মমতাজ মহল নিজে ছিলেন শেষোক্তদের অন্তর্গত, তার পিতামহ মাত্র কয়েক দশক পূর্বে কপর্দকশূন্য অবস্থায় পারস্য থেকে অভিবাসী হিসেবে মোগল দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেই অবস্থা থেকে শাহজাহানের আব্বাজান জাহাঙ্গীরের প্রধানমন্ত্রী বা *উজিরের* পদমর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন।

শাহজাহানের জীবদ্দশায় ইউরোপের বলিষ্ঠ পরিবর্তন ঘটে এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলোর ভেতরে ভারসাম্যের পরিবর্তন হয়। ত্রিশ বছরের যুদ্ধের পরিণতি জার্মানিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে দুইশ বছর পর প্রুশিয়ার সাম্রাজ্যের উত্থানের ফলেই কেবল এ পরিস্থিতির অবসান ঘটবে। ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ফ্রান্স অবশ্য চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে ক্ষমতার শিখরে আরোহণ করবে, যার কেন্দ্রীয় স্বৈরাচারী দরবারের সাথে মোগল দরবারের অনেক মিল রয়েছে এবং মোগলদের মতো তিনিও সম্রাটের দিব্য অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন।

প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী ইংল্যান্ড অবশ্য এ দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী ছিল না এবং ১৬৪৯ সালে প্রথম চার্লসের বিচার আর প্রাণদণ্ড, তার পরিবর্তে নীতিবাগীশ একটি প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি করে, যা ১৬৬০ সালে পার্লামেন্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত বজায় ছিল। ১৬০৭ সালে ইংরেজরা আমেরিকার ভার্জিনিয়ার জেমসটাউনে তাদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে, সে বছরই মমতাজের সাথে শাহজাহানের বাগদান সম্পন্ন হয়। ১৬৬৪ সালে, শাহজাহানের মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে, ডাচদের কাছ থেকে তারা নিউ আমস্টারডাম শহর অধিকার করে এর নতুন নামকরণ করে নিউইয়র্ক। ডাচরা প্রাচ্যে তাদের একচেটিয়া আর দ্রুত বিকশিত হতে থাকা মসলার ব্যবসার মাঝে

সান্ত্বনা খুঁজে পাবার চেষ্টা করে, যেখানে তারা ১৬১৯ সালেই বাটাভিয়ায় (জাকার্তা) ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির সদর দপ্তর স্থাপিত করেছে।

স্প্যানিশরা মধ্য আর দক্ষিণ আমেরিকায় বহু দিন ধরেই কর্তৃত্ব করছিল। শাহজাহানের মৃত্যুবরণের সময়েই তারা অবশ্য হৃতগৌরব একটি শক্তির ভাগ্য বরণ করতে চলেছে। তারা তাদের সমসাময়িক মোগলদের মতোই ধন-সম্পত্তির লোভ আর রাজকীয় আমলাতন্ত্রের প্রভাব মুক্ত একটি স্বাধীন ব্যবসা পদ্ধতি গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৬৫৫ সালে ইংলিশ প্রজাতন্ত্র স্পেনের কাছ থেকে জ্যামাইকা দখল করে নেয় এবং সেখান থেকে এরপর তাদের প্রাইভেটিয়্যার বা জলদস্যুরা স্পেনের ধনসম্পদ লুট শুরু করে। সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হয় যখন স্বাধীন ইংরেজ ব্যবসায়ীরা স্থানীয় স্প্যানিশ বণিকদের স্পেনের শুল্কব্যবস্থার বিধি-নিষেধের বাইরে ব্যবসা করতে সহায়তা করা শুরু করে। ইংরেজরা বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও তাদের নিজস্ব ঘরানার মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা নিয়ে হাজির হয়। ১৬১৯ সালে তারা ভার্জিনিয়ায় প্রথম নিয়ে আসা কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাসদের জন্য আফ্রিকায় স্থানীয় শাসকদের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং ইস্ট ইন্ডিজে ডাচ আর স্প্যানিশদের একচেটিয়া ব্যবসায় ভাগ বসাতে শুরু করে।

শেকসপিয়র এবং তার সমসাময়িকরা যেমন ক্রিস্টোফার মার্লো 'ভারত'-এর কথা যখন উল্লেখ করেন সেটা তাদের কাছে ছিল মসলা আর মূল্যবান রত্নের বিবিধ ঐশ্বর্যের সমার্থক। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি ১৬০০ সালে রাজকীয় ফরমান লাভ করেছিল এবং ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে যেখানে ১৫১০ সাল থেকে পর্তুগিজরা অবস্থান করছিল সেখানে প্রথম বাণিজ্য শুরু করে। মোগল দরবারে ব্রিটিশ আর পর্তুগিজরা অবশ্য কেবল মামুলি পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করত। শাহজাহানের আব্বাজান জাহাঙ্গীরের প্রতিকৃতির একটি অনুচিত্রে তাকে পৃথিবীর শাসক হিসেবে দেখানো হয়েছে। ইংল্যান্ডের প্রথম জেমসকে নিচের অংশে একটি গৌণ অবস্থানে গুরুত্বহীন অবস্থায় দেখানো হয়েছে। চিত্রে তার চেহারা খানিকটা খিটখিটে দেখায় যদিও জাহাঙ্গীরের চেয়ে তার কাপড় আর দেহ তুলনামূলকভাবে ছোট, সামান্য পরিমাণ মুক্তা আর রত্ন তার দেহে শোভা পাচ্ছে।

স্থাপত্যরীতির ক্ষেত্রে রোমে সেন্ট পিটার্সের নির্মাণ যখন মাত্র সমাপ্ত হয়েছে তখন শাহজাহান জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ক্রিস্টোফার ওয়ার্ন তার সেরা স্থাপত্যকর্ম লন্ডনে পৃথিবীর প্রথম প্রটেস্ট্যান্ট ক্যাথিড্রাল সেন্ট পলসের নির্মাণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন, তখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সেন্ট পিটার্সের সাথে পরবর্তী সময়ে বার্নিনির নকশা করা পিয়াজ্জা এবং যা নির্মিত হয়েছিল শাহজাহানের জীবনের শেষ দশকে, পুরোটাকে চারপাশ থেকে বেষ্টন করার মতো বিশাল ছিল তাজমহলের প্রাকারবেষ্টিত এলাকাটি। ভূমি থেকে ৩৬৫ ফিট উঁচু সেন্ট পলসের তুলনায় তাজমহল ২৪০ ফিটের চেয়ে সামান্য কিছুটা উঁচু কিন্তু সেন্ট পলসের পদচিহ্ন অনেক ক্ষুদ্র। পারস্যের দক্ষিণে অবস্থিত ইসফাহান শহরে শাহ আব্বাস ১৬১১ থেকে ১৬৩০ সালের ভেতর দারুণ সুন্দর শাহ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তাজমহলের সাথে এই মসজিদের, বাইরের আর ভেতরের স্তরের মাঝে ওজন সাশ্রয়ী শূন্যস্থান, বিশাল স্ফীত দ্বিস্তর

বিশিষ্ট গম্বুজ, যার অতিকায় আয়তাকার *ইবান*—প্রবেশপথ থেকে খানিকটা সরিয়ে নির্মাণ করা খিলানের কাঠামো—মকবরার সম্মুখভাগকে বিশিষ্টতা দান করেছে, নানা স্থাপত্যবিষয়ক মিল দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য তাজমহলের সাদা মর্মরের উপলবৎ বর্ণময় প্রশান্তির সাথে পারস্যের মসজিদের নীল, হালকা হলুদ আর সবুজ টালি দিয়ে আবৃত নকশার প্রাচুর্যের একটি বৈপরীত্য রয়েছে এবং এটা থেকেই বোঝা যায় মোগল ইমারতের নকশা আর অলংকরণে পারস্যের অভিবাসীদের অব্যাহতভাবে নিয়োজিত করা সত্ত্বেও মোগল স্থাপত্য পারস্যের প্রভাব থেকে কতটা সরে এসেছিল।

শাহজাহানের জীবদ্দশায় ক্যারাভাজ্জিও, ভেলাস কুয়েদ, রুবেনস ছিলেন ইউরোপের সবচেয়ে খ্যাতিমান চিত্রশিল্পীদের অন্তর্গত কিন্তু রেমব্রান্ট চিত্রশিল্পী ছাড়াও মোগল চিত্রকলা পরিলেখের সবচেয়ে বড় সংগ্রাহক। রেমব্রান্ট এসব চিত্রকর্মের ওপর ভিত্তি করে অসংখ্য খসড়া নকশা এঁকেছিলেন এবং আপাতভাবে মনে হয় চিত্রকর্মগুলোতে প্রদর্শিত অলংকারগুলোর প্রতি তার আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। শাহজাহানের চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রকর্মে, যারা তার আব্বাজান জাহাঙ্গীরের দরবারে আগত ইউরোপীয় পর্যটকদের উপহার দেয়া চিত্রকর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, রেমব্রান্ট নকল তৈরি করতেন। আর এটা নিঃসন্দেহে একটি উদাহরণ হতে পারে, কীভাবে এমনকি তখনো শৈল্পিক প্রভাব পুরো পৃথিবীব্যাপী পরিভ্রমণ করত। উৎকট স্বদেশি প্রেমে আপ্লুত ইউরোপের ঐতিহাসিকরা তাজমহলের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকায় অচিরেই তারা দাবি করতে শুরু করেন, তাজমহলের কম দামি পাথরের প্রনিহিত জটিল নকশা এবং সম্ভবত এর আকল্প ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রভাবিত বা এমনকি হয়তো তাদেরই সৃষ্টি। তাজের মূল উৎসবিন্দু সম্পর্কে এমন রেষারেষি আজও বিদ্যমান। আজকাল ভারতবর্ষে অনেকে এমন দাবিও করে যে, তাজমহল নির্মাণে ইসলামি আর স্থানীয় প্রভাবের মোগল সংশ্লেষের বদলে পুরোটাই বরং হিন্দুদের কৃতিত্ব। অন্য আরেক দলের দাবি এটা পুরোপুরি মুসলমানদের সৃষ্টি তাই শরিয়া আইনের অধীনে এর রক্ষণাবেক্ষণ হওয়া উচিত।

ইউরোপে মোগলদের সমকক্ষ যারা তাদের চেয়ে সম্ভবত তারা নিজেরাই নিজেদের বিস্তারিত জীবনযাত্রা নথিবদ্ধ রাখতে বিশেষ আগ্রহী ছিল। সম্রাট বাবর আর জাহাঙ্গীর রোজনামচা লিখতেন। আকবর আর শাহজাহান তাদের রাজত্বকালের প্রতিদিনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে দরবারে দিনপঞ্জি রচয়িতা নিয়োগ করেছিলেন এবং বিশেষ যত্নশীল ছিলেন সেগুলো আবেক্ষণ আর অনুমোদনের বিষয়ে। অনেক অমাত্যও রোজনামচা লিখতেন। রাজপরিবারের অধিকাংশ রোজনামচা আর অন্যান্য স্মৃতিকথা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। সাধারণ মানুষ 'মহান মোগল'দের রূপকথার মতো জীবন কাহিনী শুনতে আগ্রহী হওয়ায় ভারতে আগত ইউরোপীয় পর্যটকদের পুস্তকাকারে প্রকাশিত ধারাভাষ্যের সাথে একত্রে এসব দিনপঞ্জি আর ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা মুসাবিদা করা হলে রাজপরিবারের একটি বিস্ময়কর রকমের অন্তরঙ্গ আর বহুবর্ণ দৃশ্যকল্প ভেসে ওঠে, যার মধ্যে তাজমহলের সৃষ্টির বর্ণনাও পাওয়া যায়।
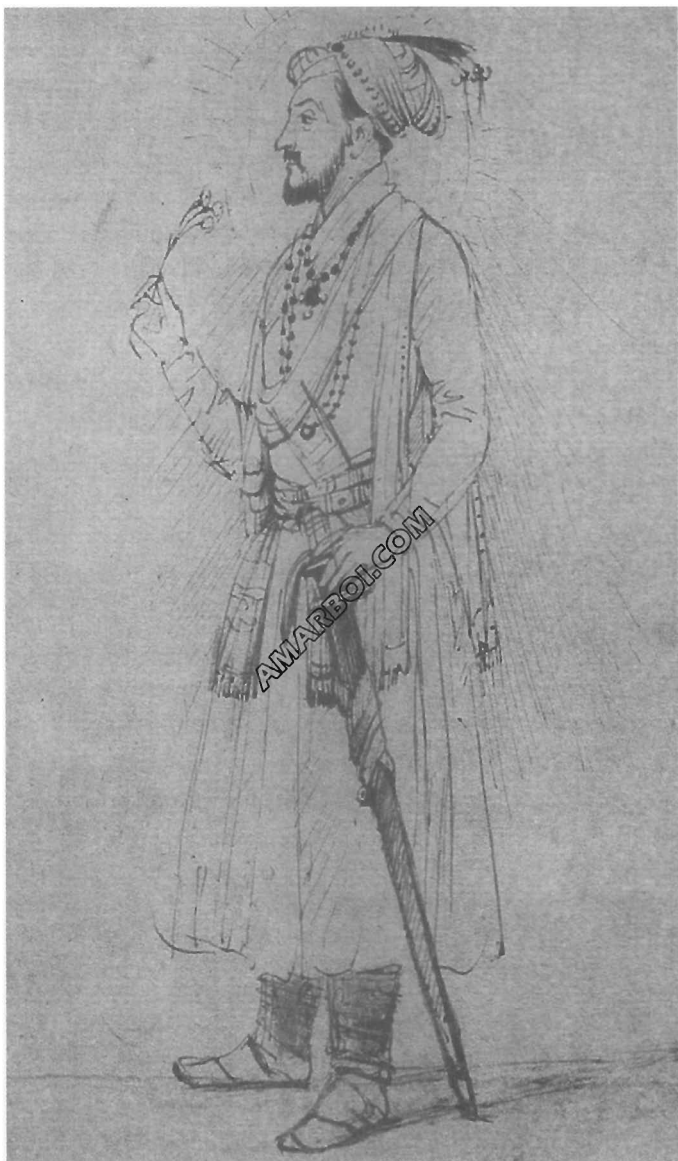
রেমব্রান্ড অঙ্কিত জনৈক মোগল শাসকের খসড়া।

তাজমহল আর তাকে সৃষ্টিকারী যে ভালোবাসা তার সাথে গ্রান্ড অপেরার পরিণত আবেগ আর গ্রিক ট্র্যাজেডির ছন্দ স্পন্দ পাওয়া যায়। তাজমহল হলো হারেমের রেশমের পর্দার পেছন থেকে দরবারের রাজনীতিতে কর্তৃত্বকারী ক্ষমতাশীল মহিমাময় নারী, ঈর্ষান্বিত পুত্র, উদ্ধত গোত্রপতিদের অচেনা দুনিয়ার বিপরীতে আপ্লুতকারী ভালোবাসার গল্প। একশ মিলিয়ন লোক অধ্যুষিত একটি সাম্রাজ্যের ভাগ্য রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল, যেখানে পুত্র পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চায়, ভাই অবলীলায় ভাইকে হত্যা করে এবং সম্রাজ্ঞী আর হবু সম্রাজ্ঞী একসাথে পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তে লিপ্ত হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও দ্যুতিময় ঐশ্বর্যের অবগুণ্ঠন, সর্বময় কর্তৃত্ব আর বিচিত্র দৃশ্যপট কোনোভাবেই আবেগের একান্ত ব্যক্তিগত কিন্তু সার্বলৌকিক প্রকৃতিকে অস্পষ্ট করতে পারেনি, যা তাজমহল সৃষ্টি করেছে। তাজমহলের সাথে সৌন্দর্য, ভালোবাসা আর শোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে সময় আর সংস্কার ছাপিয়ে যাওয়া কিছু প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে, আর সেইসাথে স্পর্শাতীত এসব গুণাবলিকে কি আদৌ সত্যিকার আর চিরস্থায়ী পার্থিব অভিব্যক্তি দেয়া সম্ভব সে সম্পর্কিত অনুচিন্তন।
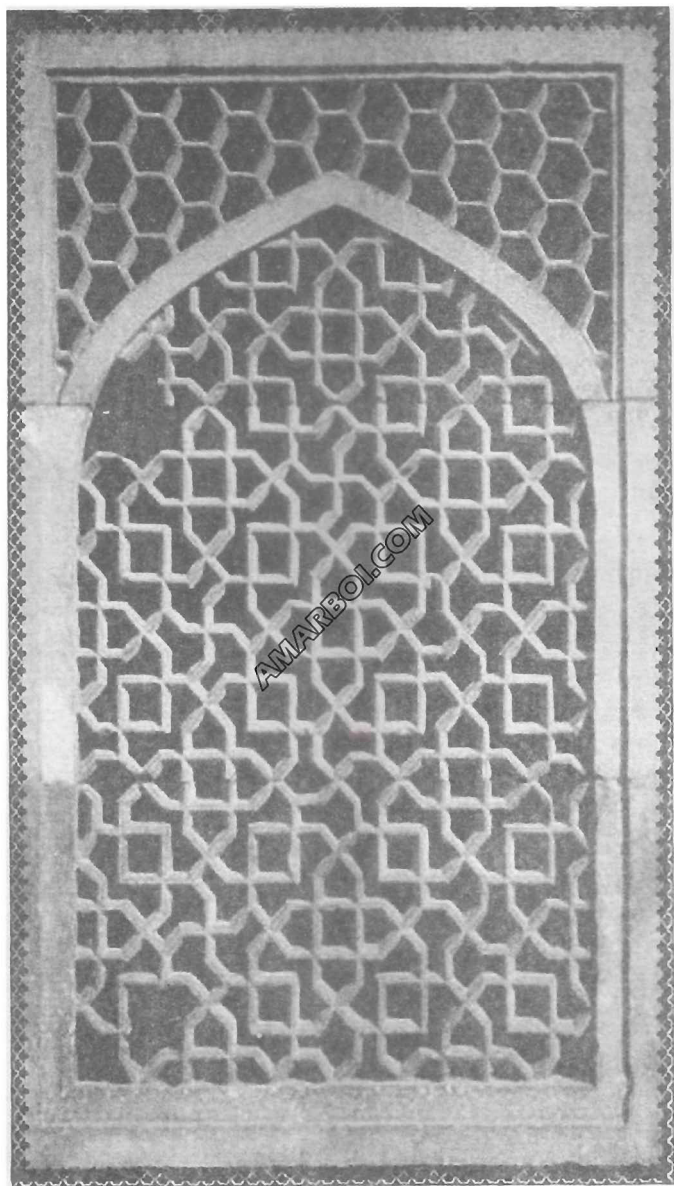
প্রথম অধ্যায়

মুগ্ধ সম্মোহনের দেশ

বাবর যদিও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তবে তার নিজের আব্বাজান ছিলেন মধ্য এশিয়ার সমরকন্দের পূর্বে অবস্থিত একটি ছোট রাজ্য ফারগানার রাজা। বাবরের ভাষায়, তিনি ছিলেন 'স্থূলকায় এবং খর্বাকৃতি...তিনি তার আলখাল্লা এত আঁটসাঁট করে পরিধান করতেন যে, দড়ি বাঁধার জন্য তাকে শ্বাস টেনে পেট ভেতরের দিকে চেপে রাখতে হতো। যদি তিনি শ্বাস ছেড়ে দিতেন তাহলে অনেক সময়ই দড়িগুলো ছিঁড়ে যেত।' তিনি ছিলেন 'সাহসী এবং বীর, মার্জিত-স্বভাবের, খানিকটা বাচাল আর তার সঙ্গ দারুণ ছিল। তার ঘুসিতে অবশ্য দারুণ জোর ছিল এবং তার ঘুসি খেয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। নিজের ভূখণ্ড বৃদ্ধির জন্য তার আকাঙ্ক্ষার কারণে অনেক সন্ধি নিমেষে ভেঙে যায় আর অনেক বন্ধু শত্রুতে পরিণত হয়।' ১৪৯৪ সালের ৮ জুন, খর্বাকৃতির গাট্টাগোট্টা এই মানুষটা যখন তার প্রাসাদের দেয়ালের ওপর অবস্থিত চবুতরা পরিদর্শন করছিলেন তখন দেয়ালের নিরাপত্তামূলক অংশ ভেঙে গিয়ে তাকে আর তার চবুতরাকে নিচের গিরিখাদে আছড়ে ফেলে। বাবর এরপরে লিখেছেন, এভাবেই 'আমার বয়স যখন বারো বছর আমি ফারগানা নামক রাজ্যের শাসকে পরিণত হই।'

বর্তমানকালের উজবেকিস্তান আর আফগানিস্তানে অবস্থিত বেশ কয়েকটা ক্ষুদ্র রাজ্যের একটি ফারগানা, যার শাসকরা ক্রমাগতভাবে নিজেদের ভেতর লড়াই করতেন দুটো পূর্ববর্তী রাজবংশের—চেঙ্গিস খান আর তৈমূর—বিখণ্ডিত উত্তরাধিকারের বৃহত্তর অংশ কুক্ষিগত করতে। প্রতিদ্বন্দ্বী শাসকদের সবাই একটি না একটি রাজবংশোদ্ভূত কিন্তু বাবর উভয় রাজবংশ থেকে উদ্ভূত বলে দাবি করতে পারতেন। বাবর তার আম্মিজানের দিক থেকে কিংবদন্তিতুল্য চেঙ্গিস খানের সরাসরি বংশধর। মঙ্গোলীয় সমভূমির স্থানীয় এক সর্দারের পুত্র, চেঙ্গিস খানের যখন জন্ম হয়েছিল বলা হয় যে তিনি তার হাতের মুঠোয় রক্তের একটি দলা খামচে ধরে ছিলেন, যা ছিল তার যোদ্ধা নিয়তির প্রতীক। ১২২৭

সালে তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি 'মহাসাগরবৎ শাসক' হিসেবে পরিচিত। তিনি আর তার যাযাবর অশ্বারোহী বাহিনী বেইজিং থেকে দানিয়ুব পর্যন্ত পরিচিত পৃথিবীর অর্ধেকটা অভিহরণ করেছেন।

তৈমূর ছিলেন তার আব্বাজানের দিক থেকে বাবরের প্র-প্র-প্রপিতামহ। ইউরোপীয়দের কাছে তিনি তার ডাকনাম 'তৈমূর দা লেম'-এর অপভ্রংশ থেকে তৈমূরলঙ নামে বেশি পরিচিত ছিলেন; তিনি ছিলেন যাযাবর বারলাস তুর্কিদের সর্দার যিনি বাবরের জন্মের একশ বছর পূর্বে আরো একবার চিনের সীমান্ত থেকে তুরস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার রাজধানী ছিল উপকথাখ্যাত সমরকন্দের সোনালি শহর। তার পূর্বে চেঙ্গিস খানের মতো, তৈমূরের সাম্রাজ্যও তার মৃত্যুর পর একজন উত্তরাধিকারীর হাতে ন্যস্ত হবার বদলে পরিবারের ভেতর ভাগ হয়ে যায়; ফলে দ্রুত সাম্রাজ্যটি টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

বাবর তার মোঙ্গল উত্তরাধিকারীর চেয়ে তার তৈমূরীয় পরিচয়ের জন্য বা যাকে তিনি তার তুর্কি বংশক্রমাগম ভাবতেন বেশি গর্বিত ছিলেন। তার মন্তব্য যে 'মোঙ্গলরা যদি দেবদূতদের বংশও হতো তার পরও তারা একটি জঘন্য জাতি হিসেবেই পরিচিতি পেত' তাদের সম্বন্ধে তার ধারণাকে প্রকাশ করে এবং তিনি নিশ্চিতভাবেই অপমানিতবোধ করতেন যে, ভারতবর্ষে তিনি যে রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন সেটা ফার্সি মোঙ্গল শব্দের অপভ্রংশ থেকে 'মোগল' হিসেবে পরিচিত হয়।

সে যাই হোক, তার মোঙ্গল পিতামহীই বাবরকে তার শাসনকালের বয়ঃসন্ধির শুরুর বছরগুলোতে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি পর্দার নেকাবের পেছন থেকে মোগল সম্রাটদের পথপ্রদর্শনকারী প্রথম মহিলা কিন্তু কোনোভাবেই তার পরেই এই রীতি শেষ হবে না, তার পৌত্রের ভাষ্য অনুসারে তিনি ছিলেন, 'বুদ্ধিমতী আর দারুণ পরিকল্পনাকারী। তার সম্মতি নিয়েই বেশির ভাগ সমস্যার সিদ্ধান্ত নেয়া হতো।' তার তত্ত্বাবধানেই বাবর তিন বছরের ভেতরে সমরকন্দ দখল করে, কিন্তু তার শাসন মাত্র একশ দিন স্থায়ী হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, কিংবদন্তিতুল্য সোনালি শহরের দখল হারাবার কষ্ট সহ্য করা 'আমার জন্য কঠিন ছিল। আমি একদম বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদেছিলাম।' তিনি অবশ্য, তিন বছরের কম সময়ের ভেতরে, ১৫০০ সালের জুলাই মাসে, পুনরায় সমরকন্দের ওপর অধিকার কায়েম করেছিলেন।

বাবর এরই মধ্যে বিয়ে করেন কিন্তু অভিজ্ঞতাটা তিনি উপভোগ করতে পারেন না। 'বিয়ের পরে শুরুর দিকের দিনগুলোতে আমি ভীষণ লাজুক ছিলাম, আমি দশ, পনেরো বা বিশ দিন পরে তার কাছে যেতাম। আমি একটি পর্যায়ে তার প্রতি একেবারেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলি...চল্লিশ দিনে একবার আম্মিজান আমার রসদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের কঠোরতায় তার কাছে ঠেলে পাঠাতেন।' বাবর

স্বীকার করেছেন যে, বাবুরি নামে বাজারের এক ছেলের প্রতি কৈশোরের প্রেমভাব জাগ্রত হওয়ায় তার ভালোবাসা অন্যত্র নিবদ্ধ ছিল : 'তার জন্য আমার ভেতর বিচিত্র একটি টান সৃষ্টি হয়েছিল—তার জন্য আমি নিজেকে কেমন খেলো করে তুলেছিলাম। এই অভিজ্ঞতার পূর্বে আমি কারো জন্য কখনো কোনো আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিনি। বাবুরি মাঝে মাঝে আমার কাছে আসত কিন্তু আমি এত লাজুক ছিলাম যে আমি কখনো তার মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না, তার সাথে খোলামেলা কথাবার্তার প্রশ্নই ওঠে না। সংগতিপূর্ণ আলাপচারিতার কোনো সম্ভবনাই ছিল না।' বাবরের স্ত্রী তাদের বিয়ের প্রায় তিন বছর পরে তাকে পরিত্যাগ করতে তিনি লিখেছেন, 'তার বড় বোনের প্ররোচনায়।'

সমরকন্দে বাবরের দ্বিতীয়বারের শাসনকাল তিনি তার প্রতিপক্ষের কাছে শহর পরিত্যাগ করে গুটিকয়েক অনুসারী নিয়ে শহর ত্যাগে বাধ্য হবার পূর্বে এক বছরের কম সময় স্থায়ী হয়েছিল। তার সৌভাগ্যের এটা ছিল নিম্নতম বিন্দু। তিনি পরবর্তী সময়ে স্বীকার করেছেন, 'পাহাড় থেকে পাহাড়ে গৃহহীন, যাযাবরের ন্যায় বিচরণের স্বপক্ষে বলার মতো কিছুই নেই।' তিনি তারপর জানতে পারেন যে কাবুল, আরেকটি পুরুষানুক্রমিক তৈমূরের এলাকা। সেখানে পূর্ববর্তী শাসকের, বাবরের চাচাদের একজন, মৃত্যুর কারণে একজন বহিরাগত সেখানের কর্তৃত্ব দখল করেছে। বাবর যদি শহরটা দখল করতে পারেন তাহলে যে কারো মতো তারও শহরটার ওপর জোরাল দাবি রয়েছে। বাবর অগ্রসর হতে শুরু করায় তার বাহিনী কলেবরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শাসকের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বিশৃঙ্খলার মাঝে শহরটা ফেলে রেখে পিঠটান দেন। বাবর স্মৃতিচারণা করেছেন, 'আমি শেষ পর্যন্ত ঘোড়ায় চেপে সেখানে উপস্থিত হই এবং চার-পাঁচজনকে গুলি করি আর দুই কিংবা একজনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করতে হয়। বিশৃঙ্খলা বন্ধ হয়।' ১৫০৪ সালের ১৪ জুন, মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি কাবুলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তার জীবনের বাকিটা সময় কাবুল তার শক্তির কেন্দ্র আর আধ্যাত্মিক বাসভূমি হিসেবে বিবেচিত হবে। বাবর এখানে এই কাবুলেই পুস্তক আর বাগিচার প্রতি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা আগ্রহকে প্রশ্রয় দেয়ার মতো অবসর পান।

ইউরোপে বর্বর যাযাবর হিসেবে তার পরিচিতি সত্ত্বেও এবং ক্রিস্টোফার মার্লোর ভাষায়, 'ঈশ্বরের চাবুক', তৈমূরও ছিলেন একজন পরিশীলিত মানুষ। সমরকন্দে তিনি চমৎকার সব উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন। এক ইউরোপীয় রাজদূত বর্ণনা করেছে কীভাবে উদ্যানগুলোর 'ফলের বৃক্ষের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য জলের নহর প্রবাহিত হতো এবং একটি সুখকর ছায়ার সৃষ্টি করত। বৃক্ষশোভিত সড়কের কেন্দ্রে ছিল উঁচু মঞ্চ।'

তৈমূর তার যাযাবর জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতি অকপট থেকে নিজের নির্মিত উদ্যানে বিশালাকৃতির তাঁবুতে বাস করতেন, যার কোনোটা ছিল লাল রঙের, কোনোটা ব্যয়বহুলভাবে রেশমের তৈরি। কিন্তু তিনি সেইসাথে গম্বুজযুক্ত মসজিদ আর মকবরাও নির্মাণ করেছিলেন, যার প্রতিটিই ছিল নিখুঁত পরিকল্পনার প্রতিসাম্য।

বাবর বর্ণনা করেছেন তিনি কীভাবে কাবুলে এবং সম্ভবত অন্যত্রও তার প্রিয় উদ্যানগুলো নির্মাণ করেছিলেন : 'আমি পাহাড়ের পাশে দক্ষিণমুখী করে (এটা) নির্মাণের পরিকল্পনা করি। পানির একটি সতত প্রবাহিত ধারা মাঝখানে একটি ছোট টিলার পাশ দিয়ে বয়ে যায়, যার ওপর চারটা বাগানের ক্ষেত্র ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত বৃত্তাকার জলাধারের চারপাশে ছিল কমলার গাছ এবং কয়েকটা ডালিমের আর পুরোটা একটি উপত্যকা দিয়ে ঘেরা। উদ্যানের এটাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ, কমলাগুলোয় যখন রং ধরত তখন সত্যিই একটি নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা হতো। সত্যিই।' তিনি নিজেকে অভিনন্দিত করেন, 'উদ্যানটা একটি দর্শনীয় স্থানে অবস্থিত।' বাবর যখন ভারতবর্ষ শাসন করছেন তখনো তিনি কাবুলের সুবেদারকে সময় করে চিঠি লিখেছেন, তার উদ্যানে যেন ঠিকমতো পানি দেয়া হয় আর কলম করা ভালো জাতের ফুল দিয়ে যথাযথভাবে সজ্জিত থাকে।

বাবর যখন নতুন ভূখণ্ড দখল করতেন, তার প্রথম কাজই ছিল পূর্ববর্তী শাসকের পাঠাগার লুট করে আর নিজের সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করা।* বাবর নিজে গদ্য আর পদ্য লিখতেন এবং শিল্পকলার প্রতি তার আগ্রহের মাত্রা তিনি তার এক আত্মীয় সম্পর্কিত ভাইয়ের ওপর যে পড়াশোনা চাপিয়ে দিয়েছিলেন সেটা থেকে নির্ণীত করা যায়, 'চারুলিপি, পাঠাভ্যাস, পদ্য লেখা, চিত্রকলা, অলংকরণ আর পত্র লেখার রীতি...সিলমোহর নকশা করা, অলংকার নির্মাণ আর রত্নাকরের মতো হাতের কাজ।'

---

* মধ্য এশিয়ার রাজকীয় পাঠাগারে কেবল পাণ্ডুলিপি থাকত। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ছাপা বই যদিও ওয়াঙ জি'র *ডায়মন্ড সূত্র*, ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে চীনে যা ছাপা হয়েছিল হাতে খোদাই করা কাঠের ব্লক দিয়ে যথেষ্ট ভোগান্তি সহ্য করে এবং ইউরোপে ছাপানো বই সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ গুটেনবার্গের পুনর্ব্যবহারযোগ্য টাইপ আর ছাপাখানার আবিষ্কারের ফলে। উভয় প্রক্রিয়ার কোনোটাই মধ্য এশিয়ায় কিংবা মোগল ভারতে ব্যবহৃত হতো না। মৌখিক আদান-প্রদানের ওপর এর ফলে অনেক বেশি মাত্রায় নির্ভরশীলতার জন্ম হয়েছিল এবং ঐতিহাসিকদের জন্য প্রায়ই সমস্যার সৃষ্টি করত, এর ফলে অবশ্য রাজাদের দিনপঞ্জির মতো আকর নথিপত্রের সুন্দরভাবে অলংকৃত করা নকল তৈরি করা হতো।

মর্মরের পানির নহরে
তাজমহলের প্রতিবিম্ব
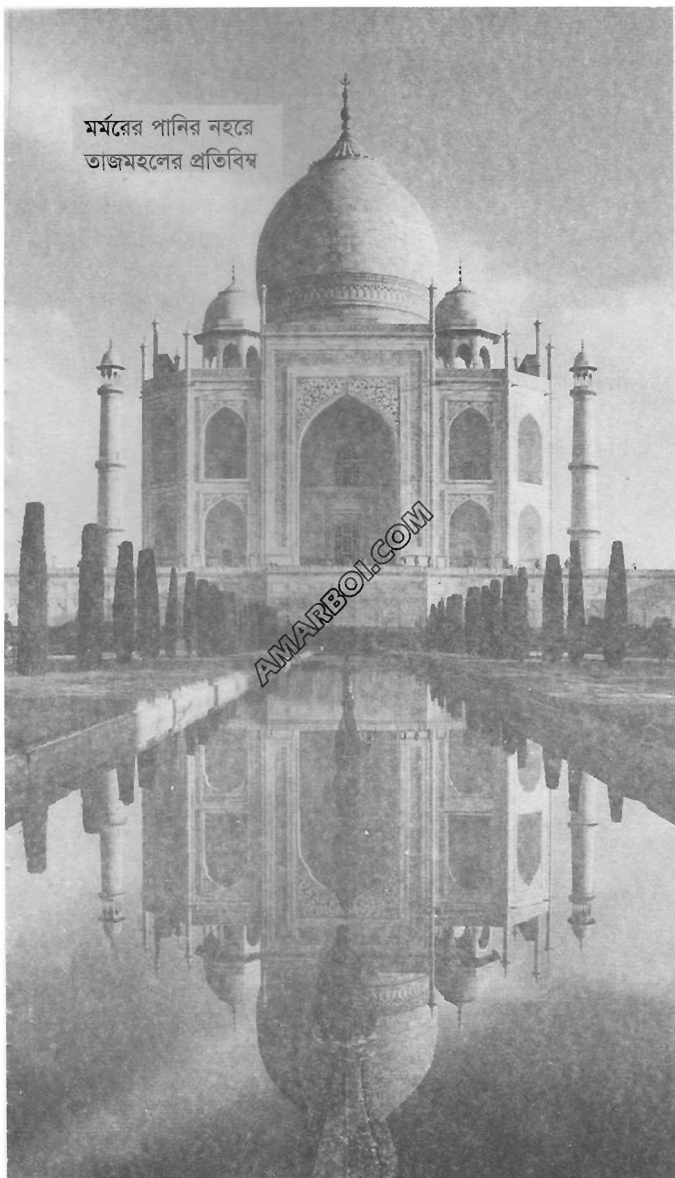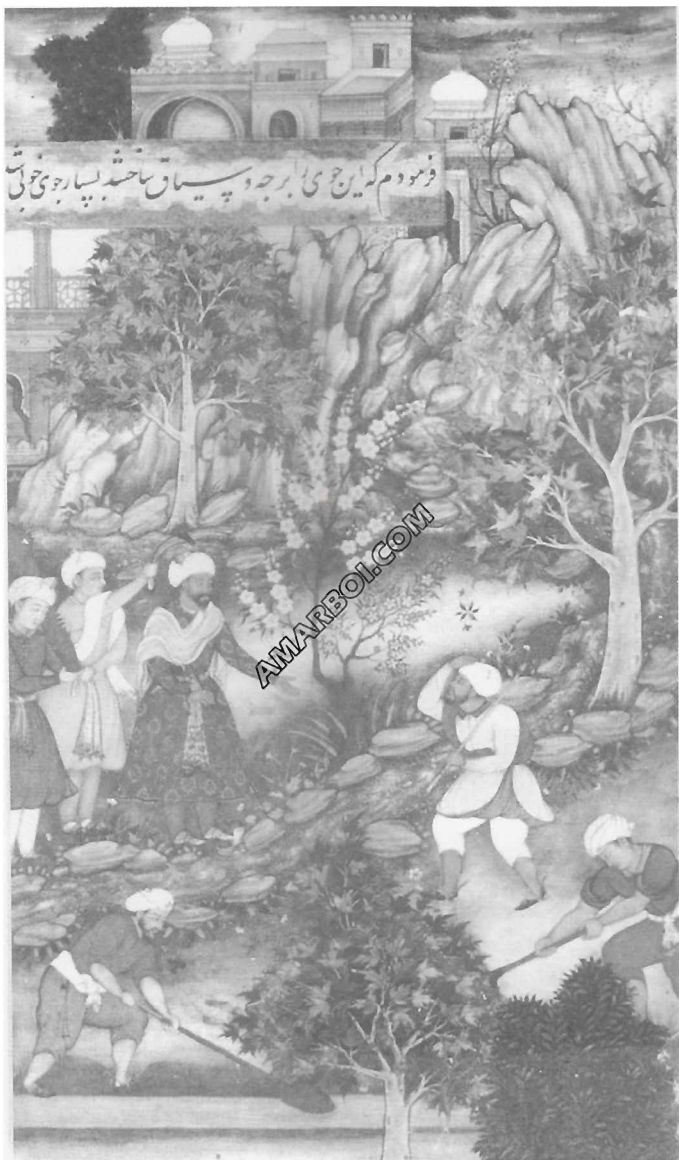
বাবর তার নির্মিত একটা উদ্যানের ঝর্নার গতিপথ পরিবর্তনের আদেশ দেন

বাবর অবশ্য একটি বিষয়ে খুব ভালো করেই ওয়াকিবহাল ছিলেন যে, তিনি যদি তার বাহিনীকে নতুন ভূখণ্ডের সন্ধানে এবং নতুন লুটতরাজে ব্যস্ত না রাখেন, তাদের মনে হয়তো বিদ্রোহের চিন্তা খেলতে শুরু করবে। পারস্যের সহায়তায় তিনি সমরকন্দ দখলের আরেকটা প্রয়াস নেন। তিনি যদিও শহরটা পুনরায় দখল করেন এবং আট মাস সেটা নিজের আয়ত্তে রাখেন তিনি আবারও উজবেকদের সামনে সমরকন্দকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হন। তিনি পরবর্তী সময়ে দক্ষিণে হিন্দুস্তানের বা উত্তর ভারতের দিকে তার আগ্রাসী মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। তার দুই বিখ্যাত পূর্বপুরুষ উপমহাদেশ অধিক্রম পরিচালনা করেছিল। ১২২১ সালে চেঙ্গিস খান সিন্ধু নদ, উত্তর ভারতকে রক্ষাকারী অন্যতম প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক পর্যন্ত পৌঁছে তারপর ফিরে গিয়েছিলেন। ১৩৯৮ সালে, তৈমূর, ষাট বছর বয়সে, যার শীতল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ চোখ দুটোকে সমসাময়িক একজন 'দীপ্তিহীন মোমের আলো'র সাথে তুলনা করেছিল, নৌকার তৈরি সেতুর ওপর দিয়ে তার লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে আগত বাহিনীর সাথে সিন্ধু নদ অতিক্রম করে। তারা দিল্লি পর্যন্ত লুটপাট আর ধবংসযজ্ঞ করতে করতে এগিয়ে যায়, তাদের পেছনে পড়ে থাকে 'মৃত শবদেহের স্তূপ, যা বাতাস দূষিত করে তোলে।' ডিসেম্বরে তৈমূর দিল্লিতে প্রবেশ করেন এবং এত দক্ষতার সাথে পুরো শহরটায় অগ্নিসংযোগ আর হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করেন যে, 'পরবর্তী দুই মাস আকাশে এমনকি একটি পাখিও উড়তে দেখা যায়নি।'

পুরো শহরটা আগুনে পুড়ে যাবার আগেই অবশ্য, তৈমূর দিল্লির কারিগরদের, বিশেষ করে পাথরের কারিগর—সমবেত করেন তার পক্ষে যতজনকে সমবেত করা সম্ভব, তার সাথে সমরকন্দে গিয়ে সেখানে তার নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করতে, যেমন তিনি নিজের জন্য সে চমৎকার সবুজাভ-নীল গম্বুজ বিশিষ্ট মকবরা তৈরি করছিলেন। তৈমূর বস্তুতপক্ষে তার প্রতিটি বিজয়ের পরে শিল্পের দক্ষ কারিগরদের নির্বাচিত করতেন তার রাজধানীর সৌন্দর্যবর্ধন করতে। তিনি তুরস্ক থেকে রুপার কারিগরদের আর দামেস্ক থেকে কাচে বাতাস প্রবেশ করাবার লোক নিয়ে এসেছিলেন। এক রাজদূত বর্ণনা করেছেন কীভাবে শ্রমিকদের 'এত বিপুল সংখ্যা' সেখানে অবস্থান করত যে সমরকন্দ 'তাদের স্থান দেয়ার মতো বিশাল ছিল না এবং এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে বাইরের গুহায় এবং গাছের নিচে কী বিপুল সংখ্যায় তারা বাস করত।'

লুটের মালপত্রে এতটাই বোঝাই যে একটি প্রতিবেদন অনুসারে তারা দিনে চার মাইলের বেশি পথ অতিক্রম করতে পারত না। তৈমূর আর তার বাহিনী ভারতবর্ষে প্রবেশের ছয় মাসের ভেতর এখান থেকে বিদায় নেয়।

ভারতবর্ষে বাবর তার নিজের অভিযান শুরু করার পূর্বে, বাবরের বাহিনী আর তার পরিবারের লোকবল বৃদ্ধি পায়। সৈন্যবাহিনী কামান এবং ম্যাচলক গাদা

বন্দুক অটোমান তুর্কিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এবং বাবর মা'সুমা সুলতান বেগম নামে আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করেন। তিনি যদিও বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'আমাকে প্রথমবার দেখার পর সে আমার প্রতি দারুণ আকর্ষণ অনুভব করেছিল', তিনি অবশ্য তার প্রতি নিজের অনুভূতির কথা প্রকাশ করেননি। কিন্তু প্রায় নয় মাস পরে, ১৫০৮ সালের মার্চে, বাবর দ্ব্যর্থহীন খুশিতে, এক পুত্রসন্তান, হুমায়ুনের, জন্মের সংবাদ প্রকাশ করেন : 'আমি আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করি। এক জায়গায় আগে কখনো একসাথে যত রুপার মুদ্রা দেখা গেছে তার চেয়েও বেশি সংখ্যক রুপার মুদ্রা স্তূপীকৃত করা হয়। এটা ছিল দারুণ একটি আনন্দোৎসব।' *হুমায়ুন* শব্দের মানে 'সৌভাগ্যবান', কিন্তু তার ভাগ্য কোনোভাবেই সব সময় ভালো হবে না। অন্যান্য স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয়া পুত্রসন্তানেরা যথাক্রমে : ১৫০৯ সালে কামরান, ১৫১৬ সালে আসকারি এবং ১৫১৯ সালে হিন্দাল।

১৫১৯ সালে শুরু করে, ১৫২৫ সালের শরৎকালে সর্বশক্তিতে অধিক্রম শুরু করার পূর্বে বাবর ভারতবর্ষে চারটা প্রাথমিক অভিযান পরিচালনা করেন। এই সময় দিল্লির মুসলিম সালতানাত, তিনশ বছরের অধিক কালব্যাপী যারা উত্তর ভারতে আধিপত্য বজায় রেখেছিল, ক্ষমতাসীন সুলতান ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বাবর তাই নির্বিঘ্নে আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের বরফাবৃত গিরিপথের ভেতর দিয়ে নিচে নেমে, সিন্ধু নদ অতিক্রম করে, পাঞ্জাবের পাদদেশে অবস্থিত পাহাড়ের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে ১৫২৬ সালের এপ্রিলে কোনো শক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হবার আগেই দিল্লি থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে ধূলিময়, উষ্ণ সমভূমি পানিপথে এসে উপস্থিত হন। সুলতান ইব্রাহিম যিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, সেখানে ১০০,০০০ জন সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন, বাবরের বাহিনীর চেয়ে তারা সংখ্যায় একজনে পাঁচজন বেশি ছিল। বাবর তার একমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেন, যা ছিল কামান আর ম্যাচলক গাদা বন্দুক—ভারতের কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে দুটো অস্ত্রই প্রথমবার মোতায়েন করা হয়েছিল। তিনি তার মালবাহী ৭০০ শকটকে চামড়ার দড়ির সাহায্যে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করেন—অনেকটা ঠিক আমেরিকার বুনো পশ্চিমের বৃত্তাকার ছাউনিযুক্ত ওয়াগনের বিন্যাস—যার পেছনে তিনি তার কামানগুলো আর বন্দুকধারী তবকিদের মোতায়েন করেন। ২০ এপ্রিল সকালের ঠিক অব্যবহিত পরেই যখন সুলতানের বাহিনী সম্মুখভাগে প্রায় এক হাজার রণহস্তি নিয়ে আক্রমণ শুরু করে, বাবরের গাদাবন্দুক আর ব্রোঞ্জের কামানের গোলা তাদের অগ্রযাত্রা আটকে দেয় এবং তাদের সারির মাঝে বিভ্রান্তি আর আতঙ্ক সৃষ্টি করে। বাবরের অশ্বারোহী তীরন্দাজের দল

এরপর বৃংহন করতে থাকা বিশৃঙ্খল হাতির পাল আর আতঙ্কিত, বিভ্রান্ত এবং চিৎকার করতে থাকা সৈন্যদের পাশ থেকে এবং পেছন থেকে আক্রমণ করে। পাঁচ ঘণ্টার ভেতরে তার শত্রুদের ২০,০০০ জন মৃত্যুবরণ করে, যাদের ভেতরে সুলতান ইব্রাহিমও ছিলেন। বাবর উত্তর ভারতের কর্তৃত্ব লাভ করেন। দিল্লিতে তার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশ্য বিবরণ হিসেবে শুক্রবারের জুমার নামাজের শেষে, তার নামে *খুতবা* পাঠ করে তাকে শাসক হিসেবে ঘোষণা করার পরই কেবল যমুনার তীর বরাবর তিনি আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। তার পুত্র হুমায়ুন এখানে তাকে বিশাল একটি হীরক খণ্ড উপহার দেয়, যা হুমায়ুনকে আবার দিয়েছিল গোয়ালিয়রের রাজপরিবার পানিপথে সুলতান ইব্রাহিমের পক্ষে লড়াই করার সময় তাদের শাসকের মৃত্যুর পরে, তাদের নিরাপত্তার জন্য কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে। বাবর বলেছেন, 'একজন রত্ন ব্যবসায়ী একবার সারা পৃথিবীর অর্ধদিবসের খরচের সমতুল্য হিসেবে এর মূল্যায়ন করেছিলেন...কিন্তু আমি (হুমায়ুনকে) এটা সাথে সাথে ফিরিয়ে দিই।' এটা ছিল বিখ্যাত কোহ-ই-নূর, 'আলোর পর্বত', যা বেশ কয়েকবার মোগল কাহিনীতে আবির্ভূত হবে।

বাবর এবার তার নতুন সাম্রাজ্যের সম্পদের তালিকা করেন। তিনি পুরোপুরি অভিভূত হতে পারেন না : 'হিন্দুস্তান মুগ্ধ, সম্মোহনের একটি জায়গা...শহর আর প্রদেশগুলো সবই অরুচিকর। উদ্যানগুলোতে কোনো দেয়াল নেই এবং অধিকাংশ স্থানই তক্তার মতো সমতল। এখানের লোকদের মাঝে কোনো সৌন্দর্য নেই, মার্জিত সমাজ নেই, কোনো কাব্য প্রতিভা নেই, আভিজাত্য, পৌরুষত্ব বা সৌজন্যর কোনো বালাই নেই...এখানে ভালো জাতের ঘোড়া, মাংস, আঙুর, তরমুজ, বা অন্য কোনো ফল পাওয়া যায় না...বরফ, শীতল পানি, ভালো আহার, গোসলের বন্দোবস্ত বা কোনো মাদ্রাসা নেই...তাদের প্রাসাদ বা উদ্যানে প্রবাহিত পানির নহর নেই এবং তাদের ইমারতগুলোয় দৃষ্টিনন্দন প্রতিসাম্য বা মিল অনুপস্থিত।' বাবর প্রথমে কেবল একটিই সন্তোষজনক বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করতে পারে : 'হিন্দুস্তানের একটিই দারুণ দিক হলো যে দেশটা বিশাল এবং সোনা আর অর্থের বিপুল সংগ্রহ এখানে রয়েছে।' তিনি একটু পরে আরেকটা বৈশিষ্ট্য যোগ করেন : '...বিপুলসংখ্যক কারিগর আর সব ধরনের কাজের লোক পাওয়া যায়।' তার পূর্বপুরুষ তৈমূরের ন্যায়, তিনি পাথরের কারিগরদের বিশেষভাবে মূল্য দিতেন। তিনি আর তার উত্তর পুরুষরা তাদের নিয়োজিত করে দারুণ চিত্তাকর্ষক অভিব্যক্তির সৃষ্টি করেন।

বাবর শীঘ্রই তার ধারণা করা কিছু দোষের প্রতিকার সাধন করেন, আগ্রায় যমুনার তীরে আজ যেখানে তাজমহল নির্মিত হয়েছে তার ঠিক উল্টো দিকে একটি উদ্যান নির্মাণের মাধ্যমে। 'আকর্ষণহীন আর বিসঙ্গত ভারতবর্ষে

চিত্তাকর্ষকভাবে নিয়মিত আর জ্যামিতিক আকৃতির উদ্যান নির্মিত হয় এবং প্রতিটি প্রান্তে গোলাপ আর নার্গিস নিখুঁত বিন্যাসে রোপণ করা হয়,' তিনি লিখেছেন।

বাবর তার পরাজিত শত্রু সুলতান ইব্রাহিম লোদির পরিবারের সাথে বেশ ভালো আচরণ করেছিলেন। সুলতানের আম্মিজান, বুয়াকে, তিনি দরবারেই স্থান দিয়েছিলেন। বুয়া অবশ্য তার দয়ার মোটেই কোনো প্রতিদান দেননি। বাবর ইব্রাহিমের চারজন রাঁধুনিকে কাজে বহাল রাখেন তাকে হিন্দুস্তানি রান্নার স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ দিতে। ১৫২৬ সালের ২১ ডিসেম্বর, বুয়া বাবরের খাবারে বিষ মিশ্রিত করতে রাঁধুনিদের একজনকে রাজি করায়। বাবর এরপরে গল্পটা বলেছেন। 'খাবারে কোনো দুর্গন্ধ বা তেমন কিছু ছিল না। আহার গ্রহণের জন্য উপবেশন করা অবস্থায় আমি দস্তরখানের ওপর প্রায় বমি করে ফেলি...আমি উঠে দাঁড়াই এবং প্রক্ষালন কক্ষের দিকে যাবার সময় আমি প্রায় বমিই করে ফেলেছিলাম। আমি কোনোমতে প্রাক্ষালন কক্ষে পৌঁছে প্রচুর বমি করি। আমি কখনো খাওয়ার পর বমি করিনি, এমনকি যখন পান করতাম তখনো এমন হয়নি। আমি বমিটা একটি কুকুরকে দিতে বলি। (কুকুরটা) প্রায় নির্জীব হয়ে পড়ে। তারা হতভাগ্য প্রাণীটাকে লক্ষ করে যতই পাথর নিক্ষেপ করুক না কেন সে উঠে দাঁড়ায় না কিন্তু মারাও যায় না।' বাবর রাঁধুনিকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেন। নির্যাতনের পর সে সব কিছু স্বীকার করে। দুজন বৃদ্ধ মহিলা, যারা বার্তাবাহক আর বাবরের খাবারের পরীক্ষক হিসেবে কাজ করত এরপর তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। 'তারাও দোষ স্বীকার করে...আমি খাদ্য পরীক্ষককে কেটে টুকরো টুকরো করার আদেশ দিই আর জীবন্ত অবস্থায় রাঁধুনির গায়ের ছাল তুলতে বলি। দুই রমণীর একজনকে আমি হাতির পায়ের নিচে ফেলে পিষ্ট করি অন্যজনকে গুলি করে হত্যা করি। আমি বুয়াকে কারাগারে নিক্ষেপ করি।' বাবর নিজেকে সুস্থ করতে দুধের সাথে খানিকটা আফিম মিশিয়ে পান করেন। 'এই ওষুধ গ্রহণের প্রথম দিন আমি পিচের মতো কালো পিত্তরস বমি করি। সব কিছু আল্লাহর রহমতে ঠিক হয়ে যায়। আমি আগে কখনো বুঝতে পারিনি জীবন এত মধুর।'

বাবর সেবার যদিও মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি আর চার বছরেরও কম সময় জীবিত থাকেন। মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রশমিত করতে এবং প্রতিবেশী রাজন্যদের আকস্মিক হামলা প্রতিহত করতে তিনি এই সময়ের কিছুটা অতিবাহিত করেন এবং কিছুটা সময় অতিবাহিত করেন পদ্য রচনায় আর তার অকপট আর অন্তরঙ্গ স্মৃতিকথা, *বাবরনামা* রচনায়, ইসলামিক সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী। দিনপঞ্জি অনুসারে বাবরের মৃত্যু তার পুত্র হুমায়ুনের মারাত্মক অসুস্থতার কারণে হয়েছিল। বাবর হয়তো নিজের

স্ত্রীদের প্রতি উদাসীন ছিলেন কিন্তু তিনি তার সন্তানদের ভালোবাসতেন আর হুমায়ুনকে 'অতুলনীয় সঙ্গী' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। তার এই পুত্র যখন গভীর চিত্তবৈকল্যে আক্রান্ত তখন ভবিষ্যদ্‌দর্শীরা বাবরকে পরামর্শ দেন, তিনি যদি হুমায়ুনের মূল্যবান কোনো বস্তু উৎসর্গ করেন তাহলে তিনি হয়তো সুস্থ হয়ে উঠবেন। তারা আপাতদৃষ্টিতে কোহ-ই-নূর বোঝাতে চাইলেও বাবর মনে করেন, আল্লাহ্‌র কাছে তার নিজের জীবন সমর্পণ করা উচিত। তিনি অশ্রুসজল চোখে তা-ই করেন, 'আমি তার পরিবর্তে নিজেকে উৎসর্গ করব...আমি তার সমস্ত কষ্ট সহ্য করব' এবং যখন আল্লাহ্ যখন তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন...বাবর নিজের ওপর অদ্ভুত একটি প্রভাব অনুভব করেন এবং চিৎকার করে ওঠেন 'আমরা পরীক্ষায় উতরে গিয়েছি!' মহামান্য সম্রাটের মাঝে সাথে সাথে বিচিত্র একটি প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং (হুমায়ুনের) ভেতর জ্বরের আকস্মিক হ্রাস ঘটে।'

এ ঘটনার পর বাবরের স্বাস্থ্য সত্যিই খারাপ হতে শুরু করে কিন্তু ১৫৩০ সালের ডিসেম্বরে তার মৃত্যুর পূর্বে বেশ কয়েক মাস অতিবাহিত হয়, যারা অপেক্ষাকৃত কম আবেগের অধিকারী তারা এই মৃত্যুর জন্য তার যৌবনের অতিরিক্ত পরিশ্রম আর সুরা, আফিম এবং অন্যান্য মাদকের প্রতি তার আসক্তিকে দায়ী করে। (বাবর বর্ণনা করেছেন কীভাবে মাদকের প্রভাবে সৃষ্ট, হিপ্পির মতো, মোহাবিষ্টতায় তিনি 'সুন্দর ফুলের বাগান' উপভোগ করেছেন।) কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার সমর্থকদের আহ্বান করবেন হুমায়ুনকে তার আইনসংগত উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে এবং হুমায়ুনকে উপদেশ দেন 'তোমার ভাইদের বিরুদ্ধে কিছু করবে না এমনকি যদি সেটা তাদের প্রাপ্যও হয়।' হুমায়ুন তার উত্তর পুরুষদের মতো ছিলেন না অনেকের থেকে আলাদা ছিলেন। তিনি তার আব্বাজানের আদেশ অনুসরণ করেছিলেন, যা একটি সাধারণ তৈমূরীয় নীতির ওপর আরোপিত যে রাজবংশের যুবরাজদের নিরাপদ রাখতে হবে। তাজমহলের ভবিষ্যৎ নির্মাণ স্থানের উল্টো দিকে তার নতুন উদ্যানে বাবরকে সমাহিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে তার মৃতদেহ তার ইচ্ছা অনুসারে কাবুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পাহাড়ের পাশে শহর দেখা যাওয়া তার নির্মিত উদ্যানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তার অনুরোধে এবং ইসলামি রীতির সাথে সংগতি রেখে যে সমাধি খোলা আকাশের নিচে অবস্থিত হবে, তার কবরের ওপরের মার্বেলের স্মৃতিফলকের ওপর কোনো ইমারত নির্মাণ করা হয়নি।

বাইশ বছর বয়সী হুমায়ুন ছিলেন 'মর্যাদাবান আর চমৎকার চরিত্রের অধিকারী এক যুবরাজ, দয়ালু এবং উদার আর নম্র স্বভাবের এবং সদাশয়।' তিনি

ব্যক্তিগতভাবে দারুণ সাহসী ছিলেন কিন্তু প্রাণবন্ত এবং মানুষকে উদ্দীপিত করার ক্ষমতার অধিকারী। তার আব্বাজানের ভারতবর্ষের ওপর চার বছরের পুরাতন শাসনকে মজবুত করতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ আর সংকল্পের মারাত্মক ঘাটতি তার ভেতরে ছিল। তিনি সহজেই মনোযোগ হারিয়ে ফেলতেন এবং এতটাই কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন যে, কোনো কক্ষে প্রবেশের সময় ডান পা আগে ফেলতেন এবং যারা সেটা করত না তাদের বাইরে পাঠাতেন পুনরায় ঠিকমতো প্রবেশ করতে। তিনি জ্যোতিষবিদ্যার দারুণ ভক্ত ছিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন রঙের পোশাক পরিধান করতেন এবং সপ্তাহের দিনগুলোর নিয়ন্ত্রক তারকার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তিনি নিজের কর্মকাণ্ডও পরিবর্তন করতেন। রবিবার যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি হলুদ রঙের পোশাক পরিধান করতেন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতেন এবং সোমবার সবুজ রং আর সেদিন ছিল আমোদের দিন। মঙ্গলবার তিনি যুদ্ধের মতো লাল পোশাক পরিধান করতেন এবং তীব্র ক্রোধ আর প্রতিশোধমূলক আচরণ করতেন। তার ক্রোধ একই সাথে নিষ্ঠুর আর খেয়ালি হতে পারত। এক মঙ্গলবার, তিনি অপরাধের সাথে শাস্তি মানানসই করার দাবি করেন। তার বিবেচনায় যারা 'গোঁয়ার' তাদের মাথাই কেটে ফেলার আদেশ দেন এবং বিবেচনার ঘাটতি—মানে, 'নিজেদের হাত আর পায়ের মাঝে পার্থক্য করতে' ব্যর্থতা যাদের রয়েছে বলে তার মনে হয়েছে তাদের হাত আর পা কেটে ফেলতে বলেন।

তার স্বভাবজাত অবসন্নতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবার জন্য একজন দিনপঞ্জির রচয়িতা দায়ী করেছে তার 'মাত্রাতিরিক্ত' আফিমের ব্যবহারকে, গোলাপ জলের সাথে মিশ্রিত করে তিনি যা সেবন করতেন। হুমায়ুন এসব ঘাটতির ফলশ্রুতিতে হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্য হারান এবং রাজ্যহীন শাসকের ন্যায়, বাবর তার যৌবনে যেমন করেছেন, যাযাবরের মতো বিচরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তার বহিষ্কারের কারণ ছিল গাট্টাগোট্টা দেহের অধিকারী, চতুর আর বিচক্ষণ শের শাহ। গঙ্গার তীরে অবস্থিত বিহারের একটি নগণ্য মুসলিম রাজ্যের ততোধিক নগণ্য একজন আধিকারীকের পদমর্যাদা থেকে তিনি কয়েক বছরের ভেতরে সবার অগোচরে নিজেকে কার্যত বাংলা আর বিহারের শাসকে পরিণত করেন। হুমায়ুন শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারেন যে শের শাহ তার রাজত্বের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি গঙ্গার উজানে বিশাল এক বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। তার অভিগমন ছিল মন্থরগতিতে এবং শের শাহকে প্রস্তুতি গ্রহণের পর্যাপ্ত সময় দিয়েছিলেন। ১৫৩৯ সালের জুন মাসে অনেক কৌশলী পরিচালনা শেষে দুটো বাহিনী অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। শের শাহের বাহিনী হুমায়ুনের বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে এবং সম্রাট বাধ্য হন

কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে পলায়ন করতে। তিনি নাজিম নামে তার এক ভিস্তির সাহায্যে কোনোমতে গঙ্গা অতিক্রম করে পালাতে সক্ষম হন। তার পশুর চামড়ার তৈরি পানির পাত্র ফুলিয়ে সেটা ভাসতে সাহায্যকারী অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করতে হুমায়ুনকে দিয়েছিল। খামখেয়ালি হুমায়ুন তার ভাইদের আর অমাত্যদের বিরক্তির উদ্রেক ঘটিয়ে মুহূর্তের উত্তেজনায় নাজিমকে রাজসিংহাসনে এক দিনের জন্য উপবেশনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা রক্ষা করেন। নাজিম সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং নিজেকে আর নিজের পরিবারকে সম্পদশালী করতে গুটি কয়েক ফরমান জারি করেন। হুমায়ুনের এই কর্মকাণ্ড তার রাজত্বকালের একটি সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তার রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধিতে কোনো সহায়তা করে না, যদিও এটা তাকে এমন একজন মানুষ হিসেবে উপস্থাপিত করে যার কথার মূল্য রয়েছে।

হুমায়ুন পালিয়ে প্রথমে আগ্রা আসেন এবং সেখান থেকে তার পরে উত্তর-পশ্চিমে লাহোরে যান তার সৎভাই কামরান, আসকারি আর হিন্দালের সাথে সাক্ষাৎ করতে। তাদের আনুগত্য নিয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল। চেঙ্গিস খান আর তৈমূর যে তাদের সাম্রাজ্য তাদের ছেলেদের ভেতরে ভাগ করে দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে সচেতন, বাবর যেমন একজন উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন সে রকম না করে, অন্যান্য প্রত্যেক ভাই পুরাতন প্রথার প্রত্যাবর্তন কামনা করে এবং ইতিমধ্যে বিদ্রোহ বা নিকট-বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছে এবং নিজেদের জন্য ভূখণ্ড দখলে সচেষ্ট। হুমায়ুন তাদের প্রতিবার অশ্রুসজল চোখে মার্জনা করেছেন তার আব্বাজানের উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার পাশাপাশি আবেগপ্রবণ আর স্নেহশীল স্বভাবের হওয়ায়। তাদের ভগিনী গুলবদনের ভাষ্য অনুসারে, চার সহোদর একটি সাধারণ হুমকি হিসেবে বিদ্যমান 'তারা মন্ত্রণা করে এবং উপদেশ গ্রহণ করে এবং পরামর্শ চায় কিন্তু কখনো কোনো বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছায় না।' শের শাহের সাথে গোপনে একটি পৃথক শান্তিচুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করেন কামরান, যার ফলে তিনি কাবুলকে নিরাপদ রাখতে পারেন। হুমায়ুন একই গোপনীয়তায় শের শাহের সাথে আপস প্রস্তাবের ভিত্তি হিসেবে চুক্তি করেন, 'আমি হিন্দুস্তান তোমায় ছেড়ে দিয়েছি। লাহোরকে রেহাই দাও এবং সিন্ধ তোমার আর আমার মাঝে সীমান্ত হিসেবে বিদ্যামান থাকুক।'

শের শাহ উভয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যখন লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হন, হুমায়ুন আর তার ভাইয়েরা এবং বলা হয় যে তাদের ২০০,০০০ অনুসারী স্রেফ পালিয়ে যায়। গুলবদন লিখেছেন, 'পুনরুত্থানের দিনের মতো একটি বিষয়, লোকজন তাদের সুসজ্জিত প্রাসাদ যেমন আছে সেভাবেই ফেলে

রেখে যায়।' হুমায়ুন হিন্দালকে সাথে নিয়ে সিন্ধের দিকে পালিয়ে যান এবং তাকে সাহায্য করার জন্য স্থানীয় শাসককে রাজি করাতে বেশ কয়েক মাস বৃথাই চেষ্টা করেন। তিনি অবশ্য রাজি করাবার অন্য একটি প্রয়াসে সফল হন, কিন্তু কেবল এক মাস চেষ্টা করার পরেই। তিনি হামিদাকে, হিন্দালের একজন পরামর্শদাতার চৌদ্দ বছরের কন্যা, রাজি করান তাকে বিয়ে করতে রাজি হতে। প্রথমে হামিদা আর হিন্দাল প্রবলভাবে বিয়েতে আপত্তি জানান, কারণ সম্ভবত তারা নিজেরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। হিন্দাল শেষ পর্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কান্দাহার অভিমুখে গমন করেন এবং হুমায়ুনের আম্মিজান তার তেত্রিশ বছরের পুত্রকে বিয়ে করার জন্য হামিদাকে এই যুক্তিতে রাজি করান যে, 'তুমি কখনো কাউকে অবশ্যই বিয়ে করবে? একজন সম্রাটের চেয়ে আর কে সেরা হতে পারে, যে সেখানে অপেক্ষা করছে?' হুমায়ুন 'নিজের আশীর্বাদপুষ্ট হাতে একটি অ্যাস্ট্রোলেইব নেন' এবং তাদের বিয়ের জন্য জ্যোতিষীর দৃষ্টিতে সবচেয়ে মঙ্গলময় দিন গণনা করেন—১৫৪১ সালের ২১ আগস্ট।

১৫৪২ সালের মে মাসে হুমায়ুন আর হামিদা সিন্ধ ত্যাগ করেন। এর পেছনে কারণ ছিল রাজস্থানের মরুভূমি অতিক্রম করে তারা ভারতে ফিরে আসতে চান, যেখানে হুমায়ুন মেওয়ারের (যোধপুর) রাজার সাথে মিত্রতার আশা করেছিলেন। এই প্রয়াস অবশ্য শীঘ্রই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং পুরো দলটা বছরের সবচেয়ে উষ্ণ সময়ে গনগনে ফোসকা পরা মরুভূমি অতিক্রম করে ফিরে যায়। হামিদা তখন আট মাসের গর্ভবতী। যাই হোক, হুমায়ুনের প্রতি তার কিছু আধিকারীকের তাচ্ছিল্য এমন পর্যায়ে পৌছায় যে, একদিন হামিদা যখন ঘোড়াবিহীন হয়ে পড়েন তখন কেউ তাকে একটি ঘোড়া দেয় না। হুমায়ুন অবশেষে তাকে নিজের ঘোড়াটা এগিয়ে দিয়ে নিজে হাচড়-পাচড় করে একটি উটের পিঠে চেপে বসেন—সম্রাটের জন্য যা অমর্যাদাকর এবং অমঙ্গলজনক একটি বাহন। একজন আধিকারিক অবশেষে সদয় হন এবং নিজের ঘোড়াটা হামিদাকে দিয়ে হুমায়ুনকে উটের পিঠ থেকে নেমে আসার সুযোগ করে দেয়।

হতশ্রী দলটা শীঘ্রই অমরকোট, মরুভূমির মাঝে অবস্থিত একটি শহরে পৌছায়, হুমায়ুনের শত্রুদের হাতে যার শাসকের মৃত্যু হয়েছে। ব্যাপারটা অনেকটা 'আমার শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু' এমন একটি বিষয় এবং হুমায়ুনের পরিশ্রান্ত দলটাকে স্বাগত জানিয়ে ভোজের আয়োজন করা হয়। ১৫৪২ সালের ১৫ অক্টোবর, সেখানেই হামিদা একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন—ভবিষ্যৎ সম্রাট আকবর। হুমায়ুন, অবশ্যই নিজের সন্তানের রাশিচক্র পরীক্ষা করেন। রাশিচক্র দারুণ সুপ্রসন্ন প্রতীয়মান হয়। হুমায়ুনের নিজের অবস্থা অবশ্য একই রকম প্রতিকূল থাকে। তিনি আরো একবার ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন, তার প্রতিপক্ষ ভাইয়েরা আসকারি এবং কামরান তাকে পরিবেষ্টিত করে ফেলেছে। তিনি

সিদ্ধান্ত নেন, এমন পরিস্থিতিতে তার একমাত্র ভরসা যেমনটা তার আব্বাজানও একই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে করেছিলেন পারস্যের শাহের কাছে সহযোগিতা কামনা করা।

শীতকালে রুক্ষ প্রান্তরের ওপর দিয়ে যেহেতু তাদের যাত্রা করতে হবে, দুই স্নেহময় অভিভাবক তাদের একমাত্র পুত্রকে, তখন মাত্র চৌদ্দ মাস বয়স, তার বিদ্রোহী চাচাজান আসকারির তত্ত্বাবধায়নে সমর্পণ করেন। তৃতীয় রিচার্ডের সাথে কোনোমতেই আসকারিকে তুলনা করা যাবে না এবং যুবরাজদের প্রতি আচরণে তৈমূরীয় অনুশাসনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করেন, তার স্ত্রী তার ভাতিজার ভালোই যত্ন নেন। ছেলের পিতা অবশ্য সেই সময় দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। 'শীতের তীব্রতায় আমার মাথা যেন জমে গেছে,' হুমায়ুন পরে স্মৃতিচারণা করেছেন। খাদ্যদ্রব্য আর রান্নার পাত্র দুটোই বাড়ন্ত এবং ভাগ্যান্বেষী দলটা তাদের একটি ঘোড়া জবাই করতে বাধ্য হয় এবং 'শিরোস্ত্রাণে খানিকটা মাংস সিদ্ধ করে।' যাই হোক, ১৫৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে তারা পারস্যে পৌঁছায়। শাহ্ সম্মানিত অতিথির মতোই হুমায়ুনকে স্বাগত জানান এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি তাকে বেশ ভালো ধরনের সাহায্য প্রদান করবেন। শাহের পরোপকারী মনোভাব জোরাল করতে অবশ্য মোগল ভবঘুরে তার আলখাল্লার নিচে থেকে যে সবুজ ফুলের নকশা করা বটুয়াটা বের করেছিল নিঃসন্দেহে সেটার বিশেষ অবদান রয়েছে। হুমায়ুন বটুয়ার ভেতর থেকে কোহ-ই-নূর এবং আরো কয়েকটা রত্ন বের করে, শুক্তির রংধনুসদৃশ খোলা দিয়ে তৈরি বাক্সে সেগুলো রেখে শাহের হাতে তুলে দেন। আকবরের প্রধান দিনপঞ্জি রচয়িতা আবুল ফজল পরবর্তী সময়ে লিখেছেন, হুমায়ুনের জন্য শাহ যত ব্যয় করেছিলেন, রত্নের মূল্য তার 'চার গুণের বেশি ছিল।'

শাহ অবশ্য সহযোগিতা অনুমোদন করার পূর্বে হুমায়ুনের ওপর চাপ প্রয়োগ করেন যে, তিনি একজন সুন্নি মুসলমান, তার উচিত নিজের ধর্মমত পরিবর্তন করে শিয়া মতাবলম্বী হওয়া।* হুমায়ুন শাহের প্রভাবে অবস্থানকালীন সময়ে

---

* ১৫০১ সালে সাফাভিদ রাজবংশ পারস্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে শিয়া ধর্মমত গ্রহণ করে। ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে শিয়া আর সুন্নির মাঝে পার্থক্য সূচিত হয় এবং মুহাম্মদ (সা.) আইনসংগত উত্তরাধিকারী কে হবে এবং দায়িত্ব কি নির্বাচিত কাউকে প্রদান করা হবে নাকি হবে না সে বিষয়ের সাথে জড়িত, শিয়ারা মহানবীর জামাতা আর তার আত্মীয় সম্পর্কিত ভাইয়ের বংশধরদের উত্তরাধিকারী দাবি করে। 'শিয়া' শব্দটার অর্থ 'দল' এবং 'আলির দল' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 'সুন্নি' মানে 'যারা মুহাম্মদের (সা.) রীতি বা 'সুন্নাহ' অনুসরণ করে। ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ দুটো ধর্মমতের মাঝে নানা বিষয়ে যেমন প্রতিদিনের নামাজের প্রকৃতি প্রভৃতি ব্যাপক বিভেদের সৃষ্টি হয়।

অন্তত কেবল নীরবে বিষয়টি মেনে নেন। কথামতো তাকে একটি সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব প্রদান করা হয় এবং হুমায়ুন আফগানিস্তান পর্যন্ত অগ্রসর হন, যেখানে তিনি তার ভাই আসকারির কাছ থেকে কান্দাহার এবং কামরানের নিকট থেকে কাবুল দখল করেন। কাবুলে তিনি আর হামিদা আকবরের সাথে পুনরায় মিলিত হন। আকবর তখন বাবরের আরেক ভগিনী খানদুরার তত্ত্বাবধানে ছিলেন, যে মোগল রাজপরিবারের রমণী হবার কারণে যুদ্ধরত ভাইদের মাঝে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছিল। প্রজাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হিসেবে, তিন বছরের আকবরের খৎনা উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করা হয়। হুমায়ুন তার অমাত্যদের সাথে উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মল্লযুদ্ধে নিজে অংশ নেন।

ভাইয়েরা যদিও আরো একবার মিলিত হন কিন্তু তাদের মধ্যকার একতা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। কামরান আর আসকারি অচিরেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। আসকারির বাহিনীর সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় হিন্দালের মৃত্যু হয়। হুমায়ুন শেষ পর্যন্ত আসকারিকে হজ করতে মক্কা পাঠাতে বাধ্য হন—মোগলদের মাঝে নির্বাসনের একটি প্রচলিত উপায়—সেখানেই তিনি মারা যান। কামরান দুবার কাবুল হুমায়ুনের কাছ থেকে দখল করে এবং দুবারই সেটার কর্তৃত্ব হারানোর পর হুমায়ুনের বাহিনী ১৫৫২ সালে তাকে বন্দি করেন। কামরানকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য হুমায়ুনের পরামর্শদাতারা জোর তদবির করেন, 'রাজত্ব আর রাজ্য পরিচালনার সাথে ভ্রাতৃত্বের কোনো সহাবস্থান হতে পারে না। আপনি যদি সম্রাট হতে চান তাহলে ভ্রাতৃত্বের আবেগ বর্জন করতে হবে...কেউ কারো ভাই নয়! সবাই মহামান্য সম্রাটের শত্রু!'

হুমায়ুন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কামরানকে অন্ধ করতে সম্মতি দেন, যা প্রতিপক্ষকে অকার্যকর করতে তৈমূরীয় রাজবংশগুলোর মাঝে স্বীকৃত কৌশল হিসেবে প্রচলিত ছিল। হুমায়ুনের কয়েকজন লোক উন্মত্তের ন্যায় ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে থাকা কামরানকে মাটিতে চেপে ধরে, তার চোখের মণি বারবার বল্লমের ফলা দিয়ে বিদ্ধ করে তারপরে ক্ষতস্থানে লবণ আর লেবুর রস ডলে দেয়। কামরান তার ক্রন্দনরত ভাইকে পরবর্তী সময়ে বলেন, 'আমার নিজের দুষ্কর্মের কারণেই আমার ভাগ্যে যা কিছু ঘটেছে।' কামরানকেও এরপর মক্কায় হজ পালনে পাঠানো হয়, যেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৫৫৪ সালে কাবুলে অবস্থানরত হুমায়ুনের কাছে শের শাহের পুত্র আর উত্তরাধিকারী ইসলাম শাহের হিন্দুস্তানে মৃত্যুবরণ করার খবর এসে পৌঁছায়। (শের শাহ নিজে একটি অভিযানের সময় বারুদের বিস্ফোরণের ফলে ১৫৪৫ সালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।) শীঘ্রই আরো সুখবর এসে পৌঁছে—হিন্দুস্তানের সিংহাসনের জন্য তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেদের ভেতর লড়াই করছে। হুমায়ুনের মতো দ্বিধান্বিত ব্যক্তিও এমন সুবর্ণ সুযোগ উপেক্ষা করতে পারেন না। নিজের অল্প বয়সী উত্তরাধিকারী আকবরকে সাথে নিয়ে তিনি দ্রুত ভারতবর্ষের দিকে

অগ্রসর হন, তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীদের দুবার পরাজিত করেন এবং ১৫৫৫ সালের জুলাই মাসে দিল্লি অধিকার করেন—শের শাহের আক্রমণের মুখে পলায়নের পরে পনেরো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।

হুমায়ুন পুনরায় নিজের সিংহাসনে আরোহণ করে নিজেকে জ্যোতিষবিদ্যা আর সাহিত্যের চর্চায় মগ্ন করলে বিস্মিত হবার কিছু থাকে না। তিনি একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং শের শাহের প্রাসাদে শের মণ্ডল নামে পরিচিত বেলে পাথরের একটি ছোট অষ্টভুজাকৃতি কক্ষকে নিজের পাঠাগার হিসেবে সজ্জিত করেন। (তার মরহুম আব্বাজানের স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপি, তার অন্যান্য মূল্যবান সম্পদের মতো তার যাযাবর জীবনে সব সময় তার সঙ্গেই থাকত।) কিন্তু তার নামের সাথে যুক্ত 'সৌভাগ্যবান' শব্দটা সব সময় ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হতে থাকে। ১৫৫৬ সালের জানুয়ারি মাসের এক সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্তের সময়, তিনি তার জ্যোতিষীদের সাথে শের মণ্ডলের সমতল ছাদে বসে রাতের আকাশে শুক্রগহ কখন উদিত হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, যেহেতু তার মতে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার জন্য সেটা একটি অনুকূল সময়। তিনি কিছুক্ষণ পরে নিজের মহলে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যখন শের মণ্ডলের সংকীর্ণ ধারাল কিনারাযুক্ত সিঁড়ির ধাপে পা রাখতে যাবেন পার্শ্ববর্তী মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি তার কানে ভেসে আসে এবং 'তার সম্মানিত পদযুগলের একটি তার আলখাল্লায় জড়িয়ে যায়...তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং মাথা নিচের দিকে দিয়ে তিনি সিঁড়িতে এত জোরে আছড়ে পড়েন যে তার ডান কপালের পাশে মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হন আর তার ডান কান দিয়ে রক্ত নির্গত হয়।' তিনি চেতন-অবচেতনের মাঝে তিন দিন অতিবাহিত করার পর 'আমার ডাক এসেছে' কথাটা বলে মৃত্যুবরণ করেন। তার তখন সাতচল্লিশ বছর দশ মাস বয়স এবং তার আব্বাজান বাবর যখন মারা গিয়েছিলেন তখনকার চেয়ে তার বয়স তখন মাত্র কয়েক দিন বয়স বেশি।

হুমায়ুন তার জীবনের এক-তৃতীয়াংশের কম সময় ভারতবর্ষে অতিবাহিত করেছিলেন। তার পুত্র আকবর, যিনি তার সমসাময়িক শেকসপিয়রের মতো নিজের জন্মদিনেই মৃত্যুবরণ করেন, ঠিক তেষট্টি বছর বাঁচেন, যার পঞ্চাশ বছর তিনি ভারতবর্ষে অতিবাহিত করেন আর এই সময়ের উনপঞ্চাশ বছরই সম্রাট হিসেবে রাজত্ব করেন। তিনি ভারতবর্ষে মোগল শাসনকে ভিনদেশি দখলদারী থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ, স্থায়ী সাম্রাজ্যের কাঠামো দান করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহ্ আকবর

কিশোর আকবরের রাজত্বকালের প্রথম ছয় বছর, তার প্রধান দিনপঞ্জি রচয়িতা যেভাবে ব্যাপারটা বর্ণিত করেছেন, 'নেকাবের পেছন থেকে' পরিচালিত হয়েছিল, প্রথমে তার আব্বাজানের প্রধান সেনাপতির তত্ত্বাবধানে এবং তারপরে তার পালক মা বা তাকে স্তনদানের জন্য নিযুক্ত ধাত্রীদের প্রধান মাহাম আগা আর তার পরিবারের অধীনে।* আবুল ফজলের ভাষ্য অনুসারে, রাজস্থানের মরুভূমিতে আকবর যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাকে তার পনেরো বছর বয়সী মায়ের স্তন্যপান করতে দেয়া হয়, 'সন্তান বাৎসল স্তনের অভয় লাভ করে তার মধু মাখানো ওষ্ঠদ্বয়, তার জীবন প্রাণসঞ্চারী দুগ্ধের প্রবাহে মধুময় হয়ে ওঠে।' অবশ্য তৈমূরীয় রীতি অনুসারে তাকে এরপর উচ্চবংশীয় একাধিক স্তন্য দানকারী ধাত্রীর অধীনে অর্পণ করা হয়। তারা তাদের আরাদ্ধ অবস্থানের কারণে বিশাল প্রতিপত্তির অধিকারী হয় এবং তাদের সন্তান রাজকীয় নবজাতকের পালক ভাইয়ের মর্যাদা লাভ করে। আকবরের

---

* আবুল ফজল, আরব বংশোদ্ভূত, এক করণিকের সন্তান। ১৫৭৪ সালে তিনি আকবরের অধীনে তেইশ বছর বয়সে কাজে যোগ দেন। তার আব্বাজানের মতো উদারমনস্ক, তিনি সম্রাটের দিনপঞ্জি রচয়িতার দায়িত্ব গ্রহণের পাশাপাশি তার অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচরে পরিণত হন। তিনি দাবি করেন, 'সততার বরাভয় ধন্য লেখনী' দিয়ে সব কিছু রচনা করেছেন। তিনি যদিও আকবরের প্রতি পক্ষপাতগ্রস্ত ছিলেন এবং ক্রমাগত আর বাকবিস্তারের সাহায্যে সম্রাটের প্রশংসা করেছেন, তথাপি দিনপঞ্জি রচয়িতা হিসেবে তার অধ্যবসায় আর আপাত যথার্থতা সন্দেহাতীতভাবে স্বীকৃত। আকবর সম্বন্ধে ইংরেজিতে তার রচনার পরিমাণ ৪০০০ পৃষ্ঠার সামান্য কম হবে, এর প্রায় ৬০ ভাগ আকবরের আর তার পূর্বসূরিদের ইতিহাস, *আকবরনামা*, এবং অবশিষ্টাংশ *আইন-ই-আকবরী* কীভাবে রাজ্য পরিচালিত হতো আর দরবারের আনুষ্ঠানিকতা বিষয়ক।

স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশিই পালক মা ছিল, যার কারণ তার জন্মের সময় নিজের অনুগত সমর্থকদের অন্য কিছু দেয়ার মতো সামর্থ্য হুমায়ুনের ছিল না।
মাহাম আগার পুত্র আদম খানের কাছে ক্ষমতা স্থানান্তরিত হয়। আবুল ফজলের ভাষায় সে 'যৌবন আর সমৃদ্ধি দ্বারা মাতাল' হয়ে যায় এবং 'ঔদ্ধত্যের বাতাসে তার গর্বের টুপি উড়ে যায়।' তিনি দখল করা শহর থেকে সম্রাটের জন্য প্রেরিত সম্পদ আর দখল করা হারেমের সবচেয়ে সুন্দরী বাসিন্দাদের নিজের জন্য আলাদা রাখতে চেষ্টা করেন। ১৫৬২ সালের মে মাসের উত্তপ্ত এক দুপুরবেলা তিনি তার দেহরক্ষীদের নিয়ে আগ্রার রাজকীয় প্রাসাদে প্রবেশ করেন যখন প্রতিদ্বন্দ্বী এক মন্ত্রী প্রকাশ্যে দর্শন দান করছিলেন। আকবরের আরেকজন ধাত্রীর স্বামী এই মন্ত্রী মহোদয় যখন উঠে দাঁড়ান তাকে স্বাগত জানাতে তখন আদম খান তার পাণ্ডাদের একজনকে ইশারা করেন তাকে ছুরিকাঘাত করতে। সে তার কথামতো কাজ করে। আদম খান তরবারি হাতে পাশে অবস্থিত হারেমের দিকে অগ্রসর হন, যেখানে আকবর ঘুমিয়ে ছিলেন। কিন্তু একজন খোজা প্রহরী দরজা আটকে ভেতর থেকে শিকল টেনে দেয়। উনিশ বছর বয়সী আকবরের ঘুম ইতিমধ্যে ভেঙে যায়, পাশের একটি দরজা খুলে বের হয়ে এসে আদম খানের দিকে দৌড়ে যান, চিৎকার করে ওঠেন 'হারামির বাচ্চা!' আদম খান ঘুরে দাঁড়িয়ে আকবরের পরনের কাপড়ের হাতা ধরতে চেষ্টা করেন। আদম খানের মুখে আকবর দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুসি বসিয়ে দেন—তার দিনপঞ্জি রচয়িতা প্রশংসার ভঙ্গিতে লিখেছেন, দেখে মনে হয়েছে যেন কেউ তার মুখে গদা দিয়ে আঘাত করেছে। আকবর তখনো সংজ্ঞাহীন আদম খানের দেহ প্রাসাদের প্রাচীর থেকে নিচে নিক্ষেপের আদেশ দেন, যা প্রায় ত্রিশ ফিট উঁচু। প্রথমবার ফেলার পরও যখন তার মৃত্যু হয় না তখন আকবর পুনরায় চুল ধরে তাকে ওপর নিয়ে এসে আবার নিচে ফেলতে বলেন। এবার মাথা নিচের দিকে দিয়ে। আবুল ফজলের ভাষ্য অনুসারে, 'তার গলা ভেঙে যায় এবং ঘিলু বেরিয়ে পড়ে। এভাবেই রক্তপিপাসু লম্পটটা তার অপরাধের উচিত শাস্তি লাভ করে।' আকবর পর্দার আড়াল থেকে প্রত্যাশাতীতভাবে আবির্ভূত হন।
আদমের সাথে তার সংঘর্ষ থেকে বোঝা যায় আকবর ব্যক্তিগতভাবে সাহসী ছিলেন। তিনি তার আব্বাজানের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করার ব্যাপারেও আগ্রহী ছিলেন। আবুল ফজলের ভাষ্য অনুসারে, তিনি বিশ্বাস করতেন 'একজন সম্রাটের সব সময় বিজয় অর্জনের বিষয়ে আগ্রহী থাকতে হবে নতুবা তার প্রতিবেশীরা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে।' তিনি প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য পরবর্তী বছরগুলোতে বহু যুদ্ধ পরিচালিত করেছেন। গিলটি করা দীপ্তিময় বর্মে বেশির ভাগ সময় সজ্জিত হয়ে তিনি সামনে অবস্থান

করে তার বাহিনীকে নেতৃত্ব দিতেন। দক্ষ আর নতুন ধারার প্রবর্তক একজন সেনাপতি হিসেবে তিনি জীবনে কখনো কোনো যুদ্ধে পরাজিত হননি। আকস্মিক আক্রমণ আর চোরাগোপ্তা হামলায় দক্ষ আকবর নয় দিনে একবার তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন। তার বাহিনীর চেয়ে অনেক বড় একটি বাহিনীকে বিস্মিত আর পরাজিত করতে। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে হাতি আর কামান দ্রুত স্থানান্তরের জন্য ভাসমান পন্টুন ব্যবহার করতেন। উচ্চ কোণে গোলা নিক্ষেপের জন্য তার একটি কামান ছিল, যেটাকে টেনে নিয়ে যেতে ১০০০ ষাঁড়ের প্রয়োজন হতো আর এমন কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন, যার ফলে চৌদ্দটা ম্যাচলক গাদাবন্দুক থেকে একসাথে গুলিবর্ষণ করা সম্ভব ছিল।

আকবরের রাজত্বকালের প্রথম বিজয় অভিযান, আজমির, গোয়ালিয়র আর জৌনপুরে পরিচালিত, তিনি তখনো পর্দার অন্তরালে অবস্থান করছেন সেই সময়ে তার পক্ষে পরিচালিত হয়েছিল। আকবর তার ব্যক্তিগত শাসনকালের গোড়ার দিকে রাজস্থানের (রাজপুতানা) কয়েকজন ক্ষমতাবান রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন। রাজপুত, যাদের নামের মানে, 'রাজার সন্তান', এবং যারা সব সময় পৃথিবীর সাহসী যোদ্ধাদের অন্যতম এবং স্পার্টানদের মতো যাদের মাঝে কঠোর সম্মানের সংহিতা প্রচলিত ছিল আর যাদের গোত্রসত্তা স্কটিশ হাইল্যান্ডের সমতুল্য। তাদের অনেককেই হিন্দু ভারতের নাইট বলা যায়। তাদের বীরত্বগাথা নিয়ে প্রচুর গল্প আর গান রচিত হয়েছে। নবম শতকের দিক থেকে রাজপুতরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে ধীরে ধীরে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে, যেখানে তারাই ছিল শাসক রাজবংশের বেশির ভাগ। তারা অবশ্য প্রায়ই একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান প্রবল গোত্রগত বৈরিতা আকবরের 'বিভক্ত আর শাসন'-এর প্রাথমিক নীতিকে সাহায্য করেছে।

১৫৬৭ সালের শেষের দিকে আর ১৫৬৮ সালের গোড়ার দিকে আকবরের চিতোর অবরোধ রাজপুতদের বীরত্বের একটি গৌরবময় অধ্যায় কিন্তু একই সাথে তাদের আপাত স্বাধীনতার সমাপ্তিও বটে। চিতোরের দুর্গ নিচের সমভূমি থেকে খাড়াভাবে উঠে যাওয়া পৌনে এক মাইল লম্বা একটি বেলে পাথরের শিলাস্তরের ওপর অবস্থিত ছিল। আকবর তার সৈন্যদের দুর্গের নিকটে পৌঁছাবার সুযোগ করে দিতে একটি লম্বা, আবৃত আক্রমণ গলিপথ নির্মাণের আদেশ দেন, *সাবাত*, যার ভেতর দিয়ে পাশাপাশি দশজন অশ্বারোহী অগ্রসর হতে পারবে এবং গলিপথটার দেয়াল পাথর আর পাথরকুচি দিয়ে তৈরি করা হয় আর ছাদ কাঠ আর চামড়া দিয়ে আবৃত করা হয়। প্রতিদিন চিতোরের দুর্গ প্রাকার থেকে তবকিরা প্রতিদিন নির্মাণ কাজে নিযুক্ত শত শত শ্রমিককে হত্যা

করে, যারা ধীরে, সর্পিল ভঙ্গিতে কিন্তু পাথরের মাঝ দিয়ে অপ্রতিরোধ্যভাবে এই মারাত্মক মনুষ্য নির্মিত সুড়ঙ্গটা তৈরি করছে। আকবর কয়েক মাস অবরোধের পর সহসা দুর্গের বিভিন্ন স্থান থেকে অগ্নিকুণ্ড আর ধোঁয়া নিঃসৃত হতে দেখেন। একজন দর্শক তাকে ব্যাখ্যা করে যে, রাজপুতেরা যখন পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পারে তখন তাদের পুরুষেরা নিজেদের বিয়ের জাফরান-হলুদ রঙের পোশাকে সজ্জিত হয়ে শহীদ হবার জন্য শেষবারের মতো আক্রমণ করার পূর্বে তাদের পরিবার জওহরব্রত পালন করছে—'শেষ ভয়ংকর উৎসর্গ, যা দেবতার উদ্দেশে রাজপুতদের হতাশ নিবেদন।' অগ্নিশিখাগুলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চিতার যেখানে রাজপুত রমণীরা নিজেদের আত্মাহুতি দিচ্ছেন।

যুদ্ধ করে রাজপুত যোদ্ধারা মৃত্যুবরণ করার পর এবং তার বন্ধুত্ব স্থাপনের স্বাভাবিক নীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে আকবর চিতোর দুর্গে তখন যারা বেঁচে ছিল, যাদের বেশির ভাগই আশ্রয়সন্ধানী কৃষক, সবাইকে নির্বিচারে হত্যার আদেশ দেন। তিনি এটা করেছিলেন সম্ভবত এ জন্য যে, চিতোর রাজপুত প্রতিরোধের একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল বা তিনি হয়তো ভবিষ্যৎ শত্রুদের বোঝাতে চেয়েছিলেন, যত বেশি প্রতিরোধ তারা গড়ে তুলবে তিনি প্রবলভাবে প্রত্যাঘাত করবেন। ১৫৭০ সাল একজন বাদে বাকি সব রাজপুত রাজা, মেওয়ারের রানা (উদয়পুর) যিনি পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, মোগল আধিপত্য স্বীকার করে নেন।

আকবর এর পরে পশ্চিম উপকূলবর্তী রাজ্য গুজরাটের দিকে মনোযোগ দেন। আরব আর অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যের একটি প্রধান প্রবেশপথ হিসেবে, সেইসাথে মক্কার উদ্দেশে তীর্থযাত্রীরা এখান থেকেই যাত্রা শুরু করায়, এর অবস্থানের সুবিধার কারণে রাজ্যটা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ছিল। মোগলরা প্রায়ই যা করে থাকে, আকবরও একটি তুচ্ছ অছিলার ওপর ভিত্তি করে নিজের কর্মকাণ্ডকে ন্যায়সংগত প্রতিপাদন করতে চান দাবি করেন, যে গুজরাট হুমায়ুনের সাম্রাজ্যের আজ্ঞাধীন ছিল। আকবর সেইসাথে তার বৈশিষ্ট্যসূচক কৌশলের সুযোগে রাজ্যের ক্ষমতাসীন অভিজাতদের মাঝে বিদ্যমান বিরোধের সুযোগ নেন, তাদের একটি দল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বলে দাবি করেন। আকবর পরবর্তী জীবনে কুটিলতার সাথে দাবি করবেন যে, তার প্রতিটি বিজয় 'স্বেচ্ছায় এবং আত্মপ্রশ্রয় থেকে অর্জিত হয়নি...আমাদের সাধারণ মানুষের প্রতি দয়ালু হওয়া ছাড়া এবং তাদের নিপীড়কের হাত থেকে মুক্তি দেয়া ভিন্ন কোনো উপায় ছিল না।' গুজরাট অভিযান ছিল একটি সংক্ষিপ্ত অভিযান এবং ১৫৭৩ সালের শেষ নাগাদ গুজরাট নিরাপদে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আকবর, একজন সুন্নি মুসলমান, যখন রাজপুতদের সাথে যুদ্ধরত তখনই তাদের সাথে এবং তার শাসনাধীন নতুন হিন্দু অধ্যুষিত সাম্রাজ্যের অন্যান্য হিন্দু জনগোষ্ঠীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারেন। তিনি একাধিক উপায়ে এই লক্ষ্য অর্জন করেন। আবুল ফজল প্রথমটা বর্ণনা করেছেন : 'মহামান্য সম্রাট হিন্দুস্তানের এবং অন্যান্য রাজ্যের রাজকুমারীদের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং এসব প্রীতিকর বন্ধনের সাহায্যে বিশ্ব শান্তি আনয়ন করেন।' আকবর উনিশ বছর বয়সে রাজপুত রাজকুমারীদের প্রথমজনকে বিয়ে করেন, আম্বারের (জয়পুর) রাজার কন্যা। তার এবং আকবরের অন্যান্য অমুসলিম স্ত্রীদের হারেমে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অনুমতি ছিল। আকবর অবশ্য তার নিজের কন্যাদের অন্য ধর্মের শাসকদের সাথে বিয়ে দেননি এবং বস্তুতপক্ষে তার সময়কাল থেকেই এটা প্রথায় পরিণত হয় যে, মোগল রাজকন্যারা পারতপক্ষে একেবারেই বিয়ে করবে না, সম্ভবত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশ সৃষ্টির সম্ভাবনা পরিহার করতে। আকবর তার দরবারে বয়োজ্যেষ্ঠ রাজপুত অভিজাতদের উচ্চপদে বহাল করেন। শীঘ্রই, ব্রিটিশ রাজকীয় বাহিনীর স্কটদের মতো, তার বাহিনীর আর সেনাপতিদের মধ্যে অনুপাতহীন সংখ্যায় তারা বহাল হয়, তাদের রাজপ্রাসাদের অশ্বারোহী প্রহরী কিংবা রাজকীয় দুর্গপ্রাসাদে তারা প্রবেশ করার সময় ঢাক বাজানোর মতো বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়।

হিন্দু মন্দির অপবিত্রীকরণ আকবর নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ১৫৬৩ সালে তিনি যখন জানতে পারেন যে তার আধিকারীকেরা আগ্রার চল্লিশ মাইল দূরে হিন্দু তীর্থস্থান মথুরা যা ভগবান কৃষ্ণের জন্মস্থান বলে হিন্দুরা বিশ্বাস করে, দর্শন করার জন্য হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে বিশেষ কর আদায় করছে তিনি সাথে সাথে তার সাম্রাজ্যের সর্বত্র তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে এমন কর আদায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ফরমান জারি করেন। ১৫৬৪ সালে মোল্লাদের অখুশির কারণ ঘটিয়ে, তিনি আরো অগ্রসর হয়ে কোরআনে বর্ণিত 'বিধর্মী'দের ওপর আরোপিত *জিজিয়া* বিলুপ্ত করেন, যা মোল্লাদের দৃষ্টিতে শরিয়ার বা ইসলামি আইনের 'সরল পথ'-এর অপরিহার্য উপাদান। আকবর সেইসাথে অসংখ্য ক্ষুদ্র, বৈষম্যমূলক আর মর্যাদাহানিকর রীতির যেমন হিন্দুরা তাদের কর দিতে বিলম্ব করলে মুসলিম কাজীদের তাদের মুখে থুতু ফেলতে পারার মতো উদ্ভট অধিকারের বিলুপ্তি সাধন করেন।

আকবর তার বিস্তৃত হতে থাকা সাম্রাজ্য সংঘটিত করতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক প্রশাসনিক আর ভূমি আইন সংস্কার করেন। তিনি শের শাহের, যিনি নিজে একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, প্রবর্তিত পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে এটা

করেন এবং সামরিক আভিজাত্যকে উচ্চ মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত রাজকীয় আমলাতন্ত্রে পরিণত করেন, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সবাই সাম্রাজ্যের সেবক হিসেবে বিবেচিত হবেন। রাজপুত এবং করদ রাজ্যগুলো যাদের শাসকরা মোগল আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছে এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ পরিচালনার বিনিময়ে রাজকোষে বার্ষিক কর পরিশোধে সম্মত হয়েছে সেগুলো ভিন্ন আকবর তার সাম্রাজ্যের সমস্ত ভূমি তার নিজস্ব রাজকীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেন এবং সেগুলো *জাগীর* হিসেবে বিভক্ত করেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার পক্ষে সেগুলো শাসন করার জন্য অভিজাতদের নিয়োগ করেন। রাজকীয় কর্মচারী, অভিজাতদের দ্বারা *জাগীর থেকে* সংগৃহীত খাজনার পরিবর্তে তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যের ব্যয় নির্বাহ করতে হতো। তারা সামরিক দায়িত্ব পালন করুক বা না করুক, তিনি তার অভিজাত আর আধিকারিকদের দশ থেকে দশ হাজারের ভেতর একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যের প্রাধান্য পরম্পরাবিশিষ্ট সেনাপতি হিসেবে বিভক্ত করেন। রাজকীয় রন্ধনশালার প্রধানও 'ছয়শত মসনবদার' হিসেবে বিবেচিত হয়।*

আকবর আরো ফরমান জারি করেন, যখন কোনো অভিজাত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে তার সম্পত্তি সম্রাট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হবে। কারণ তিনি অভিজাতদের নিজের খেয়াল খুশিমতো তাদের জাগীর থেকে সরিয়ে দিয়ে বা সাম্রাজ্যের অন্যপ্রান্তের কোনো জাগীরে তাদের পাঠানোর পাশাপাশি তাদের মৃত্যুর পরে তাদের সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের কাছ থেকে অধিকতর আনুগত্য প্রত্যাশা করেছিলেন এবং সেইসাথে অন্যত্র বৈরী শক্তিকেন্দ্র সৃষ্টির সম্ভাবনাও বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন। দিনপঞ্জি রচয়িতাদের ভাষ্য অনুসারে তার পরও তাকে ১৪৪ বার বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছে—সবই অসফল—তার রাজত্বকালে।

আকবর তার সাম্রাজ্যে ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থার, শব্দটার উভয় অর্থ অনুসারেই, গুরুত্ব বেশ ভালোভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। ব্রিটিশরা পরবর্তীকালে যখন ইংরেজি আর রেলপথ ভারত শাসনে ব্যবহার করেছিল, আকবর দরবারের ভাষা হিসেবে ফার্সি এবং রাস্তার দুই পাশে ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষযুক্ত দীর্ঘ সড়ক পথ নির্মাণ করেন।* উন্নত সড়ক বরাবর নির্দিষ্ট দূরত্বে

---

* ভারতীয়দের প্রবর্তিত শূন্যের উপর ভিত্তি করে আকবরের 'দশের' ব্যবহার নির্দিষ্ট ছিল। আবরী সংখ্যা হিসাবে আমরা যা চিনি সেগুলো বস্তুতপক্ষে ভারতীয় সংখ্যা। মধ্যপ্রাচ্যের ভিতর দিয়ে সেগুলো মূলত ইউরোপে এসেছে।

* উর্দু, বর্তমানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা, হিন্দীর সাথে মোগল শাসকদের দ্বারা ব্যবহৃত ফার্সীর সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে। মোগল সামরিক ছাউনিতে মূলত এটা ব্যবহৃত হতো এবং উর্দু শব্দটির মানে 'ছাউনি'।

অবস্থিত সরাইখানায় পথিকেরা বিশ্রাম নিতে পারত এবং রাজকীয় বার্তাবাহকেরা তাদের বাহন ঘোড়া কিংবা বার্তা বদল করতে পারত। অশ্বপর্যায়ের মাধ্যমে এভাবে চব্বিশ ঘন্টার ভেতর রাজকীয় ফরমান দেড়শ মাইল পর্যন্ত বহন করা সম্ভব ছিল। পর্যটকদের রাজকীয় ক্ষমতার পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিতে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরে কোনো একটি সরাইখানায় বিদ্রোহী আর ডাকাতদের ভাগ্যে কী লেখা রয়েছে সেটা দেখাতে ছিন্ন মস্তক স্তূপ করে রাখা থাকত। এক ইংরেজ পর্যটক বর্ণনা করেছেন কীভাবে ছিন্ন মস্তকগুলো একত্রে গেঁথে, কীভাবে ছোট্ট একটি গম্বুজ বা বলভি নির্মাণ করা হতো, যা 'দেখতে অনেকটা কবুতরের বাসার মতো', তিন কি চার ফিটের বেশি উঁচু হবে না।*

আকবরের কাছে, ধর্ম তার শাসনামলের পুরোটা সময় তার শাসনের এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনের মূল সুর হিসেবে বিদ্যমান থেকেছে। আকবর যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার হারেমে তিনশর অধিক স্ত্রী ছিল, অধিকাংশই রাজবংশীয় বধূ। কোরআন শরিফে একজন লোকের সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে কিন্তু একটি আয়াতে সম্ভবত অগণিত রমণীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক প্রকার বিয়ের কথা পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। আকবর এবং শিয়া ধর্মবেত্তা উভয়ের মতামত অনুসারে, আকবরের অতিরিক্ত বিয়ে এই পূর্বোপায় দ্বারা আইনত সিদ্ধ হয়েছে। ধর্মীয় আইনের বিষয়ে আকবরের প্রধান উপদেষ্টা সুন্নি ধর্মবেত্তা যখন দীর্ঘ বিতর্কের পর ভিন্ন মত পোষণ করেন আকবর তখন তার পরিবর্তে অনেক নতজানু শিয়া ধর্মবেত্তা নিয়োগ করেন। (প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে অষ্টম হেনরির বর্জন তুলনীয়, যখন পোপ তার অ্যারাগনের ক্যাথরিনের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ আর অ্যানা বোলিনকে বিয়ে করার অনুমতি দিতে রাজি হয় না, তখন ক্যাথলিক বিশ্বাস পরিত্যাগ করে নিজের সৃষ্ট খ্রিস্টান ধর্মমত গ্রহণের কারণ এখানেও স্পষ্ট।)

আকবরের মাঝে আপাতদৃষ্টিতে সব সময় একটি আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। তার কৈশোরের শেষ দিকে তিনি একবার সহসা ঘোড়া নিয়ে একাকী মরুভূমিতে চলে গিয়ে, সেখানে নিজের ঘোড়াটা ছেড়ে দেন এবং কঠিন ধ্যানে নিয়োজিত হবার পরে দাবি করেন যে ঐশ্বরিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। বহু বছর পরে, পাঞ্জাবে শিকারের জন্য একটি ফলবান বৃক্ষের নিচে প্রস্তুতি নেয়ার সময়, 'একটি মহামহিমান্বিত আনন্দ তার দৈহিক কাঠামোকে আপ্লুত করে, স্রষ্টার (দর্শন) অবধারণের রশ্মি আপতিত করে।' অভিজ্ঞতাটা তাকে

---

* ইংল্যান্ডে সেই সময়ে স্থানীয় ফাঁসিকাঠে রাহাজানদের ঝুলন্ত দেহ প্রদর্শিত হতো এবং লন্ডনেই কেবল টেমসের ওপর সেতুর বরাবর বিদ্রোহীদের ছিন্ন মস্তক প্রদর্শিত হতো, রাজকীয় ক্ষমতার কথা জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিতে।
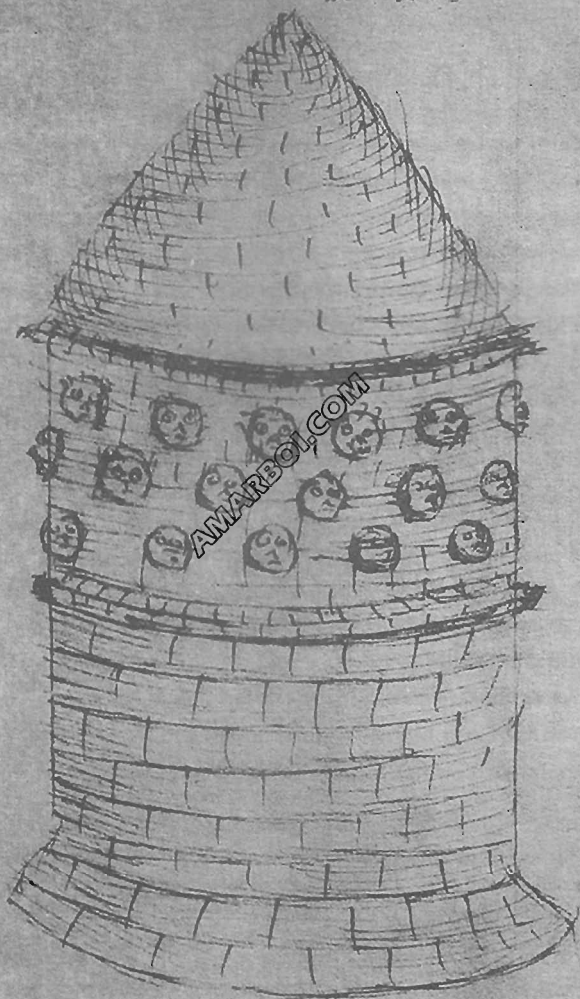
পর্যটক পিটার মানডির অঙ্কিত মানুষের ছিন্ন মস্তকের গম্বুজ।

এতটাই বিপর্যস্ত করে তোলে যে তার আম্মিজান, হামিদা তার সন্তানের যত্নের জন্য আগ্রা থেকে বিশাল একটি দূরত্ব অতিক্রম করে তার কাছে ছুটে আসেন। তার সহজাত আধ্যাত্মিকতা আর এর সাথে রাজনৈতিক অভিপ্রায় যুক্ত হয়ে ধর্মকে তার সাম্রাজ্যে বিভেদকারী শক্তির পরিবর্তে ঐক্যের স্মারকে পরিণত করে, তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধে আকবরকে আরো গভীর ধ্যানে মগ্ন করে তোলে। তিনি 'ইবাদতখানা'—'উপাসনা গৃহ' হিসেবে পরিচিত স্থাপনা নির্মাণ করেন এবং সব প্রধান ধর্মমতের তাত্ত্বিকদের সেখানে প্রবেশ করে নিজেদের ধর্মমত ব্যাখ্যা আর বিতর্কের আমন্ত্রণ জানান।

বিবদমান মুসলমান পণ্ডিতরা যখন দ্রুত একে অপরকে 'আহাম্মক আর খারেজি' বলে অবহিত করতে আরম্ভ করে, তিনি তার নিজের পক্ষে অভ্রান্তি সত্যতার ফতোয়া জারি করেন। মুসলমান ধর্মবেত্তারা যদি কোঅরান শরিফের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করে তাহলে আকবর নিজে সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়ায় বলা হয় যে, আকবর যখন বিষয়বস্তু ব্যতিরেকে কোনো ফতোয়া জারি করেন সেটা নিয়ে কোনো প্রকার তর্ক করা যাবে না, যদি না সেটা প্রতিপাদনীয়রূপে কোরআন শরিফের কোনো পূর্বোপায়ের বিরোধিতা করে। ১৫৩৪ সালে অষ্টম হেনরি ইংল্যান্ডে যা করেছিলেন ঠিক সে রকম তিনি নিজেকে তার ধর্মবিশ্বাসের অনাধ্যাত্মিক প্রধান করে তুলছিলেন, মোল্লাদের ক্ষমতাকে যা চূড়ান্তভাবে খর্ব করছিল।

আকবর সম্রাটের উপস্থিতিতে অভিবাদন জানাবার নতুন একটি রীতি প্রবর্তন করেন, সাষ্টাঙ্গপাত, মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে যা জানাতে হতো। মুসলমান ধর্মের অনুসারী যারা বিশ্বাস করে এমন অভিবাদন কেবল আল্লাহতায়ালার প্রতি করা যথার্থ তাদের কাছে এটা ছিল চরম ঘৃণিত একটি প্রথা। মোল্লার দল আকবরের অন্যান্য আরো অনেক তুচ্ছ রীতির প্রতি প্রতিবাদ জানায় যেমন তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দৈহিক মিলনের পর নয়, পূর্বে গোসল করার সিদ্ধান্ত। তাদের এই ক্ষেত্রে আপত্তির কারণ সম্ভবত এই যে তিনি যৌনতা থেকে পরিচ্ছন্ন হবার অবশ্য পালনীয় আচার দূরে সরিয়ে এই অনভূতির উদ্রেকের সময় একে আনন্দের বিষয়ে পরিণত করছেন, যা সেই প্রত্যাশায় পরিচ্ছন্নতা দাবি করে। তিনি একই সাথে রবিবার পশু জবাই করা নিষিদ্ধ করেন, কারণ দিনটা সূর্যের কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত। তিনি দাড়ি রাখাকে নিরুৎসাহিত করেন, যা গোঁড়া মুসলমানদের কাছে মুখের শোভাবর্ধক হিসেবে জনপ্রিয়, সেইসাথে পেঁয়াজ আর রসুন খাওয়াও কমাতে বলেন। তিনি মনে করতেন, 'এক টুকরো ত্বকের অপসারণ কোনোভাবেই ঈশ্বরের কাছে কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না।' এবং সে জন্য ফতোয়া জারি করেন, ছেলে বাচ্চাদের বয়স বারো বছর না হওয়া পর্যন্ত তাদের খৎনা করা যাবে না, যখন তাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া হবে যে তারা খৎনা করাতে চায় কি না।

আকবর হিন্দুদের সাথে তর্ক করেন, তাদের মহাকাব্যগুলোর অনুবাদ করান, তাদের উৎসবে যোগ দেন, এমনকি কপালে লাল *তিলক* দিয়ে তিনি সেখানে হাজির হন। বীতশ্রদ্ধ এক মুসলমান অভিযোগ জানায় যে, আকবর 'আগুন, পানি, পাথর এবং বৃক্ষ আর অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তু, এমনকি গরু আর তার গোবরকে গভীরভাবে ভক্তি করতে' প্ররোচিত হয়েছেন। আকবর পার্সিদের বা অন্য জরোস্ট্রিয়ানদের মতো করেই সূর্যের সামনে নিজেকে প্রণত করতেন। তিনি তাও, জৈন আর কনফুসিয়াসের মতবাদের ভেতরে সারবস্তুর সন্ধান পেয়েছিলেন। শিখরা তার মাঝে 'মনোযোগী একজন শ্রোতার' দেখা পেয়েছিল।

১৫৭৯ সালে আকবর ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের উপকূলে অবস্থিত গোয়ার পর্তুগিজ উপনিবেশের জেসুইট পাদ্রিদের তলব করেন। তিনি পাদ্রিদের প্রতি যথাযোগ্য সৌজন্য প্রদর্শনপূর্বক আপ্যায়িত করেন এবং তারা পরবর্তী সময়ে জানায়, তিনি বাইবেলের চার খণ্ড 'গভীর শ্রদ্ধার সাথে' গ্রহণ করেছেন, প্রতিটি খণ্ড পর্যায়ক্রমে চুম্বন করে এবং সেটা 'নিজের মাথায় স্থাপন করেছেন, যা পাদ্রিদের মাঝে সম্মান আর শ্রদ্ধার ইঙ্গিতবহ।' তিনি এমনকি পাদ্রিদের ব্যক্তিগত প্রার্থনার ছোট বেদিযুক্ত স্থানে প্রবেশের সময় নিজের মাথা থেকে পাগড়ি খুলে রেখেছিলেন এবং কখনো কখনো ক্রুশ পরিধানে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং একটি ক্রুশ তার শয্যার পাশে ঝোলানো থাকত। পাদ্রিরা দুই বছরের অধিক সময় আশাবাদী ছিল যে, তিনি হয়তো কনস্ট্যানটিনের সমকক্ষ হয়ে একটি সাম্রাজ্যকে খ্রিস্টান ধর্মমতের নিকট অর্পণ করবেন কিন্তু তিনি সেটা করেননি।

আকবরের কাছে, ভূমণ্ডলের চারপাশের অসংখ্য ধর্মমতের মাঝে খ্রিস্টধর্ম একটি, প্রতিটি বিশ্বাসের ভেতরেই সত্যের উপাদান রয়েছে। আকবর বিশেষ কোনো ধর্ম গ্রহণ করার পরিবর্তে একটি নতুন ধর্মমতের সূচনা করেন—দীন ই ইলাহি নামে পরিচিত—যা তার প্রজাদের একতাবদ্ধ করবে তাদের নিজেদের সনাতন ধর্মবিশ্বাস পরিহার করতে বাধ্য না করেই। তার প্রচারিত ধর্মমত শক্ত গাঁথুনির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল না, যেখানে পুনরুত্থান আর কর্ম উভয় নীতিই গৃহীত হয়েছিল এবং সকল জীবিত বস্তুর প্রতি ক্ষমাশীলতা, সহিষ্ণুতা এবং দয়া প্রদর্শন করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। দশটা অধর্ম আর দশটা সদ্‌গুণের নামোল্লেখ করা হয়। সূর্যকে দেবত্ব জ্ঞানে পূজা করা হয় এবং স্রষ্টার সাথে একীভবন চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। যেহেতু 'রাজার অন্তর্জ্ঞানের মাঝেই দিব্য নিজেকে প্রতীয়মান করবে', আকবর নিজে দৈব আর মানবতার মধ্যবর্তী একমাত্র সংযোগ পথ, কিন্তু তিনি নিজের জন্য কোনো দিব্য মর্যাদা দাবি করেছিলেন কি না, সেটা কখনো পরিষ্কার করা হয়নি। তিনি তার

সাম্রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রায় পরিবর্তন সাধন করে সেখানে 'আল্লাহ আকবর' কথাটা উৎকীর্ণ করেন, পূর্বে যেখানে কেবল তার নাম উৎকীর্ণ করা থাকত। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একটি শব্দ দুটোর মানে 'স্রষ্টা *আকবর*—মহান—কিন্তু এই শব্দ যুগলকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় 'আকবরই স্রষ্টা।'

আকবরের প্রথম সারির অনেক শীর্ষস্থানীয় অমাত্য নিজেদের স্বার্থের কারণে যদিও তার ধর্মবিশ্বাস মেনে নেন, তিনি কখনো এটাকে ধর্মান্তরিতকরণের ধর্মমতে পরিণত করেননি; সে কারণেই মতবাদটি কখনো ব্যাপক অনুসারী লাভ করেনি এবং তার মৃত্যুর পর বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। অবশ্য ধর্মীয় বিতর্কের তুমুল উপস্থিতি আর আকবরের সারা জীবনের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা তার প্রজাদের ভেতরে অন্তর্ভুক্তির একটি বৃহত্তর বোধের জন্ম দেয়, তারা তার সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মমতগুলোর যেটার প্রতিই বিশ্বস্ত থাকুক।

■

আকবরের বয়স যখন বিশের ঘরের মাঝামাঝি এবং অসংখ্য স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি তখনো জীবিত কোনো উত্তরাধিকারীর পিতৃত্ব অর্জন করেননি এবং পীর-ফকিরের সাথে পরামর্শ করা শুরু করেন। শেখ সেলিম চিশতি নামে একজন মুসলিম আধ্যাত্মিক সাধক বা সুফির সম্পর্কে জানতে পারেন, আগ্রার তেইশ মাইল পশ্চিমে সিক্রির ছোট একটি জনপদে বাস করেন, তিনি তার সাথে দেখা করতে যান।* মহান শেখ আকবরকে সান্ত্বনা দেন যে তার তিনটি পুত্রসন্তান হবে। আকবরের প্রধান মহিষী, আম্বারের রাজপুত রাজার কন্যা, এর কিছুদিনের ভেতরেই গর্ভধারণ করেন। আকবর তাকে শেখ সাহেবের কাছে অবস্থান করতে প্রেরণ করেন, যাতে তার গর্ভধারণ সৌভাগ্য বয়ে আনে। ১৫৬৯ সালের ৩০ আগস্ট, সিক্রিতে তিনি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলে মরমি সাধকের নাম অনুসারে আকবর তার এই পুত্রের নাম রাখেন সেলিম কিন্তু সম্রাট হবার পর আমরা তাকে জাহাঙ্গীর নামেই চিনি। অন্য দুই পুত্র মুরাদ আর দানিয়েলের জন্ম অন্য মায়েদের গর্ভে, পরবর্তী তিন বছরের ভেতরেই জন্মগ্রহণ করেন, একজন জন্মগ্রহণ করেন সিক্রিতে আর অন্যজন চিশতির অন্য আরেকটা আশ্রমে।

---

* নানা ধরনের মরমি তরিকার মাধ্যমে সুফি সাধকরা স্রষ্টার সাথে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনুসন্ধানের বিষয়ে উপদেশ প্রদান করে থাকে। *সুফি* শব্দটার মানে 'যারা *সুফ* পরিধান করে', পশমের তৈরি এক ধরনের রুক্ষ পোশাক। মরমি সাধকরা খ্রিস্টান তপস্বীদের মতোই বিশেষ এক প্রকার লেবাস গ্রহণ করেছে দারিদ্র্য আর কৃচ্ছ্রতার লক্ষণ হিসেবে।

আকবর তার পরামর্শদাতাকে সম্মান প্রদর্শন করতে এবং সিক্রি থেকে তার জন্য যে সৌভাগ্য বয়ে এসেছে তা থেকে যথার্থভাবে লাভবান হতে, তিনি সিদ্ধান্ত নেন, সেখানে নতুন একটি শহর তৈরি করে তার সাম্রাজ্যের রাজধানী আগ্রা থেকে সেখানে স্থানান্তরিত করবেন। তিনি পরবর্তী সময়ে সিক্রির নাম 'ফতেহপুর' উপসর্গযোগে অলংকৃত করবেন, যার মানে 'বিজয়ের নগর', গুজরাটে তার সামরিক সাফল্যের স্মারক। আকবরের শাসনামলে ফতেহপুর সিক্রি অবশ্য প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ প্রকল্প নয়—সেটা ছিল তার আব্বাজান হুমায়ুনের মকবরা। দিল্লির দক্ষিণৎ-পূর্ব প্রান্তে এই বিশাল উদ্যানবেষ্টিত মকবরা নির্মিত হয়েছিল এবং অনভিজ্ঞ একজন লোকই বুঝতে পারবে, এটাই তাজমহলের স্পষ্ট অগ্রদূত। একটি বিশাল প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানে লাল বেলে পাথরের বর্গাকৃতির বাইশ ফিট উঁচু খিলানযুক্ত মোকাম-কুর্সির ওপর একটি প্রতিসম পরিকল্পনা অনুসারে মকবরাটা নির্মিত হয়েছে। মকবরার বেলে পাথরের ওপর সাদা মার্বেলের জটিল নকশা প্রণিহিত করা হয়েছে এবং সৌধের কেন্দ্রস্থলে সাদা মার্বেলের একটি চওড়া গম্বুজ, যা *ইবানের* পেছনে বা সৌধের দেয়াল থেকে সরিয়ে এনে নির্মিত খিলানাকৃতি প্রবেশপথ অবস্থিত। অধিকাংশ মোগল ইমারত থেকে এটা একেবারেই আলাদা। এই মকবরাটার নির্মাণের সাথে দুজন খ্যাতিমান স্থপতির নাম জড়িয়ে রয়েছে, সৈয়দ মোহাম্মদ আর তার পিতা উস্তাদোঁ-কি-উস্তাদ মীরকে সৈয়দ মির্জা গিয়াস। তারা উভয়েই পারস্যের অধিবাসী এবং মকবরাটা মূলত পারস্যের স্থাপত্যরীতি অনুসারে নির্মিত, যেখানে রয়েছে অষ্টভুজাকৃতি সমাধিকক্ষ আর খিলানযুক্ত প্রতিহার। মকবরায় একটি স্থানীয় উপাদান অবশ্য রয়েছে সেটা হলো গম্বুজে অধিরোপিত বাইশ ফিট উঁচু পিতলের কন্দসদৃশ পদ্মের কারুকাজ এবং খিলানের ওপরের দেয়াল আর মকবরার মূল অংশের প্রতিটি ছাদে অবস্থিত ছত্রীতে—হিন্দু রাশিচক্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক, যা আত্মা আর বস্তুর মাঝে ভারসাম্য নির্দেশ করে—ছয় কোণবিশিষ্ট তারকা। (*ছত্রী* শব্দটার মানে 'ছাতা' কিন্তু স্থাপত্যবিদ্যায় এর মানে স্তম্ভযুক্ত আর গম্বুজবিশিষ্ট উন্মুক্ত শামিয়ানা।)

ভারতবর্ষে হুমায়ুনের মকবরায় প্রথম এত বিপুল পরিমাণ মার্বেল আর বেলে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। স্থাপত্যবিদ্যার কোনো কোনো ঐতিহাসিক এমনও ইঙ্গিত করেন, সাদা (মার্বেল) আর লালের (বেলে পাথর) সর্বজনীন ব্যবহারের মাধ্যমে, স্থিতধি আকবর মোগলদের সাথে হিন্দুদের সামাজিক কাঠামোর দুটো শীর্ষস্থানীয় জাতের—ব্রাহ্মণদের সাদা আর ক্ষত্রিয়দের লালের সংযোজন ঘটিয়েছেন।

আকবর যমুনার তীরে অবস্থিত আগ্রার দুর্গ পুনরায় নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নিজের সামর্থ্যের প্রদর্শন করতে বাস্তবিকই দুই হাতে দুজন

প্রাপ্তবয়স্ক লোককে উঁচু করে তুলে ধরে বেলে পাথরের তৈরি দেড় মাইল দীর্ঘ আরক্ষা প্রাচীরের পুরোটা দৌড়ে অতিক্রম করেন। ফতেহ্পুর সিক্রিতেই অবশ্য স্থাপত্যকলা সম্বন্ধে তার ধারণা ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একটি বিশাল চতুর্ভুজের আকৃতিতে শহরটা গড়ে উঠেছে, যার তিন দিকে দুর্গ নির্মাণপূর্বক শক্তিশালী করা হয়েছে এবং বাকি একটি দিকে লম্বা সরু চূড়াযুক্ত গিরি-পর্বতের অবস্থান। শহরটা যদিও মোগল রীতি অনুসরণ করেই নির্মিত হয়েছে কিন্তু ইমারতগুলোর নির্মাণশৈলীতে, যার অনেকগুলোই সংরক্ষণের কারণে আজও দারুণভাবে টিকে আছে, প্রায় পুরোপুরি হিন্দু প্রভাব রয়েছে। শহরটা বেলে পাথর দিয়ে নির্মিত হয়েছে, যা একজন দক্ষ পাথর খোদাইকারী সূত্রধর যেভাবে কাঠে খোদাই করে সেভাবে খোদাই করতে সক্ষম। হিন্দু মন্দিরের কাঠের অলংকৃত ভাস্কর্যের সাথে তাই স্পষ্টভাবে খোদাই করা অলংকরণের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। বেলে পাথরের গুণাবলির জন্য প্রাক গঠনের সুযোগ পাওয়া যায়। ইউরোপ থেকে আগত জেসুইট পাদ্রি, ফাদার আন্তোনিও মনসেরাত, লক্ষ্য করেছেন, 'পাথর খোদাইয়ের শব্দের কারণে আকবর নিজে যেন বধির না হয়ে যান সে জন্য তিনি সব কিছু ইমারতের সঠিক পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে সব কিছু দারুণ দক্ষতার সাথে অন্যত্র নির্মাণ করেন এবং নির্মিত টুকরোগুলো এরপর নির্ধারিত স্থানে নিয়ে এসে পরস্পরের সাথে যুক্ত আর গ্রন্থিত করা হয়।' ফতেহ্পুর সিক্রির পাথর খোদাইকারীদের কাজে আকবরের ব্যাপক আগ্রহের বাস্তবরূপ অণুচিত্রে দেখা যায়। মনসেরাত আরেকটু এগিয়ে গিয়ে জানান, 'আকবর মাঝেমধ্যেই অন্য শ্রমিকদের সাথে একত্রে পাথর আহরণের স্থানে গিয়ে নিজে পাথর বাছাই করতেন। তিনি আমোদের জন্য হলেও, সাধারণ কারিগরের শিল্প-কৌশল অনুশীলন...করতেও কখনো পিছপা হতেন না।'

ফতেহ্পুর সিক্রিতে মনসেরাত উল্লেখ করেছেন প্রাক গঠন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়নি কিন্তু তার পরও এটা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না কীভাবে নয়টা তোরণদ্বারযুক্ত প্রাচীরবেষ্টিত এ শহরটা মাত্র সাত বছরে নির্মিত হয়েছিল। নিরাপত্তা প্রাচীরের অভ্যন্তরে ছিল রাজকীয় টাঁকশাল, হাম্মামখানা, উদ্যান, মসজিদ, অভিজাতদের বাসস্থান এবং সেইসাথে অবশ্যই আকবরের নিজের বসবাসের জন্য নির্মিত রাজপ্রাসাদ। তার ব্যক্তিগত মহল থেকে ঝলমলে অনুপ তালাও বা 'অতুলনীয় জলাধার' দেখা যেত।

বিশাল হারেম, যার নিরাপত্তার জন্য ছিল প্রহরীদের একটি বাসস্থান আর পুরু ধাতব পাতযুক্ত দরজা যার সাথে দুর্গেরই সাদৃশ্য বেশি। হারেমের অধিবাসী মেয়েরা দেয়ালের অনেক উঁচুতে অবস্থিত পর্দা ঘেরা বারান্দা থেকে বাইরের পৃথিবীতে উঁকি দেয়ার সুযোগ পেত। কিন্তু এসব পুরু দেয়ালের পেছনে ছিল

বিলাসবহুল প্রমোদকানন। উজ্জ্বল ফুলের কেয়ারির মাঝে খেলা করত পানির ঝরনা এবং সূর্যের আলোয় ছাদের উজ্জ্বল নীল রঙের টালি দ্যুতি ছড়াত। যখন প্রশান্তিদায়ক বাতাস প্রবাহিত হতো, মেয়েরা একটি উঁচু শামিয়ানার নিচে সমবেত হতো—হাওয়া মহল বা 'বায়ুকানন'—সবাই মিলে সময়টা উপভোগ করতে। তাদের মহলের লাল বেলে পাথরের খোদাই করা ভাস্কর্য আর পরস্পরের সাথে সংযুক্ত প্রাঙ্গণের মাঝে হিন্দুদের একটি ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বিদ্যমান। আকবর, যিনি পর্দা ঘেরা সুড়ঙ্গের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা ব্যবহার করে হারেমে প্রবেশ করতে পারতেন, ধারণা করা হয় তিনি তার রক্ষিতাদের সাথে লুকাচুপি খেলতেন বা নর্তকীদের দিয়ে দাবার ঘুঁটি সাজিয়ে শতরঞ্চ উপভোগ করতেন।*

ইমারতসমূহের ভেতরে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন ইমারত একটি হলঘর, যার অভ্যন্তরে একটি চওড়া, দারুণভাবে কারুকাজ করা একটি স্তম্ভের ওপর একটি মঞ্চ রক্ষিত রয়েছে, যেখান থেকে সরু, সমকোণে অবস্থিত ঝুলন্ত সেতুর সাহায্যে প্রত্যেক কোণে অবস্থিত ঝুলন্ত প্রদর্শনী কক্ষে যাওয়া যায়। ঐতিহাসিকরা এর সুনির্দিষ্ট ব্যবহার সম্বন্ধে প্রচুর বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন কিন্তু অধিকাংশের বিবেচনায় আকবর এটাকে দর্শন দানের কামরা হিসেবে ব্যবহার করতেন। তিনি যখন মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক আহ্বান করতেন, তখন তিনি বৃত্তাকার মঞ্চের ওপর অবস্থান গ্রহণ করতে পারতেন এবং যারা সেই মুহূর্তে বারান্দায় অবস্থান করছিল তাদের কাছ থেকে পরামর্শ চাইতে পারতেন, যাদের পক্ষে যদি প্রয়োজন হতো তার দিকে সেতুর ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে পারত।

রালফ ফিচ, গোড়ার দিকের একজন ইংরেজ বণিক, আগ্রা আর ফতেহপুর সিক্রি দেখে এতটাই বিমোহিত হয়েছিলেন যে তিনি লিখেছেন, '(তারা) দুটো বিশাল বড় শহর। তাদের যেকোনো একটি শহরই লন্ডনের চেয়ে অনেক বিশাল এবং জনসংখ্যাও অনেক বেশি।' অবশ্য দৃষ্টিনন্দন ফতেহপুর সিক্রিতে অবশ্য মাত্র চৌদ্দ বছর পরিপূর্ণভাবে জীবনযাত্রা বজায় ছিল, এর পরই ১৫৮৬ সাল থেকে এটা ধীরে ধীরে একটি পরিত্যক্ত শহরে পরিণত হয়। শহরটার পরিত্যাগের কারণ নিয়ে অনেক বিতর্ক হলেও কখনো নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা

---

* তাজমহলের গাইডরা বর্তমানে পাথরের নিচু কিছু জায়গার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি করবে যে সেগুলোতে হারেমের মেয়েরা তাদের অলংকার লুকিয়ে রাখত, যাতে অলংকারের কিঙ্কিনী শব্দ তাদের অবস্থান ইঙ্গিত করতে না পারে। দাবা খেলা উৎপত্তিই হয়েছে ভারতবর্ষে এবং পারস্যের কাছ থেকে এটা ইউরোপে পৌঁছে গিয়েছে, সেখানে প্রচলিত 'চেক মেট'-এর অভিব্যক্তি মূলত ফার্সি 'শাহ মাত' থেকে এসেছে, যার মানে, 'রাজা পরাস্ত হয়েছেন'।

যায়নি। দুর্বল পানি সরবরাহ এবং অসন্তোষজনক যোগাযোগ ব্যবস্থার হয়তো কিছু অবদায়ী ভূমিকা রয়েছে। ফতেহপুর সিক্রি আগ্রার মতো আকবরের সাম্রাজ্যকে সংযুক্তকারী অতিকায় ট্রাঙ্ক রোডের যেকোনো একটির পাশে অবস্থিত ছিল না; এমনকি শহরটা যমুনার তীরেও অবস্থিত নয়, যা পণ্য পরিবহন আর ভ্রমণের অন্যতম প্রধান নদীপথ, বিশেষ করে যারা দিল্লি থেকে এবং দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করতে আগ্রহী। আকবর অবশ্য কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ফতেহপুর সিক্রি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি—সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে এটা ঘটেছে।

আকবরের মনোযোগ অন্য আরো অনেক বিষয়ের মাঝে একটি একেবারেই ভিন্ন স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হয়—কাশ্মীর। ১৫৮৬ সালে সংক্ষিপ্ত একটি অভিযানের মাধ্যমে দখল করার পর, কাশ্মীর আকবর আর তার উত্তরসূরিদের মন জয় করে নেয়। উত্তর ভারতের উঁচু পার্বত্য এলাকার মাঝে কাশ্মীরের উপত্যকা অবস্থিত এবং জায়গাটা মাত্র নব্বই মাইল দীর্ঘ আর পঁচিশ মাইল চওড়া। ঝিলম নদী দ্বারা বিধৌত, এটা একটি সুশ্যামল-শ্যাঙ্গরি-লা, এর ঢালে বাগানবিলাস আর জুনিপার এবং বিশেষ এক প্রকার ফার এবং সিডারে ছেয়ে আছে, যখন এখানের হ্রদের প্রান্তদেশ পপলার আর পাইনে ছেয়ে আছে। আকবর শরতের উজ্জ্বল রঙের বিন্যাস বিশেষভাবে পছন্দ করতেন এবং গ্রীষ্মে জাফরানের ক্ষেতের বেগুনি রং।

১৫৮০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ, তখন তার বয়স প্রায় চল্লিশ ছুঁইছুঁই করছে, ক্ষমতা আর আড়ম্বরের মধ্য গগনে তার অবস্থান, ভারতীয় আর ইউরোপীয় নির্বিশেষে যারাই তাকে দেখেছে তাদের সবার চোখেই তাকে আকর্ষণীয়, রাজকীয় আর অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম একজন মনে হয়েছে। ফাদার মনসেরাত তাকে বর্ণনা করেছেন এমন একজন হিসেবে 'যার রাজকীয় মহিমার সাথে মানানসই আর সংগতিপূর্ণ তার গুণাবলি, যার ফলে তাকে যারা প্রথমবারের মতো দেখছে তারাও তাকে দেখামাত্রই বুঝতে পারত যে তিনিই সম্রাট। তার কাঁধযুগল প্রশস্ত আর ঈষৎ বাঁকানো দুটো পা ঘোড়া পরিচালনায় বিশেষভাবে কার্যকরী এবং শ্যামলা বা বোধ করি চাপাই দেহত্বক...তার অভিব্যক্তি প্রশান্ত, খোলামেলা আর একই সাথে গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং তিনি যখন কুপিত হতেন, সম্রাট তখন ভয়ংকর...তিনি সবার কাছে নিজেকে কতটা অভিগম্য করে তুলেছিলেন সে সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা কঠিন...তাকে দেখতে এবং তার সাথে কথা বলতে সাধারণ মানুষ এবং তার অমাত্যরা যাতে সুযোগ পায় সে জন্য প্রতিদিনই তিনি সুযোগ সৃষ্টি করতেন; তিনি সবার প্রতি কঠোর মনোভাব ধারণের পরিবর্তে আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করতেন নিজেকে মধুরভাষী

আকবরের স্কেচ।

এবং বন্ধুভাবাপন্ন হিসেবে উপস্থাপন করতে...তার প্রজাদের মনে তার জায়গা করতে এই অমায়িক ব্যবহার আর সৌজন্যতাবোধ কতটা ভূমিকা রেখেছিল সেই সত্যিই বিস্ময়কর...তার একেবারেই নিজস্ব বোধক একটি অন্তর্দৃষ্টি ছিল আর বিচক্ষণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

আকবরের পুত্র সেলিম, অবশ্য একটি দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রাজকীয় গ্রন্থাগারে ব্যয়বহুলভাবে বাঁধাই করা পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ২৫,০০০ অতিক্রম করলেও তার আব্বাজান ছিলেন 'অশিক্ষিত।' কিন্তু সব সময় বিজ্ঞ আর শিক্ষিত মানুষদের সাথে আলাপচারিতার ফলে, তার মুখের ভাষা এতটাই মার্জিত ছিল যে তার সাথে আলাপ করে কেউই কখনো বুঝতে পারত না যে তিনি একেবারেই অশিক্ষিত।' আকবরের বুদ্ধিমত্তা তার চারপাশের বিশাল পৃথিবী সম্বন্ধে তার গভীর কৌতূহল থেকেও সহজবোধ্য, যা তাকে করেছিল 'বিদেশিদের প্রতি দারুণ প্রসন্ন।'

১৫৭৭ সালে দারুণ সুশিক্ষিত একজন ভিনদেশি, একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পার্সি অভিজাত নাম মির্জা গিয়াস বেগ, আকবরের দরবারে উপস্থিত হন। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী কিন্তু নিঃস্ব লোকটা, অর্থনৈতিক কারণে নিজের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে তার আসন্ন প্রসবা স্ত্রী আর তিনটি ছোট ছোট সন্তান নিয়ে বন্য আর বসতিহীন অঞ্চলের ভেতর পাড়ি দিয়ে নিজের ভাগ্য ফেরাতে মোগল দরবারে এসেছিলেন। এই দুঃসাধ্য এবং বিপজ্জনক যাত্রায় অধিক নিরাপত্তার জন্য তারা বণিকদের একটি কাফেলার সাথে যোগ দিয়েছিল। তারা পারস্য অতিক্রম করার পূর্বেই তস্করেরা পরিবারটার ওপর হামলা চালিয়ে তাদের নিঃস্ব করে দুটো খচ্চর ছাড়া বাকি সব কিছু চুরি করে নিয়ে যায়। পরিবারটা পর্যায়ক্রমে পরিশ্রান্ত জন্তু দুটোর পিঠে চড়ে অগ্রসর হয়ে, হতশ্রী দলটা কান্দাহার পৌঁছায়, যেখানে গিয়াস বেগের স্ত্রী একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। তারা তাদের নবজাত কন্যার নাম রাখেন মেহেরুন্নিসা, 'রমণীকুল শিরোমণি।'

কোনো কোনো দিনপঞ্জি রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে, বেপরোয়া, দুর্গত পিতা-মাতা তাদের নবজাত কন্যাকে মৃত্যুর জন্য অসংরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ করেন কিন্তু কাফেলার ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর দৃষ্টি মেয়েটার ক্ষুদ্র অবয়ব নড়াচড়া করতে দেখে তাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে মেয়েটার মাকে খুঁজে বের করেন এবং তাদের সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন। অন্য গল্পগুলোতে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যোগ করা হয়েছে কীভাবে পিতা-মাতা, সব কিছু সত্ত্বেও, নিজেদের নবজাত সন্তানকে পরিত্যাগ করার ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। গিয়াস বেগ দ্রুত যে গাছের নিচে মেয়েকে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন সেখানে ফিরে এসে কুণ্ডলীকৃত বিশাল একটি কালো কালকেউটের কাছে শুয়ে আনন্দে হাত-পা ছুড়তে থাকা অবস্থায় মেহেরুন্নিসাকে খুঁজে পান। উন্মত্ত পিতাকে

এগিয়ে আসতে দেখে সাপটা কুণ্ডলীকৃত অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে নীরবে প্রস্থান করলে গিয়াস বেগ নিজের কন্যাকে ফিরে পান।

বাস্তবতা যাই হোক, মেহেরুন্নিসা তার জীবনের শুরুর এই অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠে তার পরিবারের সাথেই মোগল ভূখণ্ডে এসে উপস্থিত হয়। ফতেহ্পুর সিক্রিতে পৌঁছাবার পর, দরবারে আগত আগন্তুকদের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি অনুসারে গিয়াস বেগকে আকবরের সামনে উপস্থিত করা হয়। পার্সি অভিযাত্রিক তাৎক্ষণিকভাবে একটি ছাপ ফেলতে সক্ষম হন। তিনি তার আব্বাজানের মতোই জন্মসূত্রেই বাগ্মিতা অর্জন করেছিলেন। একজন স্বভাব-কবি, যিনি কালক্রমে ইসফাহানের *উজির* হয়েছিলেন। তার পরিবারের অন্য সদস্যরা ইতিমধ্যে মোগল দরবারে নানা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করায় এটাও তার জন্য শুভ হয়েছিল। গিয়াস বেগের মতো সাফল্য অবশ্য কেউই অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, যার পরিবার পরপর বেশ কয়েকজন সম্রাটকে মানসিক আর বৌদ্ধিকভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তার কন্যা এবং পৌত্রী মোগল সম্রাজ্ঞী হন এবং তার প্রপৌত্র মোগল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

গিয়াস বেগের শুরু অবশ্য এত কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয় না। আকবর তাকে মাঝারি একটি পদে নিয়োগ দিয়ে উত্তরের সীমান্ত-ফাঁড়ি কাবুলের কোষাধক্ষ্যের দায়িত্ব দিয়ে সেখানে প্রেরণ করেন। ১৫৯৬ সালে, তাকে আগ্রায় ফিরিয়ে এনে রাজদরবারের দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয়। মধ্যবর্তী বছরগুলোতে মেহেরুন্নিসা একজন সুন্দরী আর গুণবতী মেয়ে হিসেবে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। একটি ভাষ্য অনুসারে, 'অন্য কোনো মেয়ে নৃত্য, গীত, চিত্রকলা আর পদ্য রচনায় তার সমকক্ষ ছিল না। তার মেজাজ ছিল খেয়ালি, প্রাণবন্ত আর বিদ্রূপাত্মক ধীশক্তি এবং উদ্দাম আর বেপরোয়া সত্তার অধিকারী।' এত কিছু প্রশংসার আড়ালে যা বলা হয়নি সেটা হলো তিনি ভীষণ যৌনাবেদনময়ী ছিলেন। তার যখন সতেরো বছর বয়স তখন তার বিয়ে হয় উচ্চ বংশীয় আর কুশলী এক পার্সি সেনাপতির সাথে, যিনি আকবরের সেনাবাহিনীর নানা অভিযানে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন এবং সাহসিকতার জন্য তাকে শের আফগান, 'ব্যাঘ্র হন্তারক' উপাধি দেয়া হয়েছে।

অনেকগুলো ভাষ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে, হয় কাকতালীয় বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, ইতিমধ্যে যুবরাজ সেলিমের প্রণয়োন্মুখ দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। একটি ভাষ্য অনুসারে সেলিম তার আব্বাজানের সাথে দেখা করতে এলে 'প্রথা অনুযায়ী নেকাব পরিহিত অবস্থায় মেয়েদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।' মেহেরুন্নিসা আবেগোদ্দীপ্ত সেলিমের সামনে নৃত্য পরিবেশন করে যিনি 'ভদ্রতার দোহাই দিয়ে কোনোমতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করছিল...তার দৃষ্টি যখন তাকে গ্রাস করবে বলে মনে হতে থাকে, মেহেরুন্নিসা, অসাবধানতার

অজুহাত সৃষ্টি করে, নিজের নেকাব ফেলে দেয় এবং নিজেকে তার সামনে প্রকাশ করে... ।' কোনো কোনো ঐতিহাসিক দাবি করেন, আকবর নিজে তার বিয়ের আয়োজন করেছিলেন নিজের ছেলের নাগাল থেকে তাকে দূরে রাখতে। কিন্তু অন্য ভাষ্য অনুসারে সেলিম নিজের আবেগ সংযত করেছিলেন তার বাগদান অন্যত্র সম্পন্ন হবার পর এবং আকবরও 'কোনো ধরনের অবিচারকে লেশমাত্র প্রশ্রয় দিতে কঠোরভাবে অনিচ্ছুক' বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে কোনো বাধা দেন না।

এসব ঘটনা সংঘটিত হবার বহু বছর পর এসব ইতিহাস রচিত হয়েছিল এবং কোনো কোনো ভাষ্য রচিত হবার সময় মেহেরুন্নিসা ভারতবর্ষের সবচেয়ে ক্ষমতাবান রমণী, আবার কোনো কোনোটা রচিত হয়েছে ক্ষমতা থেকে তার পতনের পর। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাকে আর তার পরিবারকে কুশলী নব্য ভূঁইফোঁড় হিসেবে উপস্থাপন করতে উদগ্রীব ছিল, যেখানে অন্য রচনায় আভিজাত্য আর চিরন্তন প্রেমের কথা বর্ণিত হয়েছে। মেহেরুন্নিসার মতোই সত্যিটা নেকাবের আড়ালেই রয়েছে, যে গিয়াস বেগের বাড়ির জেনানা মহলের মেয়েদের মাঝে একজন অভিজাত বংশীয় মেয়ের মতোই নিভৃত জীবনযাপন করত। সেলিমের জন্য বস্তুতপক্ষে দরবারে বা প্রকাশ্যে অন্য কোথাও তার সাথে দেখা করার চেষ্টা করা অসম্ভব না হলেও কঠিন ছিল। মেহেরুন্নিসা অবশ্য একজন বিশ্বস্ত অমাত্যের কন্যা হবার সুবাদে রাজকীয় হারেমের রমণীদের সাথে দেখা করার জন্য আমন্ত্রিত হতেন, পেশিবহুল জেনানা প্রহরী আর খোজাদের দলের সতর্ক দৃষ্টির সামনে দিয়ে অতিক্রম করে ভেতরের রেশম আবৃত আর সুবাসিত অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নেকাব নামিয়ে রেখে নাচে গানে মুখরিত হতে পারতেন, যেখানে সংরক্ষিত প্রাঙ্গণে সম্রাট ব্যতীত অন্য কোনো দৈহিকভাবে সক্ষম পুরুষের প্রবেশের অধিকার ছিল না।

সেলিম ইতিমধ্যে বিবাহসূত্রে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন, যার অধিকাংশই আকবরের সাম্রাজ্যের বিচিত্র উপাদানকে একত্রে গ্রন্থিত করার লক্ষ্যে মূলত রাজবংশগুলোর ভেতর এক ধরনের মিত্রতা। ১৫৮৫ সালে তার আত্মীয় সম্পর্কিত ভগিনী মান বাঈয়ের সাথে, আম্বারের (জয়পুর) হিন্দুরাজার কন্যা, তার প্রথম বিয়ে হয়। ১৫৮৭ সালে তার গর্ভে তাদের প্রথম পুত্র খসরু জন্মগ্রহণ করেন। সেলিমের দ্বিতীয় পুত্র পারভেজ ১৫৮৯ সালে এক মুসলমান স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য তার তৃতীয় সন্তানের জন্মগ্রহণ, ১৫৯২ সালের ৫ জানুয়ারি লাহোরে মারওয়ারের (যোধপুর) হিন্দু রাজকুমারী অভিজাত আর বুদ্ধিমতী যোধা বাঈয়ের গর্ভে জন্ম নেয়ার ঘটনায় আকবর সবচেয়ে প্রীত হন। আকবর আর তার জ্যোতিষীরা এই পুত্রের জন্মগ্রহণকে সবচেয়ে মঙ্গলময় হিসেবে বিবেচনা করেন। এই সন্তান 'রাজবংশের

সৌভাগ্যের উষ্ণীষে আরেকটা পালকযুক্ত করবে এবং সূর্যের চেয়েও দীপ্তিময় হবে।' আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তার জন্মের সময় তারকারাজির অবস্থান তৈমূরের জন্মের সময়ের অবস্থানের সাথে আপতিত হয়; অন্যদিকে মহানবী (সা.)-এর জন্ম মাসের সাথে তার জন্ম মাস মিলে যায় এবং বছরটা ছিল মুসলিম বর্ষপঞ্জির ১০০০ বছর। সম্রাট তার এই পুত্রের নামকরণ করেন 'খুররম', যার মানে 'আনন্দময়।' এই সন্তান, যিনি একদিন সম্রাট শাহজাহান হিসেবে পরিচিত হবেন, একেবারে প্রথম দিন থেকেই আকবরের সবচেয়ে প্রিয় পৌত্র ছিলেন।

গিয়াস বেগও পরের বছর একটি সন্তানের জন্মগ্রহণের বিষয় উদ্‌যাপনের সুযোগ পান—তার এক পুত্রের ঔরসে জন্ম নেয়া এক নাতনি, যার নাম রাখা হয় আরজুমান্দ বানু। তিনি তার জীবদ্দশায় মমতাজ মহল হিসেবে পরিচিত হন, 'প্রাসাদের প্রিয়পাত্রী' এবং শাহজাহানের শ্রেষ্ঠ প্রেমিকা। তার অকালমৃত্যু তাকে প্রবাদপ্রতিম 'তাজের রমণী' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আকবর খুদে যুবরাজ খুররমকে নিজের প্রথমা স্ত্রীর হেফাজতে অর্পণ করেন, যার নাম রুকাইয়া বেগম। নিঃসন্তান এই রমণী আবার আকবরের আত্মীয় সম্পর্কিত ভগিনী, হিন্দালের মেয়ে আর একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। হিন্দু যোধা বাঈ সান্ত্বনা হিসেবে মূল্যবান মোতি আর রুবির অলংকার লাভ করেন। মোগল রীতি অনুসারে, চার বছর চার মাস আর চার দিন বয়সে আনুষ্ঠানিকভাবে খুররমের শিক্ষাদান শুরু হয়। আকবর নিজে রেশমের পোশাক পরিহিত, রত্নালংকার সজ্জিত খুদে যুবরাজকে হাতির পিঠে চাপিয়ে শাহি মসজিদের মক্তবে নিয়ে যান যেখানে সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় আলেমরা তাকে শিল্প, সাহিত্য আর তার পূর্বপুরুষদের, বিশেষ করে মহান তৈমূরের ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা দান করেন। দরবারের দিনপঞ্জির রচয়িতারা, সম্ভবত ভাবীকথন, দাবি করেন যে, খুদে যুবরাজ শক্তিশালী স্মৃতিশক্তি আর সেইসাথে বিষয়ের ব্যাপকতা দারুণ সাবলীলতার সাথে আয়ত্ত করেন। কিন্তু আরো অস্বাভাবিকভাবে তারা এটাও লেখেন, কীভাবে সেই অল্পবয়সেই তার মাঝে ইন্দ্রিয়পরায়ণ একটি অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। সুগন্ধির মাঝে কাপড় সিক্ত করতে তিনি পছন্দ করতেন এবং উজ্জ্বল, দ্যুতিময়, নিখুঁতভাবে পালিশ করা রত্ন স্পর্শ করলে উদ্দীপিত হয়ে উঠতেন। ঐতিহাসিকরা খুঁজে বের করেছেন, খুররমের খৎনার কোনো উল্লেখ কোথাও করা হয়নি, সম্ভবত একটি বিশাল উৎসবের আয়োজন এবং তাদের অভিমত এই যে, তার দাদাজান আকবরের প্রক্রিয়াটির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মিলজনিত কারণে তার খৎনা হয়তো কখনো করাই হয়নি। তার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আকবর নিজে তাকে যুদ্ধ আর মল্লযুদ্ধের কসরত শেখান। খুররমের যখন মাত্র ছয় বছর বয়স, আকবর তাকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণে

একটি অভিযানে যান, অভিযানের সময় একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ার, চৌকশ নিশানাবাজ আর ওস্তাদ তরোয়ালবাজকে তার প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। সেই অভিযানে তিনি একটি চিতাবাঘকে লক্ষ্য করে প্রথম গুলি করে আহত করেন। খুররম এর কিছুদিন পরই গুটিবসন্তে আক্রান্ত হন কিন্তু তার দাদাজানকে স্বস্তি দিয়ে কোনো প্রকার শারীরিক ত্রুটি ছাড়াই সুস্থ হয়ে ওঠেন। তার যখন নয় বছর বয়স আকবর তাকে তার সামরিক মন্ত্রণাপরিষদের সভায় অংশ নেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

আকবরের তার পৌত্রের প্রতি ভালোবাসার ঠিক বিপরীত অনুভূতি ছিল সেলিমের জন্য, যিনি নিজের স্মৃতিকথায় খানিকটা বিষণ্ণতার সাথেই খুররমের প্রতি আকবরের মমত্ববোধের এবং কীভাবে বৃদ্ধ সম্রাট অল্পবয়সী যুবরাজকে নিজের 'আসল সন্তান' হিসেবে সর্বসম্মুখে ঘোষণা করতেন সেই স্মৃতিচারণা করেছেন। আবুল ফজলও ঠিক একই কথাই লিখেছেন, 'মমতাময়ী সম্রাট নাতিকে পুত্রের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।' কিন্তু একটি সময় ছিল যখন আকবরও সেলিমকে চোখে হারাতেন। তিনিও শৈশবে হারেমের সবচেয়ে প্রশ্রয় লাভ করা প্রিয়পাত্র ছিলেন, যার শিকার আর অস্ত্র চালনায় দক্ষতা লাভের ইঙ্গিত দেখে আকবর আনন্দিত হয়েছিলেন। তার যখন মাত্র বারো বছর বয়স তাকে বিশাল একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দান করা হয় এবং আকবরের সাথে যুদ্ধযাত্রায় গমন করেন। যাই হোক, সেলিম বয়োঃবৃদ্ধির ফলে দক্ষ আর যোগ্য একজন প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হলে তার প্রতি আকবরের ভালোবাসায় ভাটা পড়ে। বৃদ্ধ সম্রাট সম্ভবত হুমকি অনুভব করেছিলেন, যা কোনো কারণে তার কাছে মনে হয়েছিল তার ছেলের অস্থির আর লোভী আকাঙ্ক্ষা।

মোগল দরবারে আগত এক ইংরেজ বণিক, উইলিয়াম ফিঞ্চের লিখিত ভাষ্যে এর ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী মোগল ঐতিহাসিকরা দুজনের ভেতরে যৌনতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা খোলাখুলিভাবেই বলেছেন। তারা দাবি করেন, সেলিম তার আব্বাজান আকবরের সবচেয়ে সুন্দরী রক্ষিতা, আনারকলির, যার মানে 'ডালিম ফুল' প্রেমে পড়ে এবং আকবর বিষয়টি জানতে পেরে হতভাগ্য প্রেমিকাকে জীবন্ত অবস্থায় দেয়াল তুলে সমাধিস্থ করেন।

সেলিম নিশ্চিতভাবেই জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তা বোধ করেন। মোগলদের পূর্বপুরুষরা যেহেতু সব সময় জ্যেষ্ঠের নীতি অনুসরণ করেননি, তাই তিনি যদিও আকবরের জ্যেষ্ঠ সন্তান, তিনি কোনোভাবেই ধরে নিতে পারেন না যে সিংহাসন তারই হবে। সিংহাসন দাবি করতে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে তিনি বহুদূরে অবস্থান করার সময় যদি তার আব্বাজানের মৃত্যু হয় এমন অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেলিম প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে অস্বীকৃতি জানান। আকবর এই বেয়াদবির কারণে প্রকাশ্যে

তার অন্য ছেলেদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা আরম্ভ করেন, যুবরাজ মুরাদ আর যুবরাজ দানিয়েল, দুজনেই অপদার্থের চূড়ান্ত আর বেহেড মাতাল। সেলিমও সুরাপান পছন্দ করতেন। তিনি আঠারো বছর বয়সে এক পাত্র মিষ্টি হলুদ বর্ণের সুরা পান করেছিলেন, যা তিনি স্বীকার করেছেন, 'আমি পান করলাম আর অনুভূতিটা আমার দারুণ পছন্দ হলো।' তিনি প্রতিদিন পান করা শুরু করেন, অচিরেই সুরা পরিত্যাগ করে অ্যালকোহল পান আরম্ভ করেন। তার যখন বয়স ত্রিশও হয়নি তখন প্রতিদিন তিনি 'দো-চোয়ানি অ্যালকোহলের বিশটি ছোট শিশি' পান করেছেন আর মুলা এবং রুটির মতো মামুলি খাবার খেয়ে বেঁচে ছিলেন। খোয়ারির ফলে বিপর্যস্ত এবং হাত এত ভীষণভাবে কাঁপছিল যে তার পক্ষে একটি পানপাত্রও ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, তিনি দরবারের হেকিমের শরণাপন্ন হন। তারা তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তিনি যদি সুরাপান বন্ধ না করে তাহলে ছয় মাসের ভেতর তার মৃত্যু অবধারিত। সেলিম মাত্রা কমিয়ে দিনে ছয় পাত্র অ্যালকোহলের সাথে সুরা মিশিয়ে পান করেন, সাথে চৌদ্দ গ্রেন আফিম। সুরার আসক্তি মুক্ত হবার প্রক্রিয়া, হোক অসম্পূর্ণ, সম্ভবত তার মেজাজের কোনো উন্নতি ঘটাতে পারেনি বা তার প্রতি তার আব্বাজানের অবহেলার জন্য অধিক ক্ষমাশীল করে তোলেনি।

১৬০১ সালে, বিক্ষুব্ধ সেলিম বিদ্রোহ করেন। তার বিদ্রোহ ছিল নিরুৎসাহী একটি প্রচেষ্টা এবং নিজেকে আপাতত স্থিরীকৃত ভঙ্গিতে সম্রাট হিসেবে অভিহিত করে ৩০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পিতা পুত্র উভয়েই প্রকাশ্য যুদ্ধ পরিহার করতে চেষ্টা করছিলেন। সেলিম বরং নিজের ক্ষোভ আবুল ফজলের দিকে ধাবিত করেন, যিনি আকবরের দিনপঞ্জির রচয়িতার পাশাপাশি তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের একজন। তাদের সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিল যে, শিকার করতে বের হয়ে আকবর যখন অণ্ডকোষে আঘাত প্রাপ্ত হন, আবুল ফজল গর্বের সাথে স্মরণ করেন, 'সৌভাগ্যের এই পুস্তকের লেখক' ক্ষতস্থানে মলম লাগাবার দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে, বায়ান্ন বছরের এই বৃদ্ধ অবশ্য আকবরের অন্যতম সফল সেনাপতিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং সেলিমের বিদ্রোহের সময় অন্য আরেকটি অভিযানে অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন। ১৬০২ সাল নাগাদ আবুল ফজলকে আগ্রায় ডেকে পাঠাবার মতো বিরক্তিতে আকবর আক্রান্ত হন। সেলিম এই পণ্ডিত সেনাপতিকে অপছন্দ আর অবিশ্বাস করত। সে পরবর্তী সময়ে নিজের স্মৃতিকথায় যেমন লিখেছে, 'কোনোভাবেই আমার বন্ধু নন' এবং তাকে হত্যা করার ফন্দি আঁটতে থাকেন। সম্রাটের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আবুল ফজল দ্রুত ফিরে আসার সময় স্থানীয় এক রাজার হাতে তার মৃত্যু হয়। সেলিম যাকে পুরস্কৃত করার প্রস্তাব

পৃথিবীর শাসক হিসাবে জাহাঙ্গীর, ইংল্যান্ডের জেমস, স্কটল্যান্ডের ষষ্ঠ জেমসের সাথে যাকে নীচের বামপাশে অপসারিত করা হয়েছে।

জাহাঙ্গীর আর খুররমের (শাহজাহান) জন্য নূরজাহানের আয়োজিত বিজয় উৎসব। তাকিয়ে থাকা রমণীদের একজন সম্ভবত মমতাজ মহল।

দিয়েছিলেন 'যদি তিনি এই রাজবৈরী লোককে বাধা দিতে আর তাকে হত্যা করতে পারে।' কোনো কোনো ভাষ্য অনুসারে, সেলিম বিজয়দীপ্ত রাজাকে আদেশ দিয়েছিলেন আবুল ফজলের ছিন্ন মস্তক তার কাছে প্রেরণ করতে, যাতে সেটা পায়খানার খাড়িতে নিক্ষেপ করা যায়।*

আকবর তার পোষা কবুতর ওড়াবার সময় হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে পারেন এবং নিদারুণ কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি সেলিমকে শাস্তি দিতে চান কিন্তু ভীষণ জটিল একটি পরিস্থিতির মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করেন। মুরাদ, চিত্তবৈকল্যে আক্রান্ত হয়ে তীব্র যন্ত্রণায় কাঁপতে কাঁপতে মৃত্যুবরণ করেন এবং দানিয়েল সুরাপান বজায় রেখে দারুণ ব্যস্ততায় দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেন। তার কাছ থেকে অ্যালকোহল দূরে সরিয়ে রাখতে তার আব্বাজানের ঐকান্তিক প্রয়াস সত্ত্বেও তার সমর্থকরা আকবরের গুপ্তচরদের চোখ ফাঁকি দিয়ে গরুর মূত্রাশয়ের মাঝে লুকিয়ে তার কাছে অ্যালকোহল নিয়ে আসত, তারা তাদের পোশাকের নিচে দেহের সাথে মূত্রাশয় পেঁচিয়ে বেধে রাখত। আকবর বুঝতে পারেন, মোগল রাজবংশকে রক্ষা করতে হলে সেলিম আর তাকে তাদের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধের মীমাংসা করতে হবে। মোগল রীতি অনুসারে, রাজপরিবারের মেয়েরা এ ক্ষেত্রে বার্তাবাহকের ভূমিকা পালন করে থাকে। আকবরের বয়োজ্যেষ্ঠ স্ত্রীদের একজন তার সাথে আগ্রায় ফিরে আসতে হতাশ যুবরাজকে রাজি করান, যেখানে তাকে তার দাদিজান হামিদা স্বাগত জানান, পঞ্চাশ বছর পূর্বে যিনি ছিলেন হুমায়ুনের নিস্পৃহ স্ত্রী। বৃদ্ধা রমণী সেলিমকে তার আব্বাজানের পায়ের কাছে প্রণত হতে রাজি করান। আকবর নাটকের দৃশ্যকল্পের ন্যায় দুই হাত বাড়িয়ে নিজের পথভ্রষ্ট ছেলেকে দাঁড় করিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং নিজের রাজকীয় উষ্ণীষ তার মাথায় পরিয়ে দেন—প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রতি একটি ইঙ্গিত যে, সেলিম তার উত্তরাধিকারী। তিনি বিরোধ মীমাংসার কথা ঘোষণা করতে জোরে উদ্দাম তালে ঢাক বাজাবার আদেশ দেন।

কিন্তু তখনো পারিবারিক সমস্যা আর অবরাধিকার সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা দূর হয়নি। ১৬০৪ সালে, জং ধরা গাদাবন্দুকের নলের ভেতর লুকিয়ে রাখা দো-চোয়ানি অ্যালকোহল দিয়ে বিশেষভাবে দর্শনীয় এক প্রস্থ সুরাপান পর্বের শেষে, দানিয়েল মৃত্যুবরণ করে সেলিমকে ভ্রাত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে নিস্কৃতি দিয়ে যান। অবশ্য তারই জ্যেষ্ঠ পুত্র, তেজোদীপ্ত কিশোর খসরু,

---

* আবুল ফজলের সাথে পরামর্শ করে আকবর যেসব নীতি প্রচলন করেছিলেন সেগুলো যারা অপছন্দ করত তারা তাকে 'তার নির্লজ্জ চাটুকারিতা দ্বারা এবং সম্রাটের মেজাজ সম্পর্কে ভালোমতো ওয়াকিবহাল থাকা, তার শঠতা, তার কাজ করতে গড়িমসি করা' দ্বারা তার প্রতিপত্তি অর্জিত হয়েছে এমন অভিযোগ করত। আবুল ফজল সম্বন্ধে একটি কৌতূহলকর প্রাসঙ্গিক তথ্য এই যে, তার খাদক হিসেবে একটি সুনাম ছিল, দিনে প্রায় ত্রিশ পাউন্ডের মতো খাবার তিনি খেতে পারতেন।

সমর্থকদের চোখে তার খামখেয়ালি আর হিংস্র পিতার চেয়ে অনেক কম খামখেয়ালি আর নমনীয় প্রতিপন্ন হওয়ায় সিংহাসনের একজন দাবিদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্রাট আকবরের শাসনামলের শেষ বছর সাধারণ্যে একটি শক্তির মহড়া অনুষ্ঠিত হয় যখন সম্রাট ইচ্ছাকৃতভাবে সেলিম আর খসরুর সবচেয়ে শক্তিশালী রণহস্তির মাঝে একটি লড়াইয়ের বন্দোবস্ত করেন। হাতির লড়াই রাজন্যদের একটি প্রিয় অবসরকালীন বিনোদন, যেখানে অতিকায় প্রাণীগুলোকে তাদের পিঠে অবস্থানরত মাহুতের দল সুচালো লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত করে। অবশ্য এবারের লড়াইয়ের একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। বুড়ো সম্রাট হয়তো ভবিষ্যৎ সম্রাটের জন্য একটি আলামত অনুসন্ধান করছিলেন বা তিনি কেবল তার নিজের অতি-আগ্রহী পুত্রকে বিভ্রান্ত করতে চাইছিলেন যে, এক বছর পূর্বে সাতাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণকারী তার আম্মিজান হামিদার জন্য তখনো তিনি শোকার্ত ছিলেন।

আকবর তেরো বছরের খুররমের সাথে, যে চিরাচরিতভাবে তার পাশেই ছিল দাঁড়িয়ে, সেদিনের লড়াইয়ের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছিল, বারান্দা থেকে হট্টগোলপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবলোকন করেন। খসরুর হাতির কাছে সেলিমের হাতি রীতিমতো পর্যুদস্ত হয় এবং খুররম সাথে সাথে একটি অতিরিক্ত হাতি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে নিয়ে এসে প্রতিদ্বন্দ্বী হাতি দুটোকে বিচ্ছিন্ন করার আদেশ দেন। এই প্রয়াস যখন ব্যর্থ হয় তখন প্রহরীরা আতশবাজি ছোড়ে ক্রুদ্ধ, বৃংহনরত জন্তু দুটোকে আলাদা করতে। আগুনের ঝলক আর আওয়াজে আতঙ্কিত হয়ে খসরুর হাতি পালাতে শুরু করে, সেলিমের হাতি অপ্রত্যাশিতভাবে বিজয়ী হয়। পরিস্থিতি ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে, এক পর্যায়ে দুই পক্ষের সমর্থকদের ভেতরে হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে যায় এবং আকবর খুররমকে আদেশ দিয়ে পাঠান, খসরু আর সেলিম যেন নিজেদের সমর্থকদের প্রশমিত করেন। সম্ভাব্য দুই সম্রাটের মধ্যকার ঈর্ষা আর লড়াই সম্বন্ধে খুররমের ভাবনা এবং তার নিজের হস্তক্ষেপের কথা কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি, কিন্তু দাদাজানের পাশে দাঁড়িয়ে খুব কাছ থেকে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে কিশোর যুবরাজ অনেক কিছু বুঝতে পারেন। ভবিষ্যতে শাহজাহান একদিন পারিবারিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিনাশে এমন নির্মমতার পরিচয় দেন, যা তার পূর্বসূরিদের কেউই করেনি।

খুররমের তার পিতা বা সৎভাই সম্বন্ধে অনুভূতি যা-ই হোক না কেন, তিনি তার দাদাজানকে ভালোবাসতেন। হাতির লড়াইয়ের এক সপ্তাহ পর বৃদ্ধ সম্রাট উদারাময় আর অভ্যন্তরীণ রক্তপাতের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকলে হতবিহ্বল খুররম তার পাশ থেকে নড়তে চান না, জোর দিয়ে বলতে থাকেন, 'শাহ বাবার (আকবর) দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত সামান্যতম শ্বাস বজায় থাকবে, আমাকে তার পাশ থেকে কেউ সরাতে পারবে না।' তার পিতা আর সৎভাই ইত্যবসরে সিংহাসনের জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করেন। আকবর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অমাত্যদের একটি বড় অংশকে তাদের মতামত জানতে ডেকে পাঠালে তারা তরুণ খসরুর পরিবর্তে অভিজ্ঞ সেলিমের পক্ষে তাদের রায় দেন। নিজের

সাম্রাজ্যকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যগ্র আকবর তাদের মতামত মেনে নেন। মৃত্যুপথযাত্রী সম্রাট সেলিমকে সম্রাটের আলখাল্লা আর উষ্ণীষ আর তার শয্যার পায়ের কাছে ঝুলতে থাকা হুমায়ুনের তরবারি কোমরে পরিধানের অনুমতি দেন। সেই দিনই, ১৬০৫ সালের ১৫ অক্টোবর, কয়েক ঘণ্টা পরে তেষট্টি বছর বয়সে আকবরের মৃত্যু হয়। প্রত্যুষে একটি শবযানে করে তার মৃতদেহ আগ্রা থেকে পাঁচ মাইল দূরে সিকান্দ্রার বিশাল মকবরায় নিয়ে যাওয়া হয়, যা তিনি নিজের জন্য নির্মাণ করতে শুরু করলেও শেষ করতে পারেননি।

ভারতবর্ষের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা নিয়ে জাতিগত আর ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত ১০০,০০০,০০০ প্রজার একটি শক্তিশালী আর একতাবদ্ধ সাম্রাজ্য আকবরের দৃষ্টিভঙ্গি আর প্রাণশক্তির কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। হুমায়ুন তাকে যে ভূখণ্ড দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি সেই অনিশ্চিত আধিপত্যকে বাড়িয়ে প্রায় তিন গুণ করেছিলেন। আকবরের রাজত্বকালের শেষের দিকে যেসব অভিযান পরিচালিত হয়েছিল তার ভেতরে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলা আর বিহারে মোগল শাসন আরোপ আর সংহত করা, আফগানিস্তানে তার সাম্রাজ্য বিস্তার যার ভেতরে রয়েছে পার্সিদের কাছ থেকে কাবুল এবং তার পরে, বর্তমানের মতো, তখনো কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ শহর কান্দাহার দখল করা, বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত সিন্ধ আর বেলুচিস্তান দখল এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যে হামলা করা। রাজ্য দখল করার চেয়ে সেখানে আধিপত্য কায়েম রাখা অনেক কঠিন সে সম্বন্ধে সচেতন থাকায় তিনি তার সাম্রাজ্যে সংস্কার সাধন করেন এবং তার শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন করে তাকে একটি দক্ষ শাসনযন্ত্রে রূপান্তরিত করেন।

আকবরের ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য তার বিশাল সেনাবাহিনী আর কোষাগারে স্তূপীকৃত হয়ে থাকা দ্যুতিময় হীরক, রুবি, পান্না আর মোতির মাঝে প্রতীকায়িত হয়েছে, যার জন্য মোগলদের মাঝে একটি অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তিনি তার দরবারকে পরিশীলিত বিলাসিতার একটি স্থানে পরিণত করেন এবং তার নির্মিত বিশালাকৃতির, অভিজাত ইমারতগুলো দুনিয়াকে একটি ইঙ্গিতই প্রদান করে যে, মোগলদের যাযাবর দিনের সমাপ্তি ঘটেছে। তৈমূরের সমস্ত উত্তরসূরিদের ভেতরে, আকবর নিজেকে সবচেয়ে যোগ্য আর বিচক্ষণ হিসেবে, তার সত্যিকারের উত্তরসূরি এবং তার 'মহান' উপাধির উপযুক্ত হিসেবে প্রমাণ করেছেন।

আকবরের মৃত্যুর নয় দিন পর আগ্রা দুর্গের দরবার কক্ষে এই চমৎকার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে, ছত্রিশ বছরের সেলিমকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তিনি নিজের জন্য জাহাঙ্গীর উপাধি বেছে নেন, যার মানে 'পৃথিবীর অধিশ্বর।' কারণ তিনি কোনো রাখঢাক না করেই বলেছেন, 'রাজার কাজ পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করা।'
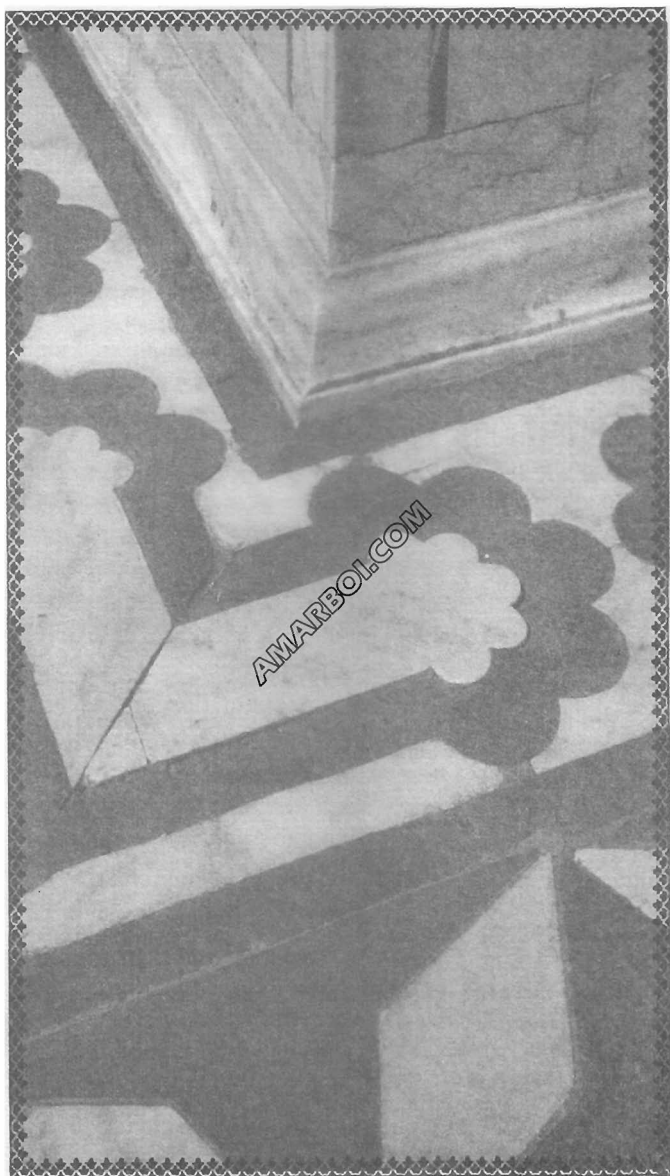
তৃতীয় অধ্যায়

অতুলনীয় মোতি আর চিত্তহারী উপচার

তরুণ যুবরাজ খুররম, পরবর্তীকালে যিনি শাহজাহান নামে পরিচিত হন, তার আব্বাজানের শাসনকাল শুরু হবার পরে নিজের সৎভাই খসরুর আচরণের কারণে ক্ষমতা আর সেইসাথে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বৈরী পারিবারিক সদস্যদের কারণে সৃষ্ট হুমকি সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। সিংহাসনে তার আব্বাজানের পরিবর্তে খসরুকে দেখতে চান তখনো এমন লোকের সংখ্যা নেহায়েত কম ছিল না। ১৬০৬ সালের এপ্রিল মাসে, নিকটেই অবস্থিত আকবরের মকবরা জিয়ারতের মেকি অজুহাতে খসরু আগ্রার লালকেল্লা থেকে দুলকি চালে ঘোড়া নিয়ে বের হন যেখানে জাহাঙ্গীর তাকে নামমাত্র গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন। রসদের জন্য মিষ্টির দোকান লুট করতে সামান্য সময় যাত্রা বিরতি করে তিনি সোজা উত্তর-পশ্চিম দিকে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে তার চারপাশে আরো সমর্থক জড়ো হতে থাকে এবং সেখানে পৌঁছে তিনি শহর অবরোধ করেন। জাহাঙ্গীরও চৌদ্দ বছরের খুররমকে নিজের সাম্রাজ্য পরিচালনাকারী পর্ষদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে নিজের বিপথগামী সন্তানের পশ্চাদধাবন করেন এবং এত দ্রুত তিনি রওনা দেন যে সেদিন সকালের 'বরাদ্দকৃত আফিম' সেবন করতেও ভুলে যান।

জাহাঙ্গীরের সৈন্যরা অনায়াসে বিদ্রোহীদের পরাস্ত করে। খসরু পালিয়ে যান কিন্তু জাহাঙ্গীর সংকল্প করেন, 'আমি তাকে পাকড়াও না করা পর্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করব না।' খসরু রাতের বেলা নাম না জানা একটি নদী অতিক্রম করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন কিন্তু নৌকার মাঝি তাকে আর তার সঙ্গীসাথীদের সাহায্য করতে অস্বীকার করে। তারা নিজেরা নৌকা বাইতে চেষ্টা করলে, নিজেদের বিচলিত আর অনভিজ্ঞতাজনিত তাড়াহুড়োর কারণে বালুচড়ায় তাদের নৌকা আটকে যান। ভোরের প্রথম আলো ফোটার সাথে সাথে তারা আত্মসমর্পণ করলে 'কম্পিত আর ক্রন্দনরত' খসরুকে তার দুই শীর্ষ সহযোগী

সমেত টেনেহিঁচড়ে তার আব্বাজানের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। জাহাঙ্গীরের ভাষ্য অনুযায়ী, 'খসরুকে পিছমোড়া করে হাত বেঁধে এবং পায়ের শিকল পরিয়ে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়।' সম্রাট তার সন্তানের দুই সহযোগীকে সদ্য জবাই করা একটি গাধা আর ষাঁড়ের দুর্গন্ধযুক্ত চামড়া পানিতে ভিজিয়ে সেটার ভেতরে ঢুকিয়ে শক্ত করে সেলাই করে দিতে বলেন, চামড়ার সাথে যেন তখনো হতভাগ্য জন্তুর মাথাটা আটকানো অবস্থায় থাকে। লোক দুজনকে এরপরে খচ্চরের পিঠে উল্টো করে বসানো হয়। এই হাস্যকর খুদে শোভাযাত্রাটাকে এরপরে লাহোরের গনগনে সূর্যের আলোয় ঘোরানো হয় যতক্ষণ না ষাঁড়ের চামড়ার ভেতরের লোকটা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। যেহেতু জাহাঙ্গীর কৌতূহলের সাথে লক্ষ্য করেন 'ষাঁড়ের চামড়া গাধার চামড়ার চেয়ে অনেক দ্রুত শুকিয়ে যায়।' গাধার চামড়ার ভেতরের লোকটা কোনোমতে প্রাণে বেঁচে যায় এবং পরবর্তী সময়ে পুনরায় সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হয়। খসরুকে একটি হাতির পিঠে চড়িয়ে একটি সড়ক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যার দুই পাশে সুচাগ্র অগ্রভাগযুক্ত কাঠের দণ্ডে তার তিনশ আর্তনাদরত সমর্থককে গেঁথে রাখা হয়েছিল। জাহাঙ্গীর সন্তুষ্টচিত্তে লেখেন, 'প্রলম্বিত যন্ত্রণায় দুষ্কৃতিকারীদের মৃত্যুবরণ করার জন্য এর চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' আর হতে পারে না। এই নির্মম অভিজ্ঞতাটা খসরুকে এতটাই বিচলিত করে তোলে যে, তার আব্বাজান আবেগহীন কণ্ঠে স্মৃতিচারণা করেছেন, 'সে তিন দিন কিছু খেতে বা পান করতে পারেনি, পুরোটা সময় ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে কেবল কেঁদেছে আর আর্তনাদ করেছে।' তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিন্তু এমন বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার পরও নির্বাপিত হবার পরিবর্তে সামান্য সময়ের জন্য কেবল প্রশমিত হয়। জাহাঙ্গীর তাকে কিছুদিন শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন কিন্তু তার আব্বাজান যখনই তিলমাত্র সদয় হবার লক্ষণ প্রকাশ করে তার পা থেকে শিকল খুলে দিতে বলেন, তিনি পুনরায় তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। তার মাঝে একটি সন্দেহ কাজ করেছিল যে, তার চেয়ে সাড়ে চার বছরের ছোট এবং বর্তমানে তার আব্বাজানের প্রিয়পাত্র খুররমকে বোধ হয় অচিরেই তার উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করা হবে। ঈর্ষা তার ইতিমধ্যে বাড়তে শুরু করা অসন্তোষকে আরেকটু উসকে দেয়।

খসরু শিকারের সময় জাহাঙ্গীরকে হত্যা করার জন্য একদল অমাত্যকে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করেন। নিয়তির পরিহাস যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী খুররম এই ষড়যন্ত্রের কথা আগেই জানতে পারেন এবং জাহাঙ্গীর লিখেছেন, 'ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সে সাথে সাথে আমাকে বিষয়টি সম্বন্ধে অবহিত করে।' জাহাঙ্গীর সাথে সাথে নাটের গুরু চারজন অমাত্যকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং খসরুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেন,

'পিতৃস্নেহ তার প্রাণ নেবার অনুমতি আমায় দেয় না।' তিনি এর পরিবর্তে তার সন্তানকে অন্ধ করে দেয়ার আদেশ দেন। খসরু যেহেতু পরবর্তী সময়ে সীমিত পরিমাণে দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছিলেন তাই ধারণা করা হয়, চোখ একেবারে তুলে ফেলা কিংবা তার চোখের পাতা একত্রে সেলাই করে দেয়ার পরিবর্তে চোখের মণিতে সম্ভবত ক্ষারজাতীয় কোনো পদার্থ ঘষে দেয়া হয়েছিল। ঘটনা যা-ই হোক, তার অস্তিত্ব একটি দুর্বিষহ পরিণতি লাভ করে এবং তার আব্বাজান তাকে চোখের সামনে দেখলেই বিরক্ত হতেন, যিনি পরিস্থিতি অনুযায়ী খানিকটা অনৈতিকভাবেই হয়তো অভিযোগ করেন যে, তাকে যখনই তার সান্নিধ্যে হাজির করা হতো তার সন্তান 'সব সময় বিষণ্ন আর মনমরা হয়ে থাকত'। খসরুর সাথে তার আব্বাজানের বৈরিতার একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এই যে, তার আম্মাজান জাহাঙ্গীরের প্রথম স্ত্রী, হতাশার বশবর্তী হয়ে 'ভাবাবেগের তাড়নায় যা রাজপুত্র স্বভাবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, আত্মহত্যা করেছিলেন। তিনি বহুবারই আকস্মিকভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন—যা নিশ্চিতভাবেই পারিবারিক বৈশিষ্ট্য যেহেতু তার বাবা আর সব ভাই সহসাই বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হতো...আমি একবার শিকারে গেলে...সে তার ভারসাম্যহীন মানসিক স্থিতির কারণে প্রচুর পরিমাণে আফিম খেয়ে ফেলে আর তার প্রভাবেই শেষ পর্যন্ত মারা যায়,' জাহাঙ্গীর লিখেছেন।

জাহাঙ্গীর খসরুর প্রতি তার আচরণের সময় নিজের বৃদ্ধ পিতার বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ নিজের স্মৃতি থেকে সুবিধাজনক কারণেই একেবারে মুছে ফেলেছিলেন। তার প্রাণবন্ত স্মৃতিকথায়, তার প্রপিতামহ বাবরের মতো সব সময় অকপট না হলেও প্রায় একই সজীবতায় ঋদ্ধ, সততার সাথে দাবি করা হয়েছে যে, 'সন্তানের উচিত সব সময় সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত থাকা।' রোজনামচায় সম্রাটকে আমরা নানা অসংগতিতে আক্রান্ত একজন মানুষ হিসেবে দেখতে পাই—আফিম বা সুরার প্রভাবে যখন বিভ্রান্ত না থাকেন তখন তিনি একজন দক্ষ শাসক, পরিশীলিত আর প্রীতিকর গুণের অধিকারী এবং কখনো কখনো অনুসন্ধিৎসু, অন্যদের প্রতি অদ্ভুতভাবে নিষ্ঠুর। জাহাঙ্গীর প্রাণদণ্ড আর নির্যাতনকে রীতিমতো প্রদর্শনীতে পরিণত করেছিলেন, একবার জীবন্ত অবস্থায় একটি লোকের দেহের চামড়া তুলে নেয়ার দৃশ্য তিনি বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেছিলেন। ভারতে ইংল্যান্ডের প্রথম রাজদূত স্যার টমাস রো, যিনি তার দরবারে ১৬১৫ সালে এসেছিলেন এবং সম্রাটকে নির্বিকার চিত্তে হাতির পায়ের নিচে অপরাধীদের নিষ্পেষিত হবার দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে শিউরে উঠে ভেবেছিলেন যে, জাহাঙ্গীর 'রক্তপাতের মাঝে খুব বেশি পুলক' অনুভব করেন। জাহাঙ্গীরের উন্মত্ততার চিত্র আরো বেশি করে বোঝা যায় যখন তিনি নিজের সাত বছরের ছেলেকে প্রহার করেন

সে কাঁদে কি না দেখতে এবং ছোট ছেলেটা যখন নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে তিনি তার গালে সুচ দিয়ে খোঁচা দেন। ছেলেটার গাল রক্তে ভেসে গেলেও সে তখনো নীরব থাকে।

জাহাঙ্গীর সম্ভবত কাপটিক ছিলেন। সব বিষয়ে ভীষণ বিলাসী হয়েও, তিনিই একবার সুরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু নিজে অভ্যাসটা পরিত্যাগ করার সাহস অর্জন করতে পারেননি। মদের প্রতি আসক্ত এক বৃদ্ধ রমণীর ছলনার সহায়তায় নিজের দুর্বলতাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করান।* তিনি যদিও বহুবার মাত্রাতিরিক্ত পানের কারণে দাঁড়িয়ে থাকার অক্ষমতার বহু নজির উপেক্ষা করে, তিনি জোর দিয়ে দাবি করেন, তিনি মদকে প্রশ্রয় দেন 'আমার খাবার ভালোমতো হজমে সাহায্য করতে।' তিনি একই সাথে নিজের বিবেককে প্রশমিত করতে সিদ্ধান্ত নেন যে, 'শুক্রবার সন্ধ্যায় আমি সুরা পানের পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখব।' তার রাজত্বকালের শেষের দিকে তিনি খানিকটা দ্ব্যর্থক ভঙ্গিতে খুররমকে সুরার উপকারিতার বিষয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন কিন্তু একই সাথে তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সতর্কতা অবলম্বন করতে : 'বাছা আমার, তুমি সন্তানের পিতা হয়েছ এবং রাজা আর রাজকুমারেরা সুরা পান করে থাকে। আজ উৎসবের দিন এবং আমি তোমার সাথে সুরা পান করব এবং আমি তোমায় ভোজের দিনগুলোয়, নববর্ষের দিনে, আর বিশাল কোনো আনন্দের দিনে সুরা পান করার বিষয়ে আমি তোমায় সুরা পান করতে নিষেধ করব না কিন্তু সব সময় মাত্রা বজায় রাখবে, কারণ মাত্রাতিরিক্ত পান করে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে দুর্বল করাটা বিজ্ঞজনেরা সব সময় এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন; বস্তুতপক্ষে পরিমিত সুরা পানের মাধ্যমে মঙ্গলময় আর উত্তম কিছু অর্জন করা সম্ভব।'

বিজ্ঞান আর প্রকৃতির বিষয়ে জাহাঙ্গীরের গভীর কৌতূহল ছিল, সারসদের প্রজননের বিষয়ে এবং হাতির গর্ভধারণকাল সম্বন্ধে কিছু মৌলিক গবেষণাও করেছেন, সদ্য ভূমিতে পতিত ধোয়া উদগিরণকারী একটি উল্কাপিণ্ড মাটি খুঁড়ে তুলে নিয়ে এসে সেটা দিয়ে তরবারি নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন আর সিংহের অন্ত্র ব্যবচ্ছেদ করে বুঝতে চেষ্টা করেছেন তারা এত সাহস কোথা থেকে পায়। তিনি হিন্দুদের কাছে পবিত্র বলে গণ্য বটবৃক্ষ কীভাবে ঝুলন্ত শিকড় নিচের দিকে প্রসারিত করে নিজের পুরো ওজন আলম্বিত করে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি যদি কিছুকাল পরে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে অনেক কারণেই ১৬৬০ সালে প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য দ্বিতীয় চার্লসের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রয়্যাল সোসাইটির একজন স্বাভাবিক সদস্য হিসেবে বিবেচিত হতেন। ভ্রমণের সময় জাহাঙ্গীরের সাথে দরবারের চিত্রকরদের

---

* 'অ্যালকোহল' শব্দটা আরবি থেকে এসেছে, যার মানে আসলে 'রুপালি সাদা চূর্ণ'।

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অঙ্কিত টার্কির মোগল চিত্রকর্ম।

একটি পুরোদস্তুর দল থাকত সম্রাটের মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন যেকোনো বিচিত্র প্রাণীর সম্বন্ধে অনুপুঙ্খ বিবরণ নথীভুক্ত করতে। একটি চমৎকার তুর্কি মোরগ, ভারতবর্ষে সেই সময়ে বিরল, তাকে একবার উপহার দেয়া হলে তিনি এর ছবি আঁকবার আদেশ দেন এবং উদ্ধত ভঙ্গিতে মন্তব্য করেন যে, 'সম্রাট বাবর যদিও তার স্মৃতিকথায় বেশ কিছু প্রাণীর বর্ণনা আর চিত্র সংযোজনে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় তাদের ছবি আঁকবার আদেশ তিনি সম্ভবত তার চিত্রকরদের কখনো দেননি।'

জাহাঙ্গীর বিশেষভাবে পছন্দ করতেন বিদেশি অতিথিরা তার জন্য ইউরোপীয় প্রতিকৃতির যেসব অণুচিত্র নিয়ে আসতেন এবং পাগড়ি কিংবা গলায় রত্নখচিত অণুচিত্র ঝোলাবার একটি নতুন রীতিই তিনি দরবারে প্রবর্তন করেছিলেন। অনুগ্রহভাজন গুটিকয়েক ব্যক্তি সম্রাট নিজে যেমন ধারণ করেন সেই রকম ক্ষুদ্রাকৃতি অণুচিত্র ধারণের বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

স্থাপত্যকলা ছিল জাহাঙ্গীরের আরেকটা আগ্রহের বিষয়। তিনি আগ্রার কাছে সিকান্দ্রায় তার আব্বাজানের জন্য 'একটি চমকপ্রদ সমাধিসৌধ'-এর নির্মাণকাজ সমাপ্ত করতে পেরে দারুণ সন্তুষ্টি লাভ করেছিলেন। আকবর তার নিজের জীবদ্দশায় মকবরার নির্মাণকাজ শুরু করেছিলেন কিন্তু সেখানে একবার নির্মাণকাজের তদারকি করতে গেলে জাহাঙ্গীরের কাছে নকশাটাকে যথেষ্ট পরিমাণ চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয় না : 'আমার অভিপ্রায় ছিল এই যে মকবরাটা এতটাই নিখুঁত চমৎকারিত্বপূর্ণ হবে যে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীর দল সেটা দেখে একবাক্যে স্বীকার করবে, বাসযোগ্য পৃথিবীর কোথাও এর তুল্য দ্বিতীয় কোনো ইমারত তারা কখনো দেখেনি।' খসরুর বিদ্রোহ দমনে তিনি যখন ভীষণ ব্যস্ত সেই অবসরে, 'নির্মাতারা তাদের আপন রুচি অনুসারে সেটার নির্মাণ সমাপ্ত করে এবং সেটা করতে গিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশিমতো মূল নকশায় পরিবর্তন আনয়ন করে।' জাহাঙ্গীর 'আপত্তিজনক অংশগুলো' ভেঙে ফেলার আদেশ দেন এবং 'কুশলী স্থপতিদের' নিয়োগ করেন, যাতে 'চারদিকে চমৎকার উদ্যান পরিবেষ্টিত একটি জাঁকজমকপূর্ণ আর মাত্রার দিক দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই বিশালাকৃতির ভবন নির্মিত হয়, যার প্রবেশপথে থাকবে একটি সুউচ্চ তোরণদ্বার আর সাদা পাথরের তৈরি মিনার।' দ্যুতিময় সাদা মর্মরের তৈরি চারটি মিনার একটি নতুন ধারার সূচনা করে, যা গুরুত্বপূর্ণ মোগল স্থাপত্যের সবচেয়ে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। আকবরের মর্মরের স্মৃতিস্তম্ভের ওপর কারুকার্যময় ফিতার মতো সূক্ষ্ম গোলাপ, নার্গিস, লিলি আর অন্যান্য ফুলের প্রণিহিত নকশা সেইসাথে ভবিষ্যতের গর্ভে কি অপেক্ষা করছে তার একটি ইঙ্গিত দান করে।

দর্শনার্থীদের বিস্মিত করার জাহাঙ্গীরের অভিপ্রায় সফল হয়। মকবরাটা যখন নির্মাণাধীন অবস্থায় রয়েছে তখনই, উইলিয়াম ফিঞ্চ একজন সম্রাটের 'যিনি প্রায়ই পৃথিবীটাকে তার জন্য বড্ড ছোট বলে মনে করতেন' জন্য নির্মিত স্মৃতিসৌধের বিশালাকৃতি দেখে বিস্মিত হয়েছেন। ১৬৩০ সালের গোড়ার দিকে আরেক ইংরেজ পর্যটক, পিটার মানডি যিনি মকবরাটার একটি নকশা-চিত্র অঙ্কন করেছিলেন, লিখেন যে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের ভেতরে এটা গণ্য হবে। ত্রিশ বছর পরে অবশ্য আরেকজন ফরাসি পর্যটক মন্তব্য করবেন যে, আকবরের মকবরাটা নিঃসন্দেহে দর্শনীয়, তিনি এর কোনো বর্ণনা দেবেন না, যেহেতু 'তাজমহলের মাঝে এর সমস্ত সৌন্দর্য আরো উৎকৃষ্টরূপে দেখতে পাওয়া যায়।'*

■

খসরুকে নিষ্ক্রিয় করা আর সাম্রাজ্যে শান্তি আর স্থিতিশীলতা বিরাজমান হবার সাথে সাথে জাহাঙ্গীরের অপত্যস্নেহের অধিশ্রয়ন ক্রমেই খুররমের প্রতি নিবদ্ধ হয়, আকবরের মৃত্যুর পরই যাকে তিনি ভালো করে জানার সুযোগ পেয়েছেন। তরুণ যুবরাজ সামরিক বিদ্যায় দারুণ পারঙ্গম এবং সুন্দর ইমারতের প্রতি তার পিতার মতো তিনিও আগ্রহী, খানিকটা হয়তো বেশিই হবেন। ১৬০৭ সালের কথা, সম্রাট খুররমের নির্মিত একটি হাভেলি পরিদর্শন করেন এবং সেটাকে 'সত্যিকারের প্রীতিকর একটি কাঠামো' হিসেবে রায় দেন। ১৬০৮ সাল, সম্রাট তার অন্য সন্তান পারভেজের, খুররমের চেয়ে মাত্র আড়াই বছরের বড়, দাবি অগ্রাহ্য করে ষোলো বছরের যুবরাজকে পাঞ্জাবের হিস্যার ফিরোজার জায়গির প্রদান করেন এবং টকটকে লাল রঙের তাঁবু স্থাপনের অধিকার দেন—ঐতিহ্য অনুসারে সম্রাটের মনোনীত উত্তরাধিকারীকে এই সম্মান দান করা হয়।

খুররমের ইতিমধ্যে বিয়ের বাগ্‌দান সম্পন্ন হয়েছে। ১৬০৭ সালের এপ্রিলে, পারস্য থেকে আগত গিয়াস বেগের নাতি, চৌদ্দ বছরের পরমা সুন্দরী আরজুমান্দ বানুর সাথে তার বিবাহার্থ বাগ্‌দান হয় এবং জাহাঙ্গীর নিজে কনের আঙুলে বাগ্‌দানের আংটি পরিয়ে দেন। কল্পনাবিলাসী ভাবধারা অনুসারে, খুররম তার হবু বধূকে প্রথম দেখেছিলেন নওরোজ—সূর্যের মেষরাশিতে প্রবেশ

---

* আজ কেউ যদি দুটো ভবনের মাঝে তুলনা করে তাহলে তিনি সম্ভবত একমত হবেন যে, আকবরের মকবরাকে, যা রেসাস বানর আর হরিণের অভয়ারণ্য একটি উদ্যানের মাঝে অবস্থিত, মনে হয় যেন 'বাছাই আর মিশ্রণ'-এর একটি চুনন, ইসলামী আর হিন্দু বাস্তুশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যের সান্নিধি কিন্তু সংশ্লেষণ কিংবা আসঞ্জন কোনোটাই অর্জিত হয়নি।

উদ্‌যাপন করতে সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত নববর্ষের অনুষ্ঠান—উদ্‌যাপনের জন্য প্রাসাদের হারেমে আয়োজিত মীনা বাজারে। নওরোজ আঠারো দিনব্যাপী বিলাসিতা আর প্রাচুর্যের একটানা আয়োজন। রাজপ্রাসাদের উদ্যানে, শ্রমিকরা, দুই একর জায়গাব্যাপী, সোনার জরির কারুকাজ করা মেরুন মখমলের চাঁদোয়াযুক্ত বিশাল একটি তাঁবু স্থাপন করে যেখানে রাজপরিবারের মহিলাদের জন্য ব্যক্তিগত কামরার বন্দোবস্ত রয়েছে যেখানে তারা বসে নওরোজের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন কিন্তু তাদের কেউ দেখতে পাবে না। তাঁবুর ভেতরটা 'সোনালি রেশমের গালিচা এবং সোনার জরি, মুক্তা আর মূল্যবান পাথরের কারুকাজ করা মখমলের পর্দা দিয়ে' আবৃত। সম্রাট সেখানে দরবার আয়োজন করতে পারতেন বা পাশেই স্থাপিত তার অমাত্যদের সুসজ্জিত তাঁবুগুলোয় দর্শন দিতেন, যেখানে 'উপঢৌকন হিসেবে বিরল রত্ন বা উপচার নজরানা হিসেবে তাকে পেশ করার জন্য তাদের ভেতরে রীতিমতো প্রতিযোগিতা আরম্ভ হতো।'

রাজকীয় মীনা বাজার বস্তুতপক্ষে আসল বাজারের একটি ভদ্র সংস্করণ। এক ফরাসি পর্যটক একে বর্ণনা করেছেন, এই 'খেয়ালি প্রকৃতির মেলা' সবেগে পানি ছিটাতে থাকা ঝরনার প্রেক্ষাপটে এবং গাছের শাখায় আন্দোলিত রঙিন লণ্ঠন আর মোমবাতির দবদব করতে থাকা আলোয় উদ্ভাসিত সুবাসিত বাগিচায় রাতের বেলা আয়োজন করা হতো। অভিজাত পরিবারের স্ত্রী আর মেয়েরা সোনা আর রুপার মামুলি অলংকার আর রেশমের গাঁট দিয়ে দোকানের পসরা সাজিয়ে বসত আর বিক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের সম্ভাব্য ক্রেতাদের—রাজপরিবারের প্রবীণা এবং রাজতনয়া, আর অবশ্যই সম্রাট এবং তার পুরুষ প্রিয়পাত্রদের সাথে—হাসিঠাট্টা আর দরকষাকষিতে মেতে উঠত। এই উৎসবটা, সামান্য কয়েকটা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের অন্যতম যখন মেয়েরা তাদের মুখের রেশমের নেকাব পুরোপুরি খুলে ফেলার এবং তাদের যত্নের সাথে প্রসাধন চর্চিত মুখাবয়ব কোমল আলোয় উদ্ভাসিত করার অনুমতি পেত। বিবাহযোগ্যা সুদর্শনা কন্যার মায়েদের জন্য পাত্রী দেখাবার জন্য এটা ছিল একটি দারুণ সুযোগ। আরজুমান্দ বানুর দিকে, যিনি নিজের বাকি জীবনের পুরোটা সময় তাকে শারীরিক আর মানসিকভাবে আপ্লুত করে রাখেন, খুররম এখানেই কেবল সরাসরি তাকিয়ে থাকতে পারেন।

দরবারের ঐতিহাসিকরা তাদের স্বভাবজাত অলংকারবহুল ভাষায় বাগদানের কথাটা লিপিবদ্ধ করেছেন, অল্পবয়সী মেয়েটার প্রশংসা করতে গিয়ে তাকে 'কৌমার্যের বলয়ের উজ্জ্বল দেবী' এবং 'নিষ্কলঙ্ক বংশানুক্রম' আর 'নিষ্পাপ চরিত্রে'র অধিকারী হিসেবে তার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। সকল ভাষ্য, সরকারি কিংবা অন্য যেকোনো, একটি বিষয়ে একমত যে, আরজুমান্দ বানু দরবারের একজন অসাধারণ সুন্দরী রমণী, যার সৌন্দর্যের কমতির কথা তার
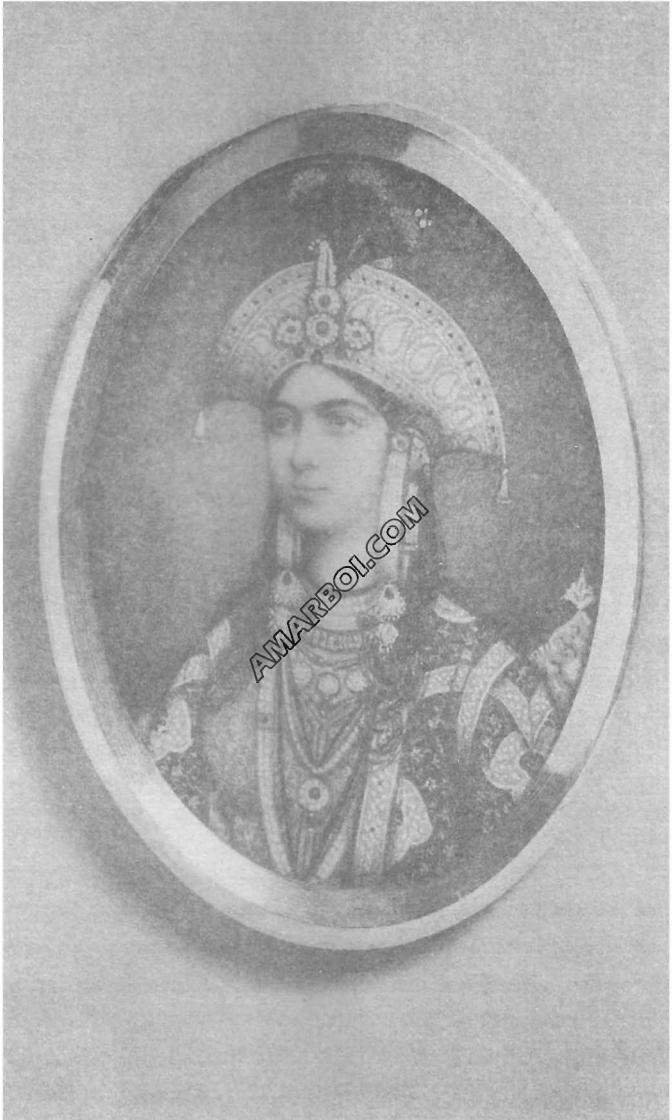
মমতাজ মহলের উনিশ শতকের একটা প্রতিকৃতি এবং বলা হয়ে থাকে এটা সপ্তদশ শতকের মূল চিত্রকর্ম থেকে নকল করা হয়েছে।

ঘোরতর সমালোচকও বলবে না। তাজমহলের মালকিন, ভবিষ্যতের মমতাজ মহলের প্রতিকৃতি, অবশ্য ছলনার অতৃপ্তিতে আবৃত। তার একটি সমসাময়িক মোগল চিত্রকলায়, আবক্ষ প্রতিকৃতি, তাকে হাতে একটি গোলাপ আর শান্ত, কোমল অভিব্যক্তির নিখুঁত বাঁকানো ভ্রূর অধিকারী, সুন্দর মুখাবয়বের একজন যুবতী হিসেবে অঙ্কিত করা হয়েছে বলে কেউ কেউ দাবি করেন। তার মাথার লম্বা কালো কেশ একটি সোনালি নেকাবে আধো ঢাকা রয়েছে এবং তার মসৃণ গলা আর সরু কোমরে চুনি আর পান্নাখচিত মুক্তার লহর জড়িয়ে রয়েছে এবং তার হাতের তালু আর নখ মেহেদি রঞ্জিত। অন্য আর মাত্র একটি প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, বলা হয়ে থাকে উনিশ শতকের শেষের দিকে পূর্বের আরেকটা মূল চিত্রকর্ম থেকে যা অঙ্কিত হয়েছে, যেখানে মার্জিতভাবে বাঁকানো ভ্রূ আর দীঘল কালো চোখের অধিকারী মুকুট পরিহিত একজন নারী হিসেবে তাকে দেখানো হয়েছে এবং এখানেও তার হাতে আমরা গোলাপ ফুল দেখতে পাই।

বাগদানের কয়েক মাসের ভেতরেই অবশ্য আরজুমান্দ বানুর পরিবার ভয়ংকর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণের পরে গিয়াস বেগকে অর্থমন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেন, তাকে ইতিমাদ-উদ-দৌলা, 'সরকারের স্তম্ভ' উপাধিতে ভূষিত করেন। পারস্য থেকে আগত এই অমাত্যের প্রশাসনিক দক্ষতা নিঃসন্দেহে দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত, কিন্তু তার সমসাময়িক একজন তার বেপরোয়া দুর্নীতি সম্বন্ধে লিখেছে 'উৎকোচ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই ছিলেন সবচেয়ে নির্ভীক আর আপসহীন।' প্রথমে তার বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের অভিযোগ আনা হলেও, পরে আরো অনেক গুরুতর অভিযোগ আনীত হয়। খসরুর সম্রাটকে হত্যা করার শেষ চক্রান্তে সংশ্লিষ্টতা থাকার জন্য জাহাঙ্গীর যে চারজন ষড়যন্ত্রকারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন তাদের ভেতরে একজন ছিল গিয়াস বেগের পুত্র। গিয়াস বেগ নিজেও অভিযুক্ত আর বন্দি হন এবং অল্পের জন্য মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পান। তিনি জাহাঙ্গীরকে বিশাল অঙ্কের অর্থ, সম্ভবত তার দুর্নীতির ফলে সংগৃহীত সম্পদ থেকে, পরিশোধ করেন নিজের জীবন বাঁচাতে আর তার পদমর্যাদা বজায় রাখতে। জাহাঙ্গীরের 'সরকারের স্তম্ভ', বা 'ইতিমাদ-উদ-দৌলা' হিসেবে তিনি পুনরায় সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন শুরু করলেও তার পরিবার আসলেই দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল।

ইতিমাদ-উদ-দৌলার বিরাগভাজন হওয়া এবং তার পুত্রের প্রাণদণ্ড সম্ভবত ব্যাখ্যা করে কেন পরবর্তী পাঁচ বছরে তার নাতি আর খুররমের মধ্যে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়নি—বিবাহযোগ্যা পাত্র আর পাত্রীর ক্ষেত্রে যা একটি বিরল দীর্ঘসূত্রিতা। ইতিমধ্যে জাহাঙ্গীরের নির্দেশে খুররম একটি রাজবংশীয় মৈত্রীজনিত বৈবাহিকসম্বন্ধে আবদ্ধ হন। ১৬১০ সালের অক্টোবর মাসে তিনি

পারস্যের আরেক রাজতনয়াকে—পারস্যের শাহ ইসমাইল সাফাভির বংশে জন্মগ্রহণকারী রাজকন্যা—বিয়ে করেন, যার গর্ভে ১৬১১ সালের আগস্ট মাসে তার প্রথম্ সন্তান, একটি কন্যার জন্ম হয়। নিজের পরিবারের ওপর ঘনায়মান দুর্যোগ, তার বাগদানের দীর্ঘসূত্রিতা এবং আরেকজন নারীর সাথে খুররমের সম্পর্কের কথা চিন্তা করার অভিজ্ঞতা আরজুমান্দ বানুর জন্য মোটেই সুখকর ছিল না, তিনি তার আব্বাজানের হারেমে উদ্বেগ আর অসহায়তার সাথে অপেক্ষা করতে থাকেন।

১৬১১ সালে জাহাঙ্গীরের সাথে ইতিমাদ-উদ-দৌলার কন্যা তার ফুপিজানের নিকাহ্ সম্পন্ন হবার সাথে সাথে আরজুমান্দ বানুর জন্য সব কিছু বদলে যেতে আরম্ভ করেন। চার বছর পূর্বে, তখন ত্রিশ বছর বয়স্ক মেহেরুন্নিসা বিধবার বেশে রাজদরবারে ফিরে এসেছিলেন। জাহাঙ্গীরের পালক ভাইকে হত্যার ঘটনাটা জাহাঙ্গীরকে ভীষণভাবে কুপিত করেছিল এবং গিয়াস বেগের পরিবারকে সম্ভবত আরো কলঙ্কিত করেছিল—প্রতিশোধ নিতে, তার যোদ্ধা স্বামী শের আফগানকে সুবে বাংলায় হত্যা করা হয়। এই সময়কালের ইউরোপীয় ভাষ্য অনেক বেশি উত্তেজনাপূর্ণ আর রোমাঞ্চকর একটি রূপকল্প ফুটিয়ে তোলে, দাবি করে যে, শের আফগানকে হত্যা করার জন্য জাহাঙ্গীরই তার পালক ভাইকে বাংলায় প্রেরণ করেছিলেন, যাতে তিনি মেহেরুন্নিসাকে লাভ করতে পারেন। কিন্তু শের আফগান, কিছু একটি আঁচ করতে পেরে প্রথমেই আঘাত হানেন। সম্রাট নিশ্চিতভাবেই তার স্বামীর মৃত্যুর পর মেহেরুন্নিসাকে আগ্রায় ডেকে পাঠান, যেখানে রাজকীয় হারেমে আকবরের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ বিধবা পত্নীর মহলে তার অবস্থানের বন্দোবস্ত করা হয়। তিনি অবশ্য হারেমে পৌঁছাবার পরে সেখানেই আপাতভাবে 'কোনো প্রকার মনোযোগ আকর্ষণ ব্যতীতই দীর্ঘসময় অবস্থান করেন' এবং এই সময়ে তিনি আর জাহাঙ্গীর শারীরিকভাবে মিলিত হয়েছিলেন এমন কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই।

১৬১১ সালের নওরোজ উৎসবের সময় সম্ভবত মেহেরুন্নিসা প্রথমবারের মতো জাহাঙ্গীরের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিলেন। এক দিনপঞ্জির রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে, 'তার উপস্থিতি সম্রাটের দূরদর্শিতাপূর্ণ চোখের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং সে তাকে তার নির্বাচিত হারেমের অধিবাসীদের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।' আরেকজনের ভাষ্য অনুসারে, 'তার সৌভাগ্যের তারকা দীপ্তি ছড়াতে আরম্ভ করে এবং গভীর সুপ্তি থেকে জেগে উঠবার মতো...কামনারা মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করে।' জাঁকজমকপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তারা দুজনে দুই মাসের ভেতরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। জাঁকালো পোশাক বা অলংকার এবং বিলাসিতার প্রতি জাহাঙ্গীরের ভালোবাসা তার নিজের আব্বাজানের চেয়ে

সুরা পানরত নূরজাহান।

অনেক বেশি ছিল এবং রত্নপাথর তাকে আনন্দ দিত, বছরের প্রতিদিন তিনি ভিন্ন ভিন্ন অলংকার ধারণ করতেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ১২৫ কিলোগ্রাম হীরক খণ্ড, পান্না, মুক্তা আর চুনি—৬২৫,০০০ ক্যারেটের রত্ন—লাভ করায় নিজের শখ অনায়াসেই পূরণ করতে পেরেছিলেন। ইংরেজ রাজদূতের কাছে তাকে পোশাকের পরিবর্তে রত্নপাথরে আবৃত বলেই মনে হয়েছে 'এবং বড়, উজ্জ্বল সব মূল্যবান অলংকার...তার মাথা, গ্রীবা, বুক, বাহু, বাহুর উর্ধ্বাংশ, কোমরে আর তার হাতের প্রতিটি আঙুলে চেইন দিয়ে সংযুক্ত দুই বা তিনটি অঙ্গুরীয় রয়েছে...চুনিগুলোর একেকটার আকৃতি আখরোটের চেয়েও বিশাল; এবং মুক্তোগুলো এতটাই দ্যুতিময় যে আমার চোখ সেদিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।' নিজের বিয়ের দিনে এই মহান মোগল সম্রাট নিশ্চয়ই একটি দারুণ দর্শনীয় দৃশ্যের জন্ম দিয়েছিলেন।

জাহাঙ্গীর তার নববিবাহিত বধূকে 'নূর মহল', 'প্রাসাদের আলো' উপাধি দান করেন এবং মেহেরুন্নিসাই আনুষ্ঠানিকভাবে তার শেষ স্ত্রীর স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৬১৬ সালে, তিনি তাকে আরো মর্যাদাসম্পন্ন উপাধিতে ভূষিত করেন—'নূর জাহান', 'দুনিয়ার নূর।' তিনি তার স্মৃতিকথায় লেখেন, 'আমায় তার চেয়ে বেশি কেউ পছন্দ করে বলে আমার মনে হয় না।' জাহাঙ্গীর তার পরিবারকে পুনরায় পদোন্নতি দান করেন আর তাদের পুরস্কৃত করেন। ইতিমাদ-উদ-দৌলা, পূববর্তী অবিচারণার জন্য তাকে মার্জনা করা হয়, বর্ধিত খেতাবের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করেন। জাহাঙ্গীর তার পুত্র আরজুমান্দের পিতাকে, সারাদাজ, 'মস্তক ছিন্নকারী', নিজের বিখ্যাত, ক্ষুরধার তরবারিগুলোর একটি উপহার দেন। (১৬১৪ সালে জাহাঙ্গীর তাকে 'আসফ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন, এ নামেই তিনি তার দীর্ঘ আর প্রভাবশালী জীবনের অবশিষ্ট সময় পরিচিত হব।) নূর, অবশ্য তার নব্যপ্রাপ্ত গৌরবের অন্তত একজন সমালোচককে হারেমে খুঁজে পান। যোধা বাঈ, খুররমের তীক্ষ্ণধি আর বাকপটু আম্মিজান, রাজকীয় হারেমের এই নবাগতার প্রতি সব সময় অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। একটি গল্প অনুযায়ী, জাহাঙ্গীর যখন যোধা বাঈকে বলেন, নূর তার মিষ্টি নিঃশ্বাসের প্রশংসা করেছেন তখন মেজাজি রাজপুত রাজকন্যা রাগত স্বরে কেবল মন্তব্য করেন, বহু পুরুষের সান্নিধ্যে সময় কাটাবার অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন একজন রমণীর পক্ষেই কেবল বলা সম্ভব যেকোনো পুরুষের নিঃশ্বাস মিষ্টি, না টক।

পরবর্তী বছরে, ১৬১২ সালের ১০ মে, একটি দিন যা দরবারের জ্যোতিষীরা নববিবাহিত দম্পতির নীরবচ্ছিন্ন সুখের নিশ্চয়তাদানকারী হিসেবে শনাক্ত করেছেন, খুররম অবশেষে আরজুমান্দ বানুকে বিয়ে করেন। দরবারের দিনপঞ্জির রচয়িতারা বর্ণনা করেছেন কীভাবে এই মঙ্গলময় রাতে, 'তারকারাজি

আর মশাল এবং লন্ঠনের দ্যুতিময় বাতি-উৎসবের উজ্জ্বলতা আকাশ আর পৃথিবীর বুকে যুগপতভাবে জ্বলজ্বল করেছিল।' 'যৌবনের দিনের চেয়ে উজ্জ্বল একটি রাত' তারা যোগ করে 'কামনার পরিতৃপ্তি আর পুলকিত আনন্দ দানকারী।'

দীর্ঘ অপেক্ষার তিক্ততা মুছে দিতেই যেন বিয়ে উপলক্ষে জাঁকালো আর আড়ম্বরপূর্ণ সমস্ত আয়োজন করা হয়, যা একটি বিপুল বিত্তশালী সাম্রাজ্যের পক্ষে করা সম্ভব। 'সম্রাটের মহান মহিমার সাথে মানানসই মাত্রায় আমোদ আর আহ্লাদের জন্য অপরিহার্য এবং উৎসবের প্রয়োজনীয় উপকরণের' বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব জাহাঙ্গীর নিজে গ্রহণ করেন। তিনি আরো লেখেন : 'আমি খুররমের মহলে যাই এবং সেখানে একদিন আর একরাত্রি অবস্থান করি। আমার আগমন উপলক্ষে সে আমাকে নানা উপঢৌকন প্রদান করে, তার নিজের মা এবং সৎমায়েরা আর বেগমদের ও হারেমের পরিচারিকা, সবাই তার অনুগ্রহ লাভ করে এবং আমির-ওমরাহদের সম্মানসূচক আলখাল্লা প্রদান করে।' খুররমের উপহার সামগ্রীর ভেতরে ছিল 'অতুলনীয় বহুমূল্য রত্ন এবং হৃদয়ে প্রশান্তি আনয়নকারী উপচার।' খুররমের হবু স্ত্রীর মহলে তার বন্ধুরা উপহার হিসেবে অর্থ আর মূল্যবান রত্ন নিয়ে যায় এবং তিনি বিশাল একটি হাতির পিঠে জাঁকালোভাবে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁদের অনুসরণ করেন।*

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার পূর্বে, মোগল অভিজাতবৃন্দ, একটি পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থেকে, খুররমের হাত সৌভাগ্যের জন্য মেহেদি আর হলুদ দিয়ে রঞ্জিত করে দেয় এবং জাহাঙ্গীর নিজে তার ছেলের মাথায় 'বিয়ের দ্যুতিময় মোতির কিরীট পরিয়ে দেন।' মোল্লারা কোরআন শরিফ থেকে পবিত্র আয়াত পাঠ করে—খুররম, যদিও তার শরীরে বহমান রাজপুত রক্তের কারণে জন্মসূত্রে এক-তৃতীয়াংশ হিন্দু, তাকে একজন সুন্নি মুসলমান হিসেবেই বড় করা হয়েছে, অন্যদিকে আরজুমান্দ বানু একজন শিয়া ধর্মাবলম্বী। তরুণী বধূ এরপর বিয়েতে তার আনুষ্ঠানিক সম্মতি প্রদান করেন এবং উভয়ের পরিবার নিজেদের ভেতরে উপহার আদান-প্রদান করে—'খনি আর কোয়ারি থেকে খুঁজে আনা মূল্যবান পদার্থ আর অমরকুন্ডার মাঠের বাছাই করা শস্য।'

আনুষ্ঠানিকতার একেবারে শেষ পর্যায়ে, গোলাপজলে খুররমের হাত ধুইয়ে দেয়া হয় এবং একীনতা নিশ্চিত করতে তিনি এক পাত্র পানি পান করেন। নববধূর পিতার মহলে বিবাহ পরবর্তী ভোজসভার আয়োজন করা হয়।

---

* মোগলরা হিন্দুদের বিয়ের শোভাযাত্রার রীতি গ্রহণ করেছিল। আকবরের শাসন আমল থেকে, মোগল রাজকীয় পরিবারে হিন্দু স্ত্রীদের বিয়ে করে আনা শুরু হলে, তারা কনের মহলে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা আয়োজনের হিন্দু রীতিও গ্রহণ করে।

মাসব্যাপী আতশবাজির প্রদর্শনী আর চাকচিক্যময় শোভাযাত্রার সাথে—যা 'আনন্দঘন ঢাকের বাদ্য আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের উদ্দীপিত চিৎকারে'র কারণে এতটাই কোলাহলপূর্ণ যে, তারা অনায়াসে 'ঘূর্ণায়মান ভূ-গোলককে নাচাতে' সক্ষম—উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

রাজকীয় দিনপঞ্জির রচয়িতারা অবশ্য বস্তুনিষ্ঠতার স্বার্থে সম্রাটদের, যাদের কীর্তিকলাপ তারা লিপিবদ্ধ করছেন তাদের পুরুষত্বের বিষয়েও ইঙ্গিত দান করতেন, কিন্তু খুররমের ক্ষেত্রে তাদের কোনো কিছু বাড়িয়ে লেখার প্রয়োজন হয়নি। তিনি তার জীবনের পুরোটা সময় একজন ভোগবিলাসী আর ইন্দ্রীয়প্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। আরজুমান্দ বানুর সাথে তার বিয়ের সময়, পেশল দেহ আর চওড়া ছাতির অধিকারী, যুবরাজের বয়স যখন বিশ বছর তিনি তখন তার যৌন ক্ষমতার তুঙ্গে অবস্থান করছেন এবং ইতিমধ্যে একজন পরিণত আর অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন, দরবারের প্রশিক্ষণের কারণে যেখানে নির্লজ্জভাবে দৈহিক সুখ উপভোগ করা হয়। মোগলরা তাদের নতুন বাসস্থানের ভোগবিলাসী রীতি বেশ দ্রুতই আত্মস্থ করেছিল। ইসলামিক বিশ্বের সর্বত্র ভারতবর্ষ তার যৌনতা আর ভোগবিলাসিতা এবং কামকলার হিন্দুশাস্ত্র *কামসূত্রের*, যা খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল, এর জন্য বিখ্যাত। শেখ নেফওয়াজি, যিনি তিউনিসের পরিবারের জন্য পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ শতাব্দীতে *দ্য পারফিউমড গার্ডেন* রচনা করেছিলেন, স্বীকার করেছেন, 'রতিক্রিয়া সম্পর্কিত অনুসন্ধান আর জ্ঞানে ভারতবর্ষের লোকজন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর ছিল।' তিনি লিখেছেন, নিকট প্রাচ্যে যখন রতিক্রিয়ার কেবল এগারোটা আসন প্রচলিত ছিল, ভারতীয়রা তখন অনেক বেশি আসনের কথা জানত, যার ভেতর *দ্য পারফিউমড গার্ডেন*-এ বর্ণিত পঁচিশটি কল্পনাশ্রয়ী অঙ্গস্থিতিও এর অন্তর্গত।

বিয়ের রাতে প্রচলিত প্রথা অনুসারেই সর্বাধিক যৌনতৃপ্তি নিশ্চিত করতে অনেক যত্নের সাথে সমস্ত আয়োজন করা হতো। বর আর বধূ উভয়কেই তাদের নিজ নিজ পরিচারকরা গোসল করিয়ে তেল আর সুগন্ধি মাখিয়ে দিত তারপর চমৎকার একটি শয্যায় তাদের শায়িত করা হতো, যেখানে পরিচারকরা দক্ষতার সাথে তাদের দেহ মালিশ করে তাদের রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত করত। নারী আর পুরুষ উভয়ের জীবনের জন্য যৌনতৃপ্তিকে একটি অধিকার, বস্তুতপক্ষে অপরিহার্য হিসেবে গণ্য করা হতো। খুররম আর আরজুমান্দ বানু তাদের প্রথম রতিক্রিয়া সমাপ্ত করার পর তাদের শয্যা সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা হতো রতিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো একটি বিষয় যে নবপরিণীতা বধূ বাস্তবিকই কুমারী ছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে। বিয়ের ছয় সপ্তাহ পর দরবারের দিনপঞ্জিতে গর্ভধারণ বিষয়ে তার অমিত ক্ষমতার কারণে 'রাজবংশের

রত্ন প্রসবিনী আকর' হিসেবে তার প্রশংসা করে ঘোষণা করা হয়, নবদম্পতির প্রথম সন্তান তিনি গর্ভে ধারণ করেছেন।

খুররমের দিনপঞ্জির রচয়িতারা বর্ণনা করেছেন, নিজের নবপরিণীতা বধূকে 'অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে তার অনন্যতা খুঁজে পেতে; সেইসাথে তার সৌন্দর্যের দৃষ্টিগোচরতার নিরিখে সমসাময়িক পৃথিবীর নারীদের মাঝে তিনি সর্বাগ্র গণ্য আর নির্বাচিত (*মমতাজ*) বুঝতে পেরে, তিনি (খুররম) তাকে মমতাজ মহল উপাধি দান করেন, যাতে খেতাবটি একদিকে সময়ের নির্বাচিত রমণী হিসেবে তার গর্ব আর মহিমা ইঙ্গিত করে, অন্যদিকে ইহকাল আর পরকালের এই খ্যাতিমান রমণীর সত্যিকারের প্রথিতযশা নাম, সংগত কারণেই যেন সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত না হয়।' মোগলদের মাঝে এমন খেতাব প্রদান করার রীতি প্রচলিত ছিল 'যখন রাজকীয় শয্যার সৌভাগ্যের মহিমা যারা লাভ করেছে তাদের মাঝে বিশেষ কাউকে তারা অধিকতর সম্মান প্রদর্শনপূর্বক স্বাতন্ত্র্য প্রদানের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত।'

■

মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী আগ্রা ছিল, যেখানে তরুণ দম্পতি তাদের বহু-বিলম্বিত বিবাহিত জীবন শুরু করে, ৭৫০,০০০ জন অধিবাসী অধ্যুষিত একটি কর্মচঞ্চল শহর। ইংরেজ পর্যটকদের কাছে শহরটাকে 'শুমারির অতীত জনবহুল'* বলে মনে হয়েছে। শহরের সাধারণ অধিবাসীদের বাসস্থান ইট আর টালির তৈরি হতো, তাদের পক্ষে যদি এর ব্যয় বহন করা সম্ভব হতো, সম্ভব না হলে কাদামাটি দিয়েই কাজ চালান হতো। মাটি দুরমুজ করে সেটা গোবর গোলা পানি দিয়ে লেপে দেয়া হতো। গ্রীষ্মের দাবদাহের হাত থেকে রক্ষা পেতে ঘরের চালে কেবল খড়ের আচ্ছাদন দেয়া হতো এবং সে কারণেই ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ড ঘটত—গ্রীষ্মের উষ্ণ, ঝলসে দেয়া বাতাসে, যার জন্য আগ্রা বিখ্যাত ছিল, চুল্লির আগুন থেকে উড়ে আসা স্ফুলিঙ্গ ঘুরপাক খেতে খেতে প্রায়ই এসব শুষ্ক ছাদে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করত। শহরের মেয়েরা অনেক সময় পর্দা ভেঙে দৌড়ে বাইরে গিয়ে আগন্তুকের সামনে নিজেদের প্রকাশ করার পরিবর্তে ঘরেই আগুনে পুড়ে মারা যাওয়াকে শ্রেয়তর মনে করত।

মোগল রাজধানীতে পুরো সাম্রাজ্য এমনকি সাম্রাজ্যের বাইরে থেকেও প্রচুর আগন্তুকের আগমন ঘটত। সমগ্র শহর জুড়ে অবস্থিত নব্বইটা সরাইখানায় ভাগ্যান্বেষী সৈন্যদের পাশাপাশি আফগান, উজবেক, তুর্কি, পার্সি এবং ইউরোপীয় বণিকরা আশ্রয় লাভ করত। ক্লান্ত পর্যটকরা শহরের আটশ

---

* লন্ডন সেই সময়ে প্যারিস আর কনস্ট্যান্টিনোপলের পরেই ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ছিল, যার লোকসংখ্যা ছিল তিন লাখ।

হাম্মামের (গোসলখানা) একটি পথের ধুলো আর ক্লান্তি থেকে পরিত্রাণ খুঁজে পেত। বর্তমানের ন্যায়, তখনো শহরের রাস্তাগুলো নানা পণ্য নিয়ে ঘুরে বেড়ানো হরকরাদের ভিড়ে গিজগিজ করত। এক ইংরেজ কেরানি বর্ণনা করেছে কীভাবে 'প্রতিটি সন্ধ্যাই ছিল উৎসবের আমেজে পূর্ণ, যখন তারা গণিকালয়ে প্রবেশ করে সেখানের খাটে শুয়ে বসে থাকা গণিকাদের ভেতর থেকে পছন্দ করে নিয়ে দরদাম করত।' সে দেখেছে কীভাবে অল্পবয়সী কৃতদাসীদের নর্তকী হিসেবে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো, তাদের কুমারিত্ব উপভোগের প্রস্তাব দেয়া হতো 'প্রথমে বিশাল অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে, তারপর তাদের সাধারণ বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করা হতো।' শহরের সড়কগুলো মানুষে এতটাই গিজগিজ করত যে যখন দরবারে গমনকারী অমাত্যদের বহনকারী সোনালি রং করা শিংয়ের সাদা গরুর গাড়িগুলো তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত তখন তাদের রাস্তার পাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। বিশালাকৃতি হাতিগুলো তাদের পিঠে বাঁধা আন্দোলিত হাওদাগুলো নিয়ে, যেখান থেকে পর্দানশীন মহিলারা বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকত, যখন মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে চলত সেগুলো ছিল আরো বেশি বিপজ্জনক। কোনো কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি পালকিতে, স্যাটিন বা রেশমের কারুকাজ করা ঝালরযুক্ত পর্দা দেয়া এক ধরনের বিছানা, দোল খেতে খেতে চলাচল করতে পছন্দ করত, যেগুলো বহন করে নিয়ে যেত ক্রীতদাসের দল, যারা পালকি কাঁধে করে দৌড়ে যাবার সময় তাদের নগ্ন পায়ের আঘাতে ধুলোয় নিয়মিত একটি শব্দ সৃষ্টি করত।
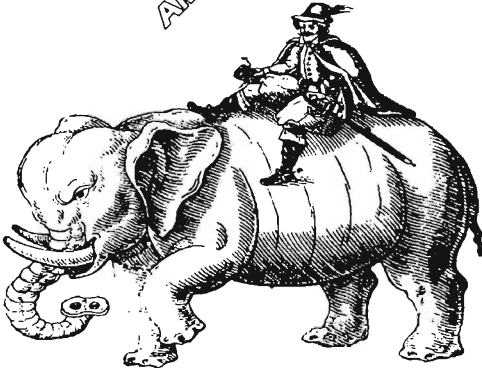
টমাস ক্রোয়াট, একবার হলেও অস্থিত পায়ে না হেঁটে ভ্রমণ করছেন।

বেলে পাথরের অতিকায় আকাশজননীযুক্ত লালকেল্লার ভেতরে অবস্থিত মহলে যখন সম্রাট অবস্থান করতেন তখন দরবারের কৃত্যানুষ্ঠান সবার জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। আকাশে ভোরের ধূসর আলো ফোটার সাথে সাথে দিন শুরু হতো যখন

দুন্দুভির (ঢাকের) শব্দ *ঝরোকা-ই—দর্শনে,* দর্শনদানের বারান্দায়, প্রতিটি দুর্গ আর প্রাসাদের বাইরের দিকের দেয়ালের অনেক উঁচুতে নির্মিত হতো, সম্রাটের আগমনের কথা ঘোষণা করত। সম্রাট জীবিত আছে এবং তিনি নিরাপদ আছেন এটা প্রজাদের কাছে প্রতীয়মান করতেই এই দর্শনদান। হিন্দু রাজাদের দরবারে প্রচলিত প্রথা থেকে গৃহীত এই রীতি প্রথম প্রচলন করেছিলেন সম্রাট আকবর। জাহাঙ্গীর তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, এই প্রথাটা এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, কোনো কিছুই, এমনকি 'প্রচণ্ড যন্ত্রণা বা দুঃখ' তাকে দর্শনদান থেকে বিরত রাখতে পারত না। জাহাঙ্গীর অবশ্য এটাও স্বীকার করেছেন, দর্শনদানের পর তিনি পুনরায় কয়েক ঘণ্টার জন্য শয্যায় ফিরে যেতেন।

প্রজাদের ভেতরে যারা সাহস সঞ্চয় করতে পারত তারা নিজেদের দুর্দশার জন্য জাহাঙ্গীরের কাছে সরাসরি প্রতিবিধান কামনা করার সুযোগ লাভ করত। একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে বিবেচিত হতে ব্যগ্র যে 'সব লোকের হৃদয় জয় করে বিষণ্ন পৃথিবীতে পুনরায় ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারবে', তিনি তার রাজত্বকালের প্রথমদিকে একটি প্রথার প্রচলন করেছিলেন, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'ন্যায়বিচারের শিকল।' শিকলটা আদতে ষাটটি সোনার ঘণ্টাযুক্ত আশি ফিট লম্বা একটি দড়ি এবং দড়িটার কাজ ছিল 'তার প্রজাদের অন্তর থেকে নিপীড়নের ক্ষত মুছে দেয়া।' আগ্রা দুর্গের আকাশজননী আর নদীর তীরের একটি পাথরের স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত এই দড়িটা সম্বন্ধে ইংরেজ পর্যটক উইলিয়াম হকিন্স লিখেছেন, 'পুরো দড়িটার দৈর্ঘ্য বরাবর সোনার গিল্টি করা ছোট ছোট ঘণ্টা ঝুলছে, ফলে কেউ দড়িটা ধরে ঝাঁকালে সম্রাট ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাবেন, যিনি তখন কাউকে প্রেরণ করবেন দুর্দশার কারণ সম্পর্কে অবহিত হতে এবং তারপর প্রয়োজনীয় ন্যায়বিচার করবেন।'

সম্রাট যদি মনে করেন তুচ্ছ কারণে কেউ দড়ি টানার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তাহলে তার কপালে শাস্তি জুটত; সেই কারণে সম্রাটের সাথে দেখা করতে হলে সাহসের প্রয়োজন ছিল। রাজদরবারের রাজকীয় আদব-কায়দা ছিল জটিল আর অবশ্য পালনীয়। পরিপূর্ণ নীরবতা বজায় রাখা ছিল অবশ্য পালনীয় আইন এবং দর্শনার্থী কক্ষে নিজেদের নির্ধারিত আসন থেকে কেউ, এমনকি যুবরাজরাও অনুমতি না নিয়ে আসন ত্যাগ করতে পারত না। সম্রাটের সামনে আদেশ দেয়া মাত্রই শাস্তি প্রদান করা হতো। হকিন্স বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'সম্রাটের ঠিক সামনেই কতোয়ালদের একজন তার প্রধান জল্লাদকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, যার সাথে থাকত আবার প্রায় চল্লিশজন সহকারী জল্লাদ, যারা প্রত্যেকে মাথায়, অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা মোটা কাপড়ের তৈরি বিশেষ এক ধরনের পাগড়ি পরিধান করত। তাদের কাঁধে থাকত একটি ছোট কুড়াল এবং অন্যদের কাছে থাকত নানা ধরনের চাবুক, সম্রাট যা আদেশ দেবেন সেটা তৎক্ষণাৎ পালন করতে প্রস্তুত।'

আগ্রায় আরো অন্য ঘণ্টার ধ্বনিও শোনা যেত, যেমন সম্রাট আকবরের আমলে জেসুইট পাদ্রিদের নির্মিত গির্জার ঘণ্টাগুলো, যাদের ঘণ্টার শব্দ মসজিদ থেকে নামাজের জন্য ভেসে আসা মুয়াজ্জিনের সুললিত কণ্ঠের আজানের ধ্বনির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। জাহাঙ্গীর ছিলেন বিভিন্ন ধর্মের প্রতি মূলত সহনশীল মনোভাবের অধিকারী। নিজের স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন, সম্রাট আকবরের ন্যায় তার ইচ্ছা, 'ধর্মীয় বিষয়ে পার্থিব শান্তির নিয়ম অনুসরণ করা।' তার দরবারে ইতালি থেকে আগত এক পর্যটক পিয়েত্তো ডেল্লা ভ্যালে লিখেছেন, তিনি 'তার রাজত্বে এক গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের ভেতর কোনো পার্থক্য করেন না এবং তার সেনাবাহিনী আর দরবারে উভয় ক্ষেত্রেই এটা পালিত হয় এবং সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানুষের মাঝেও, সবাই একই জবাবদিহিতা আর বিবেচনার অন্তর্গত।' আগ্রার সড়কে গরুর পাল দলবেঁধে ঘুরে বেড়াত, কারণ হিন্দু প্রজাদের কথা বিবেচনা করে জাহাঙ্গীর জবাই করে গরু হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছিলেন। আকবরের চেয়ে তার সহনশীলতা অবশ্য অনেকখানিই স্থূল। তিনি মাঝেমধ্যে কোনো কিছুর আবেগপ্রবণ কিংবা সৌন্দর্যতাত্ত্বিক ব্যতিক্রমে আপ্লুত হতেন—একবার যেমন বরাহ মস্তকযুক্ত একটি মূর্তি, যা তার কাছে দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়েছিল, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সেটা ভেঙে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন।*

জাহাঙ্গীরের নিজের ধর্মমত সম্বন্ধে কেবল এতটুকুই বলা যায় যে, তিনি ইসলামের মতবাদে বিশ্বাস করলেও মোল্লা আর জেসুইটদের মাঝে তর্কযুদ্ধ শুনতে পছন্দ করতেন। স্যার টমাস রো বিচক্ষণতার সাথে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, জাহাঙ্গীরের ধর্ম 'তার নিজের উদ্ভাবন' এবং এমনও মতামত দেন যে, তিনি মূলত একজন নাস্তিক। ১৬১০ সালে তিনি তার মৃত ভাই দানিয়েলের তিন সন্তানকে ধর্মান্তরিত করার অনুমতি জেসুইটদের দেন এবং পুলকিত পাদ্রিদের মধ্যরাতে প্রাসাদে ডেকে নিয়ে আসা হয়, যাতে তিনি তাদের হাতে ছেলেদের তুলে দিতে পারেন। তার ভাতিজাদের এই ধর্মান্তর অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। জেসুইট পাদ্রিরা বিরক্তির সাথে লিখেছেন, যুবরাজেরা 'আলোকিত পথ পরিত্যাগ করে এবং নিজেদের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে ফিরে যায়।'

যমুনা নদীর তীর বরাবর, অমাত্যদের বৃক্ষশোভিত আর ফুলের কুঞ্জবীথি সমৃদ্ধ বাগিচা আর শীতল পানির প্রস্রবণযুক্ত বিলাসবহুল, অভিজাত প্রাসাদগুলো

* জাহাঙ্গীর শিখ ধর্মগুরু অর্জুন সিংয়ের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলে তিনি শিখদের সবচেয়ে মহৎ আত্মোৎসর্গকারীর মর্যাদা লাভ করেন, যদিও কোনো ধর্মীয় কারণে না বরং খসরুর বিদ্রোহে অংশ নেয়ার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। শিখ ধর্মগুরু অবশ্য খসরুকে কেবল আশীর্বাদ করে সৌভাগ্যের জন্য তার কপালে কুঙ্কুমের তিলক এঁকে দিয়েছিলেন।

অবস্থিত ছিল। নদীর সম্মুখভাগ ভীষণ চাহিদাসম্পন্ন হওয়ায়, একজন ইউরোপীয় পর্যটকের ভাষ্য মতে শহরটা, 'চওড়ার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা ছিল', নদীর গতিপথের সাথে অর্ধচন্দ্রের ন্যায় বাঁকানো। খুররমের প্রাসাদটা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, মমতাজ যেখানে কোরআনের নির্দেশ অনুসারে সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে, হারেমের প্রাকারবেষ্টিত প্রথাগত প্রাঙ্গণে তার জন্য নির্ধারিত মহলে বসবাস শুরু করেন। হারেম শব্দটি আরবি *হারিম* থেকে গৃহীত, যার অর্থ পবিত্র বা নিষিদ্ধ। খুররম দুই বছর পূর্বে পারস্যের যে রাজতনয়াকে বিয়ে করেছিলেন তার ভাগ্য সম্বন্ধে দিনপঞ্জির রচয়িতারা মৌন থেকেছেন। তিনি রাজনৈতিক কারণে অন্তত আরো একজনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু দরবারের দিনপঞ্জির রচয়িতরা পরবর্তী সময়ে তার প্রত্যক্ষ আদেশে লিপিবদ্ধ করেন, 'এই কীর্তিমান রমণীর (মমতাজকে) প্রতি তার সমস্ত আগ্রহ এমনভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল যে, তিনি তার প্রতি যে ভালোবাসা অনুভব করতেন অন্যদের প্রতি তার সহস্র ভাগের এক ভাগও অনুভব করতেন না...' মমতাজের ক্ষেত্রে এতটুকু বলা যায় যে, তিনি তার নিজের পারস্যের পরিবারে যেমন বৈবাহিক বন্ধন দেখেছিলেন অবিকল তেমনই পারিবারিক বন্ধনের সুখ লাভ করেছিলেন। তার পিতামহ ইতিমাদ-উদ-দৌলা এবং তার স্ত্রী, একান্তভাবে পরস্পরের অনুরক্ত ছিলেন এবং তার ফুপিজান নূর মহলের সাথে, যাকে আমরা মেহেরুন্নিসা হিসেবে পূর্বে চিনতাম, ইতিমধ্যে তার নতুন স্বামী, জাহাঙ্গীরের একটি শক্তিশালী সম্পর্ক সৃষ্টি হতে শুরু করে।
নূর বিশাল রাজকীয় হারেমে নিজের কেন্দ্রীয় অবস্থান সংগত করছে, এমন একটি স্থান যেখানের 'কামোদ্দীপক ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, খেয়ালি আর বেপরোয়া আমোদ-প্রমোদ' মোগল দরবারে আগত পশ্চিমা পর্যটকদের, এই সময়ে তাদের সবাই অবশ্য পুরুষ, মুগ্ধ করেছে। রমণীদের এই নিজস্ব দুনিয়ার ভেতরে কী হয় সে সম্বন্ধে তারা আগ্রহভরে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছেন এবং প্রহরীরা কীভাবে মেয়েদের এসব খাসকামরায় পুংলিঙ্গের আকৃতির কোনো কিছু, এমনকি শসা বা মুলাও প্রবেশ করতে দেয় না সে সম্বন্ধে সুড়সুড়ি দেয়া কাহিনী লিখেছে। খামখেয়ালি ইংরেজ পর্যটক টমাস ক্রোয়াট, যিনি ১৬১৫ সালে মোগল দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে লিখেছেন : 'পুরুষাঙ্গের আকৃতির যেকোনো কিছু' যাতে 'অস্বাভাবিক ব্যবহারের উদ্দেশে সেটাকে পরিবর্তিত করা না হয় সে জন্য কেটে ফেলা এবং বিষমধারে পরিণত করা হতো।' হারেমের রমণীদের অবশ্য এমন কোনো মোটাদাগের উপচারের প্রয়োজনই ছিল না। সোনা, রুপা, তামা, লোহা, গজদন্ত, শিং এবং কাঠের তৈরি কৃত্রিম পুরুষাঙ্গ যা ভেতরে ফাপা এবং অতিরিক্ত সংবেদনশীলতার জন্য বাইরের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্ফীতি রয়েছে, তা ভারতবর্ষে সহজলভ্য ছিল।
রাজকীয় হারেম ছিল অবশ্যই যৌন সংগমের একটি লীলাভূমি—জাহাঙ্গীরের কমপক্ষে তিনশ যৌনসঙ্গী ছিল, কাম-উদ্দীপক আরক পান করে নিজেকে সহবাসের জন্য প্রস্তুত করতেন তিনি। হারেমের মহিলা আধিকারীকেরা যত্নের

সাথে তার সহবাসের নথিপত্র রাখত, যেখানে তার সহবাসের প্রতিটি সঙ্গী থেকে সহবাস সংখ্যা লিপিবদ্ধ থাকত। মোগল অণুচিত্র যদি সঠিক হয়, সম্রাটের সহবাসকালীন সময়ে তারা অনেক সময় উপস্থিত থাকত, যদিও তারা বিনয়ের সাথে উত্তেজনায় মোচড়াতে থাকা যুগল থেকে দৃষ্টি বিবর্তিত রাখত।

হারেম কিন্তু একই সাথে আরো অনেক কিছু ছিল। এটা রাজপরিবারের অনেক সদস্যদের—মা, খালা, বোন, আত্মীয় সম্পর্কিত বোন, বিধবা, যাদের সাথে থাকত বার্ধক্যে উপনীত হওয়া উপপত্নীরা, যাদের যৌন আকর্ষণ নিঃশেষ হওয়ায় তাদের সেখানেই থাকতে দেয়া হয়েছে—বাসস্থান। হারেম একই সাথে রাজপরিবারের সন্তানদের জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থাও করত। খসরুর মতো অনেকেই ছিলেন যাদের নিজের মায়ের পরিবর্তে কখনো কখনো রাজপরিবারের বয়স্ক মহিলারা লালন-পালন করতেন।

আকবর তার ৫,০০০ মহিলার বিশাল হারেমের পরিচালনা আর নান্দনিকতা বজায় রাখতে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেছিলেন এবং তার প্রচলিত নিয়ম-কানুন তার বংশধররা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছে। ক্ষমতাসীন সম্রাটের আম্মিজানই রীতি অনুযায়ী হারেম নিয়ন্ত্রণ করতেন, তার অনুবর্তী থাকতেন সম্রাটের প্রধান মহিষী আর অন্য স্ত্রীরা। তাদের পরে, হারেমের কর্মকাণ্ড অসংখ্য দপ্তরের দ্বারা পরিচালিত হতো, প্রতিটির দায়িত্ব প্রচুর বেতনপ্রাপ্ত 'কুমারী রমণীদের' ওপর ন্যস্ত থাকত। হারেমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল হিসাবরক্ষকের—একজন 'চতুর আর নিবেদিতপ্রাণ লেখক'—যে প্রাত্যহিক খরচ নিয়ন্ত্রণ করত আর প্রতি বছরের বাজেট নিরূপণ করত। হারেমের কোনো রমণী যখন কোনো কিছু কেনার ইচ্ছা করত সে 'তহবিলদার'-এর কাছে আবেদন করত, যে হিসাবরক্ষকের কাছে তার অনুমতি লাভের জন্য অনুরোধটা উপস্থাপন করত। গৃহকার্য বজায় রাখার সাধারণ ব্যবস্থা যদি ব্যর্থ হতো তখন হারেমের মহিলা জ্যোতিষীদের সাথে আলোচনা করা হতো। হারেমের কোনো মহল থেকে যখন একটি মূল্যবান মোতি হারিয়ে যায়, একজন জ্যোতিষী সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করে, বা গল্পটা এমনই যে, তিন দিনের ভেতরে ধূসর ত্বকের অধিকারী একজন রমণী সেটা খুঁজে পাবে, যে সম্রাটের হাতে সেটা তুলে দেবে। মহিলা আধিকারিক, পরিচারিকা আর ভৃত্যদের বিশাল প্রাধান্য পরম্পরার একেবারে নিচের ধাপে ছিল মহিলা অবস্করকের দল, যারা ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ, যেখানে মলমূত্র গিয়ে জমা হতো সেসব পরিষ্কার করত।

আগ্রার লালকেল্লার হারেম ছিল বারান্দা, উদ্যান, বৃক্ষশোভিত পথ এমনকি সাঁতারের জন্য জলাশয় বিশিষ্ট, প্রশস্ত আর খোলামেলা। প্রতিটি কামরা আর হলঘর আসবাবপত্র দিয়ে রুচিশীলভাবে সজ্জিত, যেখানে নরম গদির ওপর গ্রীষ্মকালে রংবেরঙের নকশা করা রেশমের গালিচা আর শীতকালে পশমের গালিচা বিছানো থাকত। হারেমের অভ্যন্তরের মেঝের কোনো অংশ অনাবৃত থাকত না। দরজা আর জানালা মার্জিতভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মখমল আর উজ্জ্বল রঙের রেশমের পটি বাঁধা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকত। আকবরের প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় সুগন্ধি প্রস্তুতকারী কারখানায় প্রস্তুতকৃত সুগন্ধি বাতাস সুরভিত করে

রাখত। রত্নখচিত ধূপাধার থেকে তিতিমাছের অন্ত্র থেকে প্রাপ্ত গন্ধদ্রব্য, গোলাপজল, ঘৃতকুমারী গাছের নির্যাস আর চন্দন কাঠ পাতন করে তৈরি করা ধূপের চিত্তাকর্ষক সুবাস ভেসে আসত। সুগন্ধি সাবান আর পিচ্ছিলকারী অনুলেপন হারেমের রমণীদের তাদের ত্বক সতেজ আর শীতল রাখতে সাহায্য করত। আরো ছিল গোলাপ ফুল থেকে মমতাজের পিতামহী, আসমত বেগমের উদ্ভাবিত আতর, জাহাঙ্গীর যাকে তার রাজত্বকালের সেরা আবিষ্কার বলেছিল এবং বর্ণনা করেছিলেন কীভাবে 'তিনি যখন গোলাপ জল তৈরি করছিলেন, পাত্রের উপরিভাগে একটি গাঁজলার সৃষ্টি হয় সেখানে জগ থেকে গরম গোলাপ জল ঢালতে। তিনি এই গাঁজলা একটু একটু করে সংগ্রহ করেন...এর সুগন্ধি এতটাই শক্তিশালী যে, হাতের তালুতে যদি এক ফোঁটা ফেলে ঘষা হয় এটা পুরো সমাবেশকে সুবাসিত করে তুলবে এবং মনে হবে যেন অসংখ্য লাল গোলাপের কুঁড়ি সেই মুহূর্তে প্রস্ফুটিত হয়েছে। অন্য আর কোনো সুগন্ধি এর সমকক্ষ নয়। এটা ভগ্ন হৃদয়ে আশা জাগিয়ে তোলে এবং ক্লান্ত আত্মাকে প্রাণবন্ত করে।'

স্ত্রী আর উপপত্নীরা তাদের নিজস্ব সংসার পরস্পর সংযুক্ত মহল আর কক্ষে গড়ে তুলেছিল। ভূগর্ভস্থ সিঁড়ি আর গলিপথের একটি গোপন ব্যবস্থা বায়ু চলাচল নিশ্চিত করার সাথে সাথে হারেমের অধিবাসীদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণেও সহায়তা করত। সম্রাট সমস্ত এলাকায় দ্রুত আর নীরবে চলাচল করে, কখনো এখানে কখনো অন্য কোথাও আবির্ভূত হলে, এটা তাকে অপার্থিব শক্তির মহিমা দান করত। আকবরের রাজত্বকালে গড়ে তোলা মহিলা গুপ্তচর বাহিনীর সাহায্যে তিনি সব কিছু জানতে পারতেন। হারেমের ভেতরের নিয়মানুবর্তিতা ছিল নির্মম আর কঠোর। জাহাঙ্গীরের এক প্রাক্তন উপপত্নী হারেমের এক খোজার সাথে ফষ্টিনষ্টি করার সময় ধরা পড়লে একটি কাঠের সাথে দুপা বেঁধে তাকে একটি গর্তে দাঁড় করিয়ে বগল পর্যন্ত মাটি দিয়ে ভরে দেয়া হয় এবং পানি আর খাবার ছাড়া সূর্যের নিচে সেভাবেই রেখে দেয়া হয়। ছত্রিশ ঘণ্টা পর হতভাগ্য মেয়েটা মারা যায়। আলোচ্য ঘটনার অভিযুক্ত খোজাকে 'হাতির পদদলিত করার সাজা' দেয়া হয়। নপুংসকরণের ফলে যে যৌন আকাঙ্ক্ষা সব সময় নষ্ট হয় না এই বাস্তবতার শিকার।*

সম্রাটের জন্য রাজকীয় হারেমের চেয়ে নিরাপদ কোনো স্থান আর নেই, যেখানে তিনি একাধারে প্রভু আর অতিথি হিসেবে আহার করতে আর নিদ্রা যেতে পারেন। এটা অনেকভাবেই বাল্যকালের, এমনকি সম্ভবত গর্ভের,

---

* যৌনাঙ্গ আর অণ্ডকোষ সম্পূর্ণ অপসারণের মাধ্যমে নপুংসকরণ করা যায়– যার মানে প্রস্রাবের জন্য একটি পালকের প্রয়োজন হবে– বা আরো স্বাস্থ্যসম্মত আর সহজে কেবল অণ্ডকোষ অপসারণের মাধ্যমেও করা যায়। ভিক্টোরীয় যুগের এক পর্যটক রিচার্ড বার্টনকে শেষোক্ত প্রকৃতির এক খোজার স্ত্রী বলেছিল যে তার স্বামীর মাঝে, প্রলম্বিত যৌন–উদ্দীপনার পরে, এক ধরনের কামোত্তেজনা জাগিয়ে বীর্যপাত, সম্ভবত মূত্রথলির এক প্রকার তরল ঘটানো সম্ভব।

নিরাপত্তার মাঝে ফিরে যাওয়া বোঝায়। একজন বিশেষ বিশ্বস্ত ভৃত্যের কাছে তার পান করার পানি সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়, যে মুখবন্ধ করা পাত্রে পানি সংরক্ষণ করে এবং তার পাত্রের সব খাবারই তার ঠোঁট স্পর্শ করার আগে অন্য কেউ পরীক্ষা করে। হারেমে উৎসাহী তরুণ প্রেমিকদের গোপনে প্রবেশ করা, যারা প্রতিরোধ করে সেই একই প্রহরীরা সম্ভাব্য আঁততায়ীর বিরুদ্ধেও ভালো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম। হারেমের অভ্যন্তর দীর্ঘাঙ্গী, শক্তিশালী দৈহিক কাঠামোর অধিকারী তীর আর ধনুকে বিশেষ পারদর্শী রমণীদের দ্বারা সুরক্ষিত—তুর্কি, উজবেক আর আবিসিনিয়ার রমণীদের এ ক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম রয়েছে। নির্মমতার জন্য তাদের খ্যাতি দায়িত্বে অবহেলা করলে তারা যে ভয়ংকর শাস্তি ভোগ করবে সেটার মাঝে বেশ ভালোভাবেই প্রতিফলিত হয়। তারা হারেমের বয়স্ক আধিকারিক, *খাজাস্বারার* কাছে জবাবদিহি করে এবং এসব মহিলা যোদ্ধাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বাহিনীটা স্বয়ং সম্রাটের মহল পাহারা দেয়।

সূর্যাস্তের সাথে সাথে প্রধান দরজা ব্যতীত আর সব প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়া হয়, যেখানে সারা রাত মশাল জ্বলে। হারেমে প্রবেশের সন্নিহিত পথগুলো খোজার দল পাহারা দেয়। ইংরেজ পর্যটক পিটার মানডি বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'অভিজাত লোকেরা...খোজাদের বিশ্বাস করে তাদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন, যার ভেতরে অন্যতম তাদের রমণীদের, তাদের সম্পত্তি পাহারা দেয়াটা...' কেউ কেউ, চিনেও অনেক ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটত, উন্নতির পথ হিসেবে নিজেরাই খোজা হয়। অন্যদের বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, কখনো তাদের পিতা-মাতার নির্দেশে খোজা করা হতো। এই সময়ের এক বয়স্ক রাজকীয় খোজা পরবর্তী সময়ে নিজের পিতা-মাতার সাথে দেখা করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিল, যারা তাকে 'এই পৃথিবীর সর্বোচ্চ অধিগম্য সুখ' থেকে বঞ্চিত করেছে।

খোজা প্রহরী ছাড়াও, দিনের চব্বিশ ঘণ্টা রাজপুত যোদ্ধাদের একটি দল পাহারার দায়িত্ব পালন করত, যাদের সহায়তা করতে আরো যোদ্ধার দল আর রাজকীয় বাহিনীকে সর্বদা প্রস্তুত অবস্থায় রাখা হতো। রাজকীয় হারেমে প্রবেশ করা তাই মোটেই সহজ ছিল না। কোনো অভিজাত ব্যক্তির স্ত্রী যখন হারেমে কারও সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে হারেমের আধিকারিকদের কাছে আবেদন করে, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হতো। যাদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হতো, তারা যদি প্রহরীদের কাছে অপরিচিত হতো তাহলে প্রবেশের সময় খোজা প্রহরীরা তন্ন তন্ন করে তাদের তল্লাশি নিত, 'আলোচ্য রমণীর সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থান কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে।' ভেনিসের পর্যটক নিকোলাই মানুচ্চি অভিযোগ করেছিলেন, 'এই বেবুনদের হাত আর মুখ একই সাথে কাজ করে, প্রাসাদে প্রবেশকারী রমণী আর মালপত্র সব কিছুই চরম লম্পটের মতো তারা তল্লাশি করে; তাদের মুখের ভাষা অশ্লীল আর আদিরসাত্মক গল্পের দারুণ ভক্ত।' হারেমের অভ্যন্তরে মহিলার ছদ্মবেশে যেন কোনো পুরুষ প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য

লোকদেখানো এই তল্লাশি করা হতো। ইউরোপীয় চিকিৎসকদের অনেকেই, যারা হারেমের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেছিল, বাইরের তোরণদ্বারে আনা অসম্ভব এমন অসুস্থ রমণীর চিকিৎসা করতে, নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছে। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের বর্ণনা করেছেন কীভাবে একটি কাশ্মিরী শাল দিয়ে প্রথমে তার মাথা ঢেকে দেয়া হয়েছিল, 'আমার পা পর্যন্ত বিশাল একটি গলবস্ত্রের ন্যায় সেটা ঝুলতে থাকে এবং হারেমের একজন খোজা হাত ধরে এমনভাবে আমাকে নিয়ে যায়, যেন আমি একজন অন্ধ লোক।'
অনেক ভাষ্য থেকে জানা যায়, শল্যবিদদের গর্ভপাত ঘটাবার কথা বলা হতো। ঈর্ষান্বিত স্ত্রীরা, উদ্বিগ্ন যে তাদের স্বামীর ভালোবাসায় উপপত্নী আর ক্রীতদাসীরা অনুপ্রবেশ করতে পারে, শল্যবিদদের এসব কারণে বেশ ভালো রকমের অর্থ প্রদান করত। একটি ভাষ্য থেকে জানা যায় কীভাবে এক রাজতনয়া 'এক মাসে (তার স্বামীর) হারেমের আটজন রমণীর গর্ভপাত ঘটিয়েছিল, কারণ তার নিজের সন্তান ছাড়া সে আর কারও সন্তানকে বেঁচে থাকতে দেবে না।'
কসরতবাজ, অনুকর্তা আর নর্তকীর দল হারেমের মহিলাদের মনোরঞ্জন করত, যারা জর্দা দেয়া পান মুখে দিয়ে গল্প করত, পাশা খেলত এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিতে পরিহিত অঙ্গুরীয়ে স্থাপিত মুক্তা-বাঁধানো, ক্ষুদ্রাকৃতি আয়নায় নিজেদের চেহারার তারিফ করত। কিন্তু তারা অলস আত্মরতিতে মগ্ন থেকে তাদের পুরোটা সময় অতিবাহিত করত না। রাজকীয় হারেমে নূরের মতো বিত্তশালী, সুশিক্ষিত আর উঁচু মহলে যোগাযোগ রয়েছে এমন মহিলারা, তাদের পুরুষ আত্মীয় বা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিশেষভাবে নিয়োগ করা আধিকারিকদের সাহায্যে সাফল্যের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করত। তারা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও অনেক সময় জাহাজ ভাড়া, ক্যাপ্টেন নিয়োগ করে বাইরের পৃথিবীর সাথেও বাণিজ্য করত এবং ভারতবর্ষের দ্রব্য আরবে এবং আরো দূর-দূরান্তে রপ্তানি করতে। তারা তাদের প্রাপ্য ভাতা আর উপঢৌকন ব্যবহার করত তাদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থের জোগান দিতে কিন্তু সেইসাথে ভোগ করার জন্য তাদের যে জায়গির দেয়া হতো তার আয় এবং বকেয়া শুল্ক মওকুফের মতো সুবিধাদিও তারা ব্যবহার করত। তারা বিচক্ষণতার সাথে তাদের ব্যবসার লভ্যাংশ পুনরায় বিনিয়োগ করে বিপুল পরিমাণ বিত্তের অধিকারী হতো, কিন্তু একই সাথে ভোজসভা, সমাবেশ এবং উৎসবে দরাজ হাতে খরচ করত এবং সেইসাথে ছিল দরবার জীবনের অবিচ্ছেদ্য বাহুল্য উপঢৌকন প্রদান। তারা নতুন ইমারত নির্মাণ এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানে মুক্ত হস্তে দান করত। এক ডাচ নূর সম্পর্কে লিখেছেন, 'তিনি চারপাশে প্রচুর ব্যয়বহুল ইমারত নির্মাণ করেছেন—*সরাইখানা* বা বণিক এবং পর্যটকদের জন্য বিশ্রামের স্থান এবং এমন সব প্রমোদ-উদ্যান আর প্রাসাদ যেমনটা পূর্বে কখনো নির্মিত হয়নি।' এই মহিলা প্রেমের মতো বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কোনো প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বরদাশত করতেন না।

১৬১৩ সালের ৩০ মার্চ, মমতাজ এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। 'মাঙ্গলিকতার বাগিচার প্রথম ফসল' এই রাজতনয়ার নাম রাখা হয় হূর-আল-নিসা। মমতাজের দরবারের বিলাসিতাপূর্ণ জীবন, সদ্য ভূমিষ্ঠ কন্যার সাথে খেলা করার সময়, অবশ্য শীঘ্রই সমাপ্ত হয়। জাহাঙ্গীর আরো একবার সামরিক অভিযানের ব্যাপারে মনোযোগ দেন, যা খসরুর বিদ্রোহের ফলে তিনি বাধ্য হয়ে মূলতবি রেখেছিলেন এবং ১৬১৪ সালে খুররমকে ডেকে পাঠান। মেওয়ারের (উদয়পুর) রানাকে, রাজস্থানের শাসকদের ভেতরে সবচেয়ে পরাক্রমশালী, যিনি পাহাড়ে অবস্থিত একটি শক্ত ঘাঁটি থেকে মোগলদের বিরোধিতা করা বজায় রেখেছিলেন, পরাস্ত করার দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়।
মমতাজ যদিও পুনরায় সন্তানসম্ভবা, তার পরও তিনি এই অভিযানে খুররমের সঙ্গী হন এবং এটাই তাদের বিবাহিত জীবনের ধারায় পরিণত হয়। তিনি সামরিক অভিযানে মেয়েদের কখনো না নিয়ে আসতে তার পূর্বপুরুষ বাবরের পরামর্শ দৃঢ়তার সাথে উপেক্ষা করেন। তার এক দিনপঞ্জি রচয়িতা মন্তব্য করেছেন, 'তিনি কখনো রাজকীয় কামরার এই আলো নিজের কাছ থেকে পৃথক হতে দেননি স্বদেশে কিংবা বিদেশে যেখানেই অবস্থান করেন।' দুর্ভাগ্য এবং কষ্টের মাঝে এবং কখনো সমূহ বিপদের ভেতরেও তিনি সম্রাটের পাশেই অবস্থান করেছেন এবং তাদের এই যাযাবর জীবনেই তিনি তাদের চৌদ্দ সন্তানের ভেতরে বারোজনকেই গর্ভধারণ এবং প্রসব করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

চম্পতি যুবরাজ

দাক্ষিণাত্যের বন্ধুর মালভূমির পীড়াদায়ক সুলতানদের পরাজিত করে মোগল নিয়ন্ত্রণ দক্ষিণমুখী প্রসারিত করার একটি পূর্ব লক্ষণ হিসেবে জাহাঙ্গীর মেওয়ার বিজয় করতে চেয়েছিলেন এবং তারপর আরো উত্তরে মধ্য এশিয়ায় 'আমার পূর্বপুরুষদের কৌলিক রাজ্য', বিশেষ করে সেই পুণ্যস্থান, তৈমুরের হারিয়ে ফেলা রাজধানী সমরকন্দ, পুনরুদ্ধার। জাহাঙ্গীর আগ্রার ৩০০ মাইল পশ্চিমে আজমীরে রাজদরবার স্থানান্তরিত করেন এবং মেওয়ার আর তার পুত্রের অভিযান স্থানের নিকটে এসে উপস্থিত হন।

খুররম রাজস্থানের পাহাড়ি এলাকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানে একের পর এক সামরিক চৌকি স্থাপনের মাধ্যমে তার অভিযান শুরু করেন। ভবিষ্যতের শাহজাহানের পোড়ামাটি নীতি এতটাই নির্মম আর আপসহীন ছিল যে তার নিজের সৈন্যরাও অনেক সময় খাদ্য বঞ্চিত থেকেছে এবং এমন ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হতে মেওয়ারের রানা বশ্যতা স্বীকার করেন। খুররম শত্রুদের ভেতরে সবচেয়ে গর্বিত এই নৃপতিকে অপদস্থ না করার সিদ্ধান্ত নেন। রানাকে কোনো ভূখণ্ড সমর্পণ করতে কিংবা জাহাঙ্গীরের সামনে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে অভিবাদন জানাতে তিনি বলেন না। তিনি কেবল অনুরোধ করেন যে রানা যেন তার সন্তানকে সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করতে পাঠান। রানার ছোট ছেলে করণ সিং দরবারে উপস্থিত হলে, জাহাঙ্গীর সেখানে অকৃপণভাবে তাকে উপঢৌকন প্রদান করে এবং 'বন্য প্রকৃতির আর পাহাড়ে বসবাসকারী' এই ছেলেটার মাঝে বাস্তববুদ্ধির অভাব দেখে কৌতুক বোধ করে যদিও কিছুকাল পূর্বে মোগলদের ক্ষেত্রেও এই বর্ণনা একদম সঠিক ছিল।

বাইশ বছর বয়সী খুররম যোদ্ধা আর কূটনীতিক হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেন এবং তার আব্বাজান যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন সেখানে সাফল্য লাভ করেন। আকবর মেওয়ারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য দুবার

জাহাঙ্গীরকে আদেশ দিয়েছিলেন এবং প্রতিবারই তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। বিজয়দৃপ্ত খুররম দরবারে উপস্থিত হয়ে, তার পিতাকে ৬০,০০০ রুপি মূল্যের দ্যুতিময় একটি চুনি উপহার দেয়। জাহাঙ্গীর চুনিটা বাহুতে ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু অনুভব করেন সে জন্য 'দুটো বিরল আর আলোকোজ্জ্বল অনুরূপ মোতি' প্রয়োজন চুনিকে উজ্জ্বলতর করতে। অমাত্যদের একজন, ইঙ্গিত বুঝতে পেরে, চমৎকার একটি মোতি খুঁজে বের করেন, কিন্তু খুররমেরও তখন মনে পড়ে, আকবরের সাথে তার ছেলেবেলার দিনগুলোতে তিনি 'পুরাতন একটি পাগড়িতে অবিকল এই আকার আর আকৃতির একটি মুক্তা' দেখেছিলেন। অমাত্যরা সম্মানসূচক পাগড়ির অলংকার খুঁজতে শুরু করেন এবং জাহাঙ্গীরকে লেখেন 'খোঁজার পরে ঠিক এই আকৃতি আর আকারের একটি মুক্তাবিশিষ্ট পাগড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে...রত্নকারেরা বিস্মিত হয়েছে।' খুররমের বাল্যকালে যেমনটা দাবি করা হয়েছিল তার আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি স্পষ্টতই ঠিক তেমনই তীক্ষ্ণ, কিন্তু এ ঘটনায় একই সাথে মূল্যবান রত্নের প্রতি তার প্রবল অনুরাগের প্রকাশ ঘটে, যা পরবর্তীকালে মূল্যবান রত্ন বিষয়ে তাকে মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম বিশেষজ্ঞের মর্যাদা দান করে।

■

খুররমের নতুন পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে। মেওয়ার অভিযানের সময়, ১৬১৪ সালের ২ এপ্রিল মমতাজের গর্ভে তাদের জাহানারা নামে আরো একজন কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং পরবর্তী বছর, ১৬১৫ সালের ৩০ মার্চ তাদের প্রথম পুত্র দারা শুকোহ্ জন্মগ্রহণ করে। পুরো দরবার বিষয়টি উদ্‌যাপন করে। এক ইতালিয়ান পর্যটক লক্ষ করেন, 'মহলে যখন কোনো কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে মহিলারা ভীষণ আনন্দিত হয় এবং তাদের এই আনন্দের স্মারক হিসেবে প্রচুর খরচ করে', কিন্তু 'যদি পুত্র জন্মগ্রহণ করে তখন পুরো দরবার আনন্দে শামিল হয়, যা কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়...বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় আর সংগীতের আয়োজন করা হয়...।' আমাদের আলোচিত এই দম্পতি আরো একবার শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবন উপভোগের জন্য খুব অল্প সময় পান। পরের বছর, ১৬১৬ সালে, জাহাঙ্গীর দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যে খুররমকে যেতে বলেন তার বড় ভাইকে সরিয়ে সেখানে অবস্থানরত রাজকীয় বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে। তার যুক্তি ছিল এই যে, 'দাক্ষিণাত্য অভিযানের নেতৃত্ব আর কর্তৃত্ব আমার পুত্র সুলতান পারভেজের অধীনে আমি যেমন আশা করেছিলাম তেমন সুচারুরূপে পালিত হয়নি, তাকে ডেকে পাঠানোই আমার কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে এবং তারপর বাবা খুররমকে, যে স্পষ্টতই অনেক বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন, রাজকীয় বাহিনীর অগ্রভাগে প্রেরণ করে আমি নিজে তার পেছনে অগ্রসর হব।'

মোগলরা তাদের সাম্রাজ্যের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন মুসলমান সালতানাতগুলোকে—আহমেদনগর, বিজাপুর আর গোলকুণ্ডা—একটি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করত। এই রাজ্যগুলো কখনো নিজেদের ভেতরে লড়াই করত কিন্তু তাদের উত্তরের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নিজেদের একটি সম্মিলিত বাহিনী গড়ে তোলার ঝুঁকি সব সময় রয়ে যেত। মোগল নিরাপত্তার জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় যে, তারা মোগল অধিরাজত্ব মেনে নেবে—এটা এমন একটি ব্যাপার, যার প্রতি সংগত কারণেই তাদের প্রবল অনীহা ছিল। মোগলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি মহাসংকট হিসেবে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলো আগেও বিদ্যমান ছিল এবং বর্তমানেও তাদের ভূমিকা অপরিবর্তিত রয়েছে। এক প্রাক্তন আবিসিনিয়ান ক্রীতদাস এবার শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, মালিক আম্বার, যিনি আহমেদনগরের সুলতানের, যার রাজ্যের কিয়দংশ আকবর মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, নিজ যোগ্যতাবলে উচ্চপদ লাভ করেছেন। মালিক আম্বার হৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করতে চতুরতার সাথে একটি কার্যকর গেরিলা যদ্ধ পরিচালনা করছেন এবং বিজাপুরের ধনাঢ্য সুলতানকে নিজের মিত্রে পরিণত করেছেন।

মমতাজ আর তার স্বামী একটি বিষাদময় সময়ে এই নিয়োগের সংবাদ লাভ করেন। ১৬১৬ সালের গ্রীষ্মের সূচনালগ্নে তাদের বড় মেয়ে হুর-আল-নিসা গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। মমতাজের আবেগের কথা কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি কিন্তু সেটা কল্পনা করতে খুব একটি বেগ পেতে হয় না, বিশেষ করে তিনি তখন আবারও আট মাসের গর্ভবতী। খুররম 'ভীষণভাবে শোকার্ত' এবং জাহাঙ্গীরও নাতনির মৃত্যু সংবাদে বিহ্বল হয়ে লেখেন, 'আমি যদিও এটা লিখতে ভীষণ অভিলাষী, আমার হাত আর হৃদয় ভারী হয়ে আছে। আমি যখনই লেখনী হাতে তুলে নিই, আমার নিজেকে কেমন বিভ্রান্ত মনে হয় এবং অসহায়ভাবে ইতিমাদ-উদ-দৌলাকে এটা লেখার আদেশ দিই।' ইতিমাদ-উদ-দৌলা, শিশুটির প্রপিতামহ, দরবারের সুললিত ভাষায় বিষাদময় কাহিনীটি যথাযথভাবে বর্ণনা করেন কীভাবে 'কচি মেয়েটার প্রাণ পাখি তার দেহের খাঁচা ছেড়ে বেহেশতের উদ্যানে চলে গেছে।' ক্রন্দনরত জাহাঙ্গীর দুই দিন একা থাকেন এবং তারপর আদেশ দেন, বুধবার, শিশুটির মৃত্যু দিন, পরবর্তী সময়ে 'মৃত্যু দিন' হিসেবে পালিত হবে। জাহাঙ্গীর তৃতীয় দিন খুররমের মহলে যান কিন্তু 'কোনোমতেই নিজেকে সামলে রাখতে পারেন না।'

তিন সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে অবশ্য পরিবারটির বিষাদের তীব্রতার উপশম হয়। জাহাঙ্গীর বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'আসফ খানের কন্যার (খুররমের স্ত্রী) গর্ভ থেকে মূল্যবান একটি মুক্তা পৃথিবীতে অস্তিত্ব লাভ করে। এই মহান আশীর্বাদ লাভ করে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় জোরে ঢোল বাজানো হয় এবং

মানুষের জন্য আনন্দ আর উপভোগের দ্বার অবারিত করে দেয়া হয়।' মমতাজের গর্ভে তাদের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা জন্মগ্রহণ করে।

মমতাজ সন্তান প্রসবের কষ্ট থেকে আরোগ্য লাভের সাথে সাথে খুররমের সঙ্গী হবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন যেহেতু যুদ্ধের জন্য তিনি পুনরায় প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। তাপ্তি নদীর তীরে অবস্থিত, উজ্জ্বল রঙের ছিট কাপড় আর আফিমের জন্য বিখ্যাত বুরহানপুর শহরে তিনি এবার ঘাঁটি স্থাপন করবেন এবং মোগল অভিযানের নেতৃত্বের কেন্দ্র হিসেবে শহরটা বহুদিন ধরেই দাক্ষিণাত্যের অবাধ্য রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যা ক্ষয়াটে অধিত্যকার একটি বন্ধ্যা ভূপ্রকৃতির অন্যপাশে আরো দক্ষিণে অবস্থিত। ১৬১৬ সালের ৩১ অক্টোবর, দিনটা জ্যোতিষীরা খুররমের বুরহানপুর যাত্রার জন্য নির্ধারিত করে। তিনি তার আব্বাজানের পরিদর্শনের জন্য নিজ বাহিনীর অগ্রভাগে অবস্থান করে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসেন। দারুণভাবে সজ্জিত প্রায় ৬০০ হাতি আর ১০,০০০ অশ্বারোহী, সোনালি রঙের ঝলমলে কাপড়ে সজ্জিত হয়ে আর পাগড়িতে সারসের আন্দোলিত সাদা পালক পরিহিত অবস্থায় তাদের সম্রাটকে অভিবাদন জানান। জাহাঙ্গীর তার পুত্রকে চুম্বন করেন, যার পরনে সেদিন ছিল 'নভোমণ্ডলের মতো জ্বলজ্বল করতে থাকা হীরক খণ্ড আর বিশালাকৃতি মুক্তার কারুকাজ করা রুপালি কাপড়ের আলখাল্লা' এবং পুত্রকে তিনি সেদিন অনেক উপহার দেন, যার ভেতরে ছিল রত্নখচিত পর্যাণে সজ্জিত ঘোড়া, জাহাঙ্গীর নিজে যার নাম দিয়েছিলেন 'স্পন্দিত পদ।'

খুররমের উদীয়মান সৌভাগ্য ইংরেজ রাজদূত স্যার টমাস রো নথিবদ্ধ করেছেন। 'এটা সত্যি,' তিনি লিখেছেন, 'সবাই সম্রাটের চেয়েও তাকে বেশি ভয় পেত' এবং 'সবাই এখন অত্যধিক ক্ষমতাবান ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।' রো নিজে তরুণ যুবরাজের ভক্ত ছিলেন না, যাকে তিনি 'লোভী আর জুলুমবাজ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং তিনি এমনই উদ্ধত 'লুসিফারও, যা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।' ইংরেজ বণিকদের অভদ্রজনোচিত আচরণ সম্পর্কে খুররম তার কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, 'সুরা পান করে উন্মত্ত হয়ে রাস্তায় ঝগড়া করা, আর শুল্ক দপ্তরে কথায় কথায় তরবারি বের করা।' বাণিজ্য সুবিধা অর্জনে রোর প্রয়াস যুবরাজ বারবার ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং তার লোকেরা ইংল্যান্ড থেকে রোর নিয়ে আসা উপহারসামগ্রী জব্দ করে, যা তিনি নিয়ে এসেছিলেন জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহভাজন হতে সহায়ক হবে ভেবে। বস্তুতপক্ষে গুটিকয়েক উপহারসামগ্রী, যা সম্রাটের প্রীতির কারণ হয়েছিল। মোগলদের কাছে, অবশ্যই একে একটি দূরবর্তী আর প্রতিহত দ্বীপ মনে হয়েছিল, যেখানে হিন্দুস্তান থেকে কেউ গমন করেছে এমন কোনো নজির নেই। তার ভেতরে ছিল একটি ইংলিশ ঘোড়ার গাড়ি এবং কিছু

চিত্রকর্ম। ১৬১৬ সালের নওরোজ বা নববর্ষের জন্য, জাহাঙ্গীর তার সিংহাসনের পেছনে অবস্থিত বর্ধিতাংশ ইংরেজ রাজপরিবারের প্রতিকৃতি দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন।

জাহাঙ্গীর যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি খুররমের বাহিনীকে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে অনুসরণ করেন, আজমীর থেকে নিজের দরবারকে বুরহানপুরের একশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটি উঁচু পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত মানডুর পাহাড়ি দুর্গে স্থানান্তরিত করেন। রো তার সঙ্গী হন। ইংল্যান্ডে প্রেরিত রাজদূতের শাণিত বার্তায় কখনো কখনো মোগল অশিষ্টচার সম্বন্ধে অবজ্ঞা উথলে উঠেছে। তিনি একজন রমণীর ন্যায়, যে নিজের কাছে সংকল্প করেছে 'কাপবোর্ডের সব সেটের সাথে তার কারুকাজ করা পাদুকার সাথে রুপার প্লেট...সব কিছু প্রদর্শন করার', তাদের জাহির করার প্রবণতা পছন্দ করতেন। তাকে এবারের জমকালো প্রদর্শনী যদিও দ্ব্যর্থহীনভাবে মুগ্ধ করেছে। তিনি বিদায় নেয়ার পূর্বে, জাহাঙ্গীর দ্যুতিময় রত্নে সজ্জিত এবং দুজন খোজা পালকের ঝালর আন্দোলিত করা অবস্থায় তিনি প্রাসাদের ব্যালকনিতে উপস্থিত হন উপহার আদান-প্রদান করতে। রো বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'তিনি রেশমের দড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে দেন, যা তিনি দান করবেন...তাকে যা দেয়া হয়, একজন সম্মানিত বৃদ্ধা, স্থূলকায় বেঢপ আকৃতির, ত্বকে ভাঁজ পড়েছে এবং একটি আংটা থেকে প্রতিমার ন্যায় ঝুলন্ত অবস্থায়, আরেকটি দড়ির সাহায্যে একটি গহ্বরে টেনে তোলেন...।'

রোর ধারণা, তিনি জাহাঙ্গীর আরেকজন স্ত্রীর সাথে নূরজাহানকে এক পলকের জন্য দেখতে পেয়েছেন, এসব কর্মকাণ্ড অবলোকন করছেন : 'একপাশে অবস্থিত একটি জানালায় রয়েছে তার দুই প্রধান মহিয়সী, যারা কৌতূহলের কারণে লতাপাতার ঝাঁঝরিতে, যা জানালার সামনে ঝুলছে সেখানে ছোট ছিদ্র সৃষ্টি করেছেন আমাকে দেখতে। আমি প্রথমে তাদের আঙুল দেখতে পাই, এবং ভালো করে তাকিয়ে দেখতে প্রথমে একটি চোখ, এখন আরেকটা দেখতে পাই; আমি মাঝে মাঝে তাদের সম্পূর্ণ মুখাবয়ব অনুমান করতে সক্ষম হই। তারা দুজনই চলনসই ফর্সা, মাথার কালো চুল পরিপাটি করে বাঁধা; কিন্তু আমার কাছে যদি অন্য কোনো ধরনের আলো না থাকত, তাদের হীরক আর মুক্তাই যথেষ্ট ছিল তাদের দৃষ্টিগোচর করতে। আমি যখন মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকাই তারা সেখান থেকে চলে গিয়েছিল এবং তারা এতটাই উৎফুল্ল ছিল যে, আমার মনে হয় তারা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে।'

রো বর্ণনা করেছেন কীভাবে, বিদায়ের মুহূর্ত যখন ঘনিয়ে আসে, জাহাঙ্গীর 'সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় 'পাদিশাহ্ সালামত', 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হন' এই হর্ষধ্বনিতে চারপাশ, কামানের গর্জনের মতো, মুখরিত হয়ে ওঠে...।' একজন

পরিচারক তার 'অতিকায় হীরক খণ্ড আর চুনিখচিত' তরবারিটা কোমরে বেঁধে দেয়। তার মাথার পাগড়ির একপাশে 'আখরোটের মতো বড়' একটি চুনি খালি ঝুলছে, যখন পাগড়ির অন্যপাশে 'একই রকম আকৃতির হীরক খণ্ড' ঝুলতে দেখা যায় এবং মধ্যখানে রয়েছে হৃদয়-আকৃতির একটি পান্না। জাহাঙ্গীরের পরনের সোনার জরির কারুকাজ করা জোব্বাটা 'বিশালাকৃতি মুক্তা, চুনি, আর হীরকের ছড়া দিয়ে জড়ানো' একটি পরিকরের সাহায্যে আটকানো রয়েছে...। ইংরেজ রাজদূত কৃতজ্ঞচিত্তে তাকিয়ে দেখেন জাহাঙ্গীর পারস্যের মখমলে আবৃত চার চাকার যে ইংলিশ ঘোড়ার গাড়ি নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন তারই একটি বিলাসবহুল রেপ্লিকায় আরোহণ করে খটখট শব্দ তুলে যাত্রা করেছেন। নূরজাহান মূল গাড়িতে, 'সদ্যই বিলাসবহুলভাবে আচ্ছাদিত আর পরিপাটি করা' আরোহণ করে তাকে অনুসরণ করেন। জাহাঙ্গীর ব্যয়বহুল করে এটাকে ঝকঝকে করে তুলেছেন কারণ ইংল্যান্ড থেকে দীর্ঘ, স্যাঁতসেঁতে, নোনা সমুদ্রযাত্রার সময় গাড়িটার মূল আসন, গদিসহ সব কিছু ক্ষয়কর ছত্রাকে আক্রান্ত হয়েছিল।

রো সেইসাথে মোগলদের চৌকস প্রণালীবদ্ধকরণ দেখে মুগ্ধ হন, যা ছোটখাটো একটি শহরের সমতুল্য সফরসঙ্গী নিয়ে সম্রাটকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। তার নিজস্ব উপাসনালয়ের ধর্মযাজক মনে করেছিল এটা অনেকটা *ambulans respublica,* ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্র। এক লক্ষের অধিক ষাঁড়ের দল মন্থর ভঙ্গিতে, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে করতে রসদবোঝাই কাঠের মালবাহী শকটগুলো টেনে নিয়ে চলেছে। জাহাঙ্গীর যখন অস্থায়ী শিবির স্থাপন করেন সেটা বিশ মাইল পরিধির একটি এলাকা দখল করে। শিবিরের কেন্দ্রস্থলে জাহাঙ্গীরের নিজের অবস্থানের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়। রো অস্থায়ী বাসস্থানটা মেপেছিলেন এবং দেখেছিলেন সেটার ব্যাস প্রায় তিনশ গজ। রোর কাছে এটা ছিল 'আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার ভেতরে অন্যতম বিস্ময়'। যদিও তিনি পচনক্রিয়া শুরু হওয়া তিনশ বিদ্রোহীর ছিন্ন মস্তকের বোঝা নিয়ে হেলতে দুলতে হাজির হওয়া একটি উট দেখে বিব্রত বোধ করেন, জাহাঙ্গীরের জন্য কান্দাহারের সুবেদারের পাঠানো নিঃসন্দেহে একটি বিচক্ষণ উপহার।

জাহাঙ্গীর নিজে যখন খুররমের পশ্চাতে ব্যস্ততাহীনভাবে দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছের, নূর শিকারি হিসেবে তখন নিজের দক্ষতা প্রদর্শন করেন। জাহাঙ্গীর গর্বের সাথে নথিবদ্ধ করেন যে, 'নূর দুটো বাঘের প্রতিটিকে এক গুলিতেই ঘায়েল করেছে এবং আরো দুটোকে চারটা গুলিতে ঘায়েল করেছে...আজ পর্যন্ত নিশানাবাজির এমন নিদর্শন কেউ দেখেনি যে হাতির পিঠের ওপরের হাওদার ভেতর থেকে ছয়টা গুলি করা হয়েছে এবং একটিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।'

খুররমও এমন কাজ করেন যে, তার আব্বাজানও গর্ব করতে পারেন। আরেকটা সংক্ষিপ্ত আর চতুরতার সাথে পরিচালিত অভিযানে, যুবরাজ কিছু দিনের জন্য হলেও বিজাপুরের সুলতান আর মালিক আম্বারের বিদ্রোহ দমন করেন। রোর পুরোহিত যুদ্ধমান বাহিনীর মাঝে যুদ্ধের নাটকীয়তা দেখেছিলেন যেখানে 'প্রাচ্যের এইসব যুদ্ধ প্রায়ই অবিশ্বাস্য সংখ্যক মানুষের ভেতরে সংঘটিত হয়...তারা যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাকাড়া আর লম্বা বায়ুচালিত বাদ্যযন্ত্র থেকে যুদ্ধের উপযোগী বাজনা সৃষ্টি করে। সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ উভয় বাহিনীই সাধারণত উচ্চণ্ড আক্রমণের সাথে যুদ্ধ শুরু করে...' খুররম তার প্রতিপক্ষকে তারা যে মোগল ভূখণ্ড অধিকার করেছিল সেখান থেকে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য করেন এবং তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আর সেই তাদের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, এখন থেকে ভবিষ্যতে তারা জাহাঙ্গীরের ভাষায় 'অনুগত আর শান্ত' থাকবে।

জাহাঙ্গীরের কাছে যখন খুররমের বিজয়ের সংবাদ পৌঁছায় তিনি 'ঢাকে আনন্দের বাদ্যি বাজাবার আদেশ দেন' যে 'ঝামেলাবাজ যারা বিদ্রোহ করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল তারা নিজেদের অক্ষমতা আর অসহায়তা স্বীকার করে নিয়েছে।' ১৬১৭ সালের অক্টোবরে খুররম রোর ভাষ্য অনুসারে 'বিস্ময়কর সাফল্যে অভিষিক্ত' হয়ে ফিরে আসেন। রো নিজে যুবরাজের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন, 'অর্শের কারণে তখনো রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়ায়', এমন একটি অবস্থা যা ইতিমধ্যে 'বিশ সপ্তাহ যাবত' বজায় রয়েছে। খুররমের কারণে জাহাঙ্গীরের পুলকবোধ তার স্মৃতিকথায় পরিষ্কার লেখা রয়েছে : 'আমায় সম্মান প্রদর্শন করার আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত হতে আমি তাকে জানালার কাছে আসতে বলি যেখানে আমি বসে ছিলাম এবং পিতৃস্নেহ আর ভালোবাসার আধিক্যে সহসা আক্রান্ত হয়ে আমি সাথে সাথে উঠে দাঁড়াই এবং তাকে আমার বাহুর ভেতর টেনে নিই। সে আমার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ আর সম্মান যতই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে, তার প্রতি ততই আমার মমত্ববোধ বাড়তে থাকে।' সম্রাট তার প্রিয় পুত্রের উদ্দেশে মূল্যবান রত্ন আর সোনার মোহর ভর্তি বারকোশ উৎসর্গ করেন এবং ঘোষণা করেন, আজ থেকে সে 'শাহজাহান'—পৃথিবীর অধিশ্বর—হিসেবে পরিচিত হবে। জাহাঙ্গীর আরো আদেশ দেন, 'এখন থেকে আগামীতে দরবারে আমার সিংহাসনের পাশে তার জন্য একটি আসনের বন্দোবস্ত করা হবে, এমন সম্মান...আমাদের পরিবারে পূর্বে কেউ কখনো পায়নি' এবং তাকে সমৃদ্ধ গুজরাট প্রদেশের সুবেদার নিয়োগ করেন।

নূর এই বিজয় উপলক্ষে আয়োজিত এক ভোজসভার জন্য হতবুদ্ধি করার মতো ৩০০,০০০ রুপি ব্যয় করেন, যেখানে তিনি শাহজাহানকে রত্নখচিত আলখাল্লা,

ঘোড়া আর হাতি উপহার দেন এবং মমতাজ আর তার পরিবারের অন্য মহিলাদের সম্মানসূচক পোশাক প্রদান করেন।* একটি চিত্রকর্মে খোলামেলা ভবনবিশিষ্ট একটি উদ্যানে গালিচার ওপর আয়োজিত ভোজসভা অঙ্কিত হয়েছে। নূর তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে থাকা জাহাঙ্গীরের দিকে একটি পাত্র এগিয়ে দিচ্ছেন, চিত্রকর্মে তার মাথার চারপাশে একটি জ্যোতিশ্চক্র রয়েছে। ধর্মপ্রাণতা বোঝাতে, জ্যোতিশ্চক্রের এই ব্যবহার, মূলত জাহাঙ্গীরের শৈল্পিক প্রবর্তন, যা জেসুইট শিল্পরীতি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।* শাহজাহানকে তার পিতার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে থাকতে দেখা যায় এবং জাঁকজমকপূর্ণ বস্ত্র পরিহিত অলংকার সজ্জিত একদল রমণী বিমোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। রমণীদের ভেতরে একজন সম্ভবত, মমতাজ, নিজের স্বামীর সৌভাগ্যের গর্বিত অংশীদার। বিজয় উপলক্ষে আয়োজিত এই ভোজসভার মাত্র মাসখানেক পূর্বেই মমতাজের গর্ভে তাদের পঞ্চম সন্তানের জন্ম হয়, আরেকজন কন্যা, যাকে আমরা রোসন্নারা হিসেবে চিনি।

শাহজাহানের বাবার চোখে একজন মোগল যুবরাজের ভেতরে যে গুণাবলি কাঙ্ক্ষিত তার সবই মূর্ত ছিল। জাহাঙ্গীর এক জায়গায় লিখেছেন, 'এই সন্তানের প্রতি আমার প্রশ্রয় এতটাই সীমাহীন যে, আমি তাকে প্রীত করার জন্য সব কিছু করতে পারি এবং সে বাস্তবিকই চমৎকার একটি ছেলে এবং আকর্ষণীয় গুণাবলির অধিকারী একজন মানুষ, আর আমি সন্তুষ্ট যে সে তার অল্প বয়সে যে বিষয়েই আগ্রহী হয়েছে তাতেই ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে।'

জাহাঙ্গীর অবশ্য তার পুত্রের কাছে আরো কিছু একটি প্রত্যাশা করতেন—আরো দার পরিগ্রহ করা, যা রোসন্নারা ভূমিষ্ঠ হবার দিনই তিনি যথাযথভাবে পালন করেন। নববধূ ছিল জাহাঙ্গীরের *খান খানান* বা প্রধান সেনাপতির নাতি যাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন বলে মনঃস্থির করেছিলেন। শাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুসারে এই বিয়েটা একেবারেই 'রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত' এবং নববধূও 'নামে মাত্র এই কীর্তিমান সম্পর্কের অধিকারী হতে পেরেই সন্তুষ্ট ছিল।' তিনি অবশ্যই তার গর্ভে সুলতান আফরোজ নামে এক পুত্রসন্তানের পিতা হন। এই সন্তান অবশ্য কখনো মমতাজের সন্তানদের সমমর্যাদা বা আন্তরিকতার

---

* মূল্য তুলনা ভীষণ কঠিন একটি কাজ, কিন্তু আবুল ফজলের ভাষ্য অনুসারে, এটা মোটামুটি ধরে নেয়া যায় যে, এক রুপি বা দুই রুপি দিয়ে একটি ভেড়া পাওয়া যেত এবং একটি রেশমের একটি সাধারণ কাপড়ের দাম ছিল এক থেকে পাঁচ রুপির ভেতরে, যা থেকে অপব্যয়ের একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়।
* জ্যোতিশ্চক্রের ধারণার উদ্ভব মূলত এশিয়ায়, পারস্যে আর ভারতবর্ষে যখন এর ব্যবহার লুপ্ত হয়েছে তখন বাইজেনটাইনদের মাধ্যমে এটা ইউরোপে প্রচলিত হয়।

অধিকারী হয়নি। শাহজাহানের দিনপঞ্জির রচয়িতারা এই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর কেবল নথিবদ্ধ করেন যে, 'মঙ্গলময় মুহূর্তে যেহেতু এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়নি, মহামান্য সম্রাট তাকে নিজের সাথে কখনো রাখেননি... ।' রাজপরিবারে তার গুরুত্বহীনতার কথা আমরা পরে অবশ্য জাহাঙ্গীরের লেখা একটি ঘটনা থেকে জানতে পারি। ১৬২০ সালে, মমতাজের দ্বিতীয় পুত্র, শাহ সুজা, নানা অসুস্থতায় প্রায়ই আক্রান্ত এক রুগ্‌ণ সন্তান, পুনরায় অসুস্থ হয় 'এবার এমন ভয়ংকর বমি শুরু হয় যে পানি পর্যন্ত গলা দিয়ে নামতে পারে না' এবং দরবারের জ্যোতিষীরা হতবিহ্বল পিতা-মাতাকে বলেন, গ্রহ-নক্ষত্র তার মৃত্যুর বারতা নিয়ে এসেছে। অন্য আরেকজন জ্যোতিষী অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তার পরিবর্তে 'অন্য আরেকজন পুত্র মৃত্যুবরণ করবে।' জাহাঙ্গীর পরে বিগলিত চিত্তে লিখেছেন, 'জ্যোতিষীর কথাই সত্যি হয়েছিল : শাহ সুজা বাস্তবিকই আরোগ্য লাভ করেছিল। অল্পবয়স্ক সুলতান আফরোজ ছিল সেই হতভাগ্য, যে মৃত্যুবরণ করে।' সংক্ষিপ্ত উল্লেখের পরই ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

১৬১৮ সালে, সম্রাট শাহজাহানকে যে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করছেন সে সম্বন্ধে আরো ইঙ্গিত প্রদান করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তিনি তার রাজত্বকালের প্রথম বারো বছর যে রোজনামচা লিপিবদ্ধ করেছেন সেটা একটি খণ্ডে সংকলিত করা হবে এবং বাঁধাই করে অনুগ্রহভাজন বন্ধুদের জন্য এর অনুলিপি তৈরি করা হবে বা তিনি যেমন আত্মাভিমানী ভঙ্গিতে লিখেছেন 'শাসন কার্য পরিচালনায় শাসকদের সহায়িকা হিসেবে এটা অন্য দেশে প্রেরণ করা হবে।' তিনি অবশ্য ছাব্বিশ বছর বয়সী শাহজাহানকে প্রথম খণ্ডটা উপহার দেন। তিনি লিখেছেন, 'আমি তাকে সব দিক থেকে আমার প্রথম সন্তান হিসেবে বিবেচনা করি।' শাহজাহানের আম্মিজান যোধা বাঈ কয়েক মাস পর ইন্তেকাল করলে তিনি তার পুত্রের জন্য প্রকাশ্যে নিজের ভালোবাসা আর উদ্বেগ প্রদর্শন করেন। জন্মের পরই যদিও শাহজাহানকে তার মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল তবু তিনি তার প্রতি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। বস্তুতপক্ষে তিনি তার সমস্ত জীবনই তার পরিবারের অন্তরঙ্গ রমণীদের প্রতি গভীর আবেগ বোধ করেছেন। তার শোক এতই ব্যাপক ছিল যে, জাহাঙ্গীর 'তার প্রাণাধিক পুত্রের মহলে নিজে গিয়েছিলেন।' 'তাকে সম্ভাব্য সব উপায়ে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা' করার পর এবং এর পরও তার শোক প্রশমিত হয়নি বুঝতে পেরে জাহাঙ্গীর নিজে তাকে সাথে করে প্রাসাদে নিয়ে এসে তার দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করেন।

শাহজাহান আর মমতাজের সন্তানদের প্রতি জাহাঙ্গীর এতটাই ভীষণভাবে আকৃষ্ট ছিলেন যে, এমন বিকাশমান পরিবারের প্রতিদিনকার স্বাভাবিক

টানাপড়েনও তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। তিনি শাহ সুজার অসুস্থতার আরেকবার উল্লেখ করেছেন : 'আমার পুত্র শাহজাহানের প্রিয়তম সন্তান, শাহ সুজা...যাকে আমি যারপরনাই পছন্দ করি, শৈশবের মৃগীরোগ হিসেবে পরিচিত একটি রোগে আক্রান্ত হয়। সে দীর্ঘ সময় অচেতন ছিল। এই রোগ সম্বন্ধে যাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা যে চিকিৎসা বা পথ্য প্রয়োগ করুক না কেন কোনো ফল হয় না...' মমতাজ এ সময় পুনরায় গর্ভবতী হওয়ায় দুই বছর পূর্বে গুটি বসন্তে তার বড় কন্যার মৃত্যুর ঘটনাটা নিশ্চয়ই তাকে সব সময় তাড়িত করেছে। আশঙ্কা আর উদ্বেগে জর্জরিত জাহাঙ্গীর মনে মনে মানত করেন ছেলেটা যদি এবারের মতো বেঁচে যায় 'আমি আমার হাতে কোনো জীবিত প্রাণীর' কোনো ক্ষতি করব না। বাচ্চা ছেলেটা এর পরই ধীরে ধীরে সুস্থ হতে শুরু করে এবং জাহাঙ্গীর তার মানত অনুযায়ী শিকার করা ছেড়ে দেন।

১৬১৮ সালের ৩ নভেম্বরের রাতে, মমতাজ তাদের তৃতীয় পুত্রের জন্ম দেন। হিন্দুস্তানকে দাক্ষিণাত্য থেকে উত্তরে যে পর্বতমালা পৃথক করেছে সেই উঁচু পর্বতের একটি ছোট গ্রামে মমতাজের প্রসববেদনা শুরু হয় যখন তিনি জাহাঙ্গীর, শাহজাহান আর অবশিষ্ট দরবারের সঙ্গী হয়ে আগ্রা ফিরে আসছিলেন। কয়েক দিন পর, রাজকীয় শোভাযাত্রা মালওয়া প্রদেশের রাজধানী উজ্জয়িনীতে পৌছালে যথাযথ আনুষ্ঠানিকতার সাথে নবজাতকের ভূমিষ্ঠ হবার ঘটনাটা উদ্‌যাপন করা হয়। শাহজাহানের মহলে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীর উপস্থিত থাকেন, তার পুত্র এই অনুষ্ঠানের সময় 'আমার সামনে সেই মাঙ্গলিক সন্তানকে হাজির করে এবং পঞ্চাশটা হাতি আর রত্নখচিত অলংকার আর মূল্যবান রত্ন পরিপূর্ণ বারকোশ উপঢৌকন হিসেবে পেশ করে...আমাকে নবজাতকের নামকরণ করতে অনুরোধ করে।' তিনি এই নবজাতকের নাম রাখেন আওরঙ্গজেব।

তিন মাসকাল অতিবাহিত হবার পূর্বেই, মমতাজ পুনরায় গর্ভবতী হন। মমতাজ তাদের বিয়ের প্রথম সাত বছরে সমান সংখ্যক সন্তানের জন্মদান করেছেন এবং এরপর আরো সাতটি সন্তানের তিনি জন্ম দেন। স্বামীর প্রতি তার এমন অনুরক্তি আর গর্ভবতী হবার ক্ষমতা সমসাময়িকদেরও বিস্মিত করেছে।

১৬২০ সালের মার্চ মাসে, জাহাঙ্গীর, নূর, শাহজাহান আর মমতাজ নীল ফুল আর ধূসর-গোলাপি খুবানি ফুলে ছেয়ে থাকা কাশ্মীরের উপত্যকায় এসে পৌছান। আগ্রা থেকে তাদের এখানে আসতে পাঁচ মাসের অধিক সময় লেগেছে এবং যাত্রাপথের শেষ পর্যায়গুলো জাহাঙ্গীর যাদের বর্ণনা করেছেন

'পাহাড় এবং গিরিপথ, দরী আর চড়াই উতরাই পরিপূর্ণ' ভীষণ বিপদসংকুল, এবং গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, যা আচমকাই তুষারকণায় পরিণত হয়। একটি দিন ছিল বিশেষভাবে ভয়ংকর, সংকীর্ণ পাহাড়ি পথ দিয়ে ভ্রমণের সময়, রাজপরিবারের নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী বোঝাই হাতি আর ঘোড়ার পাল যাত্রার ধকলে দুর্বল হয়ে 'মাটিতে চারপাশে আছড়ে পড়তে শুরু করে এবং সেভাবেই নিথর হয়ে পড়ে থাকে।' সেদিনই কেবল পঁচিশটা হাতি মারা যায়। সবার জন্যই অভিজ্ঞতাটা ছিল প্রাণান্তকর কিন্তু গর্ভবতী মমতাজের জন্য অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যিনি যাত্রাকালীন সময়েই ১৬১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে উম্মিদ বকশ নামে আরেকটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। (বিদেশিরা মোগল রমণীদের প্রাণশক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছেন। একজন বিদেশির ভাষ্য অনুসারে, 'তারা <মনে হয়> সন্তান জন্ম দেয়ার সময় অন্যান্য নশ্বর মানুষদের চেয়ে কম কষ্ট পায় : দিনের শেষে সন্তান জন্ম দেয়াটা তাদের জন্য মোটেই বিরল নয় এবং পরের দিন সকালেই নবজাতককে কোলে নিয়ে তারা পুনরায় যাত্রা শুরু করে।')

কিন্তু কাশ্মীরের এই স্নিগ্ধ পরিবেশে মমতাজ স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবেন, যদিও স্বপ্নসুখাচ্ছন্ন এই গ্রামীণ পরিবেশ সামান্য সময়ের জন্য বিপর্যস্ত হয় যখন ছোট্ট শাহ সুজা প্রাসাদে খেলার সময় একটি খোলা জানালা দিয়ে গলে বাইরের একটি উঁচু দেয়ালে আছড়ে পড়ে। দেয়ালের নিচে একটি ছেঁড়া তোষক আর একটি লোক বসে থাকায় ভাগ্যক্রমে এ যাত্রায় সে বেঁচে যায়। যুবরাজের মাথা তোষকে আছড়ে পড়ে আর তার দুই পা লোকটার পিঠে আঘাত করায় সে যাত্রা সে বেঁচে যায়। প্রাসাদরক্ষীদের অধিপতি 'দ্রুত দৌড়ে যায় এবং যুবরাজকে তুলে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে এবং সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে আরম্ভ করে।' বিভ্রান্ত যুবরাজ বারবার কেবল একটি কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, 'আমায় আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

ডাল হ্রদের 'স্ফটিক স্বচ্ছ' পানিতে ভাসমান *শিকারায়* রাজপরিবার অলস সময় অতিবাহিত করে আর লাল পদ্মফুল তুলে। হ্রদের পানিতে নৌকায় অলসভাবে ভেসে বেড়াবার সময় তারা স্থানীয় কৃষকদের ভাসমান দ্বীপে তাদের চাষ করা শসা আর তরমুজের যত্ন নেয়া তাকিয়ে দেখে এবং প্রথম বসন্তে জন্ম নেয়া জাফরান উৎপন্নকারী ক্ষেতের কোমল বেগুনি আভার প্রশংসা করে। প্রকৃতিপ্রেমী জাহাঙ্গীর বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত করা যায়, প্রতিটি ক্ষেত, প্রতিটি ফুলের বাগান, ফুলে ফুলে ছেয়ে রয়েছে...বেগুনি রঙের ফুলটার পাঁচটা পাপড়ি রয়েছে যার ভেতরে জাফরান উৎপাদনকারী তিনটি গর্ভমুণ্ড রয়েছে, আর সেটাই বিশুদ্ধতম জাফরান।'

কাশ্মীরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি ছন্দময়, আবেগপূর্ণ ভাষায় লেখেন :

পুষ্প উদ্যানের রূপসী নারী (ফুলগুলো) অসাধারণ
তাদের গণ্ডদ্বয় প্রদীপের ন্যায় জ্বলজ্বল করে;
তাদের বোঁটায় প্রস্ফুটিত সুগন্ধি কুঁড়ি
অনেকটা যেন প্রিয়তমের বাহুর কালো বাজুবন্ধ।
মহিমাকীর্তনে বিনিদ্র লালচে বাদামি বর্ণের নাইটিংগেল
সুরা-পানকারীদের বাসনা উস্কে দেয়;
প্রতিটি ঝরনার পানিতে হাঁসের দল মাথা ভিজিয়ে নেয়
যেন সোনালি কাঁচি রেশম কাটছে;
সদ্য ফোটা গোলাপ-কুঁড়ি আর ফুলের বাগিচায়
গোলাপের ঝাড়ে বাতাস বয়ে যায়,
পল্লীবালার চুলের বেগুনি বেণী,
ফুলের কুঁড়ি হৃদয়ে একটি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের জন্ম দেয়।

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই কাশ্মীরে উদ্যান নির্মাণ শুরু করেছিলেন এবং নতুন একটি উদ্যান নির্মাণে এবার তিনি শাহজাহানের সাহায্য কামনা করেন—ডাল হ্রদের তীরে আজ যেখানে বিখ্যাত শালিমার গার্ডেন অবস্থিত সেখানে নিচের অংশে একটি প্রমোদ কানন নির্মাণ।* যুবরাজ পরস্পর সংযুক্ত জলপ্রপাতের সারি ব্যবহার করে পাহাড়ের বরফগলা পানি একটি প্রশস্ত কেন্দ্রীয় জলের নহরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে এনে, তারপর পপলার আর চিনার গাছের সারির ভেতর দিয়ে সেই পানি এসে হ্রদের ফেলার বন্দোবস্ত করেন। জাহাঙ্গীর বিস্ময়বিমুগ্ধ ভঙ্গিতে লেখেন, তার কল্পনাশ্রয়ী ধারণাগুলো ফলে, উদ্যানগুলো কাশ্মীরের সবচেয়ে সুন্দর আর নৈসর্গিক দ্রষ্টব্যে পরিণত হয়।

এই দিনগুলো অবশ্য ছিল সম্রাট আর তার প্রিয়তম পুত্রের ভেতর অবিমিশ্র সম্প্রীতির মাঝে অতিবাহিত শেষ কয়েকটি দিন। শাহজাহান আর মমতাজকে যে শক্ত পারিবারিক বন্ধন আগলে রেখেছিল তার বুনোট আলগা হতে আরম্ভ করে। নূর শাহজাহানের সাথে নিজের ভাইঝির বিয়ের শুরুর বছরগুলোতে সব সময় চেষ্টা করেছেন তার স্বার্থ রক্ষা আর পৃষ্ঠপোষকতা করতে। তারা দুজন যখন মমতাজের পিতা, আসফ খান আর তার দাদাজান ইতিমাদ-উদ-দৌলার

---

* বাগানটার স্মৃতি–জাগানিয়া নাম ষষ্ঠ শতাব্দী এক শাসকের সময় থেকে বিদ্যমান, যিনি এখানে একটি মহল নির্মাণ করেছিলেন, যার নাম রেখেছিলেন 'শালিমার', যার মানে 'ভালোবাসার বাসস্থান'।

সাথে একত্র হন, তারা চারজন একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হয়। শাহজাহানের প্রতি সম্রাটের অনুগ্রহ বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে, জাহাঙ্গীরের ওপর নূরের নিজের নিয়ন্ত্রণও বাড়তে থাকে। জাহাঙ্গীরকে তার স্বভাবজাত আলস্য আর প্রেয়োবাদে উত্তরোত্তর আচ্ছন্ন করার পেছনে মূল কারণ ছিল সুরা আর আফিমের প্রতি তার মারাত্মক দুর্বলতা। সুরা আর মাদকের প্রভাবে জাহাঙ্গীর প্রায়ই যে অচেতন থাকতেন সেটা সমসাময়িক ভাষ্যে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। সম্রাটের অন্যতম প্রিয় সুরাপানের সঙ্গী, টমাস রো, বর্ণনা করেছেন কীভাবে রাজকীয় মন্ত্রীদের সাথে সন্ধ্যার মন্ত্রণা সভাগুলো প্রায়ই 'একটি তন্দ্রালুতার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হতো, যা বাকানলের ঘোর থেকে মহামান্য সম্রাটকে সমাবিষ্ট করে রাখত।' তিনি প্রায়ই যেখানে-সেখানে সটান শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। তার পরিচারকরা কয়েক ঘণ্টা পর তাকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক জাগিয়ে তুলত এবং খাবার নিয়ে আসত কিন্তু ভীষণ টলমলিত থাকায় যেহেতু তার পক্ষে নিজে খাওয়া অসম্ভব ছিল, 'অন্যরা তার মুখে খাবার তুলে দিত।'*

জাহাঙ্গীরকে প্রণয়জনিত কারণে নূর প্রশ্রয় দিতেন এবং তার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন। একটি ভাষ্য থেকে আমরা জানতে পারি তিনি কীভাবে তাকে বসনমুক্ত করার সময় 'তিনি যেন একটি বাচ্চা ছেলে ঠিক সেভাবে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন।' জাহাঙ্গীরের দুর্বলতা আর মাদকজনিত বিভ্রান্তি একই সময়ে নূরকে তার অবিস্মরণীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার একটি সুযোগ দান করে। তার বিয়ের সাথেই সাথেই তার ক্ষমতার আত্তীকরণ শুরু হয়েছিল। ১৬১৫ সালে স্যার টমাস রো প্রথম যখন প্রথম দরবারে আগমন করেন, তার প্রভাব তত দিনে এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি তার প্রমাণপত্রগুলো হারেমে তার কাছে পাঠাবার আদেশ দিতে পেরেছিলেন, যাতে তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সেগুলো পরীক্ষা করতে পারেন। সম্রাটের ওপর নূরের প্রভাব

---

* জাহাঙ্গীরের একারই কেবল এই মাদকাসক্তির সমস্যা ছিল না। পিটার মানডি, যিনি কয়েক বছর পরেই ভারতবর্ষে আগমন করবেন, লক্ষ্য করেছেন, 'এখানে প্রচুর পপির ক্ষেত রয়েছে, যা থেকে তার দেশের লোকেরা যাকে *আফিম* বলে সেই ওপিয়াম তারা প্রস্তুত করে, যা আরো অন্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। তারা তাদের রুটিতে বীজটা গুঁড়ো করে মিশিয়ে দেয়... খোসা পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে সেটা থেকে তারা *পোস্ত* নামে এক ধরনের সুরা প্রস্তুত করে। পানিটা চেপে আর ছেকে নিয়ে তারা এটা পান করে যা মদোন্মত্ত করে। তারা একইভাবে বিশেষ প্রজাতির একটি গাছ ভাঙ (গাঁজা) যার একই ধরনের মাদকতা সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে, আর এ জন্য তারা মাতাল লোককে সাধারণত হয় *আফিমি* (আফিম-খোর), *পোস্তি* (আফিম-মাতাল), *ভাঙ্গি* (মাদকাসক্ত) বলে...'

রো সঠিকভাবে আর দ্রুত অনুমান করতে পেরে, ইংল্যান্ডে প্রতিবেদন প্রেরণ করেন যে রাজমহিষী 'তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তার মর্জি অনুযায়ী তিনি তাকে দিয়ে যা খুশি তা-ই করাতে পারেন।' 'খোশমেজাজি আর স্বভাবত ইন্দ্রিয়পরায়ণ', জাহাঙ্গীর সাম্রাজ্য পরিচালনার ক্লান্তিকর, একঘেয়ে দায়িত্ব তার প্রাণবন্ত, যোগ্য আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্ত্রীর হাতে ক্রমেই সন্তুষ্টচিত্তে সমর্পণ করতে আরম্ভ করেন।

নূর এবার সরাসরি ক্ষমতা প্রয়োগ শুরু করেন—স্বাধীনভাবে রাজকীয় ফরমান অনুমোদন করেন এবং জাহাঙ্গীরের নামে সেগুলো জারি করার সময় রাজকীয় সিলমোহরের পাশে তার নিজের নাম, 'নূরজাহান, রানি বেগম,' যুক্ত হয়। তিনি মোগল প্রশাসনের প্রাণশক্তি হিসেবে স্বীকৃত বিভিন্ন পদে নিয়মিত নিয়োগ, পদোন্নতি আর পদভ্রংশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। একজন সমসাময়িক ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন, 'তার প্রাক্তন আর বর্তমান সমর্থকরা বেশ ভালোভাবেই পুরস্কৃত হয়েছে...সম্রাটের নিকটে অবস্থানরত বেশির ভাগ অমাত্যই তাদের পদোন্নতির জন্য তার কাছে ঋণী...ভীষণ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, কারণ সম্রাটের আদেশ বা অনুদান প্রভৃতির কার্যত কোনো নিশ্চয়তা থাকে না যতক্ষণ সেটা রানি বেগমের অনুমোদন লাভ করছে।' নূরের নামে মোহরও প্রবর্তন করা হয় এবং *শাহি, সম্রাজ্ঞী* খেতাব দ্বারা জাহাঙ্গীরের অন্য স্ত্রীদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে তাকে চিহ্নিত করা হয়। তিনি কেবল একটি অধিকারই কখনো লাভ করেননি আর সেটা হলো মসজিদে শুক্রবারের জুমার নামাজের পূর্বে সার্বভৌম ক্ষমতার বিবৃতি হিসেবে কখনো তার নামে *খুতবা* পাঠ করা হয়নি।

শাসন পদ্ধতির প্রশাসনিক পর্যেষণায় নূর তার স্বামীর প্রতিনিধিস্বরূপ যখন অংশগ্রহণ করছেন, শাহজাহান তখন জাহাঙ্গীরের সামরিক অভিযান পরিচালনায় ব্যস্ত। তাদের উভয়ের স্বার্থ কিছু সময়ের জন্য একে অপরকে সংগত করে, কিন্তু শাহজাহান একটি সময় নূরের বাড়তে থাকা কর্তৃত্ব সম্পর্কে সতর্ক হয়ে ওঠেন এবং তার অভিলাষের বিষয়ে শাহজাহান সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন। ১৬১৭ সালে ইংরেজদের বাণিজ্যিক সুবিধা দেয়ার বিষয়ে তাদের মাঝে তর্কাতর্কির সৃষ্টি হয়—তাদের ভেতরে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে মতানৈক্য প্রকাশ পায়। অবশ্য তাদের উভয়ের জন্যই এর চেয়েও অনেক বেশি গুরুতর বিষয় হিসেবে ক্রমেই সামনে এসে দাঁড়ায়, জাহাঙ্গীর যখন ইন্তেকাল করবেন তখন কী হবে? নূর তত দিনে রাজসিংহাসনের জন্য শাহজাহানের মতো বুদ্ধিমান, ক্রমেই স্বাধীনচেতা হয়ে ওঠা অভ্যর্থীর পরিবর্তে নমনীয় একজনকে খুঁজতে শুরু করেছেন—তিনি জাহাঙ্গীরের মাধ্যমে যেমন শাসনকার্য করতে পারেন তেমনি একজন লোককে খুঁজছিলেন। তার পরিবার আর

রাজসিংহাসনের ভেতরে আরেকটা বন্ধনের চেয়ে সেটা অর্জনের আর কি উত্তম পথ হতে পারে?

কোনো কোনো বিবরণ এমনটা বলতে চেষ্টা করে যে, নূর আসলে তার একমাত্র সন্তান লাডলির—তার প্রথম স্বামী শের আফগানের ঔরসজাত কন্যা—সাথে শাহজাহানের বিয়ে দেয়ার একটি চেষ্টা করেছিলেন। এটা অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে খুব একটি বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হয় না। তার ভাইঝি মমতাজ স্পষ্টত আর নিশ্চিতভাবেই শাহজাহানের প্রিয়তমা প্রধান স্ত্রী ছিলেন এবং তার গর্ভ থেকে এক ঝাঁক সন্তান জন্ম নিয়েছে, যাদের ভেতরে পুরুষ উত্তরাধিকারীও রয়েছে। নূরের প্রথম ইচ্ছা ছিল সম্ভবত এর পরিবর্তে শাহজাহানের সৎভাই যুবরাজ খসরুর সাথে লাডলির বিয়ে দেয়া। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন আংশিক দৃষ্টিশক্তির অধিকারী যুবরাজকে নিয়ন্ত্রণ করা শাহজাহানের চেয়ে অনেক বেশি সহজ হবে। কিন্তু বিয়েটা যদিও খসরুকে বন্দিদশা থেকে যেখানে তিনি বর্তমানে অন্তরীণ রয়েছেন মুক্তি দিলেও, তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ভাষ্য অনুসারে, প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পেছনে মূল কারণ ছিল স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা যে রীতিমতো জোর করে তার সাথে বন্দিদশা বরণ করেছে এবং 'অন্য যেকোনো আরাম-আয়েশের সুবিধা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে কেবল তার স্বামীর দুর্দশার সঙ্গী হবার' অভিপ্রায়ে। লাডলিকে বিয়ে করা আর সেইসাথে নিজের মুক্তি নিশ্চিত করতে তার নিঃস্বার্থ অনুরোধ সত্ত্বেও নূরের প্রস্তাব গ্রহণ না করার বিষয়ে খসরু অনড় থাকেন।

এই আলোচনা অবশ্য নূরের কৌশল সম্পর্কে শাহজাহান আর মমতাজকে সচেতন করে তোলে। ইতিমাদ-উদ-দৌলার এখন পর্যন্ত একান্নবর্তী পরিবারের মাঝে ফাটলের বিভ্রাট জন্ম নিতে শুরু করে। বতর্মান শাসকের স্ত্রী এবং যেকোনো সুনম্য যুবরাজের, যে হয়তো তার স্থলাভিষিক্ত হবে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাড়িত শাশুড়ি হিসেবে নূরের উচ্চাশা এবং ইতিমধ্যে সিংহাসনের সবচেয়ে শক্তিশালী দাবিদারের স্ত্রী আর তার একাধিক সন্তানের স্নেহময়ী জননী হিসেবে, মমতাজের অভিপ্রায়, এবার পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে অবস্থান গ্রহণ করে। নিজের আপন খালার পরিবর্তে, যিনি অচিরেই শাহজাহানের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরের শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করবেন, তার স্বামীর প্রতি ছিল মমতাজের দ্ব্যর্থহীন আনুগত্য। মমতাজের আব্বাজান আসফ খান উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে নিজেকে আরো বেশি জটিল একটি অবস্থানে নিজেকে আবিষ্কার করেন। আসফ খান তার সম্রাজ্ঞী ভগিনীর অনুগত সমর্থক আর দরবারে তার মুখপাত্র হলেও তাকে নিজের এবং তার কন্যার ভবিষ্যৎও বিবেচনা করতে হবে। বয়োবৃদ্ধ ইতিমাদ-উদ-দৌলাকে, জাহাঙ্গীরের প্রধানমন্ত্রী

হিসেবে তার আস্থার অধিকারী থাকার পাশাপাশি নিজ কন্যা আর নাতনির পরস্পরবিরোধী স্বার্থের মাঝে সংঘাত পরিহার করতে, নিজের সমস্ত দক্ষতার ব্যাপক ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।

রাজপরিবার কাশ্মীরের অবস্থান করার সময়েই এসব চাপা উত্তেজনা তীব্রভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একান্ন বছর বয়সী জাহাঙ্গীর 'শ্বাস-প্রশ্বাসের সংক্রমণে আক্রান্ত হন...বুকের বাম দিকে হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি শ্বাসনালিতে কেমন একটি পীড়িত আর সংক্রামক অনুভূতি। পুরো ব্যাপারটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে এখন প্রায় স্থায়ী রূপ ধারণ করেছে।' 'উষ্ণতাদায়ক চিকিৎসা-ক্রম' সামান্যই স্বস্তি প্রদান করতে সক্ষম হয় এবং 'আবহাওয়ায় বিদ্যমান জলকণার কারণে' সম্ভবত এই অসুস্থতা দেখা দিয়েছে এমন বদ্ধমূল ধারণা থেকে জাহাঙ্গীর কাশ্মীর ত্যাগ করে কোনো উষ্ণ আর শুষ্ক এলাকায় যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন। নূর তার স্বামীর এমন শারীরিক ভঙ্গুরতার কারণে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তিনি যদি জামাতা হিসেবে খসরুর ভূমিকা নিশ্চিত করতে না পারেন তাহলে আরেকটা সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। ১৬২০ সালের ডিসেম্বরে, সম্রাট তার পারিষদবর্গ নিয়ে সে সময় লাহোরে অবস্থান করছিলেন, নূর তার কন্যার সাথে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র অলস, আমোদপ্রিয় শাহরিয়ারের বাগদান করতে তাকে রাজি করান। নূর বিশ্বাস করেছিলেন শাহরিয়ারের পক্ষে তার কর্তৃত্ব উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। সমসাময়িক ভাষ্য অনুসারে, যদিও সে ছিল 'যুবরাজদের ভেতরে সবচেয়ে সুদর্শন' তার মাঝে 'দুর্বলচিত্ত আর জড়বুদ্ধির' সব লক্ষণই প্রকট হতে আরম্ভ করেছিল। রাজনীতির পাশাখেলায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আপাতদৃষ্টিতে তার চেয়ে আদর্শ চরিত্র আর হতে পারে না।

শাহজাহানের কাছে বিয়ের বাগদানের এই প্রস্তাবটা, যার সাথে জাহাঙ্গীরের উত্তরাধিকারী হিসেবে তার অবস্থানের প্রতি একটি পরোক্ষ হুমকি জড়িত, তার জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়ে এসে পৌঁছে। সেবারের শরৎকালে, রাজদরবারে আবারও সংবাদ এসে পৌঁছে, জাহাঙ্গীর পরবর্তী সময়ে যেমন লিখেছেন, 'শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করা দূরাত্মার দল দাক্ষিণাত্যে আবারও বিদ্রোহের নিশান উত্তোলিত করে।' বিজাপুর আর আহমেদনগরের সুলতান আর সেইসাথে তাদের নতুন মিত্র গোলকুণ্ডার সুলতান, মোগলদের সাথে তাদের সন্ধিচুক্তির সব শর্ত অস্বীকার করেন এবং বুরহানপুর আর অন্যান্য শহরে অবস্থিত রাজকীয় সেনাবাহিনীকে ৬০,০০০ সৈন্যের একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে চারপাশ থেকে অবরোধ করেন। জাহাঙ্গীর আরো একবার শাহজাহানকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন। তিনি ছিলেন স্পষ্টত, বস্তুতপক্ষে একমাত্র অবলম্বন। খসরুর যদি নিখুঁত স্বাভাবিক

দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হতো, তার ওপর আস্থা রাখাটা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ; পারভেজ যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়ে একেবারেই অযোগ্য এবং সেইসাথে সুরাসক্ততার পারিবারিক কুঅভ্যাস ভালোই রপ্ত করেছিল; অন্যদিকে সদ্যোযুবক শাহরিয়ার সামরিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ আর যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবার জন্য তার বয়সও অল্প।

নূর যখন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে ঠিক সে সময়ে দরবার থেকে হাজার মাইল দূরে যুদ্ধ করতে যাবার কোনো ইচ্ছাই শাহজাহানের ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি যখন দূরে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকবেন তখন যদি জাহাঙ্গীর মৃত্যুবরণ করেন, সিংহাসনের ওপর নিজের দাবি আরোপ করার জন্য তিনি তখন বেকায়দা একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, যেহেতু আব্বাজানের আদেশ পালন করা ভিন্ন তার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই, তিনি কেবল একটি দাবি জানাবেন। আর সেটা হলো, তার সৎভাই খসরুর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাহাঙ্গীর তাকে দেবেন, যিনি বিদ্রোহ দমন অভিযানে তার সঙ্গী হবেন। তিনি এভাবে সিংহাসনের একজন সম্ভাব্য দাবিদারকে অন্তত নজরদারির ভেতরে এবং অন্যান্য আগ্রহী গোষ্ঠীর নাগালের বাইরে রাখতে পারবেন।

জাহাঙ্গীর সম্মত হন এবং অষ্টমবারের মতো গর্ভবতী মমতাজ আর শাহজাহান সর্বাধুনিক গাদাবন্দুক সজ্জিত ১০০০ তুর্কি তবকি, ৫০,০০০ তোপচি, ধূসর হাতির বিশাল একটি বহর এবং দুরবস্থা খসরু আর তার অনুগত স্ত্রীকে সাথে নিয়ে আরো একবার দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের উদ্দেশে রওনা হন। শাহজাহান তার আব্বাজানকে আর কোনো দিন দেখতে পাবেন না, যিনি মহোল্লাসে একদা তার মাথায় সোনার মোহর বর্ষিত করেছিলেন। শাহজাহান কয়েক মাসের ভেতরেই, জাহাঙ্গীর তার রোজনামচায় ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে যেভাবে লিখেছিলেন, 'বদমাশ' হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করেন, তিনি তখন আর মোটেই বিশ্বস্ত বা প্রিয়তম নন এবং নিজের পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে ভীষণ শঙ্কিত। খসরুর সাথেও তার আব্বাজানের আর কখনো দেখা হবে না—এক বছরের ভেতরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

জ্যাকবীয় প্রতিশোধের বিয়োগান্তক নাটকের সব উপাদানই শুরু হতে যাওয়া পারিবারিক উপাখ্যানে উপস্থিত থাকবে, যার মূল কুশীলব, ভবিষ্যদ্‌দর্শী স্যার টমাস রো কর্তৃক বাছাই করা, হিসেবে আবির্ভূত হবে 'একজন মহানুভব যুবরাজ, তার পতিব্রতা পত্নী, একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা, একজন কুটিল চরিত্রের শঠ সৎমা, একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সন্তান, একজন ধূর্ত প্রিয়পাত্র...।'
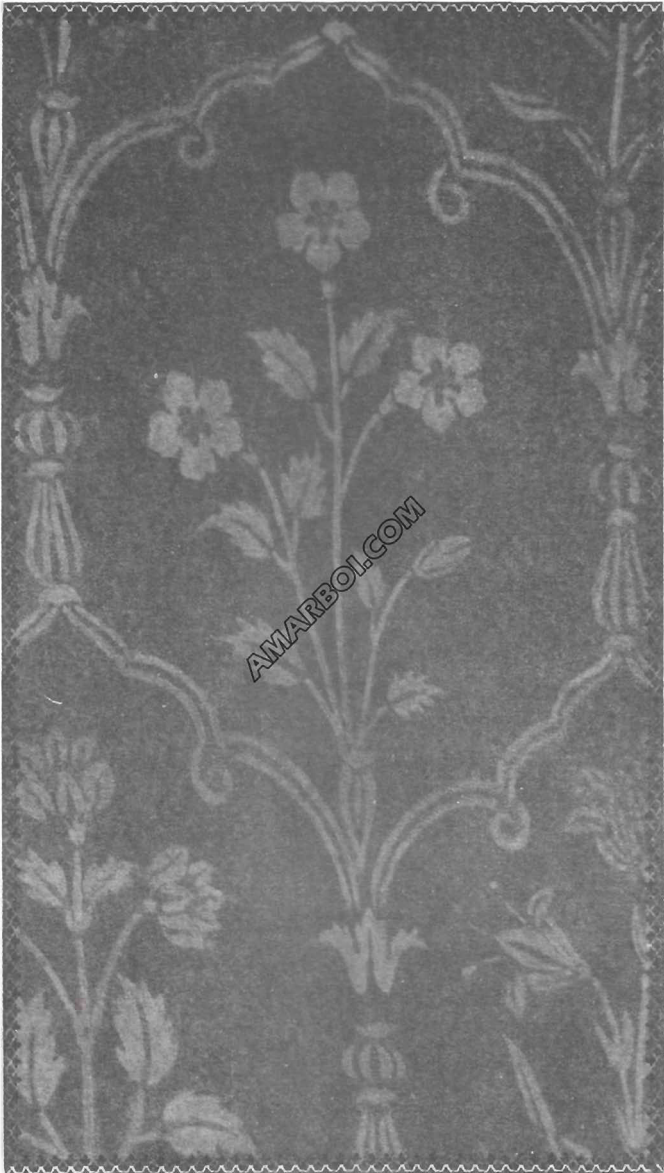
পঞ্চম অধ্যায়

পর্দার অন্তরালে অপেক্ষমাণ সম্রাট

শাহজাহান আরো একবার দাক্ষিণাত্যে তার আব্বাজানের শত্রুদের মুখোমুখি হবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হন, ছয় মাসাধিক কালব্যাপী পরিচালিত একটি অভিযানের মাধ্যমে তাদের পরাস্ত করেন এবং এবার আরো কঠোর দণ্ডাদেশ আরোপ করেন। সময় তখনো, জাহাঙ্গীর যেমন লিখেছেন, 'কৃতজ্ঞতা আর বিজয়ের' মাত্রায় সমাহিত। শাহজাহান দক্ষিণে যখন তার অবস্থান সুদৃঢ় করছের, সম্রাট তখন আগ্রায় নূর আর তার ভাই, মমতাজের পিতা কর্তৃক আয়োজিত 'রাজকীয় বিনোদন' উপভোগ করছেন, যেখানে তারা 'অনেক মূল্যবান রত্ন আর বিস্ময়ে'র উপকরণ তার সামনে উপস্থিত করেছেন। কাশ্মীরে জাহাঙ্গীর যে প্রাণান্তকর শ্বাসকষ্টের সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছিলেন সেটা এখন অনেকটাই আরোগ্য লাভ করায় এসব আয়োজন আজকাল তাকে উৎফুল্ল করে তোলে। তিনি সেইসাথে প্রকৃতির আশ্চর্য বস্তু সম্পর্কে তার নিজের পর্যালোচনা শুরু করার মতো সুস্থও হয়ে ওঠেন, জেব্রার 'চূড়ান্ত অদ্ভুত' উপস্থিতি সম্পর্কে আর বাংলা থেকে তার দরবারে উভলিঙ্গের একজন খোজা উপস্থিত হতে তিনি নিজের মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৬২১ সালের জুন মাসে, বহুদূরে দাক্ষিণাত্যের গুমোট বর্ষায় মমতাজ তাদের অষ্টম সন্তান জন্ম দেন, একটি মেয়ে সুরায়া বানু নামে যাকে সবাই চেনে। সময়টা আনন্দঘন হওয়া উচিত হলেও বহুদূরে অবস্থিত মোগল দরবার থেকে যেসব সংবাদ শাহজাহানের কানে এসে পৌঁছে তাতে তার অস্বস্তি ক্রমেই বাড়তে থাকে। তিনি জানতে পারেন, তার নবজাত কন্যা ভূমিষ্ঠ হবার কিছুদিন পূর্বেই আগ্রায় লাডলি আর শাহরিয়ারের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমাদ-উদ-দৌলার মহলে পরবর্তী সমতেয় একটি 'আনন্দের ভোজসভা'র আয়োজন করা হয়েছিল জাহাঙ্গীর যেখানে নূরের কুশলী দৃষ্টির সামনে নিজের ছোট ছেলেকে খিলাত আর খেতাবে ভরিয়ে দেন। বার্তাবাহকরা এর চেয়ে

উদ্বেগজনক সংবাদ আগ্রা থেকে বয়ে নিয়ে আসে যে, জাহাঙ্গীর পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—ভয়ংকর শ্বাসকষ্টের আক্রমণে আক্রান্ত হওয়ায় বাতাসের জন্য তাকে হাঁসফাঁস করতে দেখা গেছে। 'রোগের প্রকোপ মাত্রা ছাড়ালে' উট আর ছাগলের দুধ পান করে তিনি নিজেকে সুস্থির করতে চেষ্টা করেন এবং সেই প্রচেষ্টাও যখন ব্যর্থ হয়, হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পুনরায় সুরার কাছে ফিরে যান। খোলাখুলি তিনি স্বীকার করেন, 'আমার অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও সুরা পানের মাঝে আমি আমার উপশম খুঁজে পেয়েছি, আমি দিনের বেলায় এই আলোর শরণাপন্ন হই এবং অভ্যাসটাকে ক্রমেই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে যাই।' চারপাশে আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠার সাথে সাথে যখন তার পরিস্থিতির অবনতি হওয়া শুরু হয়, বিস্ময়ের কিছু থাকে না। উদ্বিগ্ন নূর শুশ্রূষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং 'আমার সুরাপানের মাত্রা হ্রাস করতে সচেষ্ট হয় আর আমার জন্য উপশমকারী এবং উপযুক্ত পানীয় প্রস্তুত করতে চেষ্টা করে...সে ধীরে ধীরে আমার সুরা পানের পরিমাণ কমিয়ে নিয়ে আসে এবং আমার নাগাল থেকে শিষ্টাচারবর্জিত দ্রব্য আর অনুপযুক্ত খাবার দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।'

সচরাচর মাতাল অবস্থায় থাকা পারভেজ আর চেয়ে সামান্য কম মাতাল আব্বাজানের শয্যার কাছে দৌড়ে যায় 'দায়িত্ববান আর আন্তরিক পুত্র' হিসেবে স্বীকৃতি পেতে, কিন্তু বহু মাইল দূরে দাক্ষিণাত্যে অবস্থানরত শাহজাহান আর মমতাজ উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না। রাজদরবারে এদিকে শীঘ্রই আরো পারিবারিক নাটকের দৃশ্য অভিনীত হতে শুরু করে। প্রথম দৃশ্যে, নূরের আম্মিজান, মমতাজের পিতামহী, গোলাপের আতরের সুগন্ধির আবিষ্কারক, বার্ধক্যজনিত রোগে ইন্তেকাল করেন। তিন মাস পর, সম্রাট নিজের ভগ্ন-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় যখন উত্তরের অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলের উদ্দেশে শোকার্ত নূরকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, ইতিমাদ-উদ-দৌলা, তার 'সাম্রাজ্যের স্তম্ভ', এবার অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হন। বৃদ্ধ মানুষটা তার সারা জীবনের সঙ্গী স্ত্রীকে হারিয়ে মানসিকভাবে একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন। জাহাঙ্গীর তার রোজনামচায় লিখেছেন কীভাবে 'তিনি জীবন সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হয়ে পড়ে দিন দিন সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলছিলেন!' নূরের উদ্বেগ দেখে অভিভূত হয়ে, যা 'আমি একেবারেই সহ্য করতে পারতাম না' জাহাঙ্গীর রাত জেগে তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে সঙ্গ দেন অন্যদিকে তার দরবারের বয়োজ্যেষ্ঠ অমাত্য 'নিজের মৃত্যুযন্ত্রণার মুহূর্তে' চেতন-অচেতনের মাঝে বারবার হারিয়ে যেতে থাকেন। ১৬২২ সালের জানুয়ারি মাসে, পারস্য থেকে তাদের বিপজ্জনক যাত্রায় নিজের পুরো পরিবারকে নিরাপদে পরিচালিত করার চার দশক প্রায় ৪৪ বছর পরে ইতিমাদ-উদ-দৌলা ইন্তেকাল করেন।

জাহাঙ্গীর তার মতো এমন 'আন্তরিক আর জ্ঞানী সহচর এবং বিজ্ঞ আর দক্ষ উজিরের' মৃত্যুতে যারপরনাই দুঃখিত হন। নূর স্নেহময়ী পিতার সাথে সাথে নিজের বিজ্ঞ পরামর্শদাতাকে হারাবার শোকে কাতর হন। তিনি আগ্রায় তার স্মৃতির উদ্দেশে সাদা মর্মরের একটি মকবরা তৈরির পরিকল্পনার মাঝে সান্ত্বনা খুঁজে পেলেও সেই মুহূর্তে তাকে কিছুতেই প্রবোধ দেয়া সম্ভব ছিল না। মমতাজের পিতামহ আর পিতামহীর মৃত্যুতে তার প্রতিক্রিয়ার কথা কোথাও নথিবদ্ধ হয়নি, কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই বিষণ্নতায় আক্রান্ত হবার সাথে সাথে আশঙ্কিতও হয়েছিলেন এই ভেবে যে, পরিবারের প্রধানের নিয়ন্ত্রক প্রভাব দূরীভূত হবার ফলে নূর কীভাবে এই সুযোগ গ্রহণ করবেন। নূরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর নিজের সমগ্র পরিবারের স্বার্থের মাঝে একটি ভারসাম্য আনয়নে সক্ষম এমন একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন ইতিমাদ-উদ-দৌলা। তার অবর্তমানে মমতাজের নিজের ভবিষ্যৎ আর সেইসাথে তার স্বামী এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎও এখন অনেক বেশি অনিশ্চিত হয়ে উঠবে।

ইতিমাদ-উদ-দৌলা মারা যাবার সপ্তাহখানেক পর, আরো একটি মৃত্যুসংবাদ—এবারেরটা অনেক বেশি অপ্রত্যাশিত—দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ভগ্ন-স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া জাহাঙ্গীরের রোজনামচায় একটি সাধারণ পঙ্‌ক্তি দেখতে পাওয়া যায় : 'খুররমের (শাহজাহান) কাছ থেকে পাওয়া একটি বার্তায় জানতে পারলাম যে পেটের শূল বেদনায় আক্রান্ত হয়ে খসরু মৃত্যুবরণ করেছে।' শাহজাহান তাকে যেখানে অন্তরীণ করে রেখেছিলেন সেই বুরহানপুর দুর্গেই তিনি আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুসংবাদ বহনকারী বার্তায় যদিও শাহজাহানের প্রধান অমাত্যদের সবার স্বাক্ষরই ছিল বার্তার বিষয়বস্তুর যথার্থতা নিশ্চিত করতে, খসরুর মৃত্যুর সময়টা, ঠিক যখন জাহাঙ্গীরের নিজের বেঁচে থাকার বিষয়টিই সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে সেই মুহূর্তে খসরুর মৃত্যুটা বিস্ময়ক বস্তুতপক্ষে অমঙ্গলসূচক। মোগল দরবারে সেই মুহূর্তে উপস্থিত সব ভিনদেশি অতিথি কার্যত একটিই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, শাহজাহান সিংহাসনের জন্য আসন্ন হয়ে ওঠা লড়াইয়ের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে নিজের ছত্রিশ বছর বয়সী সৎভাই খসরুকে হত্যা করেছেন।

অভিযোগটা বাতাসে ভাসতেই থাকে। কয়েক বছর পর এক অগাস্টিনিয়ান ভিক্ষু লিখিত একটি রোমাঞ্চকর বিস্তারিত বর্ণনা পুরো বিষয়টির প্রতীকস্বরূপ বিবেচনা করা যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন শাহজাহান কীভাবে, 'এই বর্বরোচিত পরিকল্পনার মূল রচয়িতা আর বাস্তবায়নকারী' খসরুকে হত্যা করার জন্য এক ক্রীতদাসকে আদেশ দিয়ে নিজের জন্য অন্যতস্থতা তৈরির উদ্দেশে 'শিকারের অজুহাত দেখিয়ে' তিনি ঘটনাস্থল থেকে দূরে চলে যান : 'আমাদের এই হন্তারক কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে গভীর রাতে যুবরাজের কামরায় এসে উপস্থিত

হয়। যুবরাজকে বিভ্রান্ত করতে সে দরজায় এমনভাবে করাঘাত করে, কথা বলে যে সে তার আব্বাজানের কাছ থেকে তার জন্য বার্তা নিয়ে এসেছে এবং কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ, যা মোগল সম্রাটদের অপরাধ মার্জনা এবং ক্ষমাশীলতা প্রদর্শনের উদ্দেশে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ইঙ্গিতবহ। হতভাগ্য যুবরাজ এই আনন্দদায়ক সংবাদ শুনে, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো আসলে কী অশুভ সংবাদ নিয়ে এসেছে সে সম্বন্ধে একেবারেই অসন্দিগ্ধ হয়ে কক্ষের দরজা খুলে দেয় নিজের আকস্মিক মৃত্যুকে বরণ করতে। হন্তারকের দল কক্ষে প্রবেশ করেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার মুখাবরোধ করে এবং তার গলায় দড়ি পরিয়ে দিয়ে তার শ্বাস রোধ করে। খসরু মারা গেলে তারা তার মৃতদেহটা শয্যার ওপর শুইয়ে দেয় এবং মৃতদেহটা সেখানেই রেখে তারা চলে যায় আর যাবার সময় কক্ষের দরজা বাইরে থেকে যত্নের সাথে এবং শক্ত করে এমনভাবে আটকে দিয়ে যায় যেন তারা কিছুই করেনি।' আরেকটা ইউরোপীয় ভাষ্য অনুসারে, খসরুর পতিব্রতা স্ত্রী কয়েক ঘণ্টা পর তার কক্ষে প্রবেশ করেন : '...তার স্বামী নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছে বলে মনে করে। তাকে নড়াচড়া করতে না দেখে সে তার মুখে হাত দেয় এবং তখনই কেবল বুঝতে পারে তার দেহে প্রাণ নেই এবং শীতল। খসরুর স্ত্রী চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বাইরে বের হয়ে আসে...।'

মানডির করা ভ্রমণরত মোগল রমণীর স্কেচ।
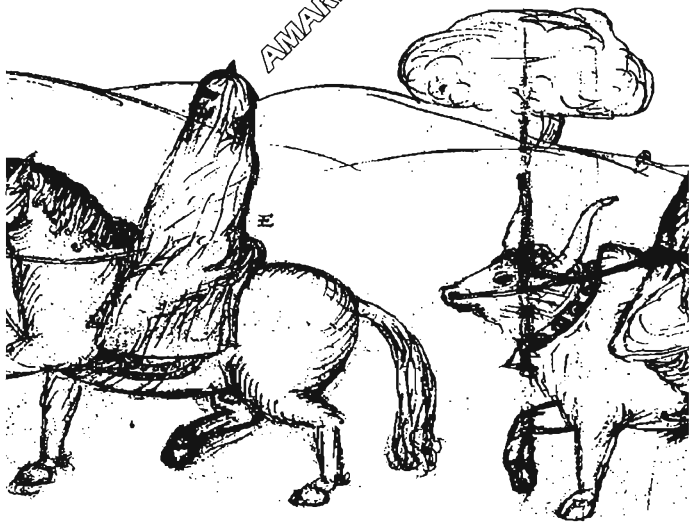
শাহজাহানের নিজস্ব ঐতিহাসিকদের একজন নিতান্তই সাদামাটাভাবে লিখেছেন, 'খসরু অস্তিত্বের পিঞ্জর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এর পরিবর্তে অনস্তিত্বের কারাগারে অন্তরীণ হন।' এক মোগল ঐতিহাসিক, শাহজাহানের জীবদ্দশায় শেষ দিকে লিখেছেন, তিনিও শাহজাহানকে দায়ী মনে করতেন, যদিও তিনি অনেক জোরালভাবে দাবি করেছেন যে, সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য খসরুর মৃত্যুটা ছিল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। বাস্তবিক প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন, খসরু সন্দেহাতীতভাবে খুনই হয়েছিলেন, খুব সম্ভবত নিজের ভাইয়ের হাতেই। শাহজাহান পূর্বেও বেশ কয়েকবার খসরুর তত্ত্বধানের দায়িত্ব লাভ করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু প্রতিবারই জাহাঙ্গীর বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি এবার কেবল সম্মত হয়েছিলেন যার কারণ হয় তিনি মাতাল ছিলেন, কিছু ভাষ্যে যেমন দাবি করা হয়ে থাকে, শাহজাহান যখন তাকে অনুরোধ করেছিলেন বা দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমন করতে শাহজাহানকে তার প্রয়োজন ছিল এবং তিনি তাকে খুশি করতে চেয়েছিলেন। নূর সম্ভবত জাহাঙ্গীরের সম্মতি আদায়ের ব্যাপারে একটি ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার মনোযোগ যেহেতু খসরুর ওপর থেকে শাহরিয়ারের দিকে পরিবর্তিত হয়েছে, সেহেতু খসরু আর শাহজাহান উভয়কে দরবার আর তাদের আব্বাজানের কাছ থেকে বিতাড়িত করার এটা একটি মোক্ষম সুযোগ বলে অবশ্যই তার মনে হয়েছিল।

খসরুকে, যে ক্ষীণদৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সম্রাটের জ্যেষ্ঠ সন্তান আর তার একদল অনুগত সমর্থক থাকায়, শাহজাহানের অবশ্যই খুন করার সংগত কারণ ছিল। সর্বোপরি, খানিকটা জড়বুদ্ধির শাহরিয়ার আর মাতাল পারভেজের চেয়ে তার দক্ষতা অনেক বেশি ছিল। তার মৃত্যুতে, আর কিছু না হোক, শাহজাহানের অন্তত সুবিধাই হয়েছিল। পরিবারের অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরবর্তী সময়ে নির্মমভাবে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেয়ার সাথে খসরুর মর্মান্তিক পরিণতির একটি মিল রয়েছে। খসরুকে হত্যার আদেশ দান করে, অবশ্য শাহজাহান এমন একটি অনৈতিক কাজ করেছিলেন যা তার রাজত্বকালের পুরো সময়টায় তাকে তাড়িয়ে বেড়াবে এবং তার সন্তানের মাঝে রক্তাক্ত একটি নজিরের জন্ম দেবে। প্রথমদিকের সহানুভূতিহীন এক ভাষ্যকার বিষয়টি এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তিনি ছিলেন 'ভাইয়ের রক্তের মাঝে তিনি নিজের সিংহাসনের ভিত রোপণ করেছেন।'

খসরুর আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে শাহজাহানের ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে থাকা জাহাঙ্গীর, নিজেও মেনে নিয়েছিলেন। সমসাময়িক ভাষ্য পাঠ করে অবশ্য মনে হয় যে, অজ্ঞাতনামা এক মোগল অমাত্যের কাছ থেকে প্রেরিত একটি বার্তা, যিনি ঘটনার সময় বুরহানপুরে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন এবং বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর ব্যাপারটা পূর্বপরিকল্পিত, তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ঘটায়। সম্রাট বুরহানপুরের অভিজাতদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বার্তা প্রেরণ করেন, 'সত্যি ঘটনাটা তারা কেন তাকে জানাতে ব্যর্থ হয়েছে সেটা এবং সেইসাথে তার সন্তানের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে নাকি অন্য কেউ তাকে খুন করেছে অনুসন্ধান করে দেখেন।' তিনি খসরুর শবদেহ কবর থেকে উত্তোলন করে এলাহাবাদে উদ্যান পরিবেষ্টিত খসরুর আম্মিজানের মকবরায় পুনরায় সমাধিস্থ করার আদেশ দেন। তিনি সেইসাথে খসরুর বিধবা পত্নী আর এতিম সন্তানকে হেফাজতের জন্য তখন লাহোরে অবস্থিত রাজদরবারে প্রেরণের আদেশ দেন।

জাহাঙ্গীর অবশ্য শীঘ্রই আরো বিশাল বিপর্যয়ের মুখোমুখি হন, যা ভ্রাতৃহন্তার মতো বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য তাকে সামান্যই অবকাশ দেয়। তার কাছে সংবাদ পৌঁছায় যে, পুনর্জায়মান পারস্যের সম্রাট, শাহ আব্বাস কাবুলের ৩০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি সীমান্ত চৌকি কান্দাহার অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন এবং সেখানের নিরাপত্তার দায়িত্বে অপর্যাপ্ত একটি সৈন্যবাহিনী রয়েছে। হুমায়ুন তার সিংহাসন পুনরুদ্ধারে শাহের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে ১৫৪৫ সালে শহরটা তাকে উপহার দেয়ার পর থেকেই এটা দুই সাম্রাজ্যের ভেতরে বিরোধের একটি উৎসে পরিণত হয়েছে। শহরটা এরপর চারবার হাতবদল হয়েছে। মালিকানার সত্যিকারের গুরুত্বের চেয়ে নীতিগত

ভাবনা জোরাল হয়ে উঠেছে। কাবুল একটি সময়ে ভারতবর্ষের বাণিজ্য পথের ওপর অবস্থিত সম্পদশালী একটি আড়ত হিসেবে বিবেচিত হলেও, পরবর্তীকালে বণিক আর তীর্থযাত্রীর দল সমুদ্রপথ বেছে নেয়ায় এর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। জাহাঙ্গীর তা সত্ত্বেও শহরটার দখল বজায় রাখার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, বিশেষভাবে তার ভয় শহরটার করায়ত্তকরণ তার সাম্রাজ্যে পারস্যের অধিক্রমের হয়তো একটি ইঙ্গিত। তিনি 'যুদ্ধাস্ত্র আর অন্যান্য উপকরণ, অর্থ, হাতি, কামান, গোলন্দাজ' বিশিষ্ট বিশাল একটি বাহিনী সমবেত করেন এবং ১৬২২ সালের মার্চ মাসে এর সাথে যোগ দিতে শাহজাহান আর তার অধীনস্থ বাহিনীকে দাক্ষিণাত্য থেকে আসতে আদেশ করেন।

শাহজাহান আর মমতাজের জন্য কঠিন আর অরুন্তুদ একটি সময়ে এই আদেশ এসে পৌঁছে। দুই বছর পূর্বে 'ভূস্বর্গ-সদৃশ্য কাশ্মীর' অভিমুখী পার্বত্য পথে ভূমিষ্ঠ হওয়া তাদের পুত্র উমাইদ বখশ, মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে 'আদি-অন্তহীন পৃথিবীর উদ্দেশে যাত্রা করেছে', বাচ্চা ছেলেটার মৃত্যু সংবাদ নথিবদ্ধ করার সময় দিনপঞ্জির রচয়িতারা সুললিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। সে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া তাদের দ্বিতীয় সন্তান। শাহজাহান তা সত্ত্বেও নিজের বাহিনীর পুরোভাগে অবস্থান করে রওনা দেন, সাথে রয়েছেন শোকার্ত আর আবারও গর্ভবতী মমতাজ বরাবরের মতোই অনুগতভাবে পরিবারের অন্য মেয়েদের সাথে পর্দা ঘেরা হাওদা, গরুর গাড়ি বা উটের হাড় বের হয়ে থাকা পাঁজরের পাশে ঝুঁড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় অনুসরণ করছেন। তিনি বুরহানপুরের ১০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মানডুর পাহাড় দুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হন, কিন্তু তার পরই যাত্রা বিরতি করেন। তিনি তার আব্বাজানকে অজুহাত দেন, বর্ষাকাল অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে চান। জাহাঙ্গীর নিজেই একবার লিখেছিলেন, 'বর্ষাকালে এই দুর্গের মতো আর কোথাও তাজা বাতাস আর মনোরম পরিবেশযুক্ত স্থান নেই' সেইসাথে রয়েছে বিশালাকৃতির হ্রদ দ্বারা চারপাশের আলো-বাতাসপূর্ণ ভবনগুলো। শাহজাহান অবশ্য এই ক্ষণটি পছন্দ করেছিলেন জাহাঙ্গীরের কাছে একাধিক দাবি পেশ করতে। কান্দাহার অভিযানের একক নেতৃত্ব তিনি তার ওপর অর্পণ করতে বলেন এবং পাঞ্জাবের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিতে বলেন। তিনি জানান, কান্দাহার অভিমুখে তিনি অগ্রসর হবার সময় জায়গাটা তার পেছনে অবস্থান করবে। তার কাছে এসবের ভেতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভবত, পঞ্চাশ বছর পূর্বে আকবর কর্তৃক দখলকৃত, রাজস্থানের রণথম্ভোরের বিশাল রাজপুত দুর্গটা, যা তিনি মমতাজ আর তাদের সন্তানদের নিরাপদ হেফাজতের জন্য দাবি করেন।

শাহজাহানের শর্তগুলোর ভেতরেই তার বিশ্বাস প্রতিফলিত হয় যে, দরবারে তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে। তার অর্জিত বিজয়কে বিশিষ্ট করতে কোনো নতুন সম্মান বা খেতাব—হয় রূপকবর্জিত বা রূপকাশ্রয়ী—তার ওপর চাপিয়ে

দেয়া হয়নি। কিংবা তার আব্বাজানের পাশে তাকে ডেকেও পাঠানো হয়নি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, দাক্ষিণাত্যে তিনি এত দিন ধরে ক্ষমতার যে বুনিয়াদ সুদৃঢ় করেছিলেন কান্দাহার অভিমুখে দীর্ঘ যাত্রা তাকে সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এবং তাকে আক্রম্য করে তুলবে। একই সাথে এটা কোনোভাবেই তার নজর এড়িয়ে যাবার কথা নয় যে, নূরের অবস্থানের ক্ষমতা আরো অধিকতর বর্ধিত করা হয়েছে। জাহাঙ্গীর তাকে তার মরহুম আব্বাজানের সমুদয় অর্থ আর জমি উপহার দিয়ে, প্রচলিত প্রথা উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রথা অনুসারে এমন সম্পদসমূহ সাম্রাজ্যের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়, যাতে করে মরহুমের পরিবারের সকল সদস্যের ভেতর সম্রাটের মর্জিমাফিক সেগুলোর বিলি-বণ্টন করা যায়। তদপেক্ষা ইঙ্গিতপূর্ণ, দরবারের আনুষ্ঠানিকতায় জাহাঙ্গীর যখন তার নিজের ঢাক বাজাবার অব্যবহিত পরেই তার ঢাক বাজাবার আদেশ দেন। শাহজাহানের কাছে এটা অবশ্যই মনে হতে পারে যে, মমতাজকে পাশে নিয়ে তিনি যখন দূরবর্তী একটি অভিযান থেকে পরবর্তী অভিযানের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তার দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফায়দা নিয়ে নূর লাভবান হচ্ছেন, সরকারের ওপর তিনি তার ইতিমধ্যে শক্তিশালী হয়ে ওঠা নিয়ন্ত্রণ আরো শক্ত করছেন। পরবর্তী সময়ে, শাহজাহান যখন সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হন, তার আনুষ্ঠানিক দিনপঞ্জি রচয়িতারা সম্রাটের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবার জন্য দরবারের অমাত্যদের দায়ী করেছেন, 'যাদের সততার মোহরে খাদ রয়েছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে তারা ঈর্ষার নিপীড়নে জর্জরিত' এবং যারা জাহাঙ্গীরকে তার পুত্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সেইসাথে প্রকুপিত করেছে 'চক্রান্ত আর বিশৃঙ্খলার আগুন, যা পরবর্তী চার বা পাঁচ বছর হিন্দুস্তানে জ্বলতে থাকে।' লেখক যদিও কোনো নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু তিনি স্পষ্টতই নূর আর তার অনুগত চক্রান্তকারী গোষ্ঠীর কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। শাহজাহানের অনুরোধের প্রতি জাহাঙ্গীরের উত্তর, নূরের ইন্ধনে সন্দেহ নেই, ছিল অকরুণ। 'তার প্রতিবেদন পাঠ করে, আমার প্রতিবেদনের অর্ন্তনিহিত অর্থের রচনাশৈলী বা সেখানে পেশ করা তার অনুরোধ পছন্দ হয়নি এবং অন্যদিকে সেখানে অসম্মানের ইঙ্গিত স্পষ্ট...' তিনি লেখেন। নূর এবং শাহরিয়ারকে দেয়া ভূসম্পত্তি শাহজাহান কর্তৃক জব্দ করার সংবাদ জানতে পেরে জাহাঙ্গীর আরো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং শাহরিয়ারের আর তার লোকেরা এমনভাবে প্রকাশ্যে ঝগড়া করে, যার ফলে 'উভয় পক্ষের অনেকেই নিহত হয়েছে।' তার পুত্রের 'মন বিকৃতির শিকার' হয়েছে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে সম্রাট 'তার কাছে তাকে আসতে নিষেধ করেন, কিন্তু কান্দাহারের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় তার কাছ থেকে যা চাওয়া হবে সেই পরিমাণ সৈন্য প্রেরণের আদেশ দেন। আমার আদেশের অন্যথা যদি সে করে তাহলে পরে তাকে এ জন্য অনুতপ্ত হতে হবে।' বিক্ষুব্ধ আর খিটখিটে মেজাজে, জাহাঙ্গীর পাঁচ বছর পূর্বে শাহজাহানের ছেলে শাহ সুজার ভীষণ অসুস্থতার সময় সুজার সুস্থতার পরিবর্তে তিনি শিকার ছেড়ে দেয়ার যে শপথ করেছিলেন সেটা ত্যাগ করে, লেখেন,

'(শাহজাহানের) নির্দয় আচরণ আমাকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে, আমি আবার বন্দুকের সাথে সখ্য আরম্ভ করি।' ১৬২২ সালের আগস্ট মাসে কান্দাহার অভিযানের নেতৃত্ব 'আমার প্রিয়পুত্র' শাহরিয়ারকে অর্পণের সিদ্ধান্ত ছিল তার অসন্তোষের আরো মারাত্মক ইঙ্গিতবহ। উৎফুল্ল নূর সেদিনই এক জোড়া 'অমূল্য' তুর্কি মোতি তার স্বামীকে উপহার দেন। সিংহাসনের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীর ঐতিহ্যবাহী জায়গির, হিসার ফিরোজও, যা চৌদ্দ বছর পূর্বে জাহাঙ্গীর পুত্র শাহজাহানকে প্রদান করেছিলেন, তার কনিষ্ঠ পুত্রকে অর্পণ করেন। সম্রাটের অভিপ্রায়ের এর চেয়ে স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ আর হতে পারে না। শাহজাহান নিজের সীমা অতিক্রম করার বিষয়ে নির্ভুলভাবে আঁচ করতে পেরে তার আব্বাজানের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে বুঝতে পেরে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। জাহাঙ্গীর লেখেন, 'আমি তাকে কোনো গুরুত্বই দিই না এবং তাকে কোনো ধরনের অনুগ্রহও দেখাই না।' বহু বছর পূর্বে খসরুর বিরুদ্ধে তিনি যেমন নিজের মনকে শক্ত করে ফেলেছিলেন, তিনি এবার তেমনই তার পুত্রদের ভেতরে সবচেয়ে প্রতিভাবান আর একদা সবচেয়ে প্রিয়তম পুত্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। দুর্দৈব-নির্ধারিতই বোধ হয়, তিনি তার আব্বাজান, আকবরের বিরুদ্ধে নিজের বিদ্রোহ মঞ্চায়িত করেছিলেন শাহজাহানের এখন প্রায় সেই বয়স—ত্রিশ বছর। এই বিষয়টি সম্ভবত তারও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।
১৬২২ সালের শেষ দিকে মমতাজ একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন কিন্তু নামকরণ করার সুযোগ পাবার পূর্বেই নবজাতক শিশুটি মৃত্যুবরণ করে। সন্তান মৃত্যুজনিত বিষাদ এবং তিনি যদি নিশ্চায়ক কোনো পদক্ষেপ না নেন তাহলে তার পরিবারের কী হবে সে সম্বন্ধে ক্রমেই বাড়তে থাকা ভয়, সম্ভবত শাহজাহানের পরবর্তী পদক্ষেপের পেছনে কাজ করেছে—প্রকাশ্য বিদ্রোহ। বিদ্রোহ একটি বিপজ্জনক যুদ্ধকৌশল যা সর্তক চিন্তাভাবনা ছাড়া তিনি হয়তো প্রয়োগ করতেন না, কিন্তু শাহজাহান জানতেন তার আব্বাজানের ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে এবং তার নিজের মতো আরো অনেকেই সম্রাটের ওপর নূরের প্রভাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং তার অনুকূলে সমর্থন ঘোষণা করতে হয়তো বাধ্য হবেন। তিনি একই সাথে নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, দাক্ষিণাত্য আর গুজরাটের, তিনি সেখানকার সুবেদার, আমির আর ওমরাহদের আনুগত্যের ওপর নির্ভর করতে পারেন। ১৬২৩ সালের জানুয়ারি মাসে শাহজাহান অবশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মমতাজ আর তাদের সন্তানদের এবং সমর্থকদের একটি বাহিনী নিয়ে মানডু থেকে উত্তর দিকে আগ্রার উদ্দেশে রওনা দেন। বিদ্রোহের জন্য তহবিল প্রয়োজন আর কান্দাহার অভিযান অর্থায়ন করতে আগ্রা দুর্গ থেকে লাহোরে রাজকীয় তহবিল প্রেরণের যে সংবাদ তার গুপ্তচররা নিয়ে এসেছিল তার অভিপ্রায় হলো সেই তহবিল দখল করা। কিছু ভাষ্য অনুসারে, মমতাজের আব্বাজান, আসফ খানই ছিলেন সংবাদদাতা, যিনি গোপনে তহবিল চালানের বিষয়টি সম্বন্ধে তাকে অবহিত করেছিলেন।

আসফ খান নিশ্চিতভাবেই বাড়তে থাকা উদ্বেগের সাথে ঘটনাবলির ওপর নজর রাখছিলেন। তিনি তার আব্বাজানের সম্পদের কিছুই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেননি—তার ভগিনী নূর সব কিছু পেয়েছেন। আরো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, জাহাঙ্গীরের প্রশ্রয়ের বলয় থেকে তার জামাতাকে নিজের জামাতার দ্বারা উচ্ছেদ করতে নূরের নির্লজ্জ কৌশল প্রয়োগের অর্থ একটিই যে তার প্রিয়তমা কন্যা মমতাজ নন বরং তার মেয়ে লাডলিই সম্রাজ্ঞী হবেন। আসফ খান অনেক বেশি দক্ষ আর কুশলী অমাত্য হবার কারণে তখনই প্রকাশ্যে বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকেন, কিন্তু পরবর্তী সম্রাট হিসেবে তিনি যে যুবরাজকে দেখতে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী তাকে খানিকটা গোপন সহায়তা প্রদান করাই তার কাছে সম্ভবত বিচক্ষণ মনে হয়েছে।

রাজকীয় তহবিল প্রেরণের সংবাদ যে শাহজাহান জানতে পেরেছেন এবং আগ্রা অভিমুখে এগিয়ে আসছেন সেই সংবাদ জাহাঙ্গীরকে আরো ক্রুদ্ধ করে তোলে যিনি ঘোষণা করেন যে তার বিদ্রোহী সন্তান 'সর্বনাশের পথে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে।' 'তার মনে লোভের আগুন জ্বলে উঠেছে', তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন এবং তিনি 'তার হাত থেকে আত্মসংযমের লাগাম পড়ে যেতে দিয়েছে।' জাহাঙ্গীর তাকে মোকাবিলা করতে দক্ষিণ দিকে বাঁক নেন, 'কান্দাহারের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম' বাতিল করেন, যা গত জুনেই চিঠি চালাচালির মাধ্যমে, যেভাবেই হোক শাহ আব্বাসের দখলে চলে গেছে। জাহাঙ্গীর প্রথাগত শিষ্টাচারের বাড়াবাড়িতে ভরা একটি বার্তায় শাহকে 'সিদ্ধত্বলাভ আর ভাবীকথনের চমৎকার পরিচর্যাকারী' বলে সম্বোধন করেন কিন্তু পুরো চিঠিতে সূক্ষ্ম অপমানের হুল মিশিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে বোঝাতে চান তিনি লোভী আর ধনসম্পদ আঁকড়ে ধরতে উদগ্রীব। জাহাঙ্গীর শাহ আব্বাসকে প্রশ্ন করেন, কেন তিনি কান্দাহারের মতো 'নগণ্য একটি গ্রামে' গেছেন? নিশ্চিতভাবেই এটা তার মর্যাদার সাথে মানানসই নয়।

'আমার নিজের দুর্ভোগের কথা আমি আর কী বলব?' জাহাঙ্গীর তার পথভ্রষ্ট সন্তানকে শায়েস্তা করতে রওনা দেয়ার সময় রোজনামচায় অভিযোগ লিখে রাখেন। 'যন্ত্রণা আর দুর্বলতার মাঝে, উষ্ণ আবহাওয়ায় যা আমার স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণভাবে অনুপযুক্ত, আমাকে এর পরও অবশ্যই ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে এবং সক্ষম থাকতে হবে আর এভাবেই এমন অবাধ্য পুত্রের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে হবে।' তিনি আদেশ দেন, শাহজাহানকে এখন থেকে *বা-দৌলত*—'বদমাশ'—বলে সম্বোধন করা হবে এবং তার পুত্রের অকৃতজ্ঞতার জন্য তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন : 'তাকে প্রদর্শিত অনুগ্রহ আর সহানুভূতি বিবেচনা করে আমি বলতে পারি, আজ পর্যন্ত কোনো সম্রাট তার পুত্রকে এত কিছু দেননি।'

জাহাঙ্গীর আগ্রায় শাহজাহানের আক্রমণ সময়মতো প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন। তার ছেলে শহরে লুটতরাজ করে কিন্তু দুর্গ কিংবা কান্দাহার অভিযানে প্রেরণের জন্য অপেক্ষমাণ তহবিল দখল করার প্রয়াস সফল হয় না। জাহাঙ্গীরের

মন্ত্রীবর্গ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে দুর্গ থেকে অর্থ তহবিল প্রেরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারা এর পরিবর্তে দুর্গের লাল পাথরের বুরুজগুলো আর পুরু তোরণদ্বারের শক্তি বৃদ্ধি করার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন, যা আক্রমণ প্রতিহত করতে তাদের সাহায্য করবে। শাহজাহান সাফল্যের অভাবে আশাহত হলেও হতোদ্যম না হয়ে তার বাহিনীকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে উত্তরে দিল্লি অভিমুখে পরিচালিত করেন জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে আগুয়ান রাজকীয় বাহিনীকে মোকাবেলা করতে। অনেকেই তখনো বিদ্রোহের সমীপরেখায় দ্বিধাদ্বন্দ্বে দুলতে থাকে, তরুণ আর তেজস্বী শাহজাহান তার বর্ষীয়ান পিতার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবেন বলেই যেন প্রতীয়মান হয়।

১৬২৩ সালের ২৯ মার্চ, দুই বাহিনীর, ৫০,০০০-এর অধিক হবে সম্মিলিত জনবল, করকটে ঝোপ আর পাথর পড়ে থাকা নিচু আর মরুময় পাহাড় দ্বারা বৃত্তাবদ্ধ অনুর্বর সমভূমির মাঝে সংঘর্ষ হয়। শাহজাহান কিংবা অসুস্থ জাহাঙ্গীর দুজনেই ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া থেকে বিরত থাকেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সামনের দিকে অবস্থানরত জাহাঙ্গীরের বাহিনীর অধিপতি স্বপক্ষ ত্যাগ করে ১০,০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে তার সাথে যোগ দেয়ার ঘটনা সত্ত্বেও শাহজাহানের বাহিনী প্রত্যাশার বিপরীতে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং তার সেনাপতিদের অনেকেই নিহত হন। অদৃষ্টের পরিহাস, রাজকীয় বাহিনীর একটি অংশের নেতৃত্বে ছিলেন আসফ খান কিন্তু জাহাঙ্গীর সেদিন বীরত্বের জন্য যাদের পুরস্কৃত করেছিলেন তাঁদের ভেতর তিনি ছিলেন না। সম্রাট হয়তো ইতিমধ্যে আসফ খানের সত্যিকারের আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহের কারণে বিব্রতবোধ করতে শুরু করেছিলেন।

রাজস্থানের ভেতর দিয়ে শাহজাহান আর মমতাজ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পালিয়ে যান, মেওয়ারের (উদয়পুর) নতুন রানা করণ সিংয়ের কাছে, সেই বন্য পাহাড়ি বালক, শাহজাহান তার পিতাকে পরাস্ত করার পর নয় বছর পূর্বে যার দরবারে আগমন জাহাঙ্গীরকে দারুণ আনন্দ দিয়েছিল। তারা অস্থায়ী একটি আশ্রয়স্থল খুঁজে পান। তরুণ রানা, দরবারে অবস্থানের সময় শাহজাহানের সাথে যার সখ্য গড়ে উঠেছিল, চার মাসের জন্য তার অতিথিদের একটি চমৎকার গম্বুজবিশিষ্ট মর্মরের মহল—গুল মহল—থাকতে দেন, যা তিনি সম্প্রতি উদয়পুরে ঝিকমিক করতে থাকা স্বচ্ছ পানির হ্রদে অবস্থিত দ্বীপে নির্মাণ করেছিলেন। শাহজাহান, মমতাজ আর তাদের ছয় সন্তান সেখান থেকে চারপাশের পর্বতের দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং গ্রীষ্মের উত্তাপ যখন তীব্রতর হচ্ছিল তখন খানিকটা হলেও স্বস্তি খুঁজে পান।

লৌকিকতার স্বার্থে, ১৬২৩ সালের মে মাসে, জাহাঙ্গীর শাহজাহানের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের দায়িত্ব তার দ্বিতীয় পুত্র পারভেজের ওপর ন্যস্ত করেন, কিন্তু এর আসল সেনাপতি ছিলেন তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত আর ছেলেবেলার বন্ধু মহবত খান, যিনি শাহজাহানেরও শিক্ষক ছিলেন এবং মোগল দরবারে সমৃদ্ধি লাভকারী পারস্যের আরেকটা পরিবারের সদস্য। জাহাঙ্গীরের আদেশ ছিল অল্প কথায় নির্মম। শাহজাহানকে ধাওয়া করবেন মহবত খান এবং তাকে জীবিত

অবস্থায় বন্দি করবেন বা সেটা করা যদি কঠিন হয় তাহলে তাকে হত্যা করবেন।

অবশ্য নূর ছিলেন শাহজাহান আর মমতাজের সবচেয়ে বিপজ্জনক আর কৃতসংকল্প প্রতিপক্ষ। নূর যদিও তার আব্বাজানের পরামর্শ থেকে বঞ্চিত এবং তার ভাই আসফ খানের আনুগত্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি লাভ করলে তিনি জাহাঙ্গীরের অখণ্ড আস্থা আর অনুরক্তি লাভ করেন। নূরের বয়স তখন চল্লিশের কোটার শেষের দিকে। এক ইংরেজ পর্যটক লক্ষ করেছেন, 'সম্রাট আর তার অমাত্যরা নিজেদের রমণীদের যত্ন নেন, কিন্তু তাদের বয়স ত্রিশ অতিক্রম করার পর এতে খুব সামান্য লাভ হয়', সেখানে সম্রাটের ওপর তার প্রভাব সত্যিই লক্ষ্যণীয় এবং তার সৌন্দর্যের দীপ্তির সাথে তার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণীয়, বুদ্ধিদীপ্ত ও ঋজু বৈশিষ্ট্য এ জন্য দায়ী। তিনি বস্তুতপক্ষে সেই বছরের সেপ্টেম্বরে দাদি হন সুদর্শন কিন্তু জড়বুদ্ধির শাহরিয়ার আর তার কন্যা লাডলি যখন একটি কন্যার জন্ম দেন। নাতনি জন্মগ্রহণ করার ফলে কোনো সন্দেহ নেই শাসন করার আকাঙ্ক্ষা তার আরো জোরাল হয়েছিল।

জাহাঙ্গীরের বাড়তে থাকা শারীরিক দুর্বলতার ফলে নতুন ক্ষমতা লাভ করা নূরের জন্য সহজ হয়েছিল। নিজের রোজনামচা নিয়মিত লেখাই যখন তার কাছে রীতিমতো কঠিন হয়ে উঠেছিল সেই সময় নূর তার দায়িত্বের বোঝা গ্রহণ করায় তিনি তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি স্বীকার করেছেন, 'দুই বছর পূর্বে শুরু হওয়া অসুস্থতা এবং যা এখনো ঠিক হয়নি, আবেগ আর বুদ্ধি ঠিকমতো সমন্বয় হয় না। আমি এখন আর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আর তার প্রতিক্রিয়া ঠিকমতো মনে রাখতে পারি না।' তিনি তার এক অমাত্য মুতামদ খানকে যে 'আমার মেজাজের সাথে পরিচিত এবং আমার কথা বুঝতে পারে' আদেশ করেন এখন থেকে সে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির নথি রাখবেন এবং সাব্যস্ত করণের জন্য তার কাছে জমা দেবেন। ১৬২৩ সালের গ্রীষ্মে জাহাঙ্গীরের মহিমাময়ী হিন্দু জননীর মৃত্যুর ফলে ক্রমেই নির্ভরশীল হয়ে ওঠা স্বামীর ওপর নূরের কর্তৃত্ব নিশ্চিতভাবেই জোরাল হয়েছিল।

মেওয়ার থেকে দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের দিকে শাহজাহান আর মমতাজ যখন অগ্রসর হন তারা শীঘ্রই তাদের প্রতি নূরের শত্রুতার গভীরতা সম্বন্ধে জানতে পারেন। যুবরাজের বাহিনী বিপজ্জনকভাবে হ্রাস পায় যখন অসংখ্য সমর্থক স্বপক্ষ ত্যাগ করে রাজকীয় বাহিনীতে যোগ দিতে থাকে এবং তিনি সিদ্ধান্ত নেন মমতাজ আর তার সন্তানদের জন্য একটি যথোপযুক্ত আশ্রয়স্থল তাকে নিশ্চিত করতে হবে। বুরহানপুরের নিকট, আসিরের বিশাল পাহাড়ি দুর্গ তিনি নির্বাচিত করেন যার নিয়ন্ত্রণভার যে গোত্রপতির অধীনে রয়েছে তার সাথে মমতাজের এক বোনের বিয়ে হওয়ায় তিনি তাদের সাহায্য করবেন বলে তিনি মনে করেন। এই বোন অবশ্য নূরের ভাইঝি হবার কারণে তিনি যখন শাহজাহানের পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন তখন সেটা ভণ্ডুল করতে পদক্ষেপ নেন। গোত্রপতিকে হুঁশিয়ার করে তিনি নিজে চিঠি লেখেন : 'সাবধান, বি-দৌলত (শাহজাহান) আর তার লোকজনকে তোমার দুর্গের

নিকটে আসার অনুমতি দেয়ার আগে হাজারবার চিন্তা করবে আর দুর্গের তোরণ এবং বুরুজ শক্তিশালী করবে আর নিজের দায়িত্ব পালন করবে আর এমন কিছু করতে যাবে না যাতে অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য অকৃতজ্ঞতা আর অভিশাপের কলঙ্ক কপালের তিলক হয়... ।'

শাহজাহান তা সত্ত্বেও হুমকি দিয়ে গোত্রপতিকে বাধ্য করেন তার দুর্গের তোরণদ্বার খুলতে কিন্তু তাকে আর তার পরিবারের পশ্চাদধাবনকারী রাজকীয় বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হতে থাকায় এর শক্তিশালী দেয়ালের নিরাপত্তা বেশি দিন অতিবাহিত করে না। দুর্গের নিয়ন্ত্রণ বিশ্বস্ত এক রাজপুতকে দিয়ে শাহজাহান তার পরিবার নিয়ে বুরহানপুরের বারো মাইল দক্ষিণে যান যেখান থেকে তিনি মহবত খানের উদ্দেশে সম্ভাব্য শান্তি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। আলোচনা যখন ব্যর্থ হতে, তিনি আর তার পরিবার তাপ্তি এবং বর্ষার বৃষ্টিতে ফুলে-ফেপে ওঠা আরো অনেক বিপজ্জনক খরস্রোতা নদী অতিক্রম করে দক্ষিণে আরো দুর্গম পথে যাত্রা করে। তিনি দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় সুলতানদের সাথে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করেন কিন্তু তারা রূঢ়ভাবে তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। মোগল সাম্রাজ্যে যেকোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে আগ্রহী গোলকুণ্ডার শাসকই কেবল খানিকটা হলেও সহায়তা করেন, নিজের প্রাক্তন শত্রু আর তার লোকজনকে নিজের রাজ্যে অতিক্রম করে উত্তর-পূর্ব দিকে উড়িষ্যায় যেতে দেন, পাহাড় আর জলাভূমির ভেতর দিয়ে এই যাত্রাকালীন সময়ে, জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানতে পারি, বৃষ্টি আর কাদায় পর্যুদস্ত দলটা 'অনেক কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য হয়' যার ফলে শাহজাহানের আরো অনেক সমর্থক তাকে ছেড়ে চলে যায়।

শাহজাহানের ভাগ্য অচিরেই সুপ্রসন্ন হয় যখন উড়িষ্যার সুবেদার, নূর আর মমতাজ উভয়ের আত্মীয় সম্পর্কিত ভাই, তার আগমনের সংবাদে এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যে তিনি সব কিছু পেছনে ফেলে পালিয়ে যান। শাহজাহান সুবেদারের বিপুল ঐশ্বর্য বাজেয়াপ্ত করেন, নিজের বাহিনী পুনর্গঠন করেন এবং রণহস্তী, ঘোড়া, কামান আর নতুন নিয়োগ করা সৈন্য নিয়ে বাংলা আর বিহার অভিমুখে অগ্রসর হয়ে বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে সেখানকার অভিজাতদের তার সাথে মিত্রতা করতে বাধ্য করেন। ১৬২৪ সালের বসন্তকালে, শাহজাহান গঙ্গার তীরে বাংলার সুবেদার, নূরের চাচাজানকে রক্তক্ষয়ী একটি যুদ্ধে নিহত করেন। নিহত সুবেদার গোলাপের আতরের আবিষ্কারকরূপে খ্যাতিমান নূরের আম্মিজানের কেবল ভাই-ই ছিলেন না, তিনি একই সাথে সম্পর্কে মমতাজের নানাজানও হতেন। ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে মমতাজের পলায়নচেষ্টা মাঝেমধ্যে তার কাছে নিশ্চয়ই দাবার অদ্ভুত খেলার মতো মনে হতো যেখানে মূল চরিত্রদের যারা হয় নিশ্চিহ্ন হয়েছে বা উন্নতি লাভ করেছে, তাদের অনেকেই তার নিকট আত্মীয়।

মহবত খান পুনরায় শাহজাহানের খুব কাছাকাছি এসে পড়েন এবং তাকে উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত করেন। যুবরাজ আর তার পরিবারের কাছে এরপরে গোলকুণ্ডা অভিমুখী আঁকাবাঁকা ফিরতি পথে গমন করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। শাহজাহান আরো একবার দাক্ষিণাত্যে ফিরে এসে

অপ্রত্যাশিত একজন মিত্রকে খুঁজে পান। আহমেদনগরের মালিক আম্বার, জাহাঙ্গীরের পক্ষে যাকে শাহজাহান দুবার পরাজিত করেছিলেন সেই প্রাক্তন আবিসিনিয়ান ক্রীতদাস, 'রাজকীয় শাসনব্যবস্থার প্রতি একই বৈরিতার ভিত্তিতে' শাহজাহানের বাহিনীর সাথে যোগ দিতে উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। এই পোড় খাওয়া গেরিলা যোদ্ধা আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাহজাহানের বিদ্রোহকে ব্যবহারের সুযোগ লাভ করায় দারুণ খুশি হন। তারা একত্রে একাধিক আক্রমণ পরিচালনা করে রাজকীয় বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তোলেন।

১৬২৫ সালে অবশ্য এক দিনপঞ্জি রচয়িতা যেমন উল্লেখ করেছেন, শাহজাহান 'সহসা অসুস্থতায় আক্রান্ত হন' এবং বুঝতে পারেন তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। মহবত খান তিন বছর ধরে রাজস্থানের মরুভূমির ওপর দিয়ে—দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যে, পূর্বে উড়িষ্যা এবং বাংলায়, সেখান থেকে পেছনে আরো একবার আগ্রার অভিমুখে তারপরে আবার দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত মঞ্চস্থ হওয়া ইঁদুর-বিড়াল খেলায় তাকে আর তার পরিবারকে হাজার মাইল পথ ধাওয়া করেন। শাহজাহান তার আব্বাজানের বাহিনীর সাথে প্রথাগত যুদ্ধের সব সম্ভাবনা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু এর পরও যখনই তিনি যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন তাকে প্রতিবারই পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। একটি যুদ্ধে শাহজাহানের ঘোড়া তীরবিদ্ধ হলে তার একজন সেনাপতি যখন তাকে নিজের ঘোড়া দেন তখনই তিনি কেবল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে সক্ষম হন। শাহজাহান আর তার সঙ্গীদের হালকা আর দ্রুত ভ্রমণ করার দক্ষতা, অন্তত মোগল মান অনুসারে, মূলত অনেক ঝামেলাপূর্ণ পশ্চাধাবনকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়া থেকে তাদের রক্ষা করেছে।

মমতাজ, এত দিন হারেমের আরাম-আয়েশে দিন অতিবাহিতকারী রমণী, এই পুরোটা সময় অবিচলভাবে তার পাশে অবস্থান করেছেন, কষ্টের অংশীদার হয়েছেন, ঠিক যেমন শাহজাহান যখন সম্রাটের প্রিয়পুত্র ছিল তখন তার সাথে অভিযানে যাবার গৌরবের অংশীদার হয়েছিলেন। বিপদ আর কষ্টকর পরিস্থিতির মাঝে বসবাসকারী পরিবারটা খুব সামান্যই মিত্র খুঁজে পায়। তারা প্রায়ই, জাহাঙ্গীর সন্তুষ্টির সাথে যেমন লিখেছেন, নিজেদের 'শোচনীয় অবস্থায় আবিষ্কার করেছে', 'ভারী বৃষ্টি আর কর্দমাক্ত পঙ্কিলতার মাঝে' বিশৃঙ্খল অবস্থায় পালাতে বাধ্য হয়েছে, যাতে 'কোনো মালপত্র যদি পেছনে ছাড়া পড়ে তাহলে কোনো অনুসন্ধান করা হবে না এবং শাহজাহান আর তার সন্তানরা এবং তার ওপর নির্ভরশীল লোকজন তাদের জীবন বাঁচাতে পারার জন্য নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে।' এই পরিস্থিতি আর চলতে দেয়া যায় না।

শাহজাহান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্ত নেন নিজেকে আর তার প্রিয়জনদের তার আব্বাজানের করুণার সামনে সমর্পণ করা ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। তার পরিবারে এখন আরেকজন সদস্য বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৬২৪ সালে গঙ্গার তীরে যেখানে শবদাহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চিতার আগুন থেকে উত্থিত ধোঁয়ার কুণ্ডলী অবিরাম আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে, সেখানে অবস্থিত হিন্দুদের পবিত্র শহর বেনারসের কাছে রোহতাসের দুর্গপ্রাসাদে জন্মগ্রহণকারী

পুত্র মুরাদ বকশকে। অসুস্থ আর হতাশ শাহজাহান 'নিজের অতীত আর বর্তমানের সব ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং নিজের দুঃখ আর অনুতাপ ব্যক্ত করে' তার আব্বাজানের কাছে বার্তা পাঠান এবং উত্তরের জন্য শঙ্কিত চিত্তে অপেক্ষা করেন।

জাহাঙ্গীরের উত্তর প্রায় বিশ বছর পূর্বে খসরুর বিদ্রোহের সময়ের নির্মম প্রতিক্রিয়ার মতো ছিল না, অনেক বেশি আপসমূলক। নূর সম্ভবত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, শাহজাহান আর তার আব্বাজানের মাঝে এতটাই বিচ্ছেদ যে মতপার্থক্যের একটি সত্যিকারের নিষ্পত্তি অসম্ভব এবং শাহজাহানের পক্ষে এখন আর মারাত্মক কোনো হুমকির সৃষ্টি করা অসম্ভব। তাকে হয়তো তার ভাই আসফ খানের বিরোধিতাও সতর্ক করে তুলেছিল। আসফ খান সম্ভবত শাহজাহানের পক্ষে জাহাঙ্গীরকে নমনীয় করতে চেষ্টা করছিলেন। সম্রাট সম্ভবত তার পুত্রের সাথে শান্তি স্থাপনের সুযোগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন একটি কারণেই, সেটা হলো, এমন একটি অভিযান বন্ধ করতে, যা তাকে হাজার মাইলব্যাপী রসদ সরবরাহের রাস্তা বিস্তার করতে বাধ্য করেছে। তিনি নিজের হাতে চিঠির উত্তরে লেখেন, তিনি তার পুত্রকে কেবল 'পূর্ণ ক্ষমা'ই প্রদর্শন করবেন না সেইসাথে মধ্য ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশ বালাঘাটের সুবেদার হিসেবে তাকে নিয়োগ করছেন। একটি কাঁটা অবশ্য ছিল। শাহজাহানকে রোহতাস আর আসিরের দুর্গ, যা তখনো তার অনুগত বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছে, অবশ্যই সম্রাটের হাতে তুলে দিতে হবে। তাকে সেইসাথে অবশ্যই দশ বছরের দারা শুকোহ্ আর সাত বছরের আওরঙ্গজেবকে দরবারে পাঠাতে হবে মূলত পণবন্দি হিসেবে। জাহাঙ্গীর এই কাঁটা সহনীয় করতে নিজের রত্নপ্রেমী পুত্রকে হীরকখচিত একটি রাজদণ্ড প্রেরণ করেন।

শাহজাহান আর মমতাজের জন্য পুত্রদের সাথে বিচ্ছিন্ন হওয়াটা এমন পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই গভীর দুঃখজনক একটি অভিজ্ঞতা ছিল। তাদের তখন পর্যন্ত জন্ম নেয়া দশ সন্তানের ভেতর তিনজন ইতিমধ্যে মারা গেছে। একজন দিনপঞ্জি রচয়িতা বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'নিজের পুত্রদের প্রতি তার ভালোবাসা সত্ত্বেও', শাহজাহান যিনি তখনো 'তার দৈহিক দুর্বলতায়' আক্রান্ত, তাদের নিজের আব্বাজানের কাছে প্রেরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না, তাদের সাথে তিনি 'নকশা করা বন্দুক, হাতি আর রত্নপাথরের উপঢৌকন' প্রেরণ করেন। পুরাতন তৈমূরীয় প্রথার ওপর শাহজাহান আর মমতাজ আস্থা রেখেছিলেন যে, এই বংশের যুবরাজদের রক্ত পবিত্র। অবশ্য তার সৎভাই খসরুর সাম্প্রতিক ভাগ্যের কথা যে তারই তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় খুন হয়েছিল, পুনর্বিবেচনার পরে শাহজাহান অবশ্যই উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন।
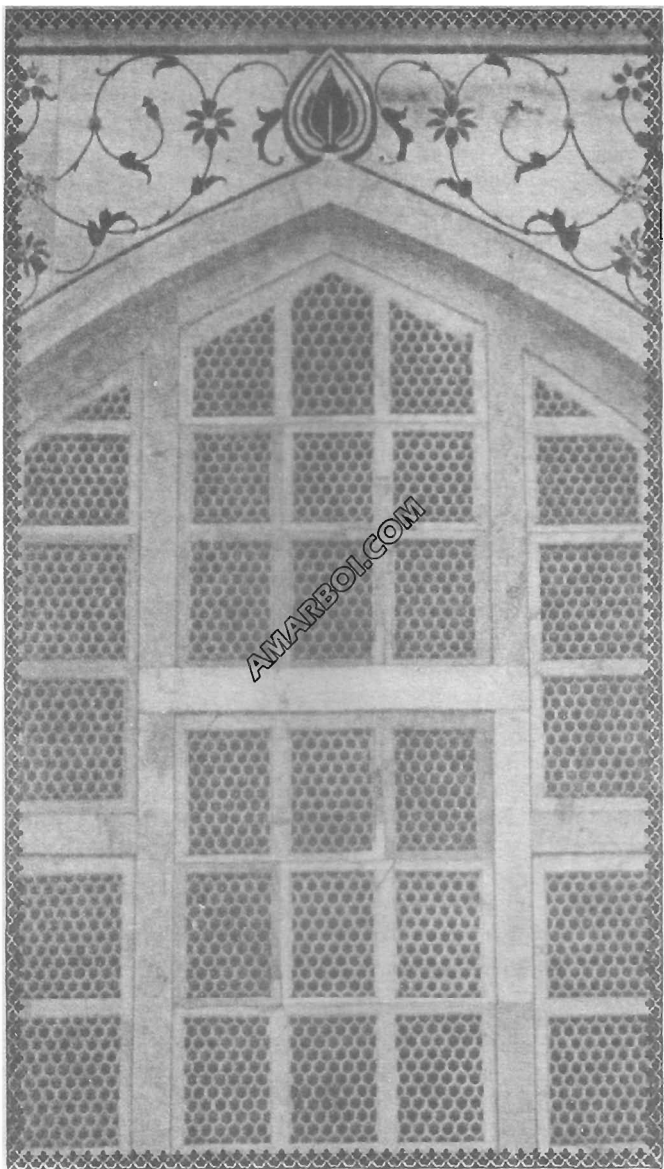
ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাসাদের আরাধ্য মালকিন

শাহজাহান আর আরজুমান্দ কার্যত তখন নির্বাসনে। তাদের তিন বছরের বিদ্রোহ প্রয়াস শারীরিক আর মানসিকভাবে তাদের নিঃস্ব করেছে, তাদের কাছ থেকে তাদের দুই পুত্রকে কেড়ে নিয়েছে এবং নূরের সাথে তাদের নিষ্পত্তির অযোগ্য বিরোধকে আরো প্রকট করে তোলা ছাড়া আর সামান্যই অর্জিত হয়েছে। সম্রাজ্ঞীর ক্রমেই মাত্রা ছাড়াতে থাকা উদ্ধত আর স্বৈরাচারী আচরণ হয়তো অন্যদের ক্ষুব্ধ করে তুলবে, এটাই তাদের তখন একমাত্র আশা।

মহবত খান সে রকমই একজন ব্যক্তি। তার নিকটে শাহজাহান পরাজিত হওয়ায় তিনি এখন জাহাঙ্গীরের অভিজাতদের ভেতরে সবচেয়ে প্রভাবশালী। তাকে অবশ্য এ জন্য ছত্রিশ বছর বয়স্ক যুবরাজ পারভেজের সাথে দীর্ঘদিন একত্রে থাকতে হয়েছে, যেহেতু তারা দুজন শাহজাহান আর তার পরিবারকে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বন্দি করার জন্য পশ্চাধাবন করেছেন। জাহাঙ্গীরের জীবিত সন্তানদের ভেতরে বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় সিংহাসনের ওপর পারভেজের ভালো রকমের একটি দাবি এমনিতেই রয়েছে। তার অতিরিক্ত পানাসক্তি একটি দুর্বলতা বটে, কিন্তু মহবত খানের বিশ্বাস করার সংগত কারণ ছিল, তিনি সম্রাট হলে সে জন্যই তাকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হবে।

পারভেজের ওপর মহবত খানের ক্রমেই বাড়তে থাকা প্রভাব, অবশ্য, নূর আর তার ভাই আসফ খান উদ্বেগের সাথে ঠিকই লক্ষ্য করছিলেন যাদের কারও পারভেজের উন্নতি দেখার কোনো আগ্রহই ছিল না। মহবত খানকে মেরুদণ্ডহীন যুবরাজের কাছ থেকে পৃথক করতে তারা প্রথমেই জাহাঙ্গীরকে রাজি করান তাকে সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকের দূরতম প্রান্তে বাংলার সুবেদার হিসেবে নিয়োগ করতে। নূর আর তার ভাই একই সাথে শাহজাহানের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের সময় হাতি আর ধনসম্পদ নয়-ছয় করার অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করেন। মহবত খান তার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র হচ্ছে অনুমান করে সম্রাটের সামনে উপস্থিত হবার এবং অভিযোগের জবার দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

১৬২৬ সালের মার্চ মাসে, মহবত খানকে ৪,০০০, বেশি রাজপুত যোদ্ধা সাথে নিয়ে কাশ্মীরের পাহাড়ি এলাকা থেকে প্রবাহিত সিন্ধু নদের শাখানদী, খরস্রোতা আর গভীর ঝিলম নদীর পূর্ব তীরে ধূলিধূসরিত রাজকীয় শিবিরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়, যেখানে কাবুলের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যাবার প্রাক্কালে জাহাঙ্গীর সাময়িক যাত্রাবিরতি করেছিলেন। জাহাঙ্গীর তার আগমনের সংবাদ জানতে পেরে আদেশ পাঠান যে, তাকে যাত্রা বিরতি করতে হবে এবং তার হাতির বহরকে আর সঙ্গে কয়েকজন পরিচারককে কেবল আগে পাঠাতে পারবেন। মহবত খান তখনো সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকায় যথাযথভাবে একটি অগ্রবর্তী দল প্রেরণ করেন, যে দলে একজন তরুণ যোদ্ধা ছিলেন, যার সাথে তার কন্যার সম্প্রতি বিয়ে হয়েছিল। মহবত খানের জামাই যখন রাজকীয় শিবিরে উপস্থিত হন, সৈন্যরা তাকে সাথে সাথে বন্দি করে, নির্দয়ভাবে চাবুকপেটা করে এবং শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে। তার বিরুদ্ধে একটিই অভিযোগ, তিনি সম্রাটের সম্মতি না নিয়ে বিয়ে করেছেন। শারীরিক জখমের ওপর বাড়তি অপমানের মতো, জাহাঙ্গীর নববিবাহিত দম্পতিকে মহবত খান বিয়েতে যে উপহার দিয়েছিলেন সেটা বাজেয়াপ্ত করে রাজকীয় কোষাগারে প্রেরণের আদেশ দেন।

মহবত খান যখন জানতে পারেন আসলে কী ঘটেছে, সেটা তার ভয়ের যথার্থতাকেই নিশ্চিত করে যে, নূর আর তার ভাইজান তাকে বরবাদ করার জন্য স্থিরসংকল্প। সে সিদ্ধান্ত নেয়, তার একমাত্র আশা, জাহাঙ্গীরের সাথে সরাসরি দেখা করার সুযোগ লাভ করা এবং তাকে ব্যক্তিগতভাবে তার প্রতি আরোপিত অভিযোগ তার সামনে ব্যক্তিগতভাবে অস্বীকার করা। জাহাঙ্গীর তার দিনপঞ্জি লেখার দায়িত্ব যে অভিজাত ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করেছিলেন এবং যে নিজে একজন প্রত্যক্ষদর্শী, নথিবদ্ধ করেছে কীভাবে মহবত খান তার লোকজন নিয়ে ঝড়ের বেগে শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আবিষ্কার করে যে, রাজকীয় দরবারের মূল অংশ, যার ভেতরে আসফ খানের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা আর দেহরক্ষী বাহিনীর একটি বিরাট দল এবং 'মালবাহী শকটের বহর, কোষাগার, অস্ত্রের আসল চালান এমনকি যেগুলো একেবারেই দেশীয়', নদীর ওপর তৈরি করা নৌকার সেতুর ওপর দিয়ে ইতিমধ্যে ব্যস্ততার সাথে অতিক্রম করতে শুরু করেছে, যাতে তারা পরের দিনের যাত্রার সময় প্রস্তুত থাকে। জাহাঙ্গীর, নূর, শাহরিয়ার এবং তাদের একেবারে ঘনিষ্ট লোকজন যারা পরের দিন সকালে বাকি দলকে অনুসরণ করবে, তারাই তখনো নিজেদের তাঁবুতে অবস্থান করছে—অরক্ষিত আর আক্রম্য।

এটা প্রায় অকল্পনীয় একটি পরিস্থিতি এবং সম্রাট হুমকি হিসেবে মহবত খানকে কতটা অকিঞ্চিৎকর মনে করতেন তার একটি প্রমাণ। মহবত খান পরিণামের কথা বিবেচনা না করে সাথে সাথে একটি অভ্যুত্থান সংঘটিত করেন। তিনি ২০০০ রাজপুত যোদ্ধাকে নৌকার সেতু পাহারা দিতে বলেন এবং যদি

প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা পুড়িয়ে ফেলবে রাজকীয় বাহিনীর তাদের প্রভুর প্রতিরক্ষায় দ্রুততার সাথে নদী অতিক্রম করা প্রতিরোধ করতে। তিনি এরপরে ধূলিধূসরিত একশ পদাতিক সৈন্যের বর্শা আর ঢাল দ্বারা সজ্জিত একটি দলকে রাজকীয় তাঁবুর কাছে নিয়ে আসেন, যেখানে সামান্য যে কয়েকজন সৈন্য প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল তারা তখন তাদের ফজরের নামাজ আদায় মাত্র শেষ করেছে। জাহাঙ্গীরের দিনপঞ্জির রচয়িতা একটি বিস্ময়কর দৃশ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। মহবত খান এখানে- সেখানে সম্রাটের খোঁজে ঘোড়া নিয়ে ছোটাছুটি করতে থাকেন, যতক্ষণ না আড়াল থেকে রাজকীয় হাম্মামের তাঁবুর প্রবেশপথের পাশে খোজাদের একটি দলকে তাকিয়ে থাকতে দেখেন এবং জাহাঙ্গীর ভেতরে রয়েছেন এই ভুল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তিনি তার পরিচারকদের তাঁবুর চারপাশের তক্তা খুলে ফেলার আদেশ দেন।

হট্টগোলের শব্দ শুনে, জাহাঙ্গীর তার বাসস্থানের জন্য নির্ধারিত তাঁবুর অন্য একটি অংশ থেকে আবির্ভূত হয়ে সশস্ত্র রাজপুত যোদ্ধাদের ভিড়ের মাঝে উপস্থিত হন। মহবত খান সম্রাটের চোখেমুখে অবিশ্বাসের অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দেখে নিজের কার্যকলাপের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন। আপাতভাবে বলতে চেষ্টা করেন, যেহেতু 'আমি নিজে নিশ্চিত হয়েছি যে আসফ খানের নিষ্করুণ ঘৃণা আর বিদ্বেষ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব এবং সেইসাথে আমাকে লজ্জাজনক আর মর্যাদাহানিকর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, আমি তাই মহামান্য জাহাপনার শরণে নিজেকে সাহসিকতা আর সাহংকারে নতজানু করছি। মৃত্যুদণ্ড অথবা অন্য কোনো শাস্তি যদি আমার প্রাপ্য হয়, আদেশ দেন আপনার উপস্থিতিতে আমি যেন সেটা ভোগ করি।' তিনি আক্ষরিক অর্থে যা বলেছিলেন সেটা সম্ভবত এত বিনয়ী বা তার বাচনভঙ্গি এত সুন্দর ছিল না এবং জাহাঙ্গীর যে তার বন্দি সে বিষয়ে দুজনের কারও মনেই সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না। জাহাঙ্গীর তার কাঁধের ওপরে আপাতভাবে নিজের মাথায় ঝটকা দিতে দিতে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন—তার হাত দুবার নিজের কোমরের তরবারির বাটের দিকে এগিয়ে যায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পূতিগন্ধময় সারমেয় সন্তানের নোংরা উপস্থিতি থেকে পৃথিবীকে মুক্তি দেয়ার অভিপ্রায়ে। মহবত খানের প্রতি বিরূপ দিনপঞ্জির একজন লিপিকার পরে যেমন বলেছেন, —কিন্তু দুবারই তিনি নিজেকে নিরস্ত করেন। জাহাঙ্গীর এর বদলে তার প্রাক্তন বন্ধু আর বর্তমান বন্দিকর্তার প্রস্তাবে সাড়া দেন যে 'ঘোড়া নিয়ে আমাদের বেড়াতে যাবার আর শিকার করার সময় হয়েছে; বরাবরের মতোই প্রয়োজনীয় আদেশগুলো দান করেন, যাতে আপনার দাসেরা আপনার তত্ত্বাবধানে বাইরে যেতে পারে এবং এটা যেন মনে হয় যে মহামান্য জাহাপনার আদেশে এমন সাহসী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।' জাহাঙ্গীর অবশ্য মহবত খানের ঘোড়ায় চাপতে অস্বীকৃতি জানান, কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে তার নিজের রাজকীয় স্ট্যালিয়ন নিয়ে আসতে বলেন।

দুটো তীরের যাত্রাপথের সমান দূরত্ব অতিক্রম করার পরে মহবত খান একটি রাজকীয় হাতির পিঠে স্থাপিত হাওদায় জাহাঙ্গীরকে ওঠার জন্য অনুরোধ করেন, প্রজারা যাতে সহজেই সম্রাটকে দেখতে পায় এবং নিজেদের বিশ্বাসকে মজবুত করে যে কোথাও কোনো কিছু বেঠিক নয়। রাজপুত যোদ্ধারা অবশ্য নেতৃত্বের পালাবদলের সময় জাহাঙ্গীরের দুজন পরিচারককে রাজপুত যোদ্ধারা হত্যা করে। তাদের বিশ্বাস যে তারা তারা নিজেদের প্রভুকে উদ্ধার করতে এসেছে। একটি ক্রমশ টানটান হতে থাকা পারিপার্শ্বিকতায়, অপহৃত সম্রাটকে দ্রুত মহবত খানের শিবিরে নিয়ে আসা হয়।

মহবত খান তার আতঙ্ক আর স্নায়বিক দৌর্বলতার কারণে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটি বা বলা যায়, একজনকে—অবহেলা করেন। নূর তখনো রাজকীয় শিবিরের অবস্থান করছেন। তিনি যখন বুঝতে পারেন কী ঘটেছে তিনি বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে দ্রুত নদীর তীরে পৌছান, যেখানে ঘটনাপ্রবাহে মনে হয় মহবত খানের রাজপুত যোদ্ধারা শালীনতার কারণে কিন্তু অবিবেচনাপ্রসূতভাবে তাকে নদী পার হতে দেয়। নূর দ্রুত তার ভাই আসফ খানের তাঁবুতে গিয়ে উপস্থিত হন, যিনি মহবত খানের আগমনের পূর্বেই নদী পার হয়েছেন এবং পর্দার রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে, প্রধান অমাত্য আর আধিকারিকদের ডেকে পাঠান এবং নিজের ভাই আর সাথে তাদেরও তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করেন। 'আপনাদের অবহেলার কারণেই ব্যাপারটা এত দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে এবং যা অকল্পনীয় ছিল তাই ঘটেছে। আল্লাহতায়ালা এবং প্রজাদের সামনে আপনারা অপমানিত হয়েছেন।' তার তিরস্কারপূর্ণ বক্তৃতার পরে বিস্ময়ের সামান্যই অবকাশ থাকে, তারা পরের দিনই ঝিলম নদী পুনরায় অতিক্রম করার এবং তাদের সম্রাটকে উদ্ধারের সিদ্ধান্ত নেয়।

সমগ্র অভিযানই চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মহবত খানের লোকেরা ইতিমধ্যে নৌকাসেতু জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং রাজকীয় বাহিনী নদী পার হবার জন্য যে অগভীর অংশটা নির্বাচন করেছিল, জাহাঙ্গীরের দিনপঞ্জির এক রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে, গভীর গর্তে পরিপূর্ণ, 'সবচেয়ে প্রতিকূল পছন্দ।' রাজকীয় বাহিনী নদী পার হবার জন্য পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে অসংখ্য মানুষ আর পশু আক্ষরিক অর্থেই পানিতে উল্টে পড়ে। তার চেয়েও বড় কথা, তারা যখন অপর তীরে যাবার জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম করছে, তারা দেখে মহবত খানের সাতশর বেশি রাজপুত যোদ্ধা তাদের বর্মসজ্জিত রণহস্তি নিয়ে 'নিদ্রি বিন্যাসে' সেখানে এসে সমবেত হয়েছে, তাদের প্রতিহত করতে প্রস্তুত। ইতিমধ্যে নাকানিচোবানি খেতে থাকা রাজকীয় বাহিনী এবার আতঙ্কে দিগ্‌ভ্রষ্ঠ হয়ে দিগ্বিদিকে ভেসে যেতে শুরু করে। সামান্য কয়েকজন গভীর পানি আর তীব্র স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে যতক্ষণ না নদী পার হবার অন্যস্থানগুলোতে পৌছায় যেখানে রাজপুত যোদ্ধারা অনুপস্থিত। এই গুটিকয়েক সাহসী যোদ্ধা হাঁপাতে হাঁপাতে, ভিজে চুপচুপে আর ক্ষতস্থান

নিয়ে, তারা জাহাঙ্গীরকে সাথে নিয়ে একসঙ্গে যেখানে শাহরিয়ারকে, যে ইতিমধ্যে মহবত খানের হাতে বন্দি হয়েছে, সেই তাঁবুর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। সেই তাঁবুর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে, কিন্তু বেশির ভাগই নিহত হয়েছে। অন্যরা পালিয়ে যায়, যাদের ভেতরে আসফ খানও রয়েছেন, যিনি দ্রুত আকবরের নির্মিত একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের নিরাপত্তার মাঝে পালিয়ে আসেন।

রাজপুত যোদ্ধারা প্রায় দুই হাজার রাজকীয় সৈন্যকে হত্যা করে এবং আরো দুই হাজারের পানিতে সলিল সমাধি হয়। তাদের দেহ ঘোড়া আর হাতির মৃতদেহের সাথে হিম শীতল, ঘুরপাক খেতে থাকা, রক্তের ছোপছোপ দাগযুক্ত পানিতে একসাথে ভাসতে থাকে। রাজপুত যোদ্ধারা যথারীতি ভীতিকর প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ইউরোপীয় এক ভাড়াটে সৈন্যের ভাষ্য অনুসারে যার তাদের সাথে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে, 'তারা সবাই আফিম সেবন করে এবং যুদ্ধের দিন তারা স্বাভাবিক মাত্রার দ্বিগুণ সেবন করে। তারা তাদের ঘোড়াকেও খানিকটা পরিমাণ আফিম দেয় তাদের ক্লান্তি সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে...তাদের অনেকেই সোনার বাজুবন্ধ পরিধান করে, যাতে তারা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করে তাহলে যারা তাদের মৃতদেহটা খুঁজে পাবে তারা যেন সেটার সৎকারের বন্দোবস্ত করে।'

নূর উঁচু একটি হাওদায় অধিষ্ঠিত অবস্থায়, তার নাতনিকে কোলে নিয়ে এবং বাচ্চার আয়াকে পাশে বসিয়ে, নদী অতিক্রম করে আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি তাকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত বৃষ্টির মতো তীরের ঝড় সহ্য করেন এবং রাজপুত যোদ্ধারা তার হাতিকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করলে সেগুলো প্রাণীটার পুরু চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি করে। বাচ্চা মেয়েটা যখন—বা অন্য আরেকটা ভাষ্য মতে, আয়াটা—বাহুতে আঘাতপ্রাপ্ত হলে, নূর নিজ হাতে সেটা টেনে বের করেন এবং ছুড়ে ফেলে দেন আর সেটা করতে গিয়ে তার পরনের কাপড় রক্তে ভিজে যায় এবং রাজপুতদের তাদের আক্রমণের যথোচিত জবাব দিতে তীরভর্তি তিনটা তূণীর তিনি তাদের ওপর শেষ করেন। তার হাতির মাহুত আহত প্রাণীটাকে নদীর অগভীর অংশ থেকে সরে নদীর গভীর অংশে যাবার জন্য তাড়া দেয় যেখানে জন্তুটা সাঁতার কাটতে পারবে এবং শেষ পর্যন্ত নূর আর তার দল রাজপুত যোদ্ধার উপস্থিতি মুক্ত নদীর দূরবর্তী তীরের একটি অংশ আয়ত্তে আনে। নদী পার হবার সময় রক্তাক্ত বিশৃঙ্খলা আর তার ভাই পালিয়ে গেছে জানতে পেরে, নূর মেনে নেন তার পক্ষে এখন আর তার স্বামীকে উদ্ধার করা অসম্ভব এবং মহবত খানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, বন্দি জাহাঙ্গীরের সাথে অবস্থান করতে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আসফ খানকে কয়েক দিনের ভেতরেই তার পাহাড়ি ডেরা থেকে টেনে বের করা হয় এবং কিছুদিন শিকল পরিয়ে রাখার পর তিনিও রাজকীয় বন্দিদের সাথে যোগ দেন।

রাজপরিবারের সাথে, বস্তুতপক্ষে সমগ্র রাজকীয় পরিবার-পরিজন, রাজপুত যোদ্ধাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু তখনো একজন অনুগত প্রজার ভান করা বজায় রাখায়, মহবত খান ২০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কাবুলের উদ্দেশে যাত্রা করেন, জাহাঙ্গীরের মূল গন্তব্যস্থলের সাথে যার মিল রয়েছে। ১৬২৬ সালের মে মাসে রাজকীয় পরিপার্শ্ব যখন খাইবার গিরিপথের অন্যপাশে মাটির দেয়াল বেষ্টিত প্রাচীন শহর অতিক্রম করে, সাধারণ মানুষের কাছে সব কিছুই স্বাভাবিক বলে মনে হয়, যখন জাহাঙ্গীর দারুণভাবে সজ্জিত একটি হাতির ওপর থেকে বিস্ময়বিমুগ্ধ আর শ্রদ্ধাবান জনতার উদ্দেশে সোনার আর রুপার মুদ্রা 'রীতি অনুযায়ী' ছিটিয়ে দেয়।

কাবুলে অবস্থানের সময় পরবর্তী অস্বস্তিকর মাসগুলোয় এই বিচিত্র ভনিতা বজায় থাকে। মহবত খান আবেগের বশে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই জাহাঙ্গীরকে বন্দি করেন এবং আপাতদৃষ্টিতে নিজে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার কোনো ভাবনা তার ভেতরে কাজ করছিল না। তিনি সম্ভবত নিজের এই হঠকারী কাজের জন্য অনুতপ্ত কিন্তু এখান থেকে বের হবার কোনো উপায় তিনি খুঁজে পান না। জাহাঙ্গীর ইতিমধ্যে নূরের যত্নশীল নির্দেশনায় শাস্তি আর নিরবচ্ছিন্নতার ছলনায় নিজের ভূমিকা ভালোমতোই পালন করেন, প্রজাদের উপস্থিতিতে মহবত খানের অনুরোধ উদারভাবে মেনে নেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মহবত খানকে পুনরায় আশ্বস্ত করেন যে, তার কোনো ক্ষতি করার অভিপ্রায় সম্রাটের নেই এবং নূরের ওপর নিজের পূর্ববর্তী সন্দেহের দায়ভার চাপিয়ে দেন। জাহাঙ্গীরের রোজনামচার রচয়িতার ভাষ্য মতে, সম্রাট তার সেনাপতিকে এমনকি সাবধানও করে দেন যে, 'তোমায় আক্রমণ করার অভিপ্রায় বেগমের রয়েছে। হুঁশিয়ার।' মহবত খান এমন আস্থার পরিচয় পেয়ে স্বস্তিবোধ করে। তিনি নিজেকে বোধ হয় এমনই বোঝান যে, মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী স্ত্রীর জোয়াল থেকে মুক্তি লাভ করে জাহাঙ্গীর খুশি।

নূর নীরবে আর ধৈর্যের সাথে মহবত খানের কাছ থেকে জোর করে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পুনরায় কেড়ে নেয়ার সুযোগের জন্য প্রতিক্ষা করেন। তার নিজস্ব রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনী রয়েছে, যা মহবত খান তাকে সাথে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই বাহ্যিক উপস্থিতির স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে আর বিরোধ পরিহার করতে। জাহাঙ্গীরের রোজনামচার লেখক যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন, নূর তাদের মন জয় করার চেষ্টা করতেন, নিশ্চিত করতে যে, তিনি 'তার রণক্লান্ত যোদ্ধাদের প্রশমিত আর তাদের মন মেজাজ ভালো' রাখতে পারে, খুব সম্ভবত ঘুষের প্রলোভনে তাদের স্বপক্ষ ত্যাগে নিরুৎসাহিত করতে। তিনি তার খৌজাদের সহায়তায় সেইসাথে গোপনে অর্থের বিনিময়ে বিপুল সংখ্যক ভাড়াটে পদাতিক আর অশ্বারোহী সৈন্যের আনুগত্য ক্রয় করেন। ১৬২৬ সালের আগস্ট মাসে যখন আসন্ন শরতের শৈত্যপ্রবাহ এড়াতে রাজকীয় পরিপার্শ্ব পুনরায় কাবুল থেকে রুক্ষ খাইবার গিরিপথের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ-

পূর্বে লাহোরের প্রীতিকর উষ্ণতা অভিমুখে ফিরতি পথে পাঁচশ মাইল দীর্ঘ যাত্রা শুরু করে, তখন তিনি তার কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পান। নভেম্বর নাগাদ তারা ঝিলম নদীর কাছাকাছি পৌঁছে যান, যেখানে মহবত খান তার সুযোগসন্ধানী অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। নূরের পরামর্শে, জাহাঙ্গীর তার সেনাপতিকে বলেন, তিনি তার সম্রাজ্ঞীর অশ্বারোহী বাহিনী পরিদর্শনে আগ্রহী এবং তাকে নিজের বাহিনী সাথে নিয়ে আগে যাত্রা করতে বলেন নূরের মুসলিম যোদ্ধাদের সাথে মহবত খানের হিন্দু রাজপুত যোদ্ধাদের ভেতরে, 'যাতে কোনো ধরনের ঝগড়ার সূত্রপাত থেকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।'

নূর যেমন আশা করেছিলেন, অনিশ্চিত আর ক্রমেই বিচলিত হয়ে ওঠা মহবত খান যা অব্যাহতিহীন একটি সংকটে পরিণত হয়েছিল, সেখান থেকে নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ নিতে পারেন। জাহাঙ্গীরের রোজনামচার লেখকের ভাষ্য অনুসারে, তিনি ইতস্তত না করে 'তাকে যা করতে বলা হয়েছে করে' এবং নিজের লোকদের নিয়ে রওনা হন। রাজকীয় বাহিনীর সাথে তার নিজের ব্যবধান বাড়তে থাকলে, সুশৃঙ্খল অগ্রযাত্রা ক্রমেই আড়ষ্ট হুড়োহুড়িতে এবং তারপরে অমনোযোগী পলায়নে পর্যবসিত হয়। মহবত খান বাড়তি সতর্কতা হিসেবে সাথে করে কয়েকজনকে বন্দি করে নিয়ে যান, যাদের ভেতরে ছিল আসফ খান আর তার পুত্র। নূরের ক্ষমতা সম্পর্কে তার এতটাই ভয় ছিল যে, তিনি যখন মহবত খানকে তাদের মুক্তি দেয়ার আদেশ দেন তিনি তাই করেন যখনই তার মনে হয় যে তিনি নিজের আর প্রতিশোধপরায়ণ সম্রাজ্ঞীর মাঝে যথেষ্ট দূরত্ব আরোপ করছেন। নূর আধুনিক যুগে শত্রুর সাথে আলোচনা করার মতো, তাকে আক্ষরিক অর্থেই মানসিকভাবে পরাস্ত করেছে।

শাহজাহান আর মমতাজ, আবারও গর্ভবতী, দক্ষিণে প্রায় হাজার মাইল দূরে, সেবারের গ্রীষ্মকালের বিচিত্র ঘটনাবলি উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে যখন খবর আর গুজবের মাঝে, দুটোই তাদের কাছে বেশ কয়েক দিনের পুরাতন হওয়ায় পর পৌঁছাবার কারণে, পার্থক্য নির্ণয় করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাদের প্রধান দুশ্চিন্তা ছিল অবশ্যই তাদের বন্দি দুই শিশুপুত্রের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে, যারা মহবত খানের অভ্যুত্থানের পরই তাদের দাদাজানের শিবিরে পৌঁছায়। মহবত খানের হাতে জাহাঙ্গীর বন্দি হবার কারণে একই সাথে শাহজাহানের সামনে তার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নতুন সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করে। মহবত খানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রথমবার অবগত হবার পরে, শাহজাহান এক হাজার অশ্বারোহী সংগ্রহ করেন এবং ১৬২৬ সালের জুন মাসে জাহাঙ্গীরের সহায়তায় যাত্রা করেন—বা তার অন্তত এমনই ভাষ্য। তিনি আর মমতাজ অবশ্য যখন উত্তর দিকে দীর্ঘ আর কষ্টকর ভ্রমণ করছিলেন তখন স্বপক্ষ ত্যাগের ঘটনায়

তাদের বাহিনীর লোকবল হ্রাস পায় এবং নিজেদের তারা, জাহাঙ্গীরের রোজনামচার রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে, 'মারাত্মক বিপর্যয় আর দারিদ্র্যের' মাঝে দেখতে পান। শাহজাহান উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধে অবস্থিত একটি বন্দর অবরোধ করার চেষ্টা করে নিজের জন্য একটি ঘাঁটির বন্দোবস্ত করতে সেখানের শাহরিয়ারের প্রতি অনুগত সুবেদার তার অগ্রসর হওয়ায় বাধা দিলে তার পরিকল্পা ভেস্তে যায়। অধিকন্তু তার দৌর্বল্যকর অসুস্থতা, যা তার নিজের বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল এখন তাকে বিব্রত করে। তিনি একটি পর্যায়ে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, কেবল খাটিয়ায় শুয়েই ভ্রমণ করতে পারতেন। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, তিনি আর মমতাজ রাজকীয় শিবিরে পৌঁছাবার আগেই, মহবত খান পালিয়ে যান এবং জাহাঙ্গীর আর নূর আবারও সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ নেন।

শাহজাহানের দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হবার কারণে আতঙ্কিত হয়ে আর তার আব্বাজানের জন্য কেবল উৎকণ্ঠার চেয়েও শাহজাহানের অভিপ্রায় আরো বেশি কিছু এমন সন্দেহ করে, নূর তাকে ফিরে যাবার আদেশ দেন। সমসাময়িক একজনের ভাষ্য অনুসারে, তিনি তাকে পত্র মারফত জানান যে, 'তার অগ্রযাত্রা মহবত খানকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল, যার বাহিনী এখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেছে এবং যুবরাজ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গিয়ে দিন বদলের জন্য প্রতিক্ষা করলেই বিচক্ষণতার পরিচয় দেবে।' শাহজাহান পারস্যে পালিয়ে যাবার কথা বিবেচনা করেন কিন্তু, শাহ আব্বাসের কাছ থেকে কোনো রকম উৎসাহ না পেয়ে তিনি মমতাজকে নিয়ে অনুগত ভঙ্গিতে দক্ষিণে ফিরে যান। নূর এসব সত্ত্বেও তার অভিপ্রায় নিয়ে এখনো সন্দিহান থাকেন। তিনি দুই শত্রুকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় করার সিদ্ধান্ত নিয়ে, মহবত খানকে আদেশ দেন শাহজাহান আবারও অগ্রসর হবার প্রয়াস নিলে তার পথরোধ করতে। মহবত খান অবশ্য এতটুকু বোঝার মতো বুদ্ধিমান যে, সম্রাটকে বন্দি করার কারণে নূর তাকে কখনো ক্ষমা করবেন না এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবেনই। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তার পূর্বের লোকজন আর একসময়ের প্রতিপক্ষের সাথে যোগ দিলেই কেবল তার স্বার্থ ভালোভাবে রক্ষিত হবে।

মহবত খানের এমন চিন্তার পেছনে ১৬২৬ সালের অক্টোবরে শাহজাহানের আটত্রিশ বছর বয়সী সৎভাই পারভেজের মৃত্যু, নিঃসন্দেহে আরেকটা কারণ। সুরার প্রতি তার আসক্তি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, 'খাবারের প্রতি ধীরে ধীরে তার মাঝে একধরনের অনীহা জন্ম নেয়।' জাহাঙ্গীরের রোজনামচার লেখক বিষণ্ন ভঙ্গিতে লিখেছেন, 'তিনি মূর্চ্ছা যাবার রোগে আক্রান্ত হন, যখন চিকিৎসকরা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো সহায়তা নেন এবং তার কপাল আর কপালের দুই পাশে পাঁচটি টুকরো রাখেন।' পরিচর্যার এমন রীতি সত্ত্বেও, বা হয়তো এ জন্যই, তিনি অবশেষে বুরহানপুর দুর্গে, যেখানে খসরুকে হত্যা করা হয়েছিল,

মৃত্যুমুখে পতিত হন। কয়েকজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক অনুমান করেন সৎভাইয়ের মৃত্যুতে শাহজাহানের হয়তো কোনো হাত থাকতেও পারে, কিন্তু খুব সম্ভবত সুরার প্রতি বংশগত দুর্বলতাই এ ক্ষেত্রে দায়ী।

ঘটনা যা-ই হোক না কেন, পারভেজের মৃত্যুর ফলে এটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে, তার দুই জীবিত পুত্রের মাঝে—শাহজাহান এবং তার অল্পবয়স্ক সৎভাই, নূরের জামাতা, শাহরিয়ার—রাজসিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। সেইসাথে এটাও স্পষ্ট যে, সেই বিরোধের শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। শ্বাসকষ্টে, হাঁপরের মতো দম নেয়া জাহাঙ্গীর ক্রমেই বৃদ্ধ হচ্ছেন। 'কাশ্মীরের বর্ষব্যাপী অতুলনীয় উদ্যানে' কিছুকাল অবস্থানও তার স্বাস্থ্য উদ্ধারে ব্যর্থ হয় এবং জাহাঙ্গীর সমভূমির উষ্ণতায় দেহমনের ক্লান্তি নিয়েই ফিরে আসতে, তার এমনকি গত চল্লিশ বছর ধরে সেবন করা আফিমের প্রতিও অরুচি জন্মে। তিনি বোধ হয় আঁচ করতে পারেন যে তার মৃত্যু আসন্ন। তার রোজনামচার রচয়িতার ভাষায় 'নিরাশার সৌরভ' তার ভেতর থেকে ক্ষরিত হতে থাকে। কৃষ্ণসার মৃগ শিকারের সময় পাহাড়ের চূড়া থেকে কুকুরের পালের এক রক্ষকের পড়ে যাবার দৃশ্য জাহাঙ্গীরের কাছে অশুভ লক্ষণ বলে মনে হয়, 'মৃত্যুর ফেরেশতা যেন তিনি এইমাত্র দেখতে পেয়েছেন।' তিন দিন পরে ১৬২৭ সালের ২৮ অক্টোবর, সমভূমির ওপরে পাহাড়ের তার তাঁবুর ভেতরে ভোরের প্রথম আলোর ধূসর কিরণ প্রবেশ করতে শুরু করলে, আটান্ন বছরের বৃদ্ধ 'পৃথিবীর অধিকারী' তার শেষ, কষ্টসাধ্য নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন। তিনি কোনো উত্তরাধিকারীর নাম ঘোষণা করে যাননি।

শোকার্ত, স্তম্ভিত নূর অভিজাতদের একটি সভা আহ্বানের চেষ্টা করেন কিন্তু সামান্য কয়েকজন এতে সাড়া দেয়। একটি নিষ্ঠুর কিন্তু পরিষ্কার সংকেত যে তার স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথেই তার ক্ষমতার অবসান হয়েছে। আসফ খান নিজের বোনকে কৌশলে পরাভূত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেন। 'নূর মহলের কাছে অল্পবয়সী যুবরাজেরা নিরাপদ নয়' এই অজুহাতে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য, তিনি তার নাতি দারা শুকোহ্ আর আওরঙ্গজেবকে সরিয়ে নেন। তিনি অনেক ভাবনা চিন্তার পরে এমন একজন অভিজাতের কাছে তাদের বিশ্বাস করে সমর্পণ করেন, যার সাথে তার এবং নূরের আরেক বোনের সাথে বিয়ে হয়েছে, যে বোনটা তাদের প্রীত করার জন্য 'তাদের চারপাশে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াত।' তিনি নূরকে তার তাঁবুতে প্রহরাধীন অবস্থায় রাখেন। আদেশ দেন যে কেউ যেন তার সাথে দেখা করতে না পারে এবং কাছে যাবার জন্য তার বারংবার অনুরোধ উপেক্ষা করা হয়।

আসফ খান, অবশ্য জটিল একটি পরিস্থিতির মাঝে অবস্থান করছিলেন। তার কন্যা মমতাজ আর শাহজাহান অনেক দূরে অবস্থান করছেন। তিনি যদিও

কালবিলম্ব না করে আর গোপনে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুসংবাদ তাদের জানাতে একজন বিশ্বস্ত হিন্দু বার্তাবাহককে নিজের সিলমোহরযুক্ত আংটি দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাদের দ্রুত উত্তর দিকে যাত্রা করতে তাগাদা দিয়েছেন, তিনি জানেন শাহজাহানের কাছে পৌঁছাতে তার বার্তাবাহকের প্রায় বিশ দিন সময় লাগবে। আসফ খানকে, ইত্যবসরে নিশ্চিত করতে হবে যে, সেই সময় লাহোরে অবস্থানরত শাহরিয়ারকে কোনোভাবেই যেন সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করা না হয়। শাহরিয়ার লাহোরে এই আশায় গিয়েছিলেন যে, পাঞ্জাবের আবহাওয়ায় তার রোগের—সম্ভবত কুষ্ঠ—উপসর্গ লাঘব করবে, যা কাশ্মীরে অবস্থানের সময় তাকে আক্রমণ করেছিল এবং 'তার সম্মানহানির কারণ হয়েছিল'—তার দাড়ি, গোফ, ভ্রূ, চোখের পাপড়ি এবং দেহের বাকি সব চুল উঠে যাওয়ায় ঘটনাকে সমসাময়িক সময়ে এভাবেই সুবচন প্রয়োগে বোঝানো হতো। এভাবে দেহের সব চুল উঠে যাবার ঘটনাকে লজ্জাজনক হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই, আসফ খান সমস্যার একটি ধূর্ত সমাধান খুঁজে বের করেন। তিনি তার সাথী অভিজাতদের বোঝান যে, শাহজাহান আর শাহরিয়ার দুজনেই দরবারে অনুপস্থিত থাকায়, শূন্যতা পরিহারের একমাত্র পথ হলো দাওয়ার বকসকে, খসরুর অল্পবয়সী এক ছেলেকে, যাকে নূর 'বাড়তি সতর্কতা' হিসেবে সম্প্রতি শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার আদেশ দিয়েছিলেন, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা। আসফ খান এই চাল দিয়ে নিশ্চিত করেন যে, শাহরিয়ার যখন সিংহাসনের জন্য নিজের দাবি জানাবে—যা সে নিশ্চিতভাবেই করবে—তখন সে বিদ্রোহী আর জবরদখলকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হবে। শাহজাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে রাজকীয় বাহিনী সমবেত করা থেকে এটা তাকে বিরত রাখবে। আর দাওয়ার বকস, সে ছিল, জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে তার রোজনামচার রচয়িতা লিখেছেন, 'কোরবানি দেয়ার জন্য একটি ভেড়া।' শাহজাহানের আগমন পর্যন্ত কেবল তাকে জবাই করা বিলম্বিত হবে। একজন ইউরোপীয় পর্যবেক্ষক ধারণা করেন, তার সামনে 'আশা কিংবা সুযোগ সামান্যই ছিল।'

দাওয়ার বকস ছিল একজন বুদ্ধিমান যুবক, যে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার প্রতি জাহাঙ্গীরের মতোই আবিষ্টতা ধারণ করত। জাহাঙ্গীরের রোজনামচার লেখকের বর্ণনা অনুসারে, সে বহু বছর আগে তার দাদাজানকে উপহার দিয়েছিল 'একটি বাঘ, যার একটি ছাগলের প্রতি অস্বাভাবিক ভালোবাসা ছিল, যে তার সাথে একই খাঁচায় বাস করত। তারা এমনভাবে একসাথে সংসর্গ আর সঙ্গমে অভ্যস্ত ছিল যে, মনে হবে তারা বুঝি একই প্রজাতির প্রাণী।' দাওয়ার বকস প্রথমদিকে সন্দিগ্ধ ছিল, বিশেষ করে তার আব্বাজানের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত থাকায়, যে তাকে 'একটি অলীক শাসকের দায়িত্ব' গ্রহণ করতে জোর করে বাধ্য করা হচ্ছে। অবশ্য আসফ খানের মিষ্টি কথা আর তার দুষ্কর্মের

সঙ্গীদের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের দ্বারা তারা অবশেষে তাকে নিজেদের পথে নিয়ে আসতে পারে। ছেলেটা, কার্যত একজন বন্দি, ঘোড়ায় চেপে এবং আসফ খান আর তার শীর্ষস্থানীয় অভিজাতদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় শাহরিয়ারকে মোকাবিলা করতে লাহোরের উদ্দেশে রওনা দেয়ার পূর্বে, তাকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করার অনুমতি তাদের দেয়। নূর, তার মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে, এক দিন পরে যাত্রা করেন। আসফ খান কঠোর আদেশ জারি করেন, মৃতদেহ সমাধিস্থলে পৌঁছানো পর্যন্ত যাত্রাপথের প্রতিটি শ্লথ পদক্ষেপে তিনি যেন শবাধারের সঙ্গে থাকেন।

লাহোরে, শাহরিয়ার বস্তুতপক্ষে নূরের কাছ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত আর লাগসই চিঠি—শেষ চিঠি বন্দি হবার আগে সে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল—দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তার স্ত্রী, নূরের কন্যা, লাডলির অনুরোধে, দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেও সিংহাসন দাবি করে, শহরের রাজকীয় কোষাগার থেকে চুরি করা সত্তর লাখ রুপি ব্যবহার করে সমর্থন ক্রয় করে এবং একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলে। আসফ খানের বাহিনী অবশ্য লাহোর থেকে প্রায় আট মাইল দূরে যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তারা দ্রুত তার অনভিজ্ঞ বাহিনীকে পরাজিত করে। এক তুর্কি ক্রীতদাস যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শহরের ঠিক বাইরে অনিশ্চিতভঙ্গিতে বিচরণ করতে থাকা শাহরিয়ারের কাছে পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে দৌড়ে আসে। যুবরাজ লাহোর দুর্গে আশ্রয় নেয়, যার শীঘ্রই আক্রমণকারী বাহিনীর নিকট পতন ঘটে। হারেমের শরণস্থল থেকে এক খোজা চুলহীন, ভয়ে কাঁপতে থাকা শাহরিয়ারকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনে। আসফ খান তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং দুই দিন পর দৃষ্টিহীন করে দেন। দাওয়ার বকস, ইত্যবসরে দুর্গ প্রাসাদের শক্ত ঘাঁটিতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়, কিন্তু বেশি দিন এটা তার দখলে থাকে না।

১৮ নভেম্বর দাক্ষিণাত্যের উত্তরে জুন্নারে শাহজাহানের কাছে আসফ খানের প্রেরিত বার্তাবাহক পৌঁছায়। শাহজাহান বার্তাবাহকের আগমনের সংবাদ জানতে পেরে হারেম থেকে দ্রুত বের হয়ে আসেন, যেখানে তিনি মমতাজের সাথে আলাপ করছিলেন। বার্তাবাহক শাহজাহানের সামনের মাটিতে নিজেকে অভিবাদন প্রকাশের ভঙ্গিতে শায়িত করে, সেখানে চুমু খায় এবং সে যা বলার জন্য প্রবৃত্ত হয়েছে সেই গল্পের প্রমাণ হিসেবে আসফ খানের আংটি তার হাতে তুলে দেয়। শাহজাহান শালীনতা আর শিষ্টাচার অনুযায়ী চার দিনের শোক পালন করেন, কিন্তু ছেলেবেলায় আকবর মারা যাবার সময় কিংবা আট বছর পূর্বে যখন তার অত্যন্ত প্রিয় আম্মিজান মারা যান তখন তিনি যেমন মানসিক

যন্ত্রণা অনুভব করেন সে রকম গভীর দুঃখের কোনো লক্ষণ আপাতভাবে প্রতীয়মান হয় না। পিতা আর পুত্রের মধ্যকার ভালোবাসার বন্ধন বহু পূর্বেই এক পাশে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিপর্যস্ত বলি আর অন্য পাশে সন্দেহের টানাপড়েনের মাঝে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

শাহজাহান অচিরেই উত্তরমুখী অভিযানের পরিকল্পনা করতে শুরু করেন। শাহজাহান এবং মমতাজ, যিনি এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আবারও গর্ভবতী, তার জ্যোতিষীদের দ্বারা বিবেচিত মঙ্গলময় দিনে সিংহাসনে নিজের দাবি কায়েম করতে, মহবত খানের রক্ষীবাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। তারা যখন পথে রয়েছেন, শাহজাহান আসফ খানের কাছ থেকে শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে 'বিজয় আর সাফল্যের শুভ সংবাদে পূর্ণ' একটি বার্তা লাভ করেন এবং অনুনয় করেছেন যে, 'পৃথিবীকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে উদ্ধার করতে তার মহিমান্বিত সফরসঙ্গীদের দ্রুততার ডানায় ভর করে অগ্রসর হওয়া উচিত।' অন্যভাবে বলতে গেলে, তাকে দ্রুত অগ্রসর হতে হুঁশিয়ার করছেন।

অল্পবয়সী পুতুল সম্রাটের সুতা কাটার সময় ঘনিয়ে আসে। শাহজাহান যত কম সম্ভব ভাগ্যের ওপর ভরসা করার সিদ্ধান্ত নেন। আগ্রার কাছাকাছি পৌঁছে, লাহোরে অবস্থানরত আসফ খানকে তিনি তার স্বহস্তে লিখিত একটি চিঠি পাঠান 'যদি খসরুর সন্তান, দাওয়ার বকস, তার অপ্রয়োজনীয় ভাই (শাহরিয়ার) এবং যুবরাজ দানিয়েলের (বহুকাল পূর্বে মৃত জাহাঙ্গীরের ভাই) পুত্রদের (দুজন), সবাইকে পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করা গেলে এর ফল হয়তো ভালোই হবে।' তার শ্বশুর-আব্বাজান খুশি মনে, শাহজাহানের কাছ থেকে বার্তা পাবার মাত্র দুই দিন পরেই, চারজনকেই হত্যার আদেশ দেন এবং বাড়তি সতর্কতা হিসেবে দাওয়ার বকসের ছোট ভাইকেও অন্য হতভাগ্যদের সঙ্গী হিসেবে প্রেরণ করেন। তাদের সম্ভবত শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল।*

এক সৎভাই, দুই ভাতিজা এবং দুজন আত্মীয়সম্পর্কিত ভাইকে এভাবে নির্মমভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় দেয়ায় রাজকীয় সিংহাসনের জন্য তৈমূর বংশীয় নিকটাত্মীয় প্রতিপক্ষের সবাইকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। শাহজাহানের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন দিনপঞ্জি রচয়িতা তার এই পদক্ষেপের পক্ষে সাফাই দেয়ার চেষ্টা করে বলেন, এটা ছিল হত্যা করার কিংবা নিজে নিহত হবার একটি প্রশ্ন। 'আত্মরক্ষণ, মানবিক মানসিকতার প্রথম নীতি, যা প্রায়ই সহৃদয় যুবরাজদের নৃশংস শাসকে রূপান্তরিত করে এবং সে জন্যই প্রয়োজনের খাতিরে মানুষ এমন সব পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়, যা হয়তো তাদের আত্মা ঘৃণা করে।' একটি প্রাচীন মোগল প্রবাদে এই উভয় সংকট নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে

---

* অন্য সূত্র অনুসারে, দাওয়ার বকস বস্তুতপক্ষে পারস্যে পালিয়ে যান। জ্যাঁ- ব্যাপটিস্ট ত্রেভার্নিয়ে, বিখ্যাত ফরাসি মণিকার, সেখানে তাকে দেখেছেন বলে পরবর্তী সময়ে দাবি করেন।

তোলা হয়েছে— *'তখন তক্তা'*, 'সিংহাসন বা শবাধার?' অবশ্য, তৈমূরী বংশীয় যুবরাজদের নিরাপত্তার পালিত নীতির এ অবমাননা এবং তার আগে খসরুর হত্যাকাণ্ডের কর্মফল শাহজাহানের কাছেই ফিরে আসে।

শাহজাহানের নিজের এবং তার বিশাল পরিবারের ভবিষ্যৎ সাময়িকভাবে যদিও নিশ্চিত বলে মনে হয়। তাদের অগ্রযাত্রা অচিরেই গৌরবদীপ্ত শোভাযাত্রায় পরিণত হয়, যখন তারা যেসব প্রদেশ দিয়ে অতিক্রম করছে সেখানকার সুবেদার এবং স্থানীয় গোত্রপতিরা তাড়াহুড়া করে এসে অভিবাদন জানান এবং উপহার দেন। ইংরেজ করণিক, পিটার ম্যানডি, যিনি সেই সময়ে ভারতবর্ষে অবস্থান করছিলেন, ফরাসি মণিকার ত্রেভার্নিয়ে ১৬৩৮ সালে যিনি প্রথমবার এখানে আগমন করেন এবং ভেনিসের পর্যটক নিকোল্লাই মানুচি ১৬৫৬ সালে যিনি সেখানে পৌছান, সবাই পুরো যাত্রাপথে নানা সম্ভাব্য নাটকের ভীষণ বর্ণময় বিবরণ লিখেছেন, যা একাধিক কষ্টকল্পিত শঙ্কর কাহিনীর জন্ম দিয়েছে। এমনই একটি গল্পের ভাষ্য অনুসারে, বিজাপুরের রাজা সিংহাসন দাবি করতে দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করতে শাহজাহানকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু শাহজাহান গোপনে ছাগলের রক্ত গলধঃকরণ করেন, যা রাজার সামনে মৃত্যুর রঙিন উদ্দীপক দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে তিনি বমি করেন। মমতাজ তখন 'তার স্বামীর মৃতদেহ তার আপন দেশে সমাধিস্থ করার জন্য বয়ে নিয়ে' যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাকে অনুমতি দেয়া হয় এবং 'কালো দিয়ে আবৃত একটি শবাধারে' খুবই জীবন্ত শাহজাহানকে উত্তরে পাচার করা হয়, 'দুঃখের সমস্ত প্রতীক দিয়ে সাজিয়ে এবং তার সব লোকজন বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদতে কাঁদতে পথ চলতে থাকে।' অনুমানসিদ্ধ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুগামীরা আগ্রার দিকে অগ্রসর হতে থাকে, আসফ খান শোকার্ত দলটার সাথে এসে মিলিত হন এবং শবাধার ভেঙে ফেলার আদেশ দেন, যারপর 'কল্পিত পরলোকগত' শাহজাহান, 'নিজেকে উঁচু করে এবং সমবেত বাহিনীর সবার চোখের সামনে আবিভূর্ত হন।'

ঘটনা যা-ই হোক না কেন, ১৬২৮ সালের ২৪ জানুয়ারি, শাহজাহানের জ্যোতিষীদের দ্বারা অনুমিত একটি অনুকূল দিনে, শাহজাহান আর তার পরিবার ধীরে ধীরে দুলতে থাকা হাতির বহরের একটি চমকপ্রদ শোভাযাত্রা নিয়ে আগ্রায় উপস্থিত হয়, সমবেত জনতার উদ্দেশে 'ডানে-বামে স্তূপীকৃত মোহর বর্ষিত করে' তাদের উৎফুল্ল চিৎকার রাজকীয় নাকাড়ার গুরুগম্ভীর গর্জনের নিচে চাপা পড়ে যায়। আসফ খান যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'চিরনবীন আগ্রার উঁচু আর নীচু শ্রেণী তাকে এমন একটি অভ্যর্থনা প্রদান করে, যার সাথে আগের কোনো শাসককে দেয়া অভ্যর্থনার তুলনা হয় না।' লাহোরে যেহেতু ইতিমধ্যে শাহজাহানের নামে *খুতবা* পাঠ করা হয়েছে, তার এখন কেবল দুর্গের অভ্যন্তরে দেওয়ানি আমের দরবারে ব্যক্তিগত দর্শনার্থীদের সামনে সিংহাসনে আরোহণ করাই বাকি রয়েছে। ১৬২৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দিনটা মনোনীত করা হয়, সেদিন আকবরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার বাহাত্তরতম বার্ষিকী এবং সেইসাথে বাবরের ১৪৫তম জন্মদিন।

শাহ্জাহান যেসব অহংকারী উপাধি নিজের বলে দাবি করেছেন তার ভেতর রয়েছে 'পৃথিবীর অধিশ্বর', 'বিশ্বাসের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ' এবং 'মঙ্গলময় সংযোগের দ্বিতীয় প্রভু'—তৈমূরের একদা গর্বিতভাবে ব্যবহৃত উপাধির সরাসরি আত্মসাৎকরণ। শাহ্জাহান একই রকম গর্বিত বোধ করতেন যে, তিনি মহান তৈমূরের সরাসরি অধঃস্তন দশম শাসক।

অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান, যা আক্ষরিক অর্থেই নতুন সম্রাটের মাথায় বর্ষিত রত্নের কারণে জ্বলজ্বল করে, যা মমতাজ এবং হারেমের অন্য রমণীদের দ্বারা প্রেরিত। শাহ্জাহান রেশমের সম্মানজনক আলখাল্লা, রত্নখচিত তরবারি, নিশান, নাকাড়া এবং স্তূপীকৃত সোনা, রুপা আর রত্নপাথর তার অভিজাতদের দান করেন এবং এসবের বদলে তাদের উপহার গ্রহণ করেন। তিনি তার শ্বশুর-আব্বাজান আসফ খানকে, যিনি লাহোর থেকে অল্পবয়সী দুই যুবরাজকে নিয়ে ফিরে আসছেন আর সে কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না, তার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। আসফ খানের আব্বাজান ইতিমাদ-উদ-দৌলা যে ভূমিকা জাহাঙ্গীরের জন্য পালন করেছিলেন এবং মহবত খানকে আজমীরের সুবেদার এবং রাজকীয় সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে বহাল করেন। অনুষ্ঠান শেষে শাহ্জাহান তারপরে রেশমের পর্দাশোভিত হারেমে ফিরে এসে, পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক মমতাজ, 'সময়ের রানি'কে, যিনি এত বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করার পরও সব সময় তার পাশে ছিলেন, তাকে পুরস্কৃত করেন। তিনি তাকে দুই লক্ষ টুকরো সোনা, ছয় লক্ষ টুকরো রুপা এবং বাৎসরিক দশ লক্ষ রুপি ভাতা প্রদান করেন।

কয়েক দিন পরে, মার্চ মাসের গোড়ার দিকে, মমতাজের আব্বাজান আসফ খান এবং তার আম্মাজান দারা শুকোহ্ আর আওরঙ্গজেবকে নিরাপদে তার কাছে ফিরিয়ে দিলে তিনি তার অল্পবয়সী দুই ছেলের সাথে পুনরায় মিলিত হন, যাদের কাছ থেকে দুই বছরের বেশি সময় তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন। শাহ্জাহানের রাজকীয় দিনপঞ্জির রচয়িতা, যা অবশ্যই দারুণ আবেগঘন একটি ঘটনা ছিল সেটাকে আবেগহীন ভাষায় বর্ণনা করেছেন : 'মহামান্য সম্রাজ্ঞী সুমহান যুবরাজদ্বয়ের এবং তার শ্রদ্ধেয় মাতা-পিতার আগমনের সংবাদ শ্রবণ করে ভীষণভাবে আনন্দিত হন। সম্রাটের অনুমতি নিয়ে, তিনি রাজকুমারী জাহানারা বেগম ও রাজপরিবারের অন্য সন্তানদের সাহচর্যে নিজের মহাপ্রাণ পিতা-মাতাকে শুভেচ্ছা জানাতে এগিয়ে যান; অন্যদিক থেকে যুবরাজদ্বয় এগিয়ে আসেন মহামান্য সম্রাজ্ঞীকে বহনকারী পালকির সাথে মিলিত হতে। তারা একটি স্থানে মিলিত হন...যেখানে এই উপলক্ষে আগেই তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পরে সবাই একে অপরকে দেখে আবেগআপ্লুত হয়ে পড়ে।'

পরের দিন, অভিজাতদের অভিজাত দ্বারা সম্মান প্রদর্শনপূর্বক, আনন্দিত এবং দুশ্চিন্তামুক্ত সম্রাজ্ঞী এবং তার সন্তানেরা সাম্রাজ্যের রাজধানীতে মিছিল করে প্রবেশ করে যেখানে লালকেল্লার *ঝরোকা* বারান্দায় যুবরাজেরা উৎফুল্ল জনতার সামনে উপস্থিত হলেও তাদের দুশ্চিন্তামুক্ত আম্মিজান সেখানে ছিলেন না।

পাদশাহনামার একমাত্র অলংকৃত পাণ্ডুলিপিতে, শাহজাহানের রাজত্বকালের সরকারি দিনপঞ্জিতে একটি চমৎকার চিত্রকর্ম রয়েছে, যা উইন্ডসর ক্যাসলের রয়েল লাইব্রেরিতে রানির ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে, সেখানে বেগুনি রঙের আলখাল্লা পরিহিত রত্নসজ্জিত সম্রাটকে তার ছেলেদের সম্ভাষণ জানাতে দেখা যায়, যুবরাজেরাও কমলা রঙের কোট, সোনা আর সবুজ জেড পাথরের অলংকারের একই রকম বাহুল্যের সাথে সজ্জিত তাদের গলায় মুক্তার ছড়া শোভা পায়। দিনপঞ্জিতে বলা হয়েছে, শাহজাহান 'নিজের সন্তানদের চোখের সামনে ভীষণ আনন্দিত হন, যারা সবাই তার প্রিয়তম স্ত্রীর গর্ভে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।'

এই দিনগুলো আনন্দ আর প্রীতিময় হওয়া উচিত। মমতাজ প্রত্যাগত যুবরাজদ্বয়কে তাদের নতুন ভাই, যাকে তারা কখনো দেখেনি পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন—পনেরো মাস বয়সের সুলতান লুফত আল্লাহ, শাহজাহানের সাথে নির্বাসনের অনিশ্চিত দিনগুলোতে যার জন্ম। ষোলো বছর আগে তার বিয়ের পর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া এগারো সন্তানের ভেতরে আটজন জীবিত এবং এখন তারা সবাই আপাতদৃষ্টিতে প্রাণবন্ত। শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণের মাত্র তিন মাসের ভেতরেই যদিও এই পরিস্থিতি বদলে যায়। ১৬২৮ সালের এপ্রিলের শেষ নাগাদ, মমতাজের সন্তান জন্ম দেয়ার নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বে, তাদের সাত বছর বয়সী কন্যা সুরাইয়া বানু গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তারপর, ১৬২৮ সালের মে মাসের ৯ তারিখে, দরবারের একজন দিনপঞ্জিকার উল্লেখ করেন যে, 'আকাশে মঙ্গলময় এক তারকার আবির্ভাব হয়েছে'—মমতাজের গর্ভে শাহজাহানের আরো একজন পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তার অষ্টম পুত্র, সুলতান দৌলত আফজা।

এ ঘটনার কারণে যদি পূর্ববর্তী দুঃখসমূহ প্রশমিত হয়েও থাকে সেটা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ব্যাপী। পাঁচ দিন পরে, 'সবাই যখন এই পৃথিবীর নিয়ামতসমূহ উপভোগ করছে' এবং শাহজাহান সবার মাঝে উদার হস্তে দান করছেন উচ্চপদস্থ অমাত্য থেকে শুরু করে 'পাগড়ি পরিহিত ধর্মীয় পণ্ডিত, যোগ্য ব্যক্তি এবং গায়ক আর নর্তকী' এবং তার প্রাণপ্রিয় মমতাজকে উপহারে ভরিয়ে দিচ্ছেন, খুদে সুলতান লুফত আল্লাহ, 'বেহেশতের একগুঁয়ে ইচ্ছার কারণে', সহসা 'অন্য পৃথিবীর শরণে' প্রস্থান করেন।

সেই সময় মানুষ যদিও শিশুমৃত্যুর আপাতভাবে উচ্চহারের সাথে পরিচিত ছিল, রাজপরিবারে একজন নবজাতকের মৃত্যু সব সময় গভীরভাবে শোকাহত করে এবং রাজত্বকাল শুরু হবার শুরুতে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটো শিশুর মৃত্যু নিশ্চিতভাবেই মনে হয় একটি খারাপ সংকেত। ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকরাও অস্বস্তিবোধ করেন নতুন রাজত্ব কী বয়ে আনতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে। অবশ্য তাদের উদ্বেগের কারণ ভিন্ন। একজন লেখেন, 'বর্তমান শাসকের প্রকৃতি অনুসারে, এখনই কোনো মন্তব্য ব্যক্ত করা অসম্ভব যদিও এটা আগে থেকেই অনায়াসে বলা যায় যে, এত অপরাধের মাধ্যমে সূচিত রাজত্ব অবশ্যই অশুভ লক্ষণযুক্ত হিসেবে প্রমাণিত হবে এবং এত নিরপরাধের রক্ত ঝরিয়ে যে সিংহাসনের অধিষ্ঠান, অবশ্যই সেটা নিরাপত্তাহীন প্রতিপন্ন হবে।'
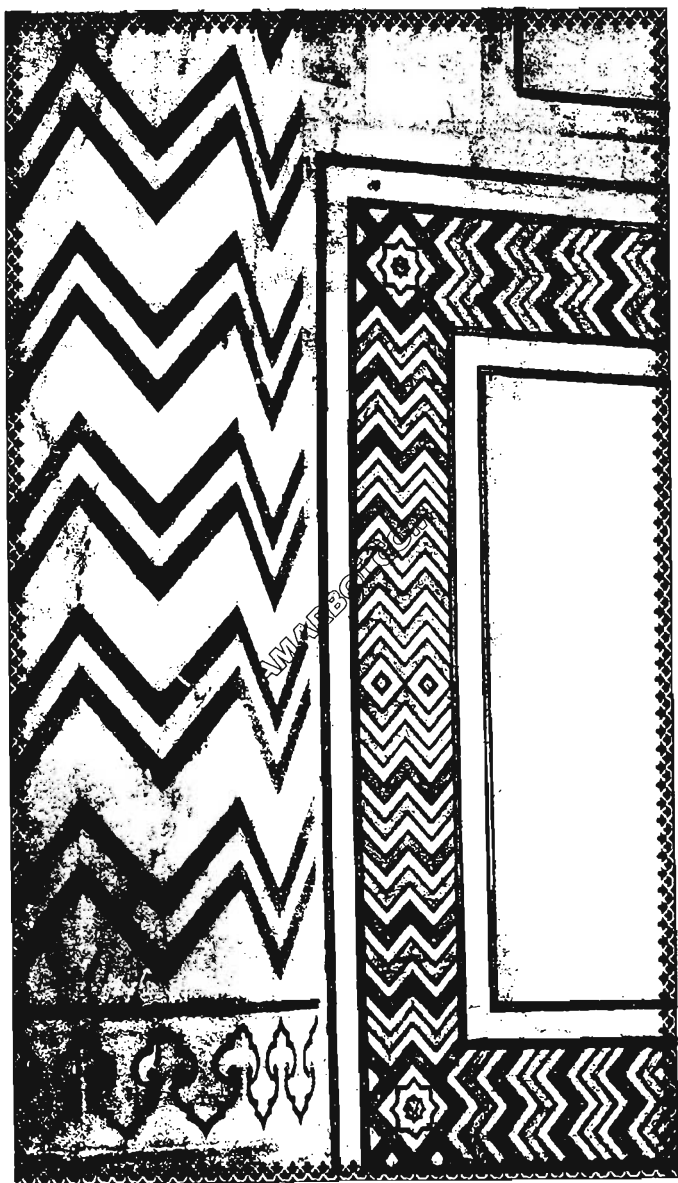
সপ্তম অধ্যায়

ময়ূর সিংহাসন

জাহাঙ্গীর তার শেষের বছরগুলোয় নানা সমস্যায় জর্জরিত থাকা সত্ত্বেও কখনো অসফল ছিলেন না। তিনি যদিও মোগল ভূখণ্ড উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেননি, বস্তুতপক্ষে পারসিকদের কাছে কান্দাহার হারিয়েছেন, তিনি দাক্ষিণাত্যের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনে অনিচ্ছুক সুলতানদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন, রাজস্থানে বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাম্রাজ্যকে তুলনামূলকভাবে সুস্থিত করে যান। তার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল আপন সন্তানদের বিদ্রোহ—তার রাজত্বের সূচনালগ্নে অধৈর্য খসরুর হঠকারিতা এবং রাজত্বের শেষপ্রান্তে *বি-দৌলত'*—'ভাগ্যপীড়িত' শাহজাহান।

অবশ্য ১৬২৮ সালে শাহজাহান যখন মমতাজকে পাশে নিয়ে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তার তখন ছত্রিশ বছর বয়স, নিজের যৌবনের উত্তমাংশে এবং অন্তর্ঘাতী সংঘাতের কোনো ভয় নেই। তিনি তার আব্বাজানের থেকে একেবারেই সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের অধিকারী। উভয়েই যদিও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি, গভীরভাবে সৌন্দর্যগ্রাহী আর বিলাসিতার কদর বুঝতে সক্ষম হলেও, শাহজাহান অনেক বেশি তেজস্বী আর আত্মসংযমের অধিকারী। জাহাঙ্গীরের মতো নন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক আগেই নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন এবং তার মতো সুরার প্রতি অত্যধিক আসক্তি ছিল না। শাহজাহানের ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করেছেন, তার আব্বাজানের অনুরোধ সত্ত্বেও তরুণ বয়সে তিনি কেবল কালেভদ্রে পান করতেন, 'উৎসবের সময় এবং মেঘাচ্ছন্ন দিনে' এবং ১৬২০ সালে সুরাপান পুরোপুরি বর্জন করেন।

তার রাজত্বের প্রথম বছরের একটি প্রতিকৃতিতে—তার অর্জনসমূহ উদ্‌যাপন করতে ভাবমূর্তি-সচেতন শাহজাহানের নিযুক্ত করা অসংখ্য চিত্রকর্মের একটি—নতুন সম্রাটের মুখপার্শ্ব উজ্জ্বল সবুজের প্রেক্ষাপটে প্রদর্শন করে। তার কালো, নিখুঁতভাবে ছাটা গোঁফ আর শ্মশ্রু একটি শক্তিশালী চমৎকার মুখরেখার

অধিকারী মুখাবয়বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার মুক্তার বিশাল কানের দুল এবং গলার আর কব্জির চারপাশে আর তার কমলা রঙের পাগড়ি আটকাতে ব্যবহৃত নানা ধরনের রত্নবিজড়িত মুক্তার মালার গোছা তার পৌরুষকে খর্ব করার চেয়ে বরং আরো বেশি গুরুত্বারোপ করে। শাহজাহানকে ডান হাতে তার তরবারির বাট আঁকড়ে ধরা অবস্থায় যখন তার বাম হাতে রয়েছে রাজকীয় সিলমোহর, যেখানে তৈমূর পর্যন্ত তার পূর্বপুরুষদের নাম খোদাই করা রয়েছে, দেখতে কোনো সন্দেহ নেই তিনি সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন, পৌরুষ আর নিয়ন্ত্রণের প্রতিকৃতি মনে হয়।

শাহজাহান, মমতাজ আর তার সন্তানেরা আগ্রার লালকেল্লায় পরবর্তী আঠারো মাস শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করে। রাজকীয় হারেমের জাঁকালো আবাসিক স্থানসমূহ মমতাজকে নিশ্চিতভাবেই অভ্যর্থনা জানায়। শাহজাহানের বিশ্বস্ত 'ভ্রমণকালীন সঙ্গী' হিসেবে বিভিন্ন স্থানে তার ইতস্তত ভ্রমণের পরে, তিনি অবশ্যই এখন তার 'স্বগৃহে সান্ত্বনা উৎস।' ব্যক্তিগত খোজা সহকারী এবং শতাধিক মহিলা পরিচারিকা পরিবেষ্টিত অবস্থায়, বিলাসবহুল আসবাবে সজ্জিত কক্ষসমূহে যেখানে তার ফুপুজান নূর একসময় কর্তৃত্ব করেছেন, তিনি এখন নিরুদ্বেগ হতেই পারেন।

শাহজাহান স্থাপত্যকলা কেবল পছন্দই করতেন না, সেইসাথে তিনি খুব ভালো করেই জানতেন যে, ভবনাদি নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ তার রাজকীয় ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় জাগ্রত করতে আর তার পূর্বপুরুষদের থেকে তার রাজত্বকালকে স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি দেয়ার একটি উপায়। তিনি তাই আগ্রা দুর্গকে কীভাবে নতুন রূপ দিয়ে এখানের জনসাধারণের কক্ষগুলোকে আরো আকর্ষণীয় আর ব্যক্তিগত কক্ষগুলোকে আরো বিলাসবহুল করা যায় সে বিষয়ে বিবেচনা করতে আরম্ভ করেন। তিনি বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত নেন আকবরের সময়ের বেলে পাথরের ভারী অবকাঠামোর বদলে খোলামেলা 'আকাশস্পর্শী' হলঘর তৈরি করবেন, যার মেঝে সাদা মার্বেলের হবে এবং প্রশস্ত আঙিনায় থাকবে গোলাপ-জলের প্রস্রবণ।

তার ব্যক্তিগত কক্ষ থেকে যমুনা দেখা যায়, সেখানে ফুলের নকশা করা, মার্বেলের সূক্ষ্ম অন্তঃপটের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো এমনভাবে চুইয়ে প্রবেশ করে যে, সূর্যকিরণের রুক্ষতা হ্রাস পেয়ে কোমল আভায় পরিণত হয়। মোগলরা তাদের তাদের জীবনের বেশির ভাগ সময় কোমল আলোয় অতিবাহিত করে। সূর্যের আলো গ্রীষ্মকালে যখন বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাদের পরিচারকেরা রেশমের পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে আলো ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়। বাতাসের শীতল প্রভাব বৃদ্ধি করতে তারা খিলানাকৃতি গবাক্ষগুলো *টাট্টি*, কাশ ঘাসের শেকড় ঝোলানো পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়ে, নিচে তারা পানির ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত করে সুগন্ধি বাতাসের একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে। শীতকালে তারা

রাজকীয় কক্ষগুলোয় মখমল আর রেশমের বুটি দেয়া কাপড়ের পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে বাতাসে কখনো বেড়ে যাওয়া শীতের প্রকোপ ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।

মমতাজের সাথে 'বেহেশতের ন্যায়' কাশ্মীরে অনাগত দিনগুলোয় ভ্রমণের সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরে শাহজাহান শালিমার উদ্যানের কলেবর বৃদ্ধির আদেশ দেন। তিনি কাশ্মীরের সুবেদারকে বিশেষ করে আদেশ দেন এক গম্বুজবিশিষ্ট একপার্শ্ব উন্মুক্ত সাদা মার্বেলের বতর্মান ভবনের ঠিক উল্টোদিকে কালো মার্বেলের অনুরূপ আরেকটা ভবন নির্মাণ করতে। আপেল, নাশপাতি, আঙুর আর আখরোট গাছ এবং পানির বৃত্তাকার জলাধারের মাঝে উদ্যানের নতুন অংশের নাম হবে ফয়েজ-বকস, 'নিয়ামত দাতা'। যমুনা নদীর তীরে মমতাজ তার নিজের জন্য চত্বরযুক্ত একটি আনন্দ উদ্যান নির্মাণ করতে শুরু করেন—যতদূর জানা যায়, এটাই তার দ্বারা গৃহীত একমাত্র স্থাপত্য প্রকল্প এবং সম্ভবত এই একটির জন্যই তিনি সুযোগ আর সময় পেয়েছিলেন।*

হারেমের পাশে তার সন্তানদের নিজেদের আবাসিক কক্ষ রয়েছে এবং তারা দিনের অধিকাংশ সময়ই তার সাথে কাটায়। তিনি তার বড় মেয়ে জাহানারার, যিনি একজন দিনপঞ্জি রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে, 'ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন বিচক্ষণ, প্রাণবন্ত, উদার আর মার্জিত স্বভাবের' এবং যার সাথে তার নিজের চেহারার মিল ছিল, তার প্রতিই বেশি অনুরক্ত ছিলেন। যমুনার তীরে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় মমতাজের পিতা-মাতা বাস করতেন এবং আসফ খান, প্রধানমন্ত্রীর পদাধিকারী হওয়ায় প্রতিদিন শাহজাহানের দরবারে উপস্থিত থাকতেন। দরবারের একজন ভাষ্যকার অনুযায়ী, শাহজাহান সিংহাসনের আরোহণের কিছুদিন পরেই আসফ খানকে 'চাচাজান' বলে সাদর সম্ভাষণ করতে শুরু করেন, সবাইকে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত করে তোলেন।

শাহজাহানের তার শ্বশুর-আব্বাজানের প্রতি শ্রদ্ধার আরেকটা নিদর্শন হলো তিনি যখন তার সাথে মমতাজ আর সন্তানদের নিয়ে দেখা করতে যেতেন তিনি সরাসরি তার বাসায় গমন করতেন। আসফ খান যথাযথভাবে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন করতেন : 'মহামান্য সম্রাটের পায়ের নিচে একটি গালিচা বিছিয়ে দিতেন এবং তার মাথার ওপর মোহর বর্ষিত করতেন' এবং 'মূল্যবান রত্ন, রত্নখচিত অলংকার, কাপড়, সোনা আর রুপার অলংকার সজ্জিত কিবচাকি ঘোড়া আর পাহাড়ের মতো দেখতে হাতি এমন চমৎকার সব উপহার দিতেন।' রাজপরিবার সেখানে বেশ কয়েক দিন নাচ-গান আর বিশাল ভোজসভার আয়োজন করে আনন্দে দিন অতিবাহিত করত।*

---

* মমতাজের নদীরতীরবর্তী উদ্যান, বর্তমানে জাহারা বাগ নামে পরিচিত, রামবাগের দক্ষিণে অবস্থিত, যা একদা তার ফুপিজানজান নূর চাষাবাদ করতেন।

* আসফ খানের সুরম্য অট্টালিকা আপাতদৃষ্টিতে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কামান দেগে উড়িয়ে দেয় যখন তারা আগামীতে সিপাহিদের

নূর অবশ্য এই ঘনিষ্ঠ পারিবারিক চক্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। উচ্চাশা আর আবেগ শেষ হতে, তিনি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে নিজের পরাজয় মেনে নেন এবং লাহোরে নিজের কন্যা লাডলি, যাকে তিনি মমতাজের পরিবর্তে সম্রাজ্ঞীর করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার সাথে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে গুটিয়ে নেন। শাহজাহান দ্বারা তার জন্য বরাদ্দকৃত ২০০,০০০ রুপি ভাতা সম্বল করেই তিনি জীবনযাপন করতে থাকেন। তিনি যমুনার পূর্বতীরে তার আব্বাজান ইতিমাদ-উদ-দৌলা এবং আম্মাজানের জন্য যে ছোট কিন্তু চমকপ্রদ সমাধিসৌধ নির্মাণ করতে শুরু করেছিলেন এবং যার নির্মাণকার্য তার পতনের বছরেই সমাপ্ত হয়েছিল সেটার অনুস্মৃতির মাঝেই দূরবর্তী নির্জনতায় কোনো সন্দেহ নেই পরিতৃপ্তি খোঁজার চেষ্টা করতেন।
সমাধিসৌধটা নির্মাণের ঐতিহ্য অনুসারে প্রাচীর দেয়া উদ্যানের অভ্যন্তরে শীতল প্রবাহিত জলের নহর আর দুই পাশে সারিবদ্ধ ঝাকড়া গাছের কাঠামোর মাঝে অবস্থিত ছিল। তিনি গম্বুজের একটি আচ্ছাদনের নিচে দ্যুতিময় মার্বেলের নিচু আর বর্গাকার নান্দনিক একটি কাঠামো তৈরি করেছিলেন এবং কাঠামোটার চারপাশে অষ্টভুজাকৃতি মিনারসদৃশ উঁচু স্তম্ভ ছিল, যাদের ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া শীর্ষদেশে পদ্মফুলের পাপড়ি উৎকীর্ণ। মেঝে আর দেয়ালে ভারতবর্ষে প্রথমবারের মতো অল্পমূল্যের রত্নপাথর—টোপাজ, নীলকান্তমণি, আকীক, রক্তিমাভ কর্নেলিয়ান আর জ্যাসপার দিয়ে কোথাও জ্যামিতিক নকশা আর অন্যান্য স্থানে ফুলের মার্জিত প্রাকৃতিক আকৃতি জটিলভাবে স্থাপন করা হয়েছিল। এই সমাধিসৌধ এবং প্রায় সমসাময়িক কালে দিল্লিতে নির্মিত আরেকটা কাঠামো যাকে চৌষট খাম্বা বলা হয়। সাদা মার্বেলে পুরোপুরি আবৃত প্রথম মোগল স্থাপনা, যা তাজমহলসহ শাহজাহানের নির্মিত অন্যান্য ভবনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ঐতিহ্য অনুসারে, এত দিন পর্যন্ত সাদা মার্বেল কেবল বেহেশতের স্মারক হিসেবে ইসলামের কামেল পুরুষদের সমাধিসৌধের জন্যই সংরক্ষিত ছিল।* একটি ছোট নিভৃত কাঠামোর চেয়ে দারুণভাবে রত্নখচিত অলংকরণের সামগ্রিক প্রভাবই মুখ্য হয়ে ওঠে।
নূর এরপর তার স্বামীর জন্য একটি সমাধিসৌধ নির্মাণে নিজেকে ব্যাপৃত করেন, যিনি বাবরের ন্যায় খোলা আকাশের নিচে সমাধিস্থ হবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন। লাহোরের বাইরে বিশাল দিলকুশা উদ্যানে, যা তিনি জাহাঙ্গীরের সাথে তার সুখের দিনগুলোতে নির্মাণ করেছিলেন এবং যেখানে তার অসংখ্য সুখস্মৃতি রয়েছে, একটি স্থান নির্বাচন করেন। একটি মামুলি নকশা নির্বাচন করা হয় : একটি বেদির ওপর অন্যত্র সমাহিত জাহাঙ্গীরের

সাথে তাদের মোকাবিলার সময় নিজেদের গোলাবর্ষণের আওতা পরিষ্কার করতে বেশি উদগ্রীব ছিল।

* ১৪৪০ সালে নির্মিত দুর্গশহর মানডুর সুবেদার হোসাঙ শাহের সাদা মার্বেলের সমাধিসৌধটাই একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল।

স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত একটি প্রস্তরখণ্ড, যা আবার একটি অতিকায় আয়তাকার মঞ্চের ওপর স্থাপিত, যার চারপাশে চারটি মিনার রয়েছে। এখানেও জটিল নকশার কারুকাজ রয়েছে তবে ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধের তুলনায় অনেক বেশি সংযত তাদের সৌন্দর্য।* নূর কাছেই, তার মৃত স্বামীর সমাধিসৌধের অনুকরণে নিজের জন্যও একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ শুরু করেন। তিনি সমাধিসৌধের চারপাশের উদ্যানে অজস্র সুগন্ধি গোলাপ আর মিষ্টিগন্ধযুক্ত জুঁই ফুলের গাছ রোপণ করেন।

■

শাহজাহান ইত্যবসরে অভূতপূর্ব মহিমার আভা প্রতিপালন করা অব্যাহত রাখেন, যা একটি সময়ে তার রাজত্বের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। তার দাদাজান আকবরের ন্যায়, তিনিও তার রাজত্বকালের মূল ঘটনাগুলো বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেন এবং তিনি যথেষ্ট যত্নের সাথে রচয়িতাদের নির্বাচিত করেন, নিয়মিত বিরতিতে তাদের পরিবর্তনও করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে নিয়মিত তাদের রচনা আবেক্ষণের পরই কেবল সেগুলোকে স্বীকৃতি দিতেন।* সেই সময়ের স্তাবকতাময় আর পুষ্পিত ভাষায় লিখিত হলেও, রচনাগুলো নিঃসন্দেহে তার দরবারের জৌলুশ বর্ণনা করে।

এ ছাড়া রয়েছে বিস্মিত হতবাক ইউরোপীয় পর্যটকদের ভাষ্য। ইংরেজ রাজদূত স্যার টমাস রোর কাছে জাহাঙ্গীরের দরবারকে মাঝে মাঝে কিছুটা অশিষ্ট মনে হয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালের সাথে তুলনায় এই সময়কে নিঃসন্দেহে মূক মনে হবে। প্রথমদিকের একজন দিনপঞ্জি রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে, 'রাজত্বের শেষার্ধে, প্রিয় সুলতানার (নূর), জৌলুশময় প্রদর্শনী শাহজাহানের দ্বারা প্রদর্শিত মহিমার বিশালতার কাছে হারিয়ে যায়।'

---

* শাহজাহানও হয়তো তার আব্বাজানের সমাধিসৌধ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
* শাহজাহানের রাজত্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় দিনপঞ্জি রচয়িতা ছিলেন মির্জা আমিনা কাঝওয়ানি, যিনি শাহজাহানের যুবরাজ থাকা কালীনসময়ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন; আবদুল হামিদ লাহোরি শাহজাহানের রাজত্বে প্রথম ছাব্বিশ বছরের বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন, *পাদশাহনামা;* মাহমুদ ওয়ারিস, লাহোরির শিষ্য যিনি লাহোরির পরে শাহজাহানের রাজত্বের ত্রিশতম বছর পর্যন্ত ভাষ্যকারের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ইনায়েত খান, শাহজাহানের গ্রন্থাগারের আধিকারিক যিনি তার পূর্বসূরিদের রচনার একটি চৌকস সারসংক্ষেপ লিখেছেন। মাহমুদ সালিহ্ কামবো, যদিও দরবারের রাজকীয় ঐতিহাসিক ছিলেন না তিনি মহাফেজখানার একজন সদস্য ছিলেন কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বের অন্যদের রাজকীয় ঐতিহাসিকদের রচনাপঞ্জিকে আকর হিসেবে ব্যবহার করে এবং তার সাথে নিজের স্মৃতিকথা যোগ করে রাজত্বের একেবারে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত একটি বিবরণ লিখেছেন।

শাহজাহানের প্রথম কাজই ছিল রাজকীয় কোষাগারের রত্নের সবচেয়ে জমকালো সংগ্রহ প্রদর্শনের জন্য বিখ্যাত *তখত-ই-তাইস*, বা 'ময়ূর সিংহাসন' নির্মাণের আদেশ দেয়া। তার সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সাতটি কোষাগার থেকে তিনি নিজে সত্যিকারের সমঝদারের মতো রত্নপাথর নির্বাচিত করেন। আগ্রার কোষাগারেই কেবল ৭৫০ পাউন্ড পরিমাণ ওজনের মুক্তা, ২৭৫ পাউন্ড পরিমাণ পান্না এবং প্রবাল এবং পোখরাজ আর অন্যান্য কম দাম রত্নপাথর ছিল অগণিত পরিমাণে। আট ফিট দীর্ঘ, ছয় ফিট প্রশস্ত আর বারো ফিট উঁচু সিংহাসনটা নির্মাণে সময় লাগে সাত বছর এবং প্রয়োজন হয় ১,১৫০ কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ সোনা। শাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিক লাহোরির ভাষ্য মতে, 'চাঁদোয়ার বহিরাবরণ ছিল কলাই করা, যার মাঝে মাঝে ছিল রত্নখচিত, ভেতরের দিকে চুনি, গার্নেট আর অন্যান্য রত্নপাথর ঘনভাবে বসানো হয়েছিল আর বারোটা পান্নার তৈরি মিনারের ওপর এটা স্থাপিত ছিল। প্রতিটি স্তম্ভের ওপর প্রভূত রত্নখচিত এক জোড়া করে ময়ূর এবং প্রতি জোড়া ময়ূরের মাঝে ছিল চুনি, হীরক, পান্না আর মুক্তাখচিত একটি গাছ। সিংহাসনে আরোহণের তিনটি ধাপ স্বচ্ছ পানির মতো দেখতে রত্ন দিয়ে সজ্জিত ছিল।'

বাদশা সোলেমানের সিংহাসনের লোককাহিনী থেকে সম্ভবত নকশার ধারণাটা নেয়া হয়েছিল। সোলেমানের সিংহাসনের চারপাশে দণ্ডায়মান চারটা সোনার তৈরি তালগাছ—যার দুটোর মাথার সোনার তৈরি ঈগল আর অন্য দুটোর মাথায় সোনার তৈরি ময়ূর শোভা পেত—কীভাবে এর সাথে সম্পর্কিত। ইসলামে প্রচলিত একটি রীতি অনুযায়ী, ময়ূর একসময় বেহেশতের প্রবেশদ্বারের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। পাখিটা শয়তানকে খেয়ে ফেলে কিন্তু তারপর পেটের ভেতরে করে শয়তানকে বেহেশতে নিয়ে আসে, সেখানে শয়তান তার পেট থেকে পালায় এবং আদম আর হাওয়ার জন্য ফাঁদ তার পাতে।*

ফরাসি মণিকার জ্যা-ব্যাপটিস্ট ত্রেভার্নিয়ের ১৬৬৫ সালে প্রথম যখন সিংহাসনটা দেখেন তিনি কেবল একটি ময়ূরের বর্ণনা দেন, 'নীলা আর অন্যান্য রঙিন রত্ন দিয়ে উঁচু করে নির্মিত পেখম, দেহটা সোনার ওপর মূল্যবান রত্নখচিত, বুকের সামনে একটি বিরাট চুনি বসানো, যেখানে ৫০ ক্যারাট বা

---

* পান্না, সবচেয়ে প্রাচীন সত্যিকারের রত্নপাথর, মুসলমানেরাই সবচেয়ে বেশি কদর করত যারা সবুজকে মনে করে ইসলামের রং। তা ছাড়া ভারতে ধর্মীয় আর জ্যোতিষতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গুরুত্বের কারণে পান্নাকে অনেক আগে থেকেই অভ্যর্থনা করা হয়। ৫০০০ বছর পূর্বে মিশরে প্রথম পান্না আবিষ্কৃত হয় এবং রোমানরা ক্লিওপেট্রার খনিগুলোতে হামলা করেছিল এর সন্ধানে। শাহজাহানের সময়কালে উত্তর আমেরিকা থেকেও পান্না আসতে শুরু করেছিল।

সেই রকম ওজনের নাশপাতি আকৃতির একটি মুক্তা ঝুলছে।' মূল সিংহাসনের অন্যান্য ভাষ্যের সাথে লাহোরির বর্ণনার খুব সামান্য তারতম্যই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যা-ই হোক না কেন, সিংহাসনটা একটিমাত্র শিল্পকর্মে সংযুক্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রত্নের একটি সংগ্রহ ধারণ করত। ত্রেভার্নিয়ের তার জহুরির চোখ দিয়ে সিংহাসনটা যাচাই করে ১০৮টি বৃহদাকৃতি চুনি, যার কোনোটিই একশ ক্যারাটের কম হবে না আর কমপক্ষে ১১৬টি ত্রিশ থেকে ষাট ক্যারাটের পান্না দেখেছিলেন।

মোগল ঐশ্বর্য আর প্রতাপ দিয়ে দর্শনার্থীদের মধ্যে ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম সৃষ্টির একটি সুযোগ করে দিত বিভিন্ন উৎসবগুলো। শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথম নওরোজ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল ১৬২৮ সালের মার্চ মাসে। দরবারের একজন ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেছেন কীভাবে আগ্রার লালকেল্লার ভেতরে 'তাঁবু স্থাপনে দক্ষ তিন হাজার কারিগর যন্ত্রবিজ্ঞানের হাজার ধরনের উত্তোলক যন্ত্র যুক্ত' একটি অতিকায় তাঁবু স্থাপন করেছিল। বাবরের আমলের কার্যকর আবাসিক স্থাপনা হিসেবে রাজকীয় তাঁবুগুলো তাদের গুরুত্ব হারিয়েছে সেগুলো এখন চাঁদোয়া আর শামিয়ানাযুক্ত জটিল অত্যাধুনিক একটি স্থাপনা। শাহজাহানের বিশাল তাঁবুকে দিনপঞ্জির রচয়িতারা প্রশংসা করে বলেছেন 'বেহেশতের মহান তাঁবু' কিংবা 'মেঘমণ্ডলীর জটলা।' তাঁবুগুলো সোনা বা রুপার খুটির ওপর সোনার জরির কারুকাজ করা মখমলের। তার নিচে রয়েছে 'রুপার মাচাযুক্ত ছোট তাঁবু, যেগুলোর আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সোনার জরির কারুকাজ করা মখমল এবং বিচিত্র রঙের গালিচা আর অলংকৃত কার্পেট দিয়ে : সিংহাসন আর অন্যান্য আসন পাতা রয়েছে এবং রোদের হাত থেকে বাঁচাতে মুক্তাখচিত পর্দা ব্যবহৃত হয়েছে।' দরজা আর দেয়াল 'গুজরাটের সোনার জরি দেয়া কাপড় এবং ইউরোপের পর্দা আর চিন এবং তুরস্ক থেকে নিয়ে আসা মখমলের কাপড় আর ইরাকের সোনার জরিযুক্ত কাপড় দিয়ে সজ্জিত...'

শাহজাহানকে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পারিপার্শ্বিকতার সাথে মানানসই রীতিতে চিত্তাকর্ষক হতে হবে। তিনি এখন আর তার পূর্বপুরুষের মামুলি মুক্তাখচিত হেরনের পালক পাগড়িতে পরিধান করেন না বরং সেখানে এখন তার পছন্দের রত্নগুলো প্রদর্শনের জন্য ফুল-পাতার আকৃতিতে তৈরি গহনা শোভা পায়। অল্পবয়সী যুবরাজ হিসেবে তার আব্বাজানের দরবারে ইউরোপীয় অতিথিদের নিয়ে আসা হেরনের পালকের তৈরি শিরোভূষণ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং এখন সেগুলো প্রতিমান হিসেবে বেশ কাজে আসে। তার রাজত্বকালে পাগড়ির আকৃতিতেও বেশ পরিবর্তন আসে। তিনি মাথায় এখনো একই রীতিতে মাত্র চার আউন্স ওজনের হালকা কাপড় পেচান হয় কিন্তু একই কাপড়ের তৈরি বিপরীত রঙের একটি বন্ধনী মাথায় ভালো করে পাগড়িকে এঁটে

রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। জাহাঙ্গীরের ন্যায়, শাহজাহানও কারুকাজ করা রেশমের আজানুলম্বিত আলখাল্লা পরিধান অব্যাহত রাখেন এবং শীতকালে স্যাবলের পশমের আস্তরণযুক্ত পুরু কোটের ওপর মার্জিত ভঙ্গিতে কাশ্মিরী শাল জড়িয়ে রাখতেন। গ্রীষ্মকালে, সূক্ষ্ম মসলিন কিংবা স্যাটিনের তৈরি খাটো আস্তিনযুক্ত বর্হিবাস পরিধান করতেন। অবশ্য ইংরেজ অশ্বারোহীর মতো ভাববিলাসী হবার প্রত্যাশায় তিনি তার কাপড় ফিটখানেক চওড়া রিবন দিয়ে বাঁধার রীতি গ্রহণ করেন, যার কিছুটা অংশ অবহেলাপূর্ণ ভঙ্গিতে আলগা ঝুলে থাকত।
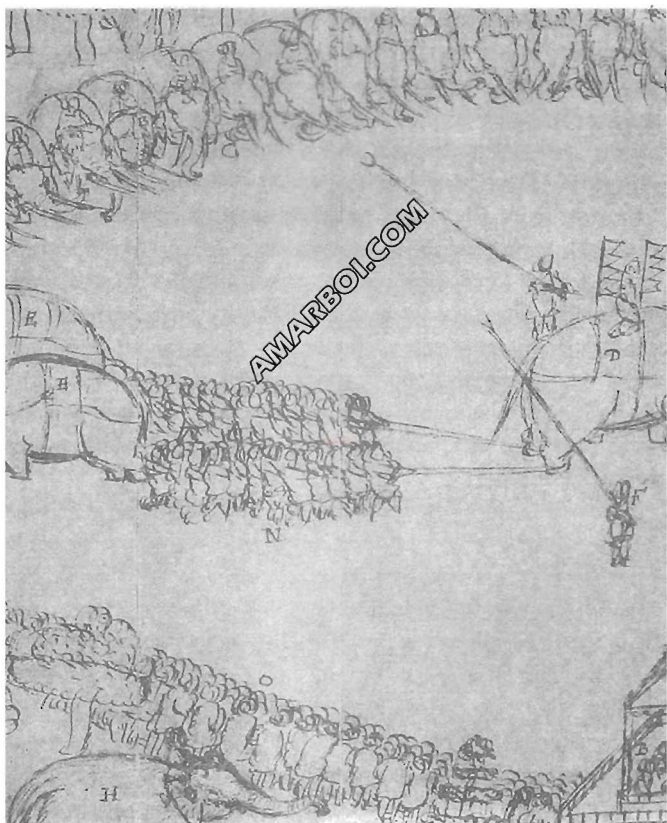
পিটার মানডির হাতির লড়াইয়ের স্কেচ।

নওরোজের পরে তখন সবচেয়ে আকর্ষণীয় উৎসব ছিল সম্রাটের জন্মদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে তার ওজন নেয়া। উৎসবটার মূল অবশ্য হিন্দু ঐতিহ্যের অন্তর্গত, যা হুমায়ুন কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। আকবর দুই দফা ওজন নেয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে একে আরো পরিশীলিত করেছিলেন—সৌরবছর অনুযায়ী জন্মদিনে একবার প্রজাদের জন্য ওজন করা হতো অন্যবার চান্দ্রমাস অনুযায়ী জন্মদিনে একান্ত অনুষ্ঠানে, শেষেরটা সাধারণত হারেমের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হতো। (সম্রাটের ভূমিষ্ঠ হবার দিনই কেবল সৌর আর চান্দ্রবছর অনুযায়ী জন্মদিন একটি তারপরে প্রতিবছর এগারো দিন করে তাদের ভেতরে দূরত্ব
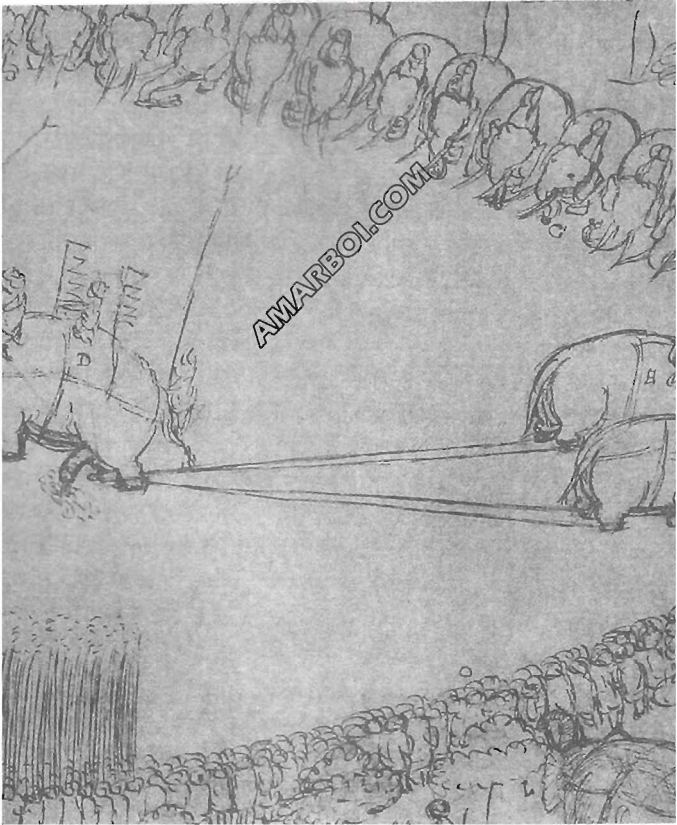
সৃষ্টি হতে থাকে।) ২৭ নভেম্বর ১৬২৮, তার রাজত্বকালে চান্দ্রবৎসর অনুযায়ী প্রথম জন্মদিন, সোনা আর অন্যান্য বিভিন্ন দ্রব্যের বিপরীতে শাহজাহানের ওজন নেয়া হয়। আকবর আর জাহাঙ্গীর, সৌরবৎসর অনুযায়ী জন্মদিনেই কেবল সোনার বিপরীতে নিজেদের ওজন করাতেন, কিন্তু জৌলুশের দিক দিয়ে তার সব পূর্বপুরুষকে ছাপিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর শাহজাহান দুটো অনুষ্ঠানেই সোনার বিপরীতে নিজের ওজন নির্ণয়ের প্রথা প্রবর্তন করেন।

অগাস্টিনিয়ান ফ্রায়ার সেবাসতিয়েন ম্যানরিকে, শাহজাহানের ওজন নির্ণয়ের আনুষ্ঠানিকতার পরবর্তীকালের একজন প্রত্যক্ষদর্শী, বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'নিখুঁতকারুকাজ করা আর পৃথিবীর সব মূল্যবান আর দামি জিনিসে ঠাসা একটি ব্যক্তিগত কক্ষের মাঝে...সোনার শেকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় সোনার তৈরি একটি দাড়িপাল্লা ঝুলছে, যার কিনারাগুলো নানা মূল্যবান রত্নখচিত। মহামান্য সম্রাট বিভিন্ন রঙের নানা বহুমূল্য পাথর বসানো সাদা স্যাটিনের আলখাল্লা পরিহিত অবস্থায় সামনে এগিয়ে আসেন, পাথরগুলোর রং যেমন একদিকে মানুষকে প্রীত করবে তেমনি তাদের আকৃতি তাদের একই সাথে বিস্মিতও করবে...দাড়িপাল্লার কাছে পৌঁছে...সম্রাট একদিকের পাল্লায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসেন এবং সাথে সাথে আধিকারিকেরা রুপার মোহর ভর্তি থলি নিয়ে এগিয়ে এসে অন্য পাল্লায় সেগুলো রাখতে থাকে, যতক্ষণ না দুই পাশের ওজন সমান হয়। এই ওজন নেয়া শেষ হলে, তারা রুপার মোহর ভর্তি থলিগুলো সরিয়ে নেন...তারা এরপরে সোনার মোহর আর মূল্যবান পাথর ভর্তি থলি দিয়ে দ্বিতীয়বার তার ওজন নেন। এটা সমাপ্ত হতে তারা সোনা, রুপা আর রেশমের সুতামিশ্রিত সুতির মূল্যবান কাপড়ের গাঁইট দিয়ে তৃতীয়বারের মতো সম্রাটের ওজন নেন। চতুর্থ ও শেষবারের মতো তারা ওজন পরিমাপের জন্য নানা ভোজ্য দ্রব্য যেমন ময়দা, ঘি, চিনি ও সাধারণের ব্যবহার্য মোটা সুতির কাপড় দিয়ে সম্রাটের ওজন নেন।' কোষাগারের আধিকারিকেরা সতর্কতার সাথে প্রথম তিনবারের ওজনের আর্থিক মূল্য নিরূপণ করেন এবং নির্ণীত মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ শেষবারের ওজন নেয়ায় ব্যবহৃত সাধারণ দ্রব্যাদির সাথে দরিদ্রদের ভেতরে দান হিসেবে বিলিয়ে দেয়া হয়। ফ্রায়ার অবশ্য শাহজাহানের 'অতোষণীয় ধনপিসাসা' সম্বন্ধে সমালোচনার ভঙ্গিতে লিখেছেন, দরবারের সমস্ত উচ্চপদস্থ অমাত্যের কাছ থেকে তিনি যে বিপুল পরিমাণ উপহার লাভ করেন সেটা তার এই দানশীল উদারতাকে বহুগুণে ছাপিয়ে যায়।

উৎসব শেষে প্রায়ই হাতির লড়াইয়ের আয়োজন করা হতো। হাতিগুলোকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নামকরণ করা হতো—উদাহরণস্বরূপ : 'মঙ্গলময় প্রবর্তক', 'পর্বত বিনাশক', 'সদাসাহসী।' যমুনা নদীর কাছে সমতলের ওপর

চার ফিট চওড়া আর ছয় ফিট প্রশস্ত মাটির তৈরি একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়। আগ্রা দুর্গের নিজ নিজ আবাসন এলাকা থেকে সম্রাট আর রাজপরিবারের মহিলারা, মেয়েদের এলাকাগুলো অবশ্যই পর্দা দিয়ে ঘেরা থাকত, মাটির দেয়ালের বিপরীত পাশ থেকে পরস্পরের দিকে ধেয়ে আসা বিশালাকৃতি হাতির দিকে তাকিয়ে থাকতে, 'প্রতিটি হাতিতে দুজনের বেশি মাহুত থাকত, হাতির দুই কাঁধের ওপর বিশাল লোহার হুঁক দিয়ে প্রাণীগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বসে থাকা লোকদের ভেতরে কেউ যদি ছিটকে পড়ে যায় তার স্থান যেন তারা সাথে সাথে নিতে পারে' একজন ইউরোপীয় পর্যটক মন্তব্য করেছেন। মাহুতেরা প্রাণীগুলোকে স্তাবকতাপূর্ণ শব্দ দিয়ে বা তাদের ভীতু বলে পরিহাস করে খেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করত এবং নিজেদের গোড়ালি দিয়ে তাদের তাগাদা দিতে থাকত যতক্ষণ না হতভাগ্য প্রাণীটা দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রতিপক্ষকে ভীষণভাবে আক্রমণ করত। সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট অভিঘাতের মাত্রা ছিল প্রচণ্ড এবং হাতিগুলো তাদের গজদাঁত, মাথা আর শুঁড় দিয়ে পরস্পরকে যেমন ভয়ংকরভাবে আঘাত করত আর ক্ষত সৃষ্টি করত এটাই বিস্ময়কর যে, এর ফলে তাদের কদাচিৎ মৃত্যু ঘটত...' লড়াই এতটাই বিপজ্জনক ছিল যে, হাতির লড়াইয়ের দিন মাহুতেরা তাদের পরিবারের কাছ থেকে 'মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামির ন্যায় শেষ বিদায় নিয়ে ময়দানে উপস্থিত হতো।'

বাহ্যিক জৌলুশের ওপর ভীষণ নির্ভরশীল এমন একটি দরবারে মোগল রীতিনীতি আনুষ্ঠানিক আর জটিল হবে এটাই স্বাভাবিক। সমসাময়িককালের ইউরোপে সবচেয়ে পরিশীলিত আর নিয়ন্ত্রিত ফরাসি রাজদরবারের সাথে বাস্তবিকপক্ষে মোগল দরবারের ভীষণ সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ফরাসি আর মোগল দরবারে সম্রাটের কক্ষের দরজায় করাঘাত করাকে ভীষণ অশ্লীল বিবেচনা করা হতো। ফ্রান্সে, সভাসদদের কাছ থেকে আশা করা হতো তারা তাদের বামহাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে সম্রাটের দরজায় আঁচড় কাটবেন; আগ্রায়, তারা হাঁটু মুড়ে বসে নিজেদের হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে দরজায় শ্রদ্ধার সাথে আলতো আঘাত করত। উভয় দরবারেই সব অমাত্যের ব্যক্তিগত মর্যাদা নিখুঁতভাবে গণনা করা হতো। ফ্রান্সে, সম্রাটের উপস্থিতিতে একজন অমাত্যের আসন গ্রহণের জন্য নির্ধারিত চেয়ারের উচ্চতা তার মর্যাদার মাত্রা দ্যোতক হিসেবে কাজ করত; শাহজাহানের দরবারে, সম্রাটের উপস্থিতিতে বসার অনুমতি লাভ করাই ছিল ভীষণ সম্মানের বিষয়, যা খুব অল্প কয়েকজনকেই দেয়া হতো, যার পেছনে কাজ করত সম্রাট প্রভু আর বাকি সবাই তার দাস এমন একটি মনোভাব। যুবরাজরাও তাদের আব্বাজানের কাছ থেকে এই সম্মানের অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত বসার অনুমতি পেত না।

শাহজাহান এবং চতুর্দশ লুই, যিনি ১৬৪৩ সালে ফরাসি সিংহাসনে আরোহণ করেন, উভয়েই তাদের দীর্ঘ রাজত্বকালের বেশির ভাগ সময়ই প্রজাদের সামনে জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বর প্রদর্শনে ব্যয় করেছেন। সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের দিন প্রকাশ্য আনুষ্ঠানিকতার একটি ধারাবাহিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো : তিনি যখন ঘুম থেকে উঠে, ভারমুক্ত হয়ে প্রকাশ্যে পোশাক পরিধান করতেন তখন পালিত হতো *lever,* তিনি যখন শিকারের পর পোশাক পরিবর্তন করতেন, প্রার্থনার জন্য সর্বসাধারণকে নিয়ে গির্জায় যেতেন, আর বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সাথে দেখা করে আবেদনপত্র গ্রহণ করতেন তখন *debotter,* প্রজাদের সামনে তিনি যখন আলখাল্লা খুলে রেখে ঘুমাতে যেতেন তখন *coucher.* শাহজাহানের দিন শুরু হতো সকাল হবার দুই ঘণ্টা পূর্বে, 'রাতের আকাশে তখনো তারারা দৃশ্যমান', যখন তিনি আগ্রা দুর্গের রাজকীয় হারেমের সুগন্ধি বাতাসে জেগে উঠে অজু করে ফজরের নামাজ আদায় করতেন। সূর্যোদয়ের পরে, *ঝরোকা-ই-দর্শন,* যমুনা নদীর বালুকাময় তীরের ওপর প্রসারিত 'দর্শনের বারান্দা'য়, তার প্রজাদের সামনে দর্শন দিতেন। শাহজাহানের দরবারের দিনপঞ্জির রচয়িতা তার পাঠকদের সতর্কতার সাথে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'প্রয়াত সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রবর্তিত, দর্শনদানের এই রীতির অভিপ্রায় ছিল, সম্রাটের প্রজারা একই সাথে আকাশ আলোকিত করা সূর্য আর বিশ্বজয়ী সম্রাটকে দর্শনের সুযোগ লাভ করে এবং সেইসাথে এ দুই জ্যোতিষ্কের আশীর্বাদ তারা কোনো প্রকার বাধা বা বিপত্তি ছাড়াই লাভ করতে পারে।' সম্রাটের প্রাত্যহিক দর্শনদান, যা *দর্শন* নামে পরিচিত। একটি সংস্কৃত শব্দ থেকে এর উৎপত্তি, যার আক্ষরিক মানে 'মূর্তি বা সাধুপুরুষ দর্শন'—যা 'নির্যাতিত আর নিপীড়িত জনগণকে' সুযোগ করে দেয় 'তাদের প্রত্যাশা আর চাহিদা খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করতে।' দুর্গের দেয়ালের বাইরে সমবেত প্রজারা যখন তাদের সম্রাটের দিকে তাকিয়ে থাকে, শাহজাহান তখন হয়তো তার মনোরঞ্জনের জন্য যমুনার তীরে 'ভয়ংকর খুনি বুনো হাতির পালের' প্রদর্শনী, সৈন্যদের কুচকাওয়াচ কিংবা কসরতবাজ এবং দড়াবাজদের উদ্ভট কীর্তি দেখছেন।

শাহজাহান, এরপরে পুরু গালিচা পাতা প্রকাশ্য দর্শনের দেহলির দিকে এগিয়ে যান যেখানে 'দেয়ালের মতো' স্থির আর পরিপূর্ণ নীরবতায়, চোখ মাটির দিকে রেখে তার অমাত্য আর আধিকারিকেরা তার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। সিংহাসন থেকে প্রতিটি মানুষের দূরত্ব সতর্কতার সাথে তার মর্যাদা অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। সকাল আটটার কিছুক্ষণ আগে, শাহজাহান যখন হারেমের ভেতর থেকে একটি দরজার নিচে দিয়ে বের হয়ে এসে দরবার কক্ষের যে বর্ধিতাংশে সিংহাসন রয়েছে সেদিকে এগিয়ে যেতে থাকেন, তখন তূর্যধ্বনি আর নাকাড়ার

শব্দ 'পৃথিবীর অধিশ্বর'-এর আগমনের সংকেত ঘোষণা করে। সিংহাসনের পেছনের দেয়ালের ওপর পাথরের জাফরি কাটা জালির পেছনে অবস্থান করে মমতাজ তার স্বামীকে নানা আবেদন বিবেচনা করতেন, প্রতিবেদন গ্রহণ করতেন, পছন্দনীয় নানা উপহার সামগ্রী পর্যবেক্ষণ করতেন আর রাজকীয় পশুশালা থেকে হাতি আর ঘোড়া নিয়ে এসে তাদের পরীক্ষা করতেন আর যদি প্রাণীগুলোকে দেখে মনে হয় যে তারা অপুষ্টিতে ভুগছে তাহলে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্তদের শাস্তি দিতেন দেখে আর শুনে। শাহজাহানের নিকটবর্তী হতে আগ্রহী সব লোকেরই ডান হাতের উল্টা পিঠ মেঝেতে ঘষতে আর ডান হাতের তালু কপালে ঠেকিয়ে ক্রমাগতভাবে নীচু হয়ে অভিবাদন জানাতে জানাতে অগ্রসর হতে হতো। সম্রাটের কাছে পৌঁছাবার পরে, লোকটাকে এবার আরো নিচু হতে হয় এবং নিজের ডান হাত মাটিতে স্থাপন করে এর উপরিভাগ চুম্বন করতে হয়। জাহাঙ্গীরের শাসনামলে তিনি তার কপাল মাটিতে স্পর্শ করবেন বলে আশা করা হতো কিন্তু শাহজাহান এ প্রথা, যা আসলে আকবরের শাসনামলে প্রবর্তিত হয়েছিল, মুসলিম চিন্তাবিদদের সাথে আলোচনার পর, যারা মনে করে যে এর সাথে নামাজের সময় করা সেজদার প্রচুর মিল রয়েছে আর সে জন্য এটা আল্লাহতায়ালার প্রতি কটাক্ষপূর্ণ মেনে নিয়ে তুলে দিয়েছেন।

সম্রাট প্রায় দুই ঘণ্টা পর তার বয়োজ্যেষ্ঠ পরামর্শদাতাদের সাথে নিয়ে ব্যক্তিগত মন্ত্রণাকক্ষে প্রস্থান করেন সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতে। বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের দর্শন দিতে আর বুধবার 'ভগ্নহৃদয় নিপীড়িত ব্যক্তিদের', শাহজাহানের দরবারের দিনপঞ্জির রচয়িতারা ন্যায়বিচার প্রার্থীদের এ বিশেষণেই সম্বোধিত করেছে, ন্যায়বিচার করতে। শাহজাহান, যিনি নিজে একজন দক্ষ চারুলিপিকর ছিলেন, তার প্রদত্ত কিছু আদেশ নিজেই লিখতেন। অন্যগুলো তার 'দক্ষ সচিবরা' লিপিবদ্ধ করতেন আর সম্রাট নিজে সেগুলোর ভুলভ্রান্তি সংশোধন করতেন। এরপর এগুলোকে পাঠানো হতো 'হারেমের সচিবের কাছে বহুল প্রশংসিত রাজকীয় সিলমোহর দিয়ে আদেশপত্রগুলোকে অলংকৃত, যা মহামান্য সম্রাজ্ঞী মুমুতাজ আল-জামানির কাছে রক্ষিত রয়েছে।' মমতাজ এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রগুলো প্রেরণের আগে আরেকবার পর্যালোচনার সুযোগ পেতেন। শাহজাহান সেইসাথে তাকে নিজের আদেশ প্রদান করতে আর রাজকর্মচারী নিয়োগের অধিকার দিয়েছিলেন। ১৬২৮ সালের অক্টোবর মাসে জারি করা একটি আদেশে আমরা দেখি একজন লোককে তার পূর্ববর্তী অবস্থান ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ করছেন, যা অন্য আরেকজন জোর করে কেড়ে নিয়েছিল। তিনি সেইসাথে পুনর্বহাল হওয়া ব্যক্তিকে আদেশ করছেন 'মহামান্য সম্রাটের প্রবর্তিত আইন আর

প্রবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে, সাধারণ প্রজা আর কৃষকদের প্রতি যেন এমন আচরণ করে যাতে তারা সম্রাটের প্রতি কৃতজ্ঞ আর সন্তুষ্ট থাকে...এবং সরকারি খাজনার একটি টাকারও যেন অপচয় না হয় বা হারিয়ে না যায়।' মমতাজের বৃত্তাকার মার্জিত সিলমোহরে ফার্সি কবিতার দুটো পঙ্ক্তি উৎকীর্ণ ছিল :

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে মমতাজ মহল এই নশ্বর পৃথিবীতে আল্লাহতায়ালার প্রতিচ্ছায়া শাহজাহানের সহচর হয়েছেন।

মমতাজ নিঃসন্দেহে প্রভাবশালী ছিলেন—সব নথিপত্র পর্যালোচনা করলে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শাহজাহান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার পরামর্শ কামনা করতেন। মমতাজ অবশ্য কর্তৃত্বব্যঞ্জক, উদ্ধত নূরের থেকে একেবারেই ভিন্ন রীতিতে নিজের প্রভাব খাটাতেন। তিনি তার ছেলেবেলা থেকে যে লোকটাকে চেনেন আর ভালোবাসেন সেই লোকটার সাথে তার সম্পর্কের প্রকৃতি এবং তার চরিত্রের নমনীয়তা আর বিচক্ষণতাও একটি কারণ ছিল। জাহাঙ্গীর নূরের রূঢ় কর্তৃত্বের সামনে প্রকাশ্যে আর স্পষ্টতই বশ্যতা স্বীকার করায় বিদেশি পর্যটক আর নিজ দরবারের অমাত্যদের কাছে তাকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছিল এটাও হয়তো সচেতনভাবে তাকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছিল। এক অখ্যাত দিনপঞ্জি রচয়িতার ভাষ্য অনুযায়ী, মহবত খান তার বিদ্রোহের আগে অভিযোগ করেছিলেন, পৃথিবীতে আর কোনো সম্রাট 'তার নিজের স্ত্রীর অভিপ্রায়ের প্রতি এতটা অনুবর্তী নন' এবং তিনি এর সাথে আরো যোগ করতে পারতেন, সেইসাথে নিজের অমাত্যদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি একেবারেই বেখেয়াল। এই একই দিনপঞ্জি রচয়িতা মন্তব্য করেছেন, 'সম্রাটের মনমানসিকতার ওপর নূরজাহান বেগম এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে মহবত খানের মতো দুইশজন লোক যদি এই মর্মে তাকে ক্রমাগত পরামর্শ দিতে থাকেন, তাদের শব্দচয়ন সম্রাটের মনে কোনো স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারবে না।'

নূর অবশ্য জাহাঙ্গীরকে যখন বিয়ে করেন তখন তিনি একজন পরিণত বয়স্ক, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বিধবা। তিনি জাহাঙ্গীরকে সত্যিই ভালোবাসতেন এই বিষয়ে যদিও সামান্যই সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, সেইসাথে এটাও অবশ্য স্পষ্ট যে, ক্ষমতার প্রতিও তার সমান ভালোবাসা ছিল। নূর তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, আগলে রেখেছেন আর পালন করেছেন, কিন্তু এসব ছাপিয়ে যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটা হলো তিনি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন, তার সিদ্ধান্তকে অনায়াসে প্রভাবিত করতেন এবং শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে তিনি নিজেই সিদ্ধান্তগুলো

মমতাজ মহল

রত্নপ্রেমী শাহজাহান উষ্ণীষে পরিধান যোগ্য একটা অলঙ্কার পর্যবেক্ষন করছেন।
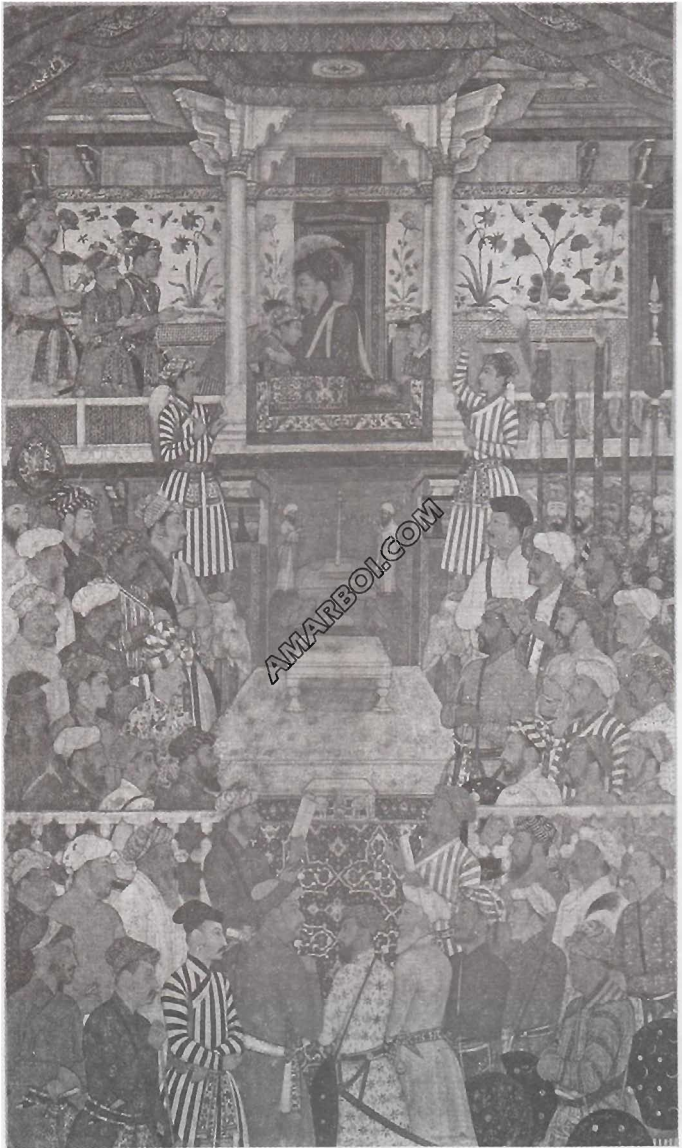
সম্রাট হিসাবে অভিষিক্ত হবার পরে সন্তানদের সাথে শাহজাহান পুনরায় মিলিত হন।

নিতেন। মমতাজ কখনো শাহজাহানকে নিয়ন্ত্রণ করতেন না। তিনি ছিলেন সব দিক থেকেই আক্ষরিক অর্থেই তার সঙ্গী। নির্বাসিত আর পলাতক জীবনে যে শারীরিক, মানসিক আর বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধন তাদের টিকে থাকতে সহায়তা করেছিল সেই একই বন্ধন এখন সম্রাট আর সম্রাজ্ঞী হিসেবে তাদের সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করছে। মমতাজ কখনো নূরের মতো ছিলেন না, তিনি সব সময় কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলেছেন এবং স্বামীর সন্তুষ্টিই ছিল তার একমাত্র কাম্য। রাজদরবারের এক সভাকবি বিষয়টিয় উদ্বেলিত হয়ে লিখেছেন :

তার আচরণের কারণে কখনো কোনো অসন্তোষ
সম্রাটের মনের মণিকোঠায় স্থান পায়নি।

তিনি সব সময়ই চেষ্টা করেছেন রাজাকে তৃপ্ত করতে
রাজাদের রাজার মেজাজ মর্জি সম্বন্ধে তার ছিল পরিপূর্ণ জ্ঞান।

রাজার সহচরী হিসেবে নিজের অগাধ ক্ষমতা সত্ত্বেও
তিনি সব সময় তার প্রতি আনুগত্য আর অনুবর্তিতা প্রদর্শন করেছেন।

তৃতীয়ত, রাজপ্রাসাদে সাম্রাজ্যের গোপনতম অন্দরমহলে সম্রাটের নির্বাচিত মন্ত্রণাপরিষদের বৈঠকে, যেখানে দরবার কক্ষে প্রজাদের সামনে দর্শনদানের পরে এবং মমতাজের দেখা প্রয়োজন এমন সব নথিপত্র হারেমে প্রেরণ করে, শাহজাহান কেবল 'কতিপয় সৌভাগ্যবান রাজপুরুষ আর তার মুষ্টিমেয় পরীক্ষিত বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের'ই ডাকতেন, যাদের ভেতরে অবশ্যই মমতাজের আব্বাজান আসফ খান ছিলেন।

শাহজাহান অবশ্য, দুপুরের দিকে সম্রাজ্ঞী আর রাজপরিবারের অন্যান্য মহিলার, যাদের ভেতরে তার কন্যা জাহানারা আর এগারো বছর বয়সী রোসন্নারাও থাকত, সাথে হারেমের নিরাপত্তার মাঝে দুপুরের আহারের জন্য যখন পুনরায় মিলিত হতেন তখন তিনি তার সাথে সারা দিনের দরবারিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করতেন। পুরু গালিচা পাতা মেঝেতে আসন পিঁড়ি হয়ে আহার করার পূর্বে, পরিষ্কার হয়ে নিতেন, মেঝেতে তখন আহারের জন্য সাদা কাপড় দিয়ে মোড়া চামড়ার টুকরো দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে।

সম্রাটের আহারের জন্য পরিবেশিত পদগুলো বর্ণাঢ্যতা আর চমৎকারিত্বের একটি রসনাবিলাসী মিশ্রণ। মোগলরা ভারতবর্ষে পারস্য, মধ্য এশিয়া আর মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাব মিশ্রিত রন্ধনপ্রণালী নিয়ে এসেছিল। আখরোট আর কিশমিশের সাথে সাথে খুবানি আর অন্যান্য শুকনো ফলের ব্যবহার আফগানিস্তান

আর পারস্য থেকে এসেছিল। মধ্যপ্রাচ্য আর সেখানের যাযাবর ঐতিহ্যের কাছ থেকে তারা ধার করেছিল শিকবিদ্ধ করে ভেড়া, হয় পুরোটা বা কাবাব (এটা একটি উর্দু শব্দ) হিসেবে, সেঁকা বা ঝলসানোর পদ্ধতি। মধ্য এশিয়া থেকে কন্দ জাতীয় সবজির ব্যবহার গ্রহণ করা হয়েছিল, যার ভেতরে ছিল গাজর আর শালগম, এই সবজিগুলোর সাথে গোলমরিচের গুঁড়া, ভেড়ার মাংস আর মাখন সহযোগে প্রস্তুত করা হতো *পোলাউ* শীতের তীব্রতা প্রতিরোধ করতে যা শক্তি জোগাত। মোগলরা টক আর মিষ্টির বৈপরীত্য দারুণ উপভোগ করত, এখন যা দূরপ্রাচ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তারা প্রায়ই চিনি আর লেবুর রস তাদের রান্না করা পদগুলোতে যোগ করত এবং মিষ্টির স্বাদ কাটাতে লবণ ব্যবহার করত।

মোগলরা খুব দ্রুত ভারতবর্ষের, বিশেষ করে হিন্দুদের নিরামিষ রন্ধনপ্রণালীর, প্রভাব আর রকমারি স্বাদের সাথে নিজেদের অঙ্গীভূত করে নেয়। যার ভেতরে ছিল দইয়ের আর নানা ধরনের ডাল জাতীয় শস্যের বিবিধ ব্যবহার। মসুর ডাল আর চালের সাথে মাখন আর নানা ধরনের মসলা দেয়া একটি পদ শাহজাহানের ভীষণ প্রিয় ছিল—ভারতীয় কৃষকদের মাঝে *খিচুড়ি*[*] নামে পরিচিত পদটির আরেকটু উন্নত সংস্করণ। ভারতের রন্ধনরীতির কাছ থেকে অন্যান্য যা কিছু তারা গ্রহণ করেছিল তার ভেতরে ছিল মুখে জল আনা, মুখের অভিব্যক্তি বদলে দেয়া তেঁতুলের ব্যবহার, যার স্বাদ-গন্ধের সাথে অন্য কোনো কিছুরই সাদৃশ্য পাওয়া ভার এবং খাবারের রং আর গন্ধের জন্য হলুদের ব্যবহার। নতুন নতুন বিজয় মোগল খাদ্য তালিকায় নতুন নতুন পদ যুক্ত করতে থাকে। কাশ্মীর অধিকৃত হবার পরে ফলমূল আর সবুজ শাকসবজি যেমন ওলকপি আর পালং শাক প্রভৃতির সাথে সাথে পাতিহাঁসের মতো জলচর পাখি অনেক বেশি মাত্রায় তাদের খাদ্য তালিকায় যুক্ত হতে থাকে।

শাহজাহান আর মমতাজের সময়কালেই, নতুন দুনিয়ার নানা উপাদান, যেমন আলু, বর্তমানে যা ভারতের অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তু—বণিকরা আমেরিকাস[**] থেকে ভারতবর্ষে আনতে শুরু করে। লবঙ্গ, গোলমরিচ, এলাচ, দারুচিনি, মৌরী, ধনে আর তাজা আদাই ছিল প্রধান সব মসলা। তখনো শুকনো মরিচ—নতুন দুনিয়া থেকে প্রাপ্ত আরেকটা মসলা—ভারতে আসেনি, তবে অচিরেই পৌঁছে যাবে। রান্নার প্রণালী ছিল জটিল আর সূক্ষ্ম। এক ইংরেজ ভদ্রলোক এমনকি রান্নার সেই কৌশলও রপ্ত করেন, যেখানে এমনভাবে চাল

---

* সম্প্রতি এক ডিএনএ পর্যালোচনায় দেখা গেছে, দক্ষিণ পেরুর একটি স্থানীয় আলুর জাত থেকেই সারা পৃথিবীর সমস্ত জাতের আলুর চাষ শুরু হয়েছে।

** *খিচুড়ি* মূলত জনপ্রিয় ইঙ্গ-ভারতীয় পদ কেডিগ্রির আদিরূপ, যা সিদ্ধ ডিম আর ভাপা মাছের সাথে প্রস্তুত করা হয়, আসল রূপ থেকে যা অনেকাংশেই বদলে গেছে।

সিদ্ধ করা হতো 'এতটাই চাতুর্যের সাথে, যেখানে মসলা মিশ্রিত অবস্থায় প্রতিটি চালের দানা একটিও জোড়া না লেগে সব আলাদা ঝরঝরে থাকত এবং এসব কিছুর মধ্যে থাকত একটি সিদ্ধ মুরগি।' আস্ত মুরগির ভেতরে কীভাবে অন্য মাংস, ডিম, ধনেপাতা আর আদার পুর দেয়া হতো সেসব উন্নত রন্ধনপ্রণালী আজও টিকে আছে। *দমপোকত*—খুবানি দেয়া মুরগি কিংবা গরুর মাংস প্রথমে আগুনে ধীরে ধীরে সিদ্ধ করে তারপর টকদই আর মাখন দিয়ে দমে দেয়া হয়—ছিল আরেকটা দারুণ জনপ্রিয় রান্না। *দম* শব্দের ভারতীয় অর্থ 'শ্বাসপ্রশ্বাস' এবং মোগল রাঁধুনিরা পরিবেশনের ঠিক আগমুহূর্তেও তাদের পদগুলোকে দমে রাখত বা অল্প আঁচে আগুনের ওপর রাখত, যা আধুনিক সেফদের কাছে দারুণ প্রয়োজনীয় একটি কৌশল। কিছু রন্ধনপ্রণালীতে পদগুলোয় ধোঁয়া দিতে ঢাকনাযুক্ত তাপনিরোধক একটি পাত্র খাদ্যে পূর্ণ করে তার মাঝে গনগনে কয়লা রাখা হতো, তারপর পনেরো মিনিটের জন্য পাত্রটাকে বায়ুনিরোধক করে বন্ধ করে দেয়া হতো যাতে ধোঁয়ার গন্ধ খাবারের মাঝে প্রবাহিত হতে পারে।

রাজকীয় রন্ধনশালা ছিল একটি আলাদা স্বাধীন বিভাগ। রাঁধুনিরা খাবারগুলোকে এখানে এমন একটি পর্যায়ে রাখত যে সম্রাট আদেশ দেয়ার এক ঘণ্টার ভেতরে একশ পদের রান্না পরিবেশন করা যায়। ভোজসভার জন্য খাদদ্রব্য সজ্জনায় সোনা আর রুপার তবক ব্যবহৃত হবার সাথে সাথে শুকনো ফল আর নানা ধরনের ওষুধি তৃণলতা ব্যবহৃত হতো। সোনা আর রুপার তৈরি তশতরিতে খাদ্য পরিবেশিত হতো এবং কখনো বিশেষ এক ধরনের জেড পাথরের তশতরি ব্যবহৃত হতো বলা হয়ে থাকে, যা বিষের বিরুদ্ধে প্রতিষেধকরূপে কাজ করত। বুয়া, দিল্লির নিহত সুলতানের মাতা, বাবর নতুন ভারতীয় রান্নার স্বাদ পরখ করার সময় বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যাচেষ্টা করেছিল এবং বিষপ্রয়োগের ব্যাপারে সব সময় সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। রাঁধুনিরা যখন রান্না করত কানাতের তিরস্করণী ব্যবহার করে তখন কৌতূহলী চোখের দৃষ্টির সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হতো। রাঁধুনিরা তাদের পোশাকের আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে আর প্রান্তদেশ গুঁজে রেখে উনুন আর পাত্র থেকে পরিবেশনের জন্য খাবার তশতরিতে তুলত কেবল এটা নিশ্চিত করতে যে, তারা যেন কোনো ধরনের বাড়তি দ্রব্য খাবারে মিশ্রিত করার সুযোগ না পায়। রাঁধুনিরা যারা সম্রাটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ প্রস্তুত করেছে তারা প্রথমে, তারপরে তাদের তত্ত্বাবধায়ক এবং সবশেষে রন্ধনশালার প্রধান বাবুর্চি সেটার স্বাদ নিত।*

---

* পুরাতন দিল্লির জনাকীর্ণ সড়কে অবস্থিত করিমের রেস্তোরাঁ মোগল বাবুর্চিদের বংশধরদের দ্বারা পরিচালিত, যারা দাবি করে যে, 'রাজকীয় খাবার প্রস্তুত করা তাদের বংশানুক্রমিক পেশা'।

হারেমে খাবার নিয়ে যাবার আগে, প্রতিটি খাবারের তশতরি আলাদাভাবে কাপড় দিয়ে মোড়া হতো এবং রন্ধনশালার প্রধান বাবুর্চি সেখানে প্রতিটি পদের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখে তাতে নিজের সিলমোহর দিতেন, যাতে কেউ কোনো তশতরি বদলে দিতে না পারে। তারপর রাঁধুনি আর অন্য পরিচারকরা হারেমে খাবার ভর্তি পাত্রগুলো বয়ে নিয়ে যেত। অবাঞ্ছিত উপদ্রব দূরে রাখতে খাদ্য বহনকারীদের সামনে আর পেছনে প্রহরী আর রাজদণ্ডবহনকারী লোক থাকত। রন্ধনশালার প্রধান এই দলটার সঙ্গে থাকত আর হারেমের প্রবেশ দ্বারে খাবার পর্ব সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময় প্রহরীরা তাকে চোখে চোখে রাখত। হারেমে উপণীত হবার পর, পুনরায় খাবার পরীক্ষা করা হতো, এই দফায় হারেমের খোজা প্রহরী আর মেয়ে পরিচারিকারা কাজটা করত শাহজাহান আর মমতাজ মহলের সামনে। এরপরই কেবল তারা খাবার পরিবেশন করত।

ভারতবর্ষ আর মুসলিম দুনিয়ায় প্রচলিত রীতি হলো ডান হাতের (বাম হাত কখনো ব্যবহার করা হয় না) আঙুল দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা। পরিচারিকার দল আরো খাবার নিয়ে আসতে বা মাছি তাড়াতে ঘোড়ার লেজের চুল দিয়ে প্রস্তুত ঝাড়ন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, বছরের কোনো কোনো সময় যাদের উপদ্রব এড়ানো অসম্ভব হয়ে উঠত। আহার পর্ব সমাপ্ত হলে, কলাই জাতীয় ডালের মসৃণ গুঁড়া দিয়ে তেলচর্বি পরিষ্কার করে তারপর হাত ধোয়া আর কুলি করে মুখ পরিষ্কার করা হতো।

মধ্য এশিয়ার আপেল আর নাশপাতি, পারস্যের আর মধ্য প্রাচ্যের ডালিম, কমলালেবু, খেজুর আর ডুমুরের পাশাপাশি মোগলরা ভারতীয় ফলেরও কদর করতে শুরু করে। বাবর পর্যন্ত মন্তব্য করেছিলেন যে, 'আম যখন ঠিকমতো পাকে সেটা সত্যিই খেতে উপাদেয়', যদিও তিনি অভিযোগ করেছেন, ভালো আম অল্পই পাওয়া যায়। তার উত্তরসূরিরা কলা, চিনির শিরায় ডোবান আপেলের স্বাদ উপভোগ করেছে এবং নথিপত্র থেকে যতটুকু জানা যায়, এমনকি কাঁঠালও বাদ যায়নি, বাবর যাকে নাকচ করে দিয়েছেন এই বলে যে, 'অবিশ্বাস্য ধরনের কুৎসিত আর তার চেয়েও বাজে স্বাদ—ফলটা দেখতে আক্ষরিক অর্থেই ভেড়ার অতিভোজনে ঠাসা পাকস্থলীর মতো পেট থেকে বের করা নাড়িভুঁড়ির মতো দেখতে (এবং) বাড়াবাড়ি ধরনের মিষ্টি স্বাদ।' জাহাঙ্গীর লিখে গেছেন কীভাবে তার আব্বাজান আকবর, 'ফরাসিদের বন্দরে প্রাপ্ত', নতুন দুনিয়া থেকে আমদানি করা আরেকটা ফল, আনারসের চাষ করেছিলেন। ফলটার স্বাদ আর গন্ধ অসাধারণ। 'আগ্রায়...প্রতিবছর কয়েক হাজার আনারস উৎপন্ন হয়।'

রন্ধনশালার লোকজন সবচেয়ে সেরা উপকরণটা সংগ্রহ করতে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করত। শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণের ত্রিশ বছর পূর্বে, আবুল ফজলের প্রস্তুত করা একটি তুলনামূলক তালিকা থেকে জানা যায়, একটি পাতিহাঁস যা প্রায়ই কাশ্মীর থেকে কিনে নিয়ে আসা হতো, অনায়াসে একটি আস্ত ভেড়ার মূল্যের অর্ধেক হতে পারে, যখন কাবুল থেকে খাইবার গিরিপথ দিয়ে আমদানি করা সেরা জাতের তরমুজের দাম এর চেয়েও অনেক বেশি হতে পারে।

পানীয় জল আর বরফের জন্য পৃথক একটি দপ্তরই ছিল। বর্তমান সময়ের খনিজ পানির রসজ্ঞের ন্যায়, প্রত্যেক মোগল সম্রাট ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের পানীয় জল পছন্দ করতেন। আকবর পছন্দ করতেন গঙ্গার পানি এবং তিনি যেখানেই অবস্থান করতেন সেখানেই দূষণ কিংবা অবৈধ হস্তক্ষেপ পরিহার করতে সিল করা চামড়ার মশকভর্তি পানীয় জল প্রতিদিন ভিস্তির দল পৌঁছে দিত। জাহাঙ্গীর এতটা খুঁতখুঁতে ছিলেন না কিন্তু বিচক্ষণতার সাথে জলাধারে সামান্য সময়ের জন্য রক্ষিত এমন পানীয় জলের পরিবর্তে বহমান উৎস কিংবা ঝরনা থেকে সংগৃহীত পানিই পান করতে পছন্দ করতেন। শাহজাহান যমুনার 'গলিত তুষার' বলে তিনি যাকে অবহিত করতেন কেবল সেই পানিই পান করতেন। গ্রীষ্মকালে তিনজনই শীতল পানীয় জল আর শরবত পান করতে পছন্দ করতেন। উত্তর-পশ্চিমের পাহাড়ি এলাকা থেকে নৌকা, গরুর গাড়ি আর বাহকদের দ্বারা বরফ নিয়ে আসা হতো এবং মাঝে মাঝে শীতলকারী উপাদান হিসেবে যবক্ষার বা সোরাও ব্যবহৃত হতো। রাজপরিবারের সদস্যরা ধূসর, গোলাপি রঙের স্ফটিকের বা সাদা অথবা সবুজ জেড পাথরের পানপাত্র থেকে পান করত।

শাহজাহান মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হবার পরে বিশ্রাম নিতেন, কিন্তু তার নিয়োজিত ঐতিহাসিকরা অনেকটা সাধুমন্যতায় দাবি করেছেন, কার্যদিবসের এই পর্যায়ে কখনো যৌনক্রিয়াকে প্রশ্রয় দিতেন না। 'মহামান্য সম্রাট—অন্যান্য তুচ্ছ নৃপতির মতো ছিলেন না—এমনকি পবিত্র জেনানামহলেও দৈহিক লালসা আর ইন্দ্রিয় সুখকে প্রশ্রয় দেয়া থেকে বিরত থাকতেন এবং দরিদ্রদের অনুরোধ অনুমোদনে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন।' মমতাজ দরিদ্র নিঃস্ব মেয়ে যৌতুক, কাপড় আর গহনার অভাবে দুর্দশার মধ্যে রয়েছে বা খাসজমি মঞ্জুর কিংবা ভাতার অভাবে কষ্টে থাকা এতিম আর দুঃস্থ বিধবাদের আর্জিগুলোর প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য পারস্যের অধিবাসী তার প্রতিভাধর বন্ধু সাতী আল-নিসা খানানের ওপর নির্ভর করতেন, যাতে তিনি তার স্বামীর সামনে বিষয়গুলো উত্থাপন করতে পারেন, যিনি তারপর তাদের অভাব অভিযোগ দূর করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আদেশ দেবেন। সাতী, দরবারের

ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুযায়ী, 'তার অভিজাত আদব-কায়দা, বাগ্মিতা, আত্মবিশ্বাস আর অসাধারণ কর্মকুশলতার' কারণে মমতাজের বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। মমতাজের মেয়ে জাহানারাকে, কোরআনে ব্যুৎপন্ন, সাতী ফার্সিতে সাহিত্য চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দিত, মমতাজ নিজেও ফার্সিতে সাহিত্য চর্চা করতেন।

সম্রাট মধ্যাহ্নের বাকি সময় আর বিকেলের প্রথমভাগে অসমাপ্ত বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করতেন, পুনরায় দরবারে এবং দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত মসজিদে নামাজের জন্য উপস্থিত হতেন। রাত প্রায় আটটার সময়, তিনি সান্ধ্যকালীন আহার আর রাতের মনোরঞ্জন—'তারের মূর্চ্ছনা বা সুন্দর গান', কখনো মমতাজের সাথে একহাত দাবা খেলতেন যার ঘুঁটিগুলো সোনা, রুপা, চন্দনকাঠ বা হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি বা রতিক্রিয়ার জন্য হারেমে ফিরে আসতেন। সন্ধ্যার এই সময় নাগাদ, রাজকীয় আবাসস্থল শত সহস্র মশাল, প্রদীপ আর মোমবাতির কোমল আভায় আলোকিত হয়ে উঠত। রাজপরিবারের আগুনের উৎস, *অজিনগির* বা অগ্নি-পাত্রে একটি পবিত্র কম্পিত শিখা, দরবারের একজন আধিকারিক রক্ষণাবেক্ষণ করত। প্রতিবছর সূর্য যখন মেষরাশির ১৯ ডিগ্রিতে আগমন করত তখন আলো আর আগুনের প্রতি আকবরের ভালোবাসার কারণে তার প্রবর্তিত একটি কৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে শিখাটা বছরে একবার প্রজ্বালন করা হতো। পরিচারকরা একটি দ্যুতিময় সাদা পাথর সূর্যের উষ্ণ শিখায় উন্মুক্ত করত। তারা এরপর সুতির মসৃণ এক টুকরো কাপড় তপ্ত পাথরের পাশে স্থাপন করত যতক্ষণ না কাপড়ের টুকরোটায় আগুন জ্বলে ওঠে।

প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময়, রাজকীয় পরিচারকরা কর্পূরের গন্ধযুক্ত বারোটা মোমবাতি প্রজ্বালন করত এবং সেগুলোকে সোনা আর রুপার তৈরি মোমদানিতে রেখে সম্রাটের সামনে নিয়ে আসত। দরবারের একজন গায়ক তখন উচ্চস্বরে আল্লাহর প্রশংসা শুরু করতেন এবং মঙ্গলময় রাজত্বকাল অব্যাহত থাকার জন্য দোয়া করতেন। সমস্ত প্রাসাদকে এরপর আলোকিত করা হতো। কিছু মোমবাতি ছিল বিশালাকৃতির। আকবর একটি মোমদানির উদ্ভাবন করেছিলেন, যেখানে পাঁচটা পিলসুজ ছিল, যার প্রতিটি একেকটা প্রাণীর আকৃতির আর মোমদানিটা তিন ফুট উঁচু একটি উপস্তম্ভের ওপর দণ্ডায়মান থাকত। নয় ফুট বা তার চেয়েও লম্বা, সাদা মোমবাতি সেখানে জ্বলত আর পরিচারকরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠে মোমবাতিগুলোর সলতে নির্বাপিত করত।

চন্দ্রকলা অনুযায়ী প্রাসাদের আলোকসজ্জায় তারতম্য ঘটত। প্রতি চন্দ্র মাসের প্রথম তিন রাত্রি, যখন চাঁদের আলোর সময়কাল সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত তখন কাঁসা,

পিতল বা তামার বিশালাকৃতি *দিয়া*, অগভীর পাত্র সরিষার তেলে পূর্ণ করে সেখানে আটটি শিখা প্রজ্বালন করত। প্রাসাদের সংযোগ স্থাপক পথ আর দরদালানের দেয়ালে অবস্থিত কুলুঙ্গিতে পরিচারকরা সেই দিয়াগুলো স্থাপন করত। চন্দ্র মাসের চতুর্থ দিন থেকে শুরু করে দশম দিন পর্যন্ত তারা প্রতি রাতে ক্রমান্বয়ে একটি করে সলতে কমাতে থাকত, যাতে করে দশম রাতে চাঁদের আলো যখন সবচেয়ে দ্যুতিময়, তখন দিয়ায় যেন কেবল একটি সলতে জ্বলে। পুরো প্রক্রিয়াটা এভাবেই ষোড়শ রাত্রি পর্যন্ত অব্যাহত থাকত। এবার তারা কেবল পুনরায় প্রতি রাতে একটি একটি সলতে বাড়াতে থাকে।

কোমল আলোকসজ্জায় হারেমের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভব বাড়িয়ে দেয় যেখানে পরিশ্রান্ত নতুন সম্রাট দীর্ঘদিনের শেষে বিশ্রাম নেন। বিয়ের ষোলো বছর এবং বারোজন সন্তান জন্ম দেয়ার পরও, শাহজাহানের কাছে মমতাজের অনন্য যৌনাবেদন তখনো স্পষ্টতই অটুট। তার বয়স এখন ত্রিশের শেষ ভাগে, যে বয়সে অধিকাংশ স্ত্রী আর রক্ষিতাকে যৌন সংসর্গের পক্ষে রীতিমতো বৃদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে, কিন্তু ফুপুজান নূরের মতো তার সৌন্দর্যও নিশ্চয়ই অটুট ছিল। সম্রাটের শয্যাসঙ্গিনী হতে নিজের দেহ পরিষ্কার এবং এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে তিনি অবশ্য প্রসাধনের দুর্দান্ত সাজসরঞ্জামের ওপর নির্ভর করতেন, যার ভেতরে রয়েছে কালো চুলের দীপ্তি বাড়াতে নানা ধরনের ফুলের পাপড়ি, বীজ আর তেল দ্বারা প্রস্তুতকৃত মিশ্রণ, কালো অ্যান্টিমনি সালফাইড গুঁড়া—*কাজল*—চোখের প্রান্তদেশ রঞ্জিত করতে এবং দেহের অবাঞ্ছিত কেশ অপসারণের জন্য শঙ্খ ভস্ম আর কলার রসের মিশ্রণের ব্যবহার।*

মমতাজের কাছে সেইসাথে অবশ্য সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক পোশাকের সহজলভ্যতাও ছিল—চুনি লাল বা গোলাপ-বেইন বা ধূসর কমলা থেকে রংধনুর আভাযুক্ত মসৃণ রেশম বা স্বচ্ছ, মাকড়সার জালের মতো পাতলা মসলিন, যা বয়নের সূক্ষ্মতার কারণে 'প্রবাহিত জলস্রোত', 'জমাট বায়ুপ্রবাহ', এবং 'সাঁঝের শিশিরকণা' প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। আঁটসাঁটো *পাজামা* বা *সালওয়ার*—মেয়েদের পাওয়ালা অন্তর্বাস এসব কাপড় দিয়ে প্রস্তুত করা হতো, যা মুক্তার গিঁট দিয়ে বাঁধা থাকত—বুকের সাথে চেপে বসা *চোলি* বা কাঁচুলি, যা বুকের সামান্য অংশই আবৃত করত এবং বিজয় সংকেত আকৃতির গলাবিশিষ্ট *পেসভাজ*, বুকের কাছে থেকে শুরু হয়ে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা স্বচ্ছ

---

* মোগলদের রূপচর্চার অনুষঙ্গ সমসাময়িক কালের ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়, যেখানে শরীরের অবাঞ্ছিত কেশ অপসারণের জন্য মেয়েরা বিড়ালের বিষ্ঠার সাথে প্রস্রাবের মিশ্রণ ব্যবহার করত এবং ইঁদুরের চামড়া দিয়ে চোখের নকল পাপড়ি তৈরি করত।

ঢোলা কোট। মোগল রমণীদের পোশাক-পরিচ্ছদ তখনো যদিও ভীষণভাবে তুর্কি প্রভাবযুক্ত, তারা চুল বাঁধার ক্ষেত্রে দ্রুত হিন্দু রীতি গ্রহণ করে। চুল খোলা অবস্থায় দুই পাশে ছেড়ে রাখার বদলে তারা চুলের গোছা বৃত্তাকারে পাকাতে শুরু করে 'মাথার পেছনে একটি সমতল প্যাড তৈরি করে, যেখান থেকে কয়েক গোছা বাঁকানো চুল বের হয়ে থাকে।' মমতাজ সব সময় মাথায় সোনালি নেকাব দিয়ে আবৃত রাখত বা অস্ট্রিচের পালক আন্দোলিত উজ্জ্বল রেশমের উষ্ণীষ পরিধান করত। সম্রাটের প্রিয়তম স্ত্রী হিসেবে যিনি আবার রত্নপাথরের প্রতি আগ্রহী, তার কাছে চমৎকার আর সুনির্মিত রত্ন থাকা অসম্ভব ছিল না। রাজকীয় হারেমের একজন রমণীকে চিকিৎসা করার সুযোগ লাভকারী এক ইউরোপীয় চিকিৎসকের কাছ থেকে আমরা সামান্য ইঙ্গিত পাই তিনি আদতেই কী পরিধান করতেন। চিকিৎসক অভিযোগ জানান, 'ভারী বালা বা মুক্তার কবজি বন্ধনীর কারণে, যা সাধারণত নয় কি বারো বার কবজিতে পেচানো থাকত', তিনি তার রোগীর নাড়ি ঠিকমতো নির্ণয় করতে পারছেন না। সম্রাটের যৌন সন্তোষ বিধান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মমতাজ নিশ্চয়ই কোনো কৌশল ব্যবহার করত ক্রমাগতভাবে গর্ভধারণ করার ফলে তার শীথিল হয়ে পড়া যোনিপথ, *মদন-মন্দির* বা ভালোবাসার মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার তার আনন্দবর্ধনের জন্য সংকীর্ণ করতে। তিনি হয়তো তার যোনিপথের দুই পাশের ত্বকে ডালিমের রস বা দুধের সাথে পদ্মফুলের পাপড়ি বাটা, কপূর্রের সাথে মধু মিশ্রিত সুগন্ধি মিশ্রণ সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করতেন। মেয়েদের যৌনতৃপ্তি অনুভবের প্রয়োজনীয়তার দিকেও লক্ষ্য রাখা হতো এবং বিভিন্ন ধরনের যৌন উত্তেজনাবর্ধক মিশ্রণ ছিল মেয়েদের রাগমোচনে সহায়তা করতে। কেউ তাদের যোনিপথের অভ্যন্তরে বড় মৌমাছি থেকে প্রাপ্ত মধুর সাথে আদা আর কালো গোলমরিচের গুঁড়া মিশ্রিত করে প্রয়োগ করতেন। অন্য সব যৌন উত্তেজনাবর্ধক মিশ্রণ রতিক্রিয়ার দুই ঘণ্টা পূর্বে প্রেমিকের লিঙ্গে প্রয়োগ করা হতো; বলা হতো লিঙ্গের আকৃতি বৃদ্ধি করে আর উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়ে এসব মিশ্রণ মেয়েদের যৌনসুখের তুঙ্গে নিয়ে যেত। পুরুষদের দ্রুত বীর্যপাত রোধ করতেও অনেক ধরনের পদ্ধতি ছিল, কেউ আফিম গিলে ফেলতেন এবং পুরুষকে স্ট্যালিয়নের মতো যৌনশক্তি দান করতে পারে এমন সব কার্যকর কামোদ্দীপক বস্তুও ছিল। সম্মিলিতভাবে 'অশ্বের শক্তিলাভ' নামে পরিচিত একজাতীয় যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী উদ্দীপক ভীষণভাবে জনপ্রিয় ছিল।

তিনি আর মমতাজ যে পদ্ধতিরই সহায়তা নিয়ে থাকুক, শাহজাহান রতিক্রিয়া শেষে তার প্রিয় বইসমূহ থেকে, যার ভেতরে ছিল বাবরের রোজনামচা বা তৈমূরের অভিযানের বর্ণনা, সুকণ্ঠের অধিকারী মহিলাদের দ্বারা, যারা তিরস্করণীর আড়ালে অবস্থান করত, উচ্চ স্বরে পাঠ করা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তে পছন্দ করত।

শাহজাহান যতটা আশা করেছিলেন বা কামনা করেছিলেন তার চেয়ে অনেক দ্রুত যুদ্ধযাত্রার জন্য তার নিজের ডাক আসে। মোগল সাম্রাজ্য সম্বন্ধে এক ইউরোপীয় পর্যটক যেমন মন্তব্য করেছে, '(সম্রাট) যিনি মোগল শক্তির কাছে কোনো ধরনের অনীহা প্রদর্শন ছাড়াই অনুবর্তী হন যখন তার শিবির কাছে রয়েছে, যখন তিনি জানেন যে শিবির দূরে তখন সাথে সাথে তিনি অনুবর্তিতা পরিহার করেন, যা উত্তেজনা তৈরি করে মোগলদের জন্য অন্তহীন ঝামেলা সৃষ্টি আর ব্যয়বৃদ্ধি করেছে।' ঝামেলার উৎস এইবারও আবারও দাক্ষিণাত্যের সমৃদ্ধ, বিদ্রোহী সুলতানেরা। ১৬২৯ সালের শেষ নাগাদ, শাহজাহান তার বাহিনী নিয়ে দক্ষিণে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হন। মমতাজ, তার ত্রয়োদশ গর্ভধারণের প্রায় শেষের দিকে, বরাবরের মতোই স্বামীর সঙ্গী হন। তিনি আর কখনো আগ্রা বা যমুনার তীরে মাত্র অঙ্কুরিত হতে শুরু করা তার নতুন চত্বরযুক্ত উদ্যান আর কখনো দেখবেন না।
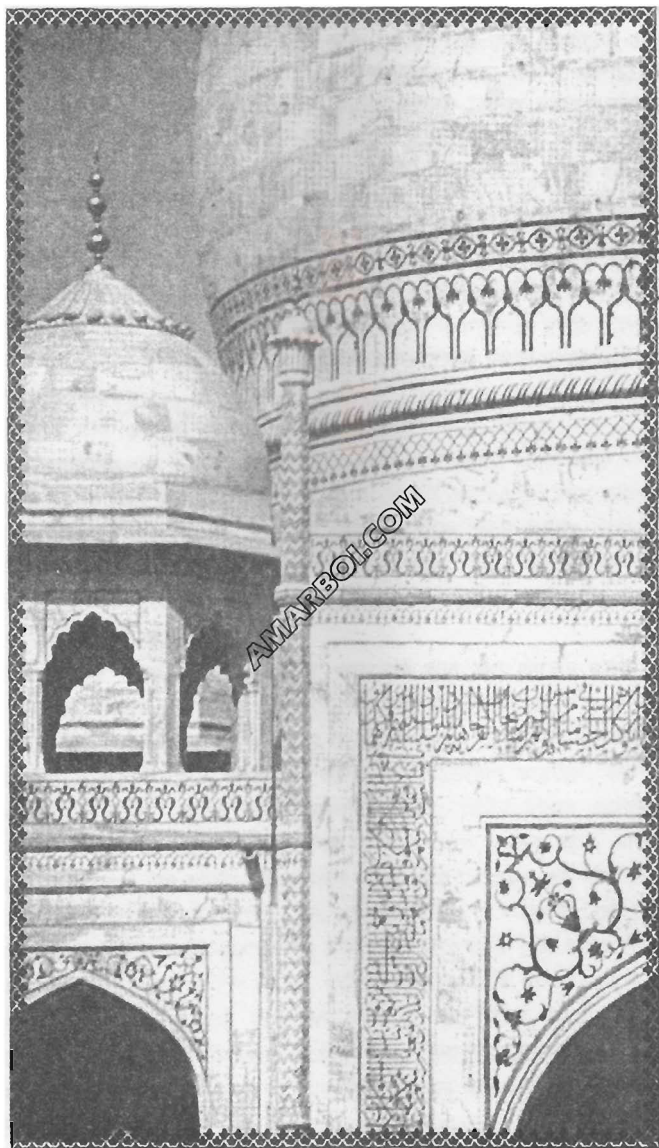
অষ্টম অধ্যায়

আমার জন্য একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করবেন

ইংরেজ করণিক পিটার মানডির ভাষ্য অনুসারে আগুয়ান মোগল বাহিনী, 'একটি রাজসিক, যুদ্ধংদেহী আর দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য', এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে এমনই একটি ধারণা সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী সময়ের বাঘা বাঘা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের এ বিষয়টি দারুণভাবে আকর্ষণ করেছে।* পুরো বহরটার ভেতরে প্রথমে আবির্ভূত হতো কাঠের কামানবাহী শকটে টেনে নেয়া কামান নিয়ে গোলন্দাজ বাহিনী। কামানগুলোর কোনোটার, যেমন শাহজাহান যেটার নাম দিয়েছিলেন 'বিশ্ববিজেতা', সেটার নলের দৈর্ঘ্য ছিল সতেরো ফিট। বিপুলসংখ্যক মালবাহী লটগাড়ির পেছনে, ধুলার সমুদ্রের মাঝে, 'জাহাজের বহরের মতো' এগিয়ে আসত মালবাহী হাতির পাল, সারি সারি থুতু নিক্ষেপকারী উট আর ধৈর্যশীল খচ্চরের দল আর ষাঁড়-টানা হাজার হাজার শকট। লটগাড়ির সাথে কোদাল আর দুই পাশ তীক্ষ্ণাগ্র ভারী কুড়াল কাঁধে মজুরের দল এগিয়ে যেত, পথে যেকোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে তারা প্রস্তুত।

প্রধান পদাতিকবাহিনী এরপর দৃশ্যপটে উপস্থিত হতো এবং 'হাজার হাজার অশ্বারোহী, প্রত্যেকে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে, আড়াআড়িভাবে মূল দলের পাশে অগ্রসর হতো, তাদের বাতাসে আন্দোলিত হতে থাকা রেশমের নিশানে তাদের সেনাপতিদের প্রতীক গর্বের সাথে উৎকীর্ণ রয়েছে।' তাদের পেছনে রাজকীয় হাতির বহর, মখমল আর সোনার সুতা দিয়ে বোনা কাপড়ে জমকালোভাবে সজ্জিত, সোনা আর রুপার বর্মপাত, শিকল আর ঘণ্টার ধাতব

---

* ১৯২০ সালে হলিউডের নিজস্ব চলচ্চিত্র সম্রাটদের বৈশিষ্ট্যসূচক বিশেষণ হিসেবে মোগলদের উপকথাখ্যাত শক্তি আর বিলাসবহুল ঐশ্বর্য প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হয়। মূল অভিনেতাকে বর্ণনা করতে 'তারকা' শব্দটা আরো একশ বছর পূর্বে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল।

ধ্বনি করতে করতে মন্থর গতিতে অগ্রসর হতো। বিশেষভাবে প্রিয় জন্তুগুলো উদীয়মান সূর্যের প্রেক্ষাপটে উৎকীর্ণ ব্যাঘ্রের রাজকীয় পতাকা বহন করত। তারপর সম্রাট যুবরাজ আর তাদের দেহরক্ষীদের এগিয়ে আসতে দেখা যেত, এই দলটার ঠিক পেছনেই নাকাড়া, তূর্য আর লম্বা বাঁশি বাজাতে বাজাতে হাতি কিংবা ঘোড়ায় আরূঢ় বাদ্যযন্ত্রীর দল অবস্থান করত এবং এরপর সবশেষে এগিয়ে আসত পশ্চাদরক্ষীর দল, 'যাদের বর্শাগুলো, ভীষণ লম্বা, চওড়া আর ঝকঝকে হওয়ায়, সূর্যের আলোয় ভীষণ উজ্জ্বলভাবে ঝলমল করতে থাকত।' সবার শেষে পরিচারক আর পণ্য এবং সেবা বিক্রির নিমিত্তে অনুসরণকারী লক্ষাধিক অসামরিক লোকজন পরিশ্রান্ত ভঙ্গিতে অগ্রসর হতো।

এই ভীতি উদ্রেককারী জমকালো শোভাযাত্রা অনেক অনুশীলনের পরই জন্ম নিয়েছে—সব মোগল সম্রাটই তাদের রাজত্বকালের এক-তৃতীয়াংশ সময় সঞ্চরমান অবস্থায় অতিবাহিত করেন, হয় যুদ্ধাভিযান পরিচালনার নিমিত্তে কিংবা সাম্রাজ্য পরিদর্শনে, আবুল ফজলের ভাষ্য অনুযায়ী যার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছাতে এক বছর সময় লাগে, আয়োজিত সফরে বের হয়ে এক শিবির থেকে অন্য শিবিরের দিকে এগিয়ে চলেন। সম্রাটের সঙ্গে, তার সিংহাসন এবং রাজকীয় নথিপত্র আর দলিল দস্তাবেজ থেকে শুরু করে—যার পরিমাণ এতই বিশাল যে সেগুলো বহন করতেই অসংখ্য মালবাহী শকটের প্রয়োজন—স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি থলে, রুপার জরি দিয়ে তৈরি কাপড়ের সম্মানসূচক আলখাল্লা, উপহার হিসেবে প্রদানের জন্য রত্নখচিত তরবারি পর্যন্ত, প্রশাসনিক বহুবিধ খুটিনাটি অনুষঙ্গ থাকে। এক মোগল সেনাপতির বিবেচনা অনুযায়ী, 'সেনাবাহিনীর সাথে যদি কোষাগার থাকে, সেনাবাহিনীকে (রসদ সরবরাহের জন্য) অনুসরণকারী বণিকদের মাঝে এক ধরনের নিরাপত্তাবোধও জন্ম নেয়।' সম্রাট হালকা জলখাবারের জন্য কখনো সাময়িক যাত্রাবিরতি করবেন এবং তার অভিপ্রায় আগেই বুঝে নিয়ে সব কিছু সেভাবেই প্রস্তুত রাখা হতো। সম্রাটের সাথে রাজকীয় রন্ধনশালা সে জন্য সব সময় একত্রে ভ্রমণ করত, সোনা, রুপা আর চিনামাটির বাসনপত্র খচ্চরের পিঠের দুই পাশে ঝোলানো ঝুড়িতে যত্নের সাথে মুড়ে রাখা হতো এবং রাজপরিবারের পানীয় জল আর রসদপত্র বিষপ্রয়োগকারীদের ভয়ে সব সময় কড়া পাহারায় রাখা হতো। তন্দুর—মোগলরা তাদের যাযাবর দিনগুলোতে মাটির তৈরি যে তপ্ত ভাটি বা চুল্লি ব্যবহার করত এবং তাদের দ্বারা ভারতবর্ষে এর প্রচলন হয়—ভ্রমণের কালে দ্রুত খাবার প্রস্তুত করার, বিশেষ করে রুটি, মাংস আর ডাল রান্নার একটি কার্যকর মাধ্যম।*

---

* মোগলরা ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তের গভীরে প্রবেশ না করার কারণে বোঝা যায় কেন সেখানে তন্দুর খুব একটি দেখা যায় না।

শাহজাহান কখনো চমৎকার সব ঘোড়ায় আরূঢ় হয়ে যাদের মাখন আর চিনির মিশ্রণে প্রস্তুত বিশেষ ধরনের খাবার দিয়ে সব সময় শারীরিক সক্ষমতার তুঙ্গে রাখা হতো, ভ্রমণ করতেন, তখন রোদের কবল থেকে বাঁচতে তার মাথার ওপর থাকত রেশমের তৈরি ছাতা। তিনি ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ করে ক্লান্ত হয়ে পড়লে, তখন হয়তো তার নিজের রাজকীয় হাতির, 'বাকি সব হাতির তুলনায় দামি সাজসজ্জায় সজ্জিত' পিঠে আরোহণ করতেন এবং সোনার জরি দিয়ে তৈরি কাপড়ের চাঁদোয়ার নিচে বসতেন। সম্ভ্রমোপহত বিদেশিদের কাছে, এটা ছিল, 'এখন পর্যন্ত সবচেয়ে আকর্ষণীয় আর জমকালো ভ্রমণ রীতি, কোনো কিছুর পক্ষেই ঘোড়ার সাজসজ্জা আর সম্রাটের ব্যবহৃত প্রতীক অলংকারের জাঁকজমক আর প্রাচুর্যকে ছাপিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।' বিকল্পরূপে, তাকে কখনো আবার বহন করা হতো, 'চলমান সিংহাসনে...কাচের জানালা আর রং ও গিল্টি করা স্তম্ভযুক্ত বহনযোগ্য আসনের চমৎকার একটি নিদর্শন...এই পালকির চারটা সুগোল দণ্ড টকটকে লাল মখমল কিংবা বুটিদার রেশমের ওপর সোনা আর রেশমের সুতার সূক্ষ্ম কারুকাজ করা কাপড় দিয়ে আবৃত থাকত। প্রতিটি সুগোল দণ্ডের শেষ প্রান্তে দুজন শক্তিশালী আর মার্জিত পোশাক পরিহিত লোক অবস্থান করত, তত্ত্বাবধায়নে নিয়োজিত ব্যক্তি যাদের ভিন্ন আটজন লোক দ্বারা নিয়মিত বিরতিতে অব্যাহতি দিত।'

'রাজকীয় সৈন্য আর দরবার রাজসিক ধারায় নিয়মিতভাবে অগ্রসর হতো, প্রায়ই অতিক্রান্ত দূরত্ব দিনে দশ মাইলের বেশি হতো না। এক টুকরো দড়ির সাহায্যে আধিকারিকরা প্রতিদিনের অতিক্রান্ত পথের দৈর্ঘ্য পরিমাপ এবং লিপিবদ্ধ করতেন। ভেনিসের পর্যটক নিকোলো মানুচ্চি, যিনি কয়েক বছর পরে এই পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, বর্ণনা করেছেন কীভাবে পরিমাপ করা হতো "সম্রাট রাজকীয় তাঁবু থেকে বের হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করলে তারা রাজকীয় তাঁবু থেকে পরিমাপ করা আরম্ভ করত। সামনে অবস্থানরত লোকটা যার হাতে দড়ির এক প্রান্ত রয়েছে সে মাটিতে একটি চিহ্ন দিত এবং পেছনে অবস্থানরত লোকটা যখন এই চিহ্নের কাছে পৌঁছাত সে চিৎকার করে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করত এবং সামনের লোকটা তখন মাটিতে আরেকটা নতুন চিহ্ন দিত এবং গণনা করত 'দুই'। তারা এভাবে 'তিন', 'চার' গণনা করতে করতে চলার পথের পুরোটা সময় অগ্রসর হতো। আরেকজন লোক হাতে নথিপত্র নিয়ে পায়ে হেঁটে মোট দূরত্ব পরিমাপ করতে থাকত। সম্রাট যদি দৈবাৎ জানতে চান তিনি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছেন, তারা সাথে সাথে উত্তর দিতে পারত কারণ তারা জানে এক লিগ দূরত্ব অতিক্রম করতে তাদের দড়ির টুকরো কতবার আবর্তিত হয়।" মানুচ্চি সেইসাথে কীভাবে সময় গণনা করা হতো সে বিষয়েও বর্ণনা করেছেন : 'অন্য আরেকজন লোক পায়ে হেঁটে অগ্রসর হতো,

বালিঘড়ি আর সময় পরিমাপ করার দায়িত্ব যার ওপর অর্পিত হয়েছে এবং ব্রোঞ্জের চাকতির ওপর কাঠের হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে সে প্রতিবার ঘণ্টার সংখ্যা ঘোষণা করত।'

অভিজাত মোগল রমণীরা কখনো ঘোড়ার পিঠে ভ্রমণ করার সময়, বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে, সাধারণের দৃষ্টি থেকে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে মাথা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সুতির পোশাকে আবৃত রাখত কেবল বাইরে দেখার জন্য ডাকবাক্স আকৃতির ছোট এক খণ্ড সুতার জাল থাকত। তারা অধিকাংশ সময় সচরাচর, জরদারি বা স্যাটিনের পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করে, চারজন বা ছয়জন বেহারার কাঁধে স্থাপিত বাঁকানো বাঁশের দণ্ড থেকে ঝুলন্ত তৈমূরের
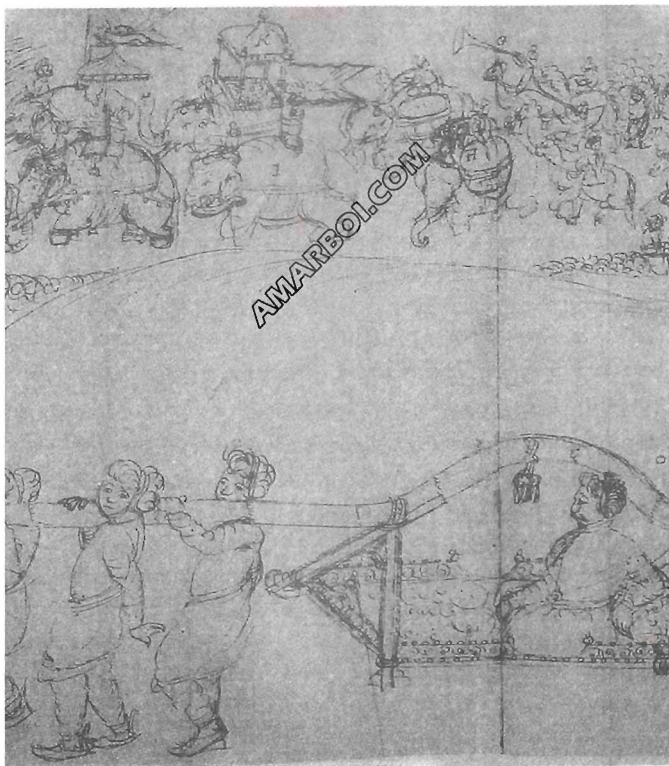
ল দরবারের স্থানান্তর, পিটার মানডি অঙ্কিত।

খাটিয়ায় সটান শুয়ে থাকত, যাদের অসমান মাটির ওপর দিয়ে ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিতে দৌড়াবার প্রশিক্ষণ রয়েছে এবং এভাবেই পালঙ্কে শায়িত তন্দ্রাচ্ছন্ন আরোহী আকস্মিক ঝাঁকির হাত থেকে নিরাপদ থাকে। বাঁকানো বাঁশ এই বহনযোগ্য পালঙ্ক তৈরির খাতিরে প্রচুর ব্যয় করে বিশেষভাবে চাষ করা হতো। রমণীরা ইচ্ছা করলে ব্যয়বহুলভাবে সজ্জিত বলদ-টানা গাড়িতে বা এক জোড়া ছোট হাতি বা শক্তিশালী উটের মাঝে ঝুলন্ত প্রশস্ত পালকিতেও আরামদায়ক ভঙ্গিতে ভ্রমণ করতে পারত। পিটার মানডি বর্ণনা করেছেন কীভাবে পালকির চারপাশ আচ্ছাদিত করতে ব্যবহৃত হতো 'এক ধরনের সুগন্ধিযুক্ত, শক্ত ঘাসের আঁটি...অনেকটা আমাদের ইংল্যান্ডের শুকনো শনের মতো, ঘাসের মাঝে মাঝে বার্লি আর মাটি ছিটিয়ে দেয়া হতো, যাতে বাইরে পানি ছিটালে, সেটা ভেতরে খুব শীতল একটি বাতাবরণ তৈরি করে...আর সেইসাথে কয়েক দিনের ভেতরে বার্লির অঙ্কুরোদম ঘটে, একটি দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের অবতারণা ঘটত...।'

মমতাজ আর তার কন্যারা তাদের অবস্থানের পক্ষে মানানসই আরো বিলাসবহুল আর মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিতে ভ্রমণ করত। তারা মাঝে মাঝে ডুলির মতো দেখতে গিল্টি করা আর ছাদযুক্ত শিবিকায় চলাচল করত, যা বহন করত শক্তসমর্থ দেখতে বেহারার দল এবং 'নানা রঙের রেশমের চমৎকার জালি দিয়ে সেটা আবৃত থাকত, নানা ধরনের সুন্দর অলংকৃত সজ্জাব, শোভাবর্ধক টাসেল আর সুতার কারুকাজ দিয়ে জালিকে আরো দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হতো।' তারা অনেক সময় চমৎকারভাবে সজ্জিত হাওদায় ভ্রমণ করত—ক্ষুদ্রাকৃতি, ঝলমলে, আন্দোলিত আর আচ্ছাদনযুক্ত দুর্গ—পোষমানা মাদি হাতির পিঠে দড়ি আর পুলির সাহায্যে যুক্ত করা হয়েছে। সোনালি তারের বুননিযুক্ত তিরস্করণীর ভেতর দিয়ে সম্রাজ্ঞী চারপাশের অপসৃয়মাণ প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করতে করতে এগিয়ে যেতেন, সামনের রাস্তায় ধুলোর উপদ্রব হ্রাস করতে পানি ছিটাবার রীতির প্রতি তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত কারণ অন্যথায় বিশাল সামরিক মিছিলটার কারণে উত্থিত ধুলা তার চারপাশে শ্বাসরুদ্ধকর একটি মেঘের সৃষ্টি করত।

সর্বত্র কঠোর শিষ্টাচারবিধি বজায় রাখা হতো। মমতাজ যখন হাতির পিঠে ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতেন তখন প্রাণীটাকে বিশেষভাবে নির্মিত একটি তাঁবুর ভেতর নিয়ে এসে সেখানে তাকে হাঁটু মুড়ে বসান হতো। হাতির পরিচালক বা মাহুত, নিজের মাথা মোটা একটি কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখত যাতে সে তার রাজকীয় যাত্রী যখন তার হাওদায় আরোহণ করবেন তখন তাকে এক ঝলকের জন্যও দেখতে না পায়। তিনি কদাচিৎ শাহজাহানের সাথে একসাথে ভ্রমণ করতেন। রাজকীয় হারেম সশস্ত্র মহিলা দেহরক্ষী আর খোজাদের দ্বারা, যারা রত্নখচিত ময়ূরের পালকের তৈরি পাখা দিয়ে মাছি তাড়াত, পরিবেষ্টিত অবস্থায় বরং মাইলখানেক পেছনে অবস্থান করত।

খোজারা সেইসাথে হেঁটে কিংবা ঘোড়ায় চেপে সামনে অবস্থান করে এগিয়ে যেত, অপরিচিত কোনো পুরুষ হারেমের খুব কাছাকাছি আসবার ধৃষ্টতা দেখালে তাকে তাদের হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করে তাড়িয়ে দিতে। ফরাসি চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের, যিনি পরবর্তীকালে কাশ্মীরের উদ্দেশে মমতাজের এক কন্যার জৌলুশপূর্ণ অশ্বারোহী শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, লিখেছেন, 'শোভাযাত্রায় অংশ নেয়া, কোনো অশ্বারোহী, সে যতই উচ্চপদস্থ হোক না কেন, তাকে যদি রাজকন্যার খুব কাছাকাছি পাওয়া যেত তবে তার কপালে অশেষ দুর্ভোগ ছিল। খোজাদের ঔদ্ধত্যের কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না এবং পথচারী যাদের তারা নিয়ন্ত্রণ করত যেকোনো ছুতোয় তাদের নির্দয়ভাবে প্রহার করার সামান্যতম সুযোগ তারা নষ্ট করত না।' যাই হোক, রাজকীয় হারেম, হাওদারও 'নীলাকাশের নিচে জ্বলজ্বল করতে থাকা সোনার দীপ্তিতে'

রূপকথাতুল্য সৌন্দর্য অবলোকন করে বার্নিয়ের বিস্ময় এতটাই মাত্রাছাড়া যে তিনি 'অধিকাংশ ভারতীয় কবির ন্যায় যখন তারা অশ্লীল দৃষ্টি থেকে দেবীদের আড়াল করতে হাতির অবতারণা করেছে, কল্পনার জগতে হারিয়ে গেছেন।'

সম্রাট মাঝে মাঝে যখন স্থানীয় কোনো দুর্গ, দর্শনীয় স্থান বা দরগা জিয়ারতের উদ্দেশে একটু ঘুরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, হারেমের বহরটা তখন সংক্ষিপ্ত পথে সম্রাটের পূর্বেই অস্থায়ী ছাউনিতে পৌঁছে যায়। মমতাজ এর ফলে শাহজাহানকে রেওয়াজমাফিক সম্ভাষণ '*মুবারক মঞ্জিল*', 'যাত্রা আনন্দদায়ক হোক' বলে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত থাকতে পারবে যখন তিনি তূর্যনিনাদের ধাতব ঝংকার আর নাকাড়ার গম্ভীর শব্দের মাঝে সম্রাটের জন্য নির্ধারিত এলাকায় প্রবেশ করবেন।

সময়কাল থেকে এই কৃত্যানুষ্ঠানের অধিষ্ঠানে সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে। অস্থায়ী রাজকীয় শিবির অনেকটা একটি শহরের ন্যায় যাতায়াতের সুনির্দিষ্ট সড়কসহ একটি পূর্বনির্ধারিত নকশা অনুসারে স্থাপিত, যা আকৃতির বিশালতার কারণে সে রকমই মনে হতো। শিবিরের জীবনযাত্রা একটি বিশাল জনবসতির মতোই ছিল। এক মোগল অভিজাত লিখেছেন, 'শিবিরে নামাজ, রোজা রাখার মতো ইবাদতের পাশাপাশি জুয়া খেলা, মাতলামি, পায়ুকাম আর ব্যভিচারও সমানতালে চলত।' নিম্নপদস্থ সৈন্য আর সামরিক শিবির অনুসরণকারীর দল শিবিরের সীমানার কাছে জটলা করত এবং নিজেদের খাবার রান্না করার জন্য গরু আর উটের গোবর দিয়ে আগুন জ্বালাত। শিবিরের সীমানার ভেতরে, মানুষজন যাতে সহজেই পথ খুঁজে পায় সে কারণে প্রত্যেক অভিজাত ব্যক্তির নিজের তাঁবু স্থাপনের জন্য নিজের নির্ধারিত স্থান ছিল, যা এক শিবির থেকে পরবর্তী শিবিরে অপরিবর্তিত থাকত। অভিজাতরা তাদের তাঁবু স্থাপনের সময় লক্ষ্য রাখত যাতে রাজকীয় তাঁবুর চেয়ে সেটা উঁচু না হয়, কারণ তারা ভালো করেই জানত সে রকম হলে তাঁবু গুঁড়িয়ে দেয়া হবে এবং সেইসাথে সম্ভবত সেও ধ্বংস হয়ে যাবে।

মমতাজ আর শাহজাহান অস্থায়ী শিবিরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি বিশাল দুর্গের ন্যায় পরিবেষ্টিত এলাকায় অবস্থান করতেন, মাঝে বিশাল একটি ফাঁকা স্থান তাদের অভিজাতদের তাঁবুর সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করত এবং পুরো এলাকাটা গোলন্দাজ আর শক্ত, চোখা কাঠের খুঁচার তৈরি বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করা। একটি চমৎকার তোরণগৃহ যুক্ত দেয়ালের বাইরের অংশে লাল কাপড় দিয়ে মোড়ানো কাঠের তক্তা চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা থাকত। সম্রাটের সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়ার একটি দলকে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি সামাল দেয়ার উদ্দেশে পর্যানসহ তোরণগৃহে প্রস্তুত অবস্থায় রাখা হতো। প্রাচীর বেষ্টিত এলাকার ভেতরে রাজদরবারের সব সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান—বিশালাকৃতি

তাঁবুতে সাধারণ আর ব্যক্তিগত দর্শনদানের হলঘর সোনা আর রুপার জরি দিয়ে তৈরি কাপড় দিয়ে ঝলমলে করে সজ্জিত। প্রতিটি হলঘরের কেন্দ্রস্থলে চমৎকার কারুকাজ করা মঞ্চ থাকত যেখানে ফুলের নকশা করা রেশম বা মখমলের চাঁদোয়ার নিচে শাহজাহান তার দর্শনপ্রার্থীদের সামনে উপস্থিত হতেন। সামরিক মিছিলটার সাথে *ঝরোকা* অলিন্দযুক্ত বহনযোগ্য একটি কাঠের দোতলা বাসস্থানও ছিল যাতে শাহজাহান, রীতি অনুযায়ী তার লোকদের আশ্বস্ত করতে পারেন তিনি এখনো জীবিত আছেন। তিরস্করণী দ্বারা নিখুঁতভাবে সুরক্ষিত, প্রশস্ত আর ব্যয়বহুলভাবে সজ্জিত হারেম কাছেই অবস্থিত ছিল। হাম্মামখানা আর শৌচালয়ের ব্যবস্থা বিশেষ তাঁবুতে করা হতো—তৈমূরের সময়কাল থেকেই দৈহিক পরিচ্ছন্নতা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে। তার যাযাবর যোদ্ধার দল সাধারণের জন্য নির্ধারিত ভ্রাম্যমাণ হাম্মামে উনুনে গরম করা পানি ব্যবহার করে যুদ্ধের ঘাম, রক্ত আর ধুলা ধুয়ে ফেলতে অভ্যস্থ ছিল।*

জল নিরোধক কাপড়ের কানাতযুক্ত বিশালাকৃতির রাজকীয় তাঁবু স্থানান্তরিত করতে বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রয়োজন হতো, বিশেষ করে সব কিছুই যখন দুই প্রস্থ করে ছিল। আবুল ফজলের ভাষ্য অনুসারে, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে কাজটা করতে একশ হাতি, পাঁচশ উট আর চারশ গরুর গাড়ির প্রয়োজন হতো। দুই প্রস্থ থাকার অর্থ একটি শিবির যখন স্থাপিত হয়েছে, আরেকটি তাঁবু আগেই রাজকীয় বাজার সরকারের তত্ত্বাবধানে সামনে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে যিনি পরের রাতের অস্থায়ী শিবিরের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীকে স্বাগত জানাবার সময় সব কিছু যেন ঠিক থাকে সেটা নিশ্চিত করবেন।

আলোকসজ্জার পরিকল্পনা, রাজপ্রাসাদের মতো বিশদভাবে, করা হতো দূর থেকে মোগল শিবিরকে দ্যুতিময়—আর দর্শনীয়—দেখাতে। পরিচারকের দল ষোলোটা টানটান করে বাঁধা দড়ির সাহায্যে একশ বিশ ফিটের চেয়েও উঁচু একটি অতিকায় দণ্ড স্থাপন করত। দণ্ডের শীর্ষভাগে থাকত একটি বিশাল *দিয়া*, তুলার বীজ আর তেল পূর্ণ একটি পাত্র, সূর্যাস্তের পর যাতে অগ্নিসংযোগ করা হলে, রাতের আকাশের বুকে উর্ধ্বমুখী আগুনের শিখা দাউ দাউ করে

---

* ভ্রমণের কালে জাহাঙ্গীরের সাথে এক খণ্ড পাথর কেটে তৈরি করা পাঁচ ফুট উঁচু, ছয় ফুট চওড়া চা পানের পাত্রের মত দেখতে একটি অতিকায় স্নানাধার থাকত। তিনি যখন স্নান করতে আগ্রহী হতেন তার পরিচারকেরা ঈষদুষ্ণ গোলাপ-জলে সেটা পূর্ণ করে দিত। তাকে স্নানাধারে উঠতে নামতে সাহায্য করতে বাইরে আরোহণের এবং অভ্যন্তরে অবরোহণের সিঁড়ি ছিল। আজও আগ্রা দুর্গের প্রাঙ্গণে স্নানাধারটা দেখতে পাওয়া যায়।

জ্বলত। *আকাশ-দিয়া*, 'আকাশের আলো' নামে এটাকে অভিহিত করা হতো। অভিজাতবৃন্দ, সম্রাটের তলব পেয়ে সাক্ষাৎ করতে আসার সময়, মশালের আলোয় তাদের পথ খুঁজে পেত। বার্নিয়ের লিখেছেন, শিবিরের দিকে 'রাতের আঁধারে দূর থেকে তাকালে একটি মহিমান্বিত আর চিত্তচমৎকারী দৃশ্য ভেসে উঠত, বর্ধিত তাঁবুর সারির মাঝে মশালের লম্বা সারি এই অভিজাতদের আলোকিত করে তুলেছে...।'
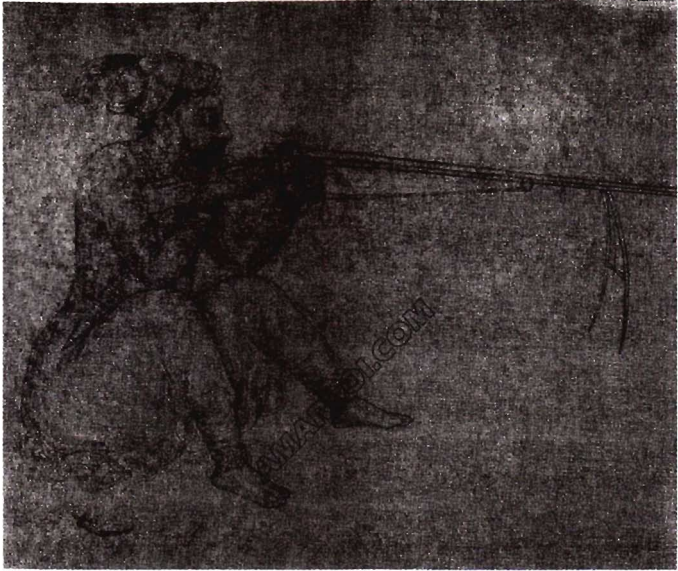
শিকারের সময় একটা ম্যাচলক গাদাবন্দুক দিয়ে শাহজাহান গুলিবর্ষণ করছেন।

সম্রাট যদিও তার সভাসদবর্গ নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছেন, শাহজাহান আর মমতাজের কাছে জীবন তখনো আগ্রার মতোই উৎসবমুখর। প্রতিদিনই রাজপরিবারের মনোরঞ্জনের জন্য নাচ-গানের আয়োজন করা হয় এবং অস্থায়ী শিবিরের সাথে সিংহ থেকে শুরু করে গন্ডার পর্যন্ত বিচিত্র বন্যপ্রাণীর একটি সংগ্রহ রয়েছে, যাতে লড়াইয়ের আয়োজন করা যায়। শাহজাহান নিজেও শিকারে যেতেন। মমতাজ তার ফুপুজান নূরের মতো, অব্যর্থ নিশানাভেদী ছিলেন এবং শিকারের সময় তার সঙ্গী হতেন এমন কোনো তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না কিন্তু শাহজাহান নিশ্চিতভাবেই শিকার করতে পছন্দ করতেন। তিনি বাজপাখি নিয়ে শিকারে যেতেন এবং বাঘ আর সিংহ শিকার করতেন—একটি রাজকীয় প্রাধিকার। তিনি অবশ্য পোষ মানানো চিতাবাঘ দিয়েও হরিণ শিকার

করতেন, জন্তুগুলোর রোমশ গলায় থাকত রত্নখচিত গলবন্ধনী, শিরস্কযুক্ত অবস্থায় তাদের পশ্চাধাবনের স্থানে নিয়ে আসা হতো। ফ্রানসিসকো পেলসার্ত নামে হল্যান্ডের এক অধিবাসীর কাছে, যিনি নিজের চোখে চিতাবাঘগুলোকে শিকার করতে দেখেছেন, এটাকে মনে হয়েছে 'এক অসামান্য ক্রীড়া রীতি', লিখেছেন : 'এই নির্বোধ পশুগুলো মানুষের উপস্থিতির সাথে এতটাই অভ্যস্থ যে তাদের শাবক অবস্থায় ধরে লালন করা হোক বা প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় যেভাবেই পোষ মানানো হোক তারা বিড়ালের মতোই পোষ-মানা। চিতাবাঘগুলোকে খুবই সতর্কতার সাথে খেতে দেয়া হয় এবং প্রতিটির জন্য দুজন করে লোক রয়েছে সেই সঙ্গে খাঁচাযুক্ত একটি গাড়ি যেখানে তারা বসে থাকে বা যেখান থেকে তাদের প্রতিদিন শিকারের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হয়। চিতাবাঘগুলো যখন এমন স্থানে পৌঁছায় যেখান থেকে তারা হরিণ দেখতে পাবে, গাড়ির খাঁচা খুলে তাদের ছেড়ে দেয়া হয় এবং জন্তুটা কিছু দেখতে পাবার আগ পর্যন্ত চারপায়ের ওপর ভর দিয়ে হামাগুড়ির সাহায্যে গাছপালা বা ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে এগোতে থাকে, যতক্ষণ না সে বুঝতে পারে জ্যাঁ মুক্ত তীরের মতো লাফিয়ে উঠে দ্রুত ধাওয়া করলে সে সফল হবে, কারণ সে কেবল একটি সুযোগই পাবে। চিতাবাঘগুলোর বেশির ভাগই এতই প্রশিক্ষিত যে তারা কখনো বা কদাচিৎ শিকার ধরতে ব্যর্থ হয়।'

১৬৩০ সালের শুরুর দিকে, শাহজাহান, মমতাজ আর তাদের সফরসঙ্গীবৃন্দ বিন্ধ্যা পর্বতমালার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে এবং আগ্রার ৪৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তাপ্তি নদীর তীরে অবস্থিত বুরহানপুর শহর অভিমুখে বৃক্ষময়, ছায়াবৃত পাহাড়ি এলাকার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। দাক্ষিণাত্য শাহজাহান আর মমতাজের কাছে ভীষণ পরিচিত—তারা তাদের সতেরো বছরের বিবাহিত জীবনের এক-তৃতীয়াংশ সময় এখানে অতিবাহিত করেছেন, যার কিছু ছিল তরুণ বিজয়ী যুবরাজ হিসেবে শাহজাহানের গৌরবময় বছরগুলো আর কিছু কেটেছে বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মাঝে। তারা বুরহানপুরের দুর্গ-প্রাসাদ খুব ভালো করেই চেনে—মমতাজ সেখানে দুজন কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছে এবং এখানেই তাদের এক পুত্রও মৃত্যুবরণ করেছে। এই দুর্গেই শাহজাহানের সৎভাই খসরুর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে, যখন তার আরেক সৎভাই পারভেজ নিজের সুরাসক্তাতর কারণে এখানেই মৃত্যুবরণ করেছে। ১৬৩০ সালের মার্চ মাসে শাহজাহান আর মমতাজ যখন বুরহানপুর দুর্গ-প্রাসাদে প্রবেশ করেন, তখন নিশ্চিতভাবেই তাদের দুজনের মনে নানা স্মৃতি এসে ভিড় করেছিল, যার কিছু স্বস্তিদায়ক আবার কিছু ততটা নয়।

■

খানজাহান লোদি, জাহাঙ্গীরের একসময়ের প্রিয় পাত্র এই অভিজাতের স্বপক্ষ-ত্যাগের ফলে সৃষ্ট সমস্যার কারণে তারা আগ্রার বিত্ত-বৈভব ছেড়ে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছেন। শাহজাহান তার আব্বাজানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরে খানজাহান তাকে প্রতিরোধ করতে আগ্রা পাহারা দিয়েছেন এবং জাহাঙ্গীর প্রতিদানে তাকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিয়োগ করেছিলেন। এই গর্বিত, স্বাধীনচেতা লোকটা আফগান লোদি সুলতানদের বংশধর যারা বাবরের কাছে পরাস্ত হবার আগে দিল্লি শাসন করতেন। শাহজাহান যখন সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হন, খানজাহান অসুস্থতার দোহাই দিয়ে দৃষ্টিকটুভাবে নিজে আগ্রা এসে অভিবাদন জানানো থেকে বিরত থাকেন। শাহজাহান সাথে সাথে তাকে আগ্রায় তলব করলে তিনি অনীহার সাথে তার আদেশ পালন করেন। খানজাহান দরবারে উপস্থিত হবার পর তখনো সন্দিগ্ধ শাহজাহান তাকে তার সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিতে বলেন এবং তার কিছু জমি বাজেয়াপ্ত করেন।

খানজাহানের কাছে শাস্তির মাত্রাটা বাড়াবাড়ি রকমের মনে হলে তিনি ১৬২৯ সালের অক্টোবর মাসে রাতের আঁধারে দুই হাজার আফগান যোদ্ধা নিয়ে দাক্ষিণাত্যের উদ্দেশ্যে আগ্রা থেকে পলায়ন করেন। শাহজাহান কালবিলম্ব না করে তার পশ্চাতদ্ধাবন করতে রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা দ্রুত অনুসরণ করে তাকে ধরে ফেলে এবং আগ্রা থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে, চম্বল নদীর তীরে তার বাহিনীর মুখোমুখি হয়। এক প্রচণ্ড রক্তাক্ত যুদ্ধের পর যেখানে খানজাহানের দুই পুত্র, দুই ভাইসহ তার প্রচুর অনুসারী নিহত হয়। তিনি ভরা নদী সাঁতরে পার হয়ে পালিয়ে যান এবং আহমেদনগর রাজ্যের উদ্দেশে অগ্রসর হন। খানজাহানকে আগ্রায় ডেকে পাঠাবার আগে থেকেই তিনি আহমেদনগরের শাসকের সাথে গোপনে ষড়যন্ত্র শুরু করায় তিনি তাকে তার মিত্র হিসেবে সেখানে স্বাগত জানান এবং নিজের সৈন্যদল পরিচালনার দায়িত্ব দেন।

শাহজাহান বুরহানপুরে শিবির স্থাপনের মাঝে সিদ্ধান্ত নেন এবার কেবল আহমেদনগর নয়, দাক্ষিণাত্যে তার অন্য পুরান শত্রুদেরও—বিজাপুর আর গোলকুণ্ডা রাজ্য—সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করতে চেষ্টা করবে। শাহজাহান এবারের অভিযানে নিজে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে আগ্রহী নন কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মোগল বাহিনীর সর্বময় সেনাপতি হিসেবে তার উপস্থিতি ভীষণ অপরিহার্য। তার এক ঐতিহাসিকের ভাষ্য অনুসারে, 'তার বাহিনীর নেতৃত্বদানকারী সেনাপতি আর গোত্রপতিদের মাঝে মতানৈক্য আর ঝগড়ার মাত্রা এতটাই প্রবল ছিল যে, তারা ক্রমাগত একে অপরের সাহসী উদ্যোগ ব্যর্থ করতে চেষ্টা করতেন।'

শাহজাহান যখন তার সেনাপতি, পরামর্শদাতাদের সাথে আলোচনা করে নিজের যুদ্ধকৌশল বিবেচনা করছেন, মমতাজ তখন দুর্গের রাজকীয় আবাসিক এলাকায় তাদের তেরোতম সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন। বুরহানপুরে তাদের আগমনের এক মাসের ভেতরেই তিনি একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। রাজদরবারের দিনপঞ্জির রচয়িতারা সাদামাটাভাবে লিপিবদ্ধ করেন, ভূমিষ্ঠ হবার পর পরই নবজাতকের মৃত্যু হয়েছিল।

■

১৬৩০ সালের শেষ নাগাদ আহমেদনগর অবশেষে আত্মসমর্পণ করে। খানজাহানকে তার প্রাক্তন মিত্ররা পরিত্যাগ করলে তিনি পাঞ্জাবের দিকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন কিন্তু মোগল সৈন্যবাহিনী পথে তাকে বন্দি করে এবং হত্যা করে। তার কর্তিত মস্তক বুরহানপুরে শাহজাহানের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং শহরের প্রধান প্রবেশদ্বারে টাঙিয়ে রাখা হয়। অবশ্য পরবর্তী অভিযান মোটেই মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়নি। দাক্ষিণাত্যের সুলতানেরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের শক্ত ঘাঁটিতে গিয়ে আশ্রয় নিলে যুদ্ধটা পর্যায়ক্রমিক অবরোধে পর্যবসিত হয়। এক দিনপঞ্জি রচয়িতা লিখেছেন, দুর্গগুলো শক্তিশালী, সৈন্য শিবিরের মনোভাব কঠোর...' শতবর্ষের ভেতরে সবচেয়ে তীব্র আর দীর্ঘায়িত দুর্ভিক্ষ এলাকায় আক্রমণ করতে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠে। তিন বছর পূর্বে দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়েছিল এবং ১৬৩০ সাল নাগাদ আরব সাগরের উপকূল হতে স্থলভাগের অনেক ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের ফলে অবশ্য খাদ্য ঘাটতি আরো প্রকট হয়ে উঠেছিল। ইউরোপীয় বণিকের বর্ণনা অনুসারে 'মানুষ এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে তারা জীবনের পরোয়া করত না, তারা আহারের সংস্থানের জন্য যেকোনো কিছু করতে দ্বিধা করত না।' রাজপথ আর সড়কগুলো 'বিপুলসংখ্যক মৃত আর মরণাপন্ন মানুষের' ভিড়ে 'বিষাদাক্রান্ত দৃশ্যে পরিণত হয়েছিল।'

পিটার মানডি, এই সময়ে উপকূল থেকে বুরহানপুরের দিকে যাত্রা করছিলেন। পথে মানুষকে পশুর বিষ্ঠা নিয়ে একে অপরের সাথে মারামারি করতে দেখেছেন যেখান থেকে তারা হজম না হওয়া খাদ্যশস্য ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে খুটে খাচ্ছে। তিনি বেপরোয়া পিতা-মাতাকে নিজ সন্তান বিক্রি করতে বা দান করতে দেখেছেন, 'যারা তাদের সন্তানকে নিতে আগ্রহী...যাতে তারা হয়তো তাদের জীবিত রাখবে, যদিও তারা নিশ্চিত যে আর কখনো নিজের সন্তানকে তারা দেখতে পাবে না।' বাতাসে তখন কেবল মৃত্যুর মিষ্টি গা গুলিয়ে তোলা গন্ধ। দুর্ভিক্ষপীড়িত শহর আর গ্রামে তখনো যাদের দেহে শক্তি অবশিষ্ট ছিল তারা মৃতপ্রায় নগ্ন, কঙ্কালসার মানুষগুলোকে শেয়াল-কুকুরের আহারে পরিণত হবার

জন্য টেনে বাইরে স্তূপীকৃত করে ফেলে রাখায় পিটার মানডি কোনো কোনো রাতে তাঁবু টাঙানোর স্থান খুঁজে পেতেন না।

শাহজাহান পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করেন, যা ইতিমধ্যে বুরহানপুরের সড়কে এসে উপস্থিত হয়েছে, যদিও সেখানের অধিবাসীদের অন্তত তাপ্তির ক্রমহ্রাসমান পানির সরবরাহ রয়েছে। তার ঐতিহাসিকরা নথিবদ্ধ করেন : 'গত এক বছরে এক ফোঁটাও বৃষ্টিপাত হয়নি...এবং খরার প্রকোপ ভীষণ তীব্র...ছাগলের মাংসের বদলে বাজারে কুকুরের মাংস বিক্রি হচ্ছে এবং মৃত (মানুষের) হাড় গুঁড়া করে ময়দার সাথে মিশিয়ে বিক্রি হচ্ছে (রুটি তৈরির জন্য)...দুর্গতির মাত্রা এমনই চরম আকার ধারণ করেছিল যে, মানুষ একে অপরের মাংস খেতে শুরু করে এবং পুত্রের মাংস তার প্রিয়জনদের কাছে সবচেয়ে উপাদেয় হয়ে দেখা দেয়।' শাহজাহান তার দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের সাহায্য করতে খাজনা মাফ করে দেন এবং তার আধিকারিকদের বুরহানপুর এবং অন্যান্য শহরে লঙ্গরখানা খোলার আদেশ দেন, যেখান থেকে ক্ষুধার্ত মানুষদের মাঝে রুটি আর ডাল ভাগ করে দেয়া হবে। তিনি সেইসাথে প্রতি সোমবার দরিদ্রদের মাঝে পাঁচ হাজার রুপি দান করার আদেশ দেন, 'যে দিনটা সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণের দিন হিসেবে সপ্তাহের অন্য দিনগুলো থেকে আলাদা হিসেবে দেখা হয়।'

মৃত্যু আর দুর্গতির মাঝে, খাঁ-খাঁ করতে থাকা প্রান্তরে যখন কেবল শকুন আর চিলের আনাগোনা। শাহজাহান আর সতত গর্ভবতী মমতাজ আরো একবার নবাগত সন্তানের মুখ দেখার জন্য প্রস্তুত হন। মমতাজ তার গর্ভাবস্থার কিছু সময় নিজের বড় ছেলে পনেরো বছর বয়সী দারা শুকোহ্‌র বিয়ের পরিকল্পনা করে অতিবাহিত করেন। তিনি বধূ হিসেবে দারার চাচাতো বোন, শাহজাহানের সৎভাই পারভেজের মেয়ের নাম প্রস্তাব করেন। রাজবংশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করলে যুক্তিসংগত প্রস্তাব এবং মমতাজ সম্ভবত রাজপরিবারের মধ্যে বিদ্যমান বিভেদ উপশমের আশা করেছিলেন। ঘটনা যাই হোক না কেন, তার স্বামী এবং পুত্র উভয়েই তার পরামর্শকে স্বাগত জানান এবং শাহজাহান দিল্লিতে বার্তাবাহক প্রেরণ করে তার আধিকারিকদের চমকপ্রদ এক অনুষ্ঠান আয়োজন করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেন।

মমতাজ যখন তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন, তিনি তখন দুর্গ-প্রাসাদের আরাম-আয়েশ উপভোগে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। তার তিন তলা বিশিষ্ট বাসস্থানের একদিকে নদী আর অন্যদিকে মাটি খুঁড়ে তৈরি করা দৃষ্টিনন্দন উদ্যান। নদীর তীরে অবস্থিত হাতি মহলে রক্ষিত তার স্বামীর রণহস্তির পালকে, সেখান থেকে তাপ্তি নদীতে গোসলের জন্য নিয়ে গেলে সেটা

একটি চিত্তবিক্ষেপের সৃষ্টি করে। মমতাজ নিজে লতাপাতার নকশা করা গম্বুজাকৃতি ছাদের নিচে মার্বেলের হাম্মানে গোসল সম্পন্ন করেন। শীতল, সুবাসিত পানি মার্বেলের একটি নহর দিয়ে প্রবাহিত হয় যখন অন্য আরেকটা নহর দিয়ে সর্বদা জ্বলন্ত তেলের প্রদীপের দ্বারা উষ্ণ পানি মৃদু তরঙ্গ তুলে প্রবাহিত হয়।

১৬৩১ সালের গ্রীষ্মকালের প্রখর দাবদাহের সময় মমতাজের গর্ভযন্ত্রণা শুরু হয়। তার কন্যা জাহানারা তার পাশেই ছিল এবং শাহজাহান পাশের একটি কক্ষে অপেক্ষা করছিলেন। রাজদরবারের জ্যোতিষীরা আরো একজন যুবরাজের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক দীর্ঘ ত্রিশ ঘণ্টা শেষে বহু কষ্টে একটি কন্যাসন্তান, গওহোরার জন্ম হয়। আটত্রিশ বছর বয়সী সম্রাজ্ঞীর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ঠিক কী ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে বহু পূর্বে হারিয়ে যাওয়া ফার্সি পাণ্ডুলিপির নকল থেকে পরস্পরবিরোধী নানা ভাষ্য আমরা জানতে পারি। সর্বাধিক প্রচলিত একটি ভাষ্য অনুসারে মমতাজ যখন গর্ভযন্ত্রণার কষ্টের মাঝে ক্লান্ত হয়ে শুয়েছিলেন তখন তিনি তার গর্ভের ভেতর থেকে কান্নার একটি শব্দ ভেসে আসতে শোনেন। রহস্যজনক, ক্ষীণ শব্দে আতঙ্কিত হয়ে উঠে তিনি জাহানারাকে বলেন দৌড়ে গিয়ে শাহজাহানকে ডেকে নিয়ে আসতে। তার উদ্বিগ্ন স্বামী দ্রুত তার পাশে এসে উপস্থিত হতে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়। মমতাজ তাদের সন্তানদের নিরাপদে রাখার জন্য শাহজাহানকে অনুরোধ করার আগেই ফিসফিস করে তাকে শেষ বিদায় জানান এবং তার বাহুতে মৃত্যুবরণ করেন। ভোর হতে তখনো তিন ঘণ্টা বাকি।

আরেকটা একই রকম কিন্তু আরো বিস্তারিত বর্ণনা অনুসারে, দেহে গর্ভাবস্থার লক্ষণ ভীষণভাবে প্রকট হয়ে ওঠা অবস্থায় মমতাজ তার তার স্বামীর সাথে শতরঞ্জ খেলার সময় উভয়েই বাচ্চার ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পান। তারা চমকে উঠে নিজেদের চারপাশে তাকালে তারা কাছাকাছি কোনো শিশুকে দেখতে অপারগ হন। তারা কিছুক্ষণ পর আবারও ফোঁপানির আওয়াজ শুনতে পান এবং আতঙ্কিত হয়ে অনুধাবন করেন, মমতাজের গর্ভ থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। কান্নার আওয়াজকে একটি অশুভ লক্ষণ হিসেবে ভেবে ভয় পেয়ে, তারা সাথে সাথে হেকিম, জ্যোতিষী আর অন্য বিজ্ঞজনদের এই কান্নার মানে তরজমা করতে বলেন। শাহজাহান যখন আল্লাহতায়ালার করুণা লাভের জন্য দরিদ্রদের মাঝে দুই হাতে অর্থ বিতরণ করছেন, হেকিমরা সম্রাজ্ঞীকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন, তার যন্ত্রণা তখন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে এবং প্রতিমুহূর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজের জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে এবং অশ্রুসজল চোখে, মমতাজ বহু কষ্টে শাহজাহানের প্রতি তার শেষ ভালোবাসাপূর্ণ শব্দগুলো উচ্চারণ করেন, 'আজ বিদায়ের বেলা সমাগত; বিচ্ছেদ মেনে নিয়ে যন্ত্রণাকে আলিঙ্গনের সময় হয়েছে। গত কয়েক দিন আমি

আমার প্রিয়তমের সৌন্দর্য দ্বারা মুগ্ধ হয়ে ছিলাম, এখন (আমার) রক্তক্ষরণ হচ্ছে, কারণ আজ বিচ্ছেদের সময় সমাগত।' মমতাজ যখন ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন, তখন তিনি শাহজাহানের কাছে প্রতিশ্রুতি চান অন্য কারো গর্ভে তিনি আর কোনো সন্তান জন্ম দেবেন না। তিনি সেইসাথে তার অশ্রুসজল স্বামীকে বলেন, আগের রাতে তিনি স্বপ্নে 'সবুজ উদ্যানবেষ্টিত একটি সুন্দর প্রাসাদ দেখেছেন, যেমনটা তিনি আগে কখনো কল্পনাও করেননি' এবং তাকে অনুরোধ করে বলেন তার সমাধিসৌধ যেন অবিকল সেই রকমভাবে তৈরি করা হয়। আরেকটা ভাষ্য আরো কাব্যিকভাবে ঘোষণা করে যে, মমতাজের শেষ কথাগুলো ছিল : 'আমার জন্য একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করবেন, যা হবে অনন্য আর অসাধারণ সুন্দর পৃথিবীর বুকে যার সৌন্দর্যের কোনো খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

শাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিকরা সাদামাটা কিন্তু মর্মস্পর্শী কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। মমতাজের পক্ষে দীর্ঘ, কষ্টকর প্রসব বেদনা এবং অবশেষে কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠের কালে যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি সহ্য করা সম্ভব হয়নি। 'দুর্বলতা তাকে একেবারেই কাহিল করে ফেলেছিল' এবং তিনি মারা যাচ্ছেন বুঝতে পেরেই জাহানারাকে পাঠিয়েছিলেন শাহজাহানকে ডেকে নিয়ে আসতে। 'আবেগে অধীর হয়ে,' তিনি সংক্ষিপ্ত, শেষ বিদায়ের জন্য দ্রুত তার পাশে এসে উপস্থিত হন। ক্রন্দনরত মমতাজ 'যন্ত্রণা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে' তাদের সন্তানদের যত্ন নেয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করেন এবং তার কাছ থেকে চূড়ান্ত বিদায় নেন। এর কিছুক্ষণ পরই, 'ঘড়িতে যখন সেই কালরাত্রির আরো তিন ঘণ্টা বাকি রয়েছে ধ্বনিত হয়...তিনি পরম করুণাময়ের আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পিত করেন।'

ইসলামি রীতি অনুসারে, মমতাজকে দ্রুত সমাধিস্থ করা হয়। মৃত মেয়ে মানুষের শরীর সমাধিস্থ করার জন্য প্রস্তুত করার সনাতন রীতি অনুসারে প্রথমে একজন স্ত্রীলোক কর্পূর মিশ্রিত শীতল জলে মৃতদেহ ভালোমতো গোসল করাবে, তারপর সাদা সুতির পাঁচ টুকরো কাফনের কাপড় দিয়ে মৃতদেহটা মুড়ে দেবে। ভূত-প্রেতের দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ভয়ের কারণে এরপরে, প্রাসাদের দেয়ালে সদ্য তৈরি করা একটি উন্মুক্ত স্থান দিয়ে প্রথমে মাথা রেখে পুরো দেহটা বাইরে বের করা হয়। এই রীতি অনুসৃত হতো যাতে যেখানে মৃত্যু হয়েছে সেখানে সেই ভবনের ভেতরে মৃতের আত্মাকে পথ খুঁজে ফিরে আসতে বাঁধা দিতে। মমতাজের মৃতদেহ এরপরে তাপ্তি নদীর অপর তীরে শাহজাহানের চাচাজান দানিয়েলের তৈরি করা প্রাচীরবেষ্টিত মোগল আনন্দ উদ্যানে কাঠের শবাধারে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে সেখানে অস্থায়ী একটি কবরে মাথা উত্তর দিকে শায়িত করে মুখ কাবাঘরের দিকে ফিরিয়ে রেখে সমাধিস্থ করা হয়।
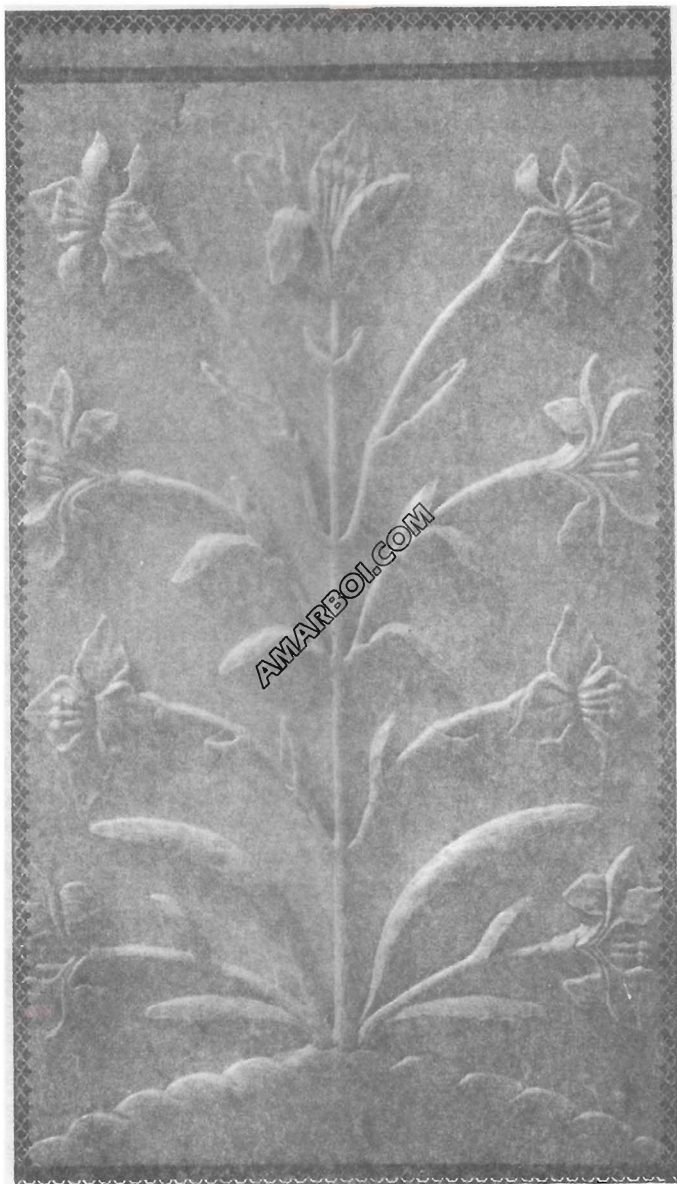
নবম অধ্যায়

যন্ত্রণার রেণুকণা

মমতাজের আকস্মিক মৃত্যু শাহজাহানকে মানসিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলে। গত পনেরো বছর তিনি ছিলেন 'তার রাতের কক্ষের আলোকচ্ছটা' যার কাছ থেকে তিনি কখনো আলাদা থাকার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। অথচ তাদের সব ছাপিয়ে যাওয়া আবেগ এবং গর্ভধারণের ক্ষেত্রে তার অবিস্মরণীয় উর্বরতাই শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শাহজাহানের একজন ঐতিহাসিক যেমনটা লিখেছেন, মমতাজ ছিলেন 'সৌভাগ্যের সমুদ্রের ঝিনুক, যিনি বছরের বেশির ভাগ সময়ই গর্ভবতী থাকতেন' যাতে করে :

তিনি মর্যাদাবান সম্রাটের উরু সংযোগস্থল থেকে
পৃথিবীতে রাজবংশের চৌদ্দজনকে নিয়ে এসেছেন।

তাদের ভেতরে, সাতজনের বেহেশত নসিব হয়েছে,
সাতজন যারা বেঁচে আছেন তারা সাম্রাজ্যের প্রদীপ শিখা।

তিনি যখন এই সন্তানদের জন্ম দিয়ে পৃথিবীকে অলংকৃত করেছেন,
চাঁদের মতো চৌদ্দের পরে তিনি ক্ষীণজ্যোতি হয়ে পড়েছেন।

তিনি যখন গর্ভের শেষ মুক্তার জন্ম দান করলেন,
ঝিনুকের মতো তিনি নিজের দেহ তারপরে নিঃস্ব করে দিলেন।

অন্যভাবে বলতে গেলে, উনিশ বছরের অটমান, অনেক সময়ে বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে চৌদ্দবার গর্ভধারণ করাটা মমতাজের জন্য এক কথায় সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল।

দরবারের ঐতিহাসিক একই সাথে মানুষের সুখের বহমান প্রকৃতির জন্য, যা এমনকি সম্রাটদের ক্ষেত্রের প্রয়োজ্য, শাহজাহানের হতাশাও ফুটিয়ে তুলেছেন : 'হায়! এই স্বল্পকালস্থায়ী পৃথিবী অস্থিত এবং এখানে স্বস্তির গোলাপ কণ্টকাকীর্ণ মাঠের ভেতরে অবস্থিত। পৃথিবীর পঙ্কিল প্রেক্ষাপটে, এমন কোনো বায়ুপ্রবাহ নেই যা থেকে যন্ত্রণার রেণুকণা উত্থিত হয় না এবং পৃথিবীর এই সমাবেশে, কেউই আনন্দে কোনো আসনে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না, যাকে সেটা দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে খালি না করতে হবে।' তাদের ভাষ্য অনুসারে, শাহজাহান তার মমতাজহীন প্রাধিকার অস্তিত্বের নিস্ফলতার জন্য বিলাপ করেছেন : 'অপ্রতিম দাতা আমাদের যদিও অশেষ দানে ভরিয়ে তুলেছেন...কিন্তু আমরা যার সাথে সেই দান উপভোগ করতে চাই সেই মানুষটাই চলে গেছে।' শোকের প্রথম প্রহরে তিনি এমনকি সিংহাসন ত্যাগের কথাও বিবেচনা করেছেন, তার অমাত্যদের কাছে বলেছেন, 'পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা যদি আমাদের ওপর...পৃথিবীর দায়িত্বভার এবং সমগ্র মানবতার রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ না করতেন...আমরা তাহলে রাজত্ব পরিত্যাগ করে নির্জনতার পৃথিবীর দায়িত্ব গ্রহণ করতাম।'

শাহজাহান নিজের 'মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ আর রাত্রি আলোকিত করা রত্নপাথর' পরিত্যাগ করে 'ভোরের প্রথম আলোর মতো ধূসর সাদা লেবাস' পরিধান করে গভীর শোকে নিমজ্জিত হন, পরবর্তী দুই বছর এবং তারপরে প্রতি বুধবার—মমতাজের মৃত্যুর দিনে তিনি এই পোশাক পরিধান করতেন। শাহজাহানের রাজত্বকালের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি লিখেছেন :

ক্রমাগত ঝরতে থাকা অশ্রু তার পরিচ্ছদ সাদা করে ফেলেছিল
হিন্দুস্তানে, সাদা হলো শোকের রং

শুরুর দিকের মোগলদের কাছে নীল আর কালো ছিল শোকের রং কিন্তু শাহজাহানের সময়ে তারা তাদের হিন্দু প্রজাদের শোকের বর্ণ আর কৃচ্ছ্রতার প্রতীক হিসেবে—সাদাকে গ্রহণ করেছেন। রাজদরবারের অন্যরা—'সমস্ত ভাগ্যবান যুবরাজ, কীর্তিমান আমির, সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা আর সাম্রাজ্যের অভিজাতসম্প্রদায়'—এই রং অনুসরণ করে, নিজের চমৎকার আলখাল্লার পরিবর্তে সাদা জোব্বা পরিধান করতে আরম্ভ করেন। সম্রাট সেইসাথে 'সব ধরনের আমোদ-প্রমোদ আর মনোরঞ্জন বিশেষ করে সংগীত আর বাদ্যযন্ত্র' পুরোপুরি বর্জন করেন। তিনি নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তার মুখাবয়বে 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রমাগতভাবে শোক, দুঃখ আর বিপর্যয়ের লক্ষণ আবিভূর্ত হতে থাকে', যখন 'সর্বদা অশ্রুসজল থাকার কারণে তিনি চমশা পরিধানে বাধ্য হন।'

মমতাজের মৃত্যু খুবই প্রত্যক্ষভাবে শাহজাহানের তারুণ্যের সমাপ্তির সূচনা করে। তার ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করেছেন, 'তার মাঙ্গলিক শশ্রুরাজিতে এই শোকাবহ ঘটনার পূর্বে দশ কি বারোটার বেশি সাদা কেশের অস্তিত্ব ছিল না, যা তিনি টেনে তুলে ফেলতেন, কয়েক দিনের ভেতরেই শ্মশ্রুর এক-তৃতীয়াংশ সাদা হয় যায় : এবং তিনি পাকা কেশ তুলে ফেলার অভ্যাস পরিত্যাগ করেন। এবং তিনি প্রায়ই বিষয়টি সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন যে, তার এই বয়সে শ্রদ্ধা উদ্রেককারী শ্মশ্রুরাজি এই আত্মা-গ্রাসকারী ঘটনার যন্ত্রণা আর পীড়ার মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে এত দ্রুত সাদা হয়েছে।'

সম্রাট পুরো একটি সপ্তাহ *ঝরোকা* বারান্দায় তার প্রথাগত দর্শনদান বা দরবারে প্রকাশ্যে বা একান্তে সাক্ষাৎ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। এই সপ্তাহের শেষ নাগাদ, ২৫ জুন ১৬৩১ সাল, তিনি একটি নৌকা নিয়ে একাকী তাপ্তি নদী অতিক্রম করে মমতাজকে যেখানে সমাধিস্থ করা হয়েছে সেই প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানে গমন করেন, যেখানে স্ত্রীর সমাধিতে তিনি 'অঝোরে দীপ্তিময় মুক্তার মতো অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করেন।' কয়েক দিন পর, জুলাই মাসের ৪ তারিখে, সচরাচর আনন্দোচ্ছল গোলাপ-জলের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু তিনি যদিও মমতাজ আর তার সন্তানদের এবং কার আব্বাজানকে লিলিফুল আর কমলা ফুলের নির্যাসযুক্ত গোলাপ-জলের রত্নখচিত প্রথাগত পাত্র উপহার দেন, উৎসবটা সংক্ষিপ্ত করা হয় এবং পুরো আয়োজনের পরিবেশই ছিল বিষণ্ন নিরানন্দ।

মমতাজ দারুণ ধনবান এক মহিলা হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ সোনা, রুপা রত্নপাথর আর অলংকার মিলিয়ে প্রায় ১০,০০০,০০০ রুপির অধিক হিসেবে নির্ধারিত হয়। শাহজাহান এই সম্পদের অর্ধেক তাদের জ্যেষ্ঠ কন্যা সতেরো বছর বয়সী জাহানারাকে দান করেন এবং বাকি অংশ তাদের ছয় সন্তানের মধ্যে বিলিয়ে দেন (তাদের সবচেয়ে কনিষ্ঠ সন্তান, দৌলত আফজা, কয়েক মাস পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।) অল্প বয়সী হওয়া সত্ত্বেও, সুন্দরী, চতুর, গুণবতী জাহানারাই কার্যত শাহজাহানের অন্য দুই অবহেলিত স্ত্রীর পরিবর্তে মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান মহিষী হিসেবে 'বেগম সাহিবা' উপাধি নিয়ে মমতাজের শূন্যস্থান পূরণ করেন। কয়েক মাস পর শাহজাহান তার আম্মিজানের ন্যায় জাহানারাকে রাজকীয় সিলমোহরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেন যাতে, 'সেদিন থেকে, রাজকীয় অধ্যাদেশে মহান সিলমোহর সংযুক্ত করার দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়।' তার আম্মিজান যেমন করতেন, তিনিও অচিরেই নিজ অধিকারবলে আদেশ জারি করতে আরম্ভ করেন।

শাহজাহান কখনো চাননি যে বুরহানপুর মমতাজের স্থায়ী সমাধিস্থল হিসেবে পরিগণিত হোক। তার মরদেহ কবর থেকে তোলা হয় এবং ১৬৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিষণ্ন একটি শোভাযাত্রা রওনা দেয় মৃত সম্রাজ্ঞীকে আগ্রায় নিজগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। জাহানারা এই শোভাযাত্রায় অংশ নেননি বরং নিজের শোকার্ত পিতার সেবা-শুশ্রূষার জন্য তিনি থেকে যান যিনি সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে নিজের সামরিক অভিযান সমাপ্ত করার অভিপ্রায়ে অবস্থান করছিলেন। স্বর্ণ নির্মিত শবাধার মমতাজকে যেটায় বহন করে নিয়ে আসা হবে সেই শবাধারকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিয়ে আসার দায়িত্ব পনেরো বছর বয়সী শাহ সুজা আর মমতাজের বন্ধু এবং প্রধান সঙ্গিনী, স্বাতী-আল নিসার ওপর অর্পিত হয়।

তারা যখন মন্থর গতিতে উত্তর দিকে ভ্রমণ করে, পরহেজগার মানুষেরা উচ্চস্বরে কোরআন শরিফ পাঠ করতে থাকেন এবং পুরোটা পথ রাজকীয় পরিচারকরা দরিদ্রদের ভেতরে খাদ্যদ্রব্য, পানীয় এবং স্বর্ণ আর রৌপ্য মুদ্রা বিতরণ করে। শবাধার বহনকারী দলটা আগ্রার নিকটবর্তী হতে, দরবারের এক কবি বর্ণনা করেছেন কীভাবে বিপুল একটি বিলাপের সুর চারপাশ থেকে ভেসে ওঠে :

পৃথিবী তার বাসিন্দাদের চোখে কালো আর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে
শহরের পুরুষ আর মহিলারা, প্রজা থেকে শুরু করে পরিচারকরা সবাই,
তাদের মুখ শোকের নীল রঙে রঞ্জিত করে।

মমতাজকে দ্রুত যমুনার তীরে 'একটি ছোট গম্বুজযুক্ত ভবনে' সমাধিস্থ করা হয়। এই দ্বিতীয় সমাধিও তার শেষ বিশ্রামস্থল হবে না। শাহজাহান যদিও তখনো বুরহানপুরেই অবস্থান করছিলেন তিনি ইতিমধ্যে তার 'সময়ের রানি'র জন্য একটি উপযুক্ত অট্টালিকা, 'একটি উজ্জ্বল সমাধিসৌধ' পরিকল্পনা করেন।

শাহজাহানকে মূলত তিনটি অভিপ্রায় অনুপ্রাণিত করেছিল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য, যা মমতাজ মহলের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ 'তাজমহল' হিসেবে প্রায় সাথে সাথে লোকমুখে পরিচিতি লাভ করে। প্রধান অভিপ্রায় ছিল মমতাজের প্রতি তার চিরন্তন ভালোবাসা এবং তাকে স্মরণীয় করে রাখতে তার আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সেইসাথে রাজকীয় ক্ষমতা আর মর্যাদার প্রতীক হিসেবে অট্টালিকা সম্বন্ধে তার ধারণা এবং স্থাপত্য আর নকশার জন্য এসবের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল গৌণ কারণ।

কতিপয় ঐতিহাসিক সাম্প্রতিক সময়ে মমতাজ মহলের প্রতি শাহজাহানের ভালোবাসাকে খর্ব করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু একাধারে বন্ধু আর প্রেমিক এমন একটি দম্পতির মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ক সম্পর্কে আমরা যা কিছু জানি সবই আমাদের বিপরীত ধারণাই দেয়। শাহজাহান, নিজের রাজকীয় ভাবমূর্তি সম্বন্ধে দারুণ সচেতন, খুবই যত্নের সাথে নিশ্চিত করেছেন যে তার দরবারের ঐতিহাসিকরা যা লিপিবদ্ধ করবেন তাতে যেন তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয় এবং তিনি নিজে তাদের প্রতিটি শব্দ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পরেই কেবল অনুমোদন করেছেন। তিনি নিজের আচ্ছন্ন করা শোক, শোকের 'স্থায়ী' চিহ্ন যা 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও' তার মুখে ফুটে থাকত এবং তার ভাবমূর্তির জন্য অবজ্ঞাপূর্ণ সব কিছু সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য লিপিবদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি সেইসাথে তার অন্য পত্নীরা 'পত্নীত্বের উপাধির বেশি কিছু উপভোগ করতেন না' এবং মমতাজের জন্য তার যে 'গভীর আর অন্তরঙ্গ অনুরাগ ছিল' তিনি সে রকম 'অন্য আর কারো প্রতি' অনুভব করতেন না মমতাজ মহলের দীপ্তিময় প্রশংসায়, যা শেষ অনুচ্ছেদে মূর্ত হয়ে উঠেছে এসবই তিনি নিশ্চিতভাবে অনুমোদনের অনুমতি দিয়েছিলেন : 'তিনি সর্বদা মহামান্য সম্রাটের সাথে অন্তরঙ্গতা আর নৈকট্যের সৌভাগ্য এবং সতত সঙ্গী আর সহচরের পরিতৃপ্তির সর্বোত্তম সম্মান আর স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাদের মধ্যকার বন্ধুত্ব আর মতৈক্য এমন একটি মাত্রা লাভ করেছিল, যা শাসক শ্রেণীর বা জনগণের অন্য শ্রেণীর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পূর্বে কখনো পরিলক্ষিত হয়নি এবং কেবল এটা শারীরিক আকাঙ্ক্ষা থেকে নয় বরং উচ্চকোটির সদগুণ আর প্রীতিকর প্রবৃত্তি, অন্তরের আর বাইরের ভালোত্ব এবং উভয় পক্ষের শারীরিক আর আধ্যাত্মিক উপযুক্ততা থেকেই এমন প্রবল ভালোবাসা আর প্রীতি এবং সীমাহীন অনুরাগ আর ঘনিষ্ঠতার জন্ম হয়েছিল।'

শাহজাহান এমন একটি সমাজে বাস করতেন, যা ছিল একেবারেই পুরুষশাসিত, যেখানে বহুবিবাহ স্বীকৃত আর একজন স্ত্রীর জন্য আবেগ প্রকাশ করা এবং তার মৃত্যুতে এমন প্রবল শোক প্রকাশকে একজন সম্রাটের গুণের পরিবর্তে তার দুর্বলতা হিসেবে গণ্য করা হতো, সেখানে তার এমন আবেগের প্রকাশ সত্যিই বিস্ময়কর। পূর্ব আর পশ্চিমের অন্য শাসকেরা অবশ্য তাদের মহোত্তম আর সবচেয়ে ব্যয়বহুল স্থাপত্য আর শৈল্পিক প্রয়াসে ব্যয় করেছেন—উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মিশরের পিরামিড, চিনে বেইজিংয়ের কাছে জিন বা মিঙ সমাধিতে প্রাপ্ত টেরাকোটা সৈন্য এবং ১৬১৬ থেকে ১৬৩৬ সালের মধ্যে জাপানের নিক্কোতে মৃত শোগানদের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত বিশাল সমাধিসৌধ। এসব স্মৃতিসৌধ অবশ্য শাসকদের সঙ্গীদের চেয়ে তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই মূলত নির্মাণ করা হয়েছে।

শাহজাহানের ন্যায় একই ধরনের অনুরক্তি নিয়ে স্ত্রীর মৃত্যুকে স্মরণীয় করে রাখতে তার পূর্বে সম্ভবত অন্য আর একজন শাসক চেষ্টা করছেন তিনি ইংল্যান্ডের প্রথম এডওয়ার্ড, যিনি ত্রয়োদশ শতকের শেষ নাগাদ তার স্ত্রী ইলেনরকে হারান যখন তিনি তার সাথে একটি রাজকীয় শোভাযাত্রায় সঙ্গী হয়েছিলেন। তাদের বিয়েটা যদিও মূলত সম্বন্ধ করে বিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা স্পষ্টতই প্রেমপূর্ণ বিয়েতে পর্যবসিত হয়। তাদের ছত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে ইলেনরের গর্ভে তার ষোলোটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, মমতাজের গর্ভে শাহজাহানের জন্ম নেয়া সন্তানের চেয়ে দুটি বেশি। ইলেনরের শবাধার বহনকারী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভাযাত্রা ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবের উদ্দেশ্যে ফিরতি পথে ২০০ মাইল দীর্ঘযাত্রায় প্রতি রাতে যেখানেই যাত্রা বিরতি করেছিল সেখানেই এডওয়ার্ড একটি করে অলংকৃত পাথরের ক্রুশ স্থাপন করেছিলেন।*

প্রথম এডওয়ার্ডের ক্ষেত্রে, তার কর্মকাণ্ডের একটি নিয়ামক ছিল খুব সম্ভবত নিজের রাজকীয় ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য (আজকের হিসাবে তিনি প্রায় উনিশ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় করেছিলেন) প্রদর্শন করা। মোগলরা এবং বিশেষ করে শাহজাহান, রাজকীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অসারতা এবং প্রজাদের নগণ্যতা প্রদর্শন করতে এবং জনগণকে ভয়ে অভিভূত আর মুগ্ধ করতে অট্টালিকাসমূহের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে ভালোভাবেই সচেতন ছিলেন। আবুল ফজল লিখেছেন, 'পরাক্রমশালী দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল, যা ভীরুকে রক্ষা করবে, বিদ্রোহীদের ভীত করে তুলবে এবং অনুগতকে প্রীত করবে...প্রকাণ্ড মিনারও নির্মিত হয়েছিল...এবং যা মর্যাদার জন্য উপকারী, যা পার্থিব ক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয়।' শাহজাহানের দিনপঞ্জির রচয়িতা লাহোরি সম্রাটের স্থাপত্য প্রকল্প সম্বন্ধে লিখেছেন "...এইসব প্রমাণ আকৃতির আর চমৎকার ভবনসমূহের নির্মাণ, যা আরবী প্রবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 'যথার্থই আমাদের নিদর্শনসমূহ আমাদের কথাই বলবে', মহামান্য সম্রাটের আল্লাহ প্রদত্ত আকাঙ্ক্ষা আর সম্ভ্রমউদ্রেককারী ঐশ্বর্যের কথা নির্বাক বাগ্মিতায় বলে (যাবে)।" তিনি তাজমহলকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন শাহজাহানের 'আকাশস্পর্শী আকাঙ্ক্ষায় সিক্ত একটি স্মৃতিসৌধ।' যদিও অবশ্য সুন্দর অট্টালিকার প্রতি শাহজাহানের ভালোবাসা আর এইসব ভবনের সৃষ্টি করা দৃশ্যকল্প মূল্যায়নে তার ক্ষমতা সব কিছু তিনি যে বিশাল প্রকল্প শুরু করতে চলেছেন তার সাথে সুন্দরভাবে একাঙ্গীভূত হয়ে যায়, এসবই জুড়িহীন ভালোবাসাকে স্বীকৃতি জানাতে তার সংকল্পের কাছে গৌণ।

---

* প্রথম এডওয়ার্ডের স্থাপিত বেশির ভাগ ক্রুশই হারিয়ে গিয়েছে কিন্তু চেরিং ক্রশে স্থাপিত ক্রুশটা পুনর্গঠিত করা হয়েছে এবং লন্ডন থেকে দূরত্ব গণনা করতে এই নির্দিষ্ট স্থানটি ব্যবহৃত হয়।
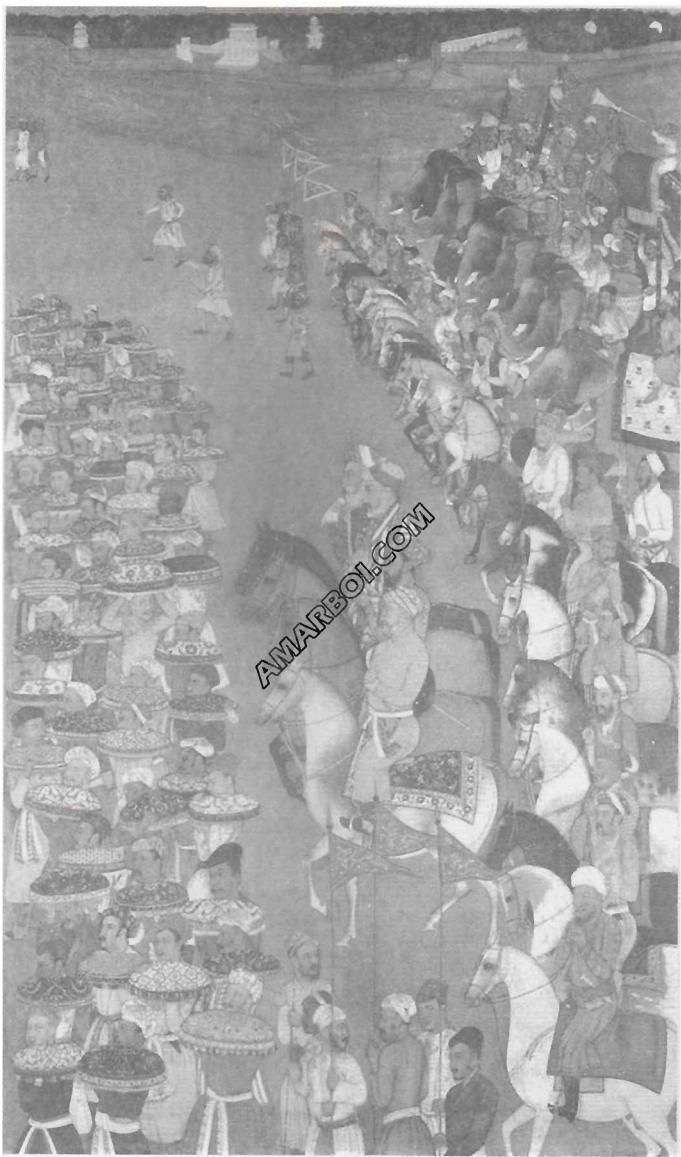
১৬৩৩ সালে, দারা শুকোহর বিবাহযাত্রা

আতশবাজি উপভোগরত মোগল রমণী

অন্যথায় তিনি তার মহোত্তম ধারণার কেন্দ্রস্থলে মমতাজকে শায়িত করতেন না।

মমতাজ মহলের জন্য সমাধিসৌধের পরিকল্পনা করার সময়, শাহজাহান ভারতবর্ষে আর মধ্য এশিয়ায় উভয় স্থানে তার পূর্বপুরুষদের নির্মিত সমাধিসৌধের দীর্ঘ ঐতিহ্যের মাঝে বিবেচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এ কথা সত্যি যে, চেঙ্গিস খানের আদেশ অনুসারে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভাযাত্রা যারা দর্শন করবে তারা যেন কেউ গল্প বলার জন্য জীবিত না থাকে তা পালিত হয়েছিল
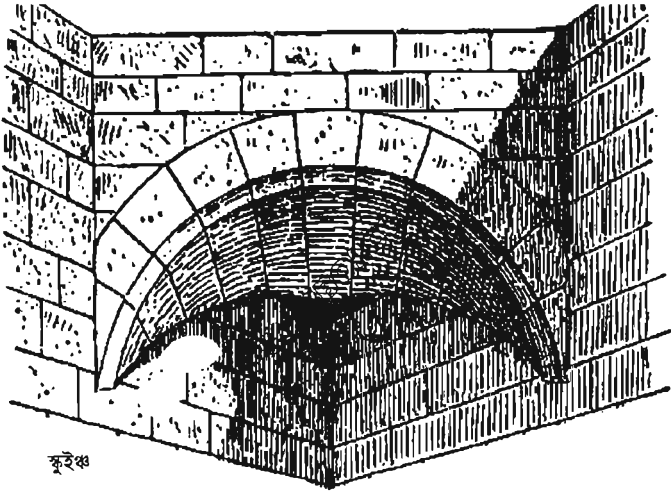
স্কুইঞ্চ

এবং নিশ্চিতভাবেই তাকে কোথায় সমাধিস্থ করা হয়েছে সে বিষয়ে কোনো নথিপত্র পাওয়া যায় না। তার বংশধরেরা অবশ্য সমাধিসৌধ নির্মাতা হিসেবে নিজেদের উন্নত ধারণা আর প্রাণশক্তির প্রচুর নজির পরবর্তী কালে রেখে গেছেন। যেমন চৌদ্দ শতকের গোড়ার দিকে পারস্যের সুলতানিয়ার নিজের সাম্রাজ্যের রাজধানীতে মোঙ্গল যুবরাজ উলজাতুর নিজের জন্য নির্মিত ১৬০ ফিট উঁচু ডিম্বাকৃতি গম্বুজ বিশিষ্ট অষ্টভুজাকৃতি সমাধি যার চারপাশে বৃত্তাকারে আটটি মিনার রয়েছে।* মোগল স্থাপত্যরীতিতে পরবর্তী সময়ে আরো

---

* আজও এই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। তেহরানের ঠিক বাইরে আয়াতুল্লাহ্ খোমেনির জন্য ইসলামের সবচেয়ে বৃহৎ সমাধি কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে। এটা যদিও তার উত্তরসূরিদের মতো এতটা প্রাচুর্যময় নয়। আয়াতুল্লাহ্র আদেশ অনুসারে নির্মাণে

পরিশীলিত হয়ে প্রতিভাত হবে এমন অনেক কিছুই এই সমাধিতে ব্যবহৃত হয়েছে।
শাহজাহানের সময়ে একটি গম্বুজকে কীভাবে একটি ভবনের উপরে স্থাপন করা যাবে যার অভ্যন্তরভাগের আকার গম্বুজের আকারের চেয়ে বেশি এই অন্যতম প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা দূরীভূত হয়েছিল। পারস্যের সাসানিড সাম্রাজ্যের নির্মাতারা খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের দিকেই সমস্যাটার সমাধান বের করেছিল, তারা একটি নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে, যেখানে গম্বুজটার ভার বহনের জন্য দুটো দেয়ালের পরস্পর মিলিত হবার স্থানে—স্কুইঞ্চ—আড়াআড়িভাবে তারা একটি সাধারণ খিলান ব্যবহার করে। এটা অষ্টভুজের ক্ষেত্রে একটি বর্গে পরিণত হবে। অষ্টভুজের কোণে প্রয়োজন হলে আরো ক্ষুদ্রাকৃতি খিলান আড়াআড়িভাবে যুক্ত করে, ষোলোটা পার্শ্বদেশযুক্ত একটি কাঠামো নির্মাণ করা যায়, যা মোটামুটিভাবে গম্বুজের বৃত্তের সমান। স্কুইঞ্চের আবিষ্কারের প্রায় সাথে সাথেই সিরিয়ায় পেনডেনটিভ পদ্ধতি বিকাশ লাভ করে—একটি ঘুড়ি আকৃতির ধনুকাকৃতি ছাদ একটি বর্গাকার কক্ষের দুই পাশের মিলিত স্থানে ওপরে একটি ভারবাহী স্তম্ভ দ্বারা আলম্বিত করা হয়েছে। স্কুইঞ্চ আর পেনডেনটিভের নকশা দ্রুত বিকাশ লাভ করতে থাকে নির্মাতারা যখন নির্মাণ কৌশল আর শৈল্পিক সম্ভাবনার সাথে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা আরম্ভ করেন আর আয়ত্ত করতে থাকেন কীভাবে যেকোনো আকার আর আকৃতির ভবনে ওপরে গম্বুজ সংযুক্ত করা যায়। এই নির্মাণ কৌশল পূর্ব আর পশ্চিম উভয় দিকেই ছড়িয়ে গিয়ে, কনস্ট্যান্টিনোপোলের সেন্ট. সোফিয়া, ফ্লোরেন্সের সান্তা মারিয়া ডেল ফিয়োরি এবং রোমের সেন্ট পিটার্সে ব্যবহৃত হয়, যদিও পশ্চিম ইউরোপে গম্বুজের পরিবর্তে মোচাকার চূড়া আর মিনার চার্চের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হিসেবে বজায় থাকে।
মোগলদের পছন্দনীয় পূর্বপুরুষ, তৈমূর নিজে একজন ছিলেন একজন মহান নির্মাতা এবং পরস্পর সম্পর্কিত অনেক রাজকীয় সমাধি নির্মাণ করেছিলেন, যার ভেতরে একটি তার নিজের জন্য সমরকন্দে নির্মিত, যা সবচেয়ে চিত্তচমৎকারী। একটি *মাদ্রাসা* কমপ্লেক্সের কেন্দ্রে সমাধিটা আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং স্থাপত্যকলায় যা 'দ্বৈত গম্বুজ' হিসেবে পরিচিত। পুরু, ভীষণ ভারী একক কাঠামোর পরিবর্তে, বাইরের আর ভেতরের আস্তরণের মাঝে বিদ্যমান শূন্যস্থানযুক্ত দ্বৈত কাঠামো ব্যবহার করে নির্মাতারা গম্বুজের ভেতরের আর বাইরের উচ্চতার মাঝে অধিকতর ফারাক সৃষ্টিতে সক্ষম হন। অট্টালিকার অনুপাত এটা বৃদ্ধি করে এবং অবশিষ্ট ভবনকে কাঠামোগত চাপ আর বিপুল পরিমাণ ভার বহন করা থেকে বিরত রাখে। তৈমূরের সমাধিতে

কেবল উপযোগী নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিশালাকৃতি গম্বুজটি তৈরি করা হয়েছে কংক্রিট দিয়ে।

একটি বিশালাকৃতি, উঁচু, পেঁয়াজের মতো পাঁজরযুক্ত গম্বুজ রয়েছে, যার বহির্ভাগ উজ্জ্বল সবুজাভ-নীল রঙের টালি দিয়ে আবৃত আর ভেতরের অংশে, একটি নিচু অর্ধ গোলাকৃতি গম্বুজ তেলের পিপা সদৃশ একই ভিত্তি থেকে নির্মিত হয়েছে। গম্বুজের বাইরের অংশ দৃশ্যমানতা আর রাজকীয় স্মৃতিসৌধের বাহ্যিক জাঁকজমক নিশ্চিত করে, যখন ভেতরের নিচু গম্বুজটা অভ্যন্তরের আনুপাতিক সমতা বজায় রাখে।*

মুসলমান শাসকরা সমাধির উপরিভাগ আকাশের দিকে খোলা থাকতে হবে, কোরআন শরিফের এই বিধানের সাথে তাল রাখতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছেন। অনেকে তৈমূরের সমাধিসৌধের ন্যায় একটি নিচু অভ্যন্তরীণ গম্বুজ ব্যবহার করেছেন আকাশের চাঁদোয়ার রূপক হিসেবে। সে কারণেই এসব গম্বুজের অনেকগুলোকে তারকাখচিত হিসেবে দেখা যায়। অন্যরা বাইরের প্রবেশপথ সরদলের মাঝে একটি শূন্যস্থান রেখে দেয় যাতে সমাধির ওপরে বাইরের তাজা বাতাস প্রবাহিত হবার সুযোগ পায়। বাবর তার নিজের সমাধি আক্ষরিক অর্থেই উন্মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। আকবর তার আব্বাজান হুমায়ুনের জন্য একটি অতিকায় দ্বৈত-গম্বুজবিশিষ্ট সমাধিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি তার নিজের সমাধিতে, যা মূলত তার নিজেরই নকশা করা হলেও জাহাঙ্গীর দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। একটি উন্মুক্ত কক্ষের মধ্যেখানে তার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত, যদিও তার মূল সমাধিস্থল সমাধির নিচে অনেক গভীরে অবস্থিত। জাহাঙ্গীরের বিশাল, মিনারযুক্ত সমতল সমাধিসৌধ লাহোরে তার আর নূরের প্রিয় উদ্যানের একটিয় অবস্থিত, এখানেও তার স্মৃতিস্তম্ভ ছাদহীন একটি কক্ষের মধ্যেখানে মূলত অবস্থিত যতিও তার সমাধিস্থল নিচে সমাধির অভ্যন্তরে অবস্থিত। (সমাধিস্তম্ভটা বহুদিন পূর্বেই চুরি হয়ে গেছে।)

শাহজাহান একবার যখন সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি মমতাজ মহল আর তার প্রতি নিজের ভীষণ ভালোবাসা আর সেইসাথে তার রাজত্বকালের ক্ষমতা আর মর্যাদা স্মরণীয় করে রাখতে আগ্রহী, তার প্রথম কাজ তখন ছিল তিনি সে সৌধের প্রতিকৃতি মনে মনে দেখেছেন সেটা নির্মাণের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান পছন্দ করা। স্থান নির্বাচনের সময় তিনি যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তার ভেতরে অন্যতম ছিল ব্যস্ত আগ্রা শহরের কোলাহল থেকে দূরে শান্তিপূর্ণ একটি

---

* দ্বৈত গম্বুজের নকশার পরিবর্তিত রূপ ইউরোপেও গৃহীত হয়েছে– যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ফিলিপ্পো ব্রুনেলেস্চি ফ্লোরেন্সের শান্তা মারিয়া ডেল ফিয়োরের গির্জার গম্বুজের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন এবং ক্রিস্টোফার ওয়ার্ন লন্ডনের সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালের গম্বুজের জন্য তার নকশায় এটা ব্যবহার করেছেন।

স্থান তিনি নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। স্থানটা আবার একই সাথে দূর থেকে দৃশ্যমান হতে হবে আর সেইসাথে যমুনা নদীর নিকটবর্তী, যাতে উদ্যানের সেচের আর সৌধে পানির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সহজেই পানি পাওয়া যায় আর সেইসাথে গ্রীষ্মকালে শীতল একটি পরিবেশ বজায় থাকে। স্থানটা যদি যমুনার তীরে অবস্থিত হয় তাহলে সেটা এমন একটি অবস্থানে হতে হবে যাতে বন্যা বা ভাঙনের কবলে না পড়ে আবার সেইসাথে তার স্থপতিদের তাদের নকশায় নদীকে সতত পরিবর্তনশীল, প্রতিফলিত প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়, নদীর জলসীমা সেই সময় বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি উঁচু ছিল। সম্রাট সেইসাথে ভবিষ্যতে পাশেই নিজের জন্য একটি সমাধির স্থান বিদ্যমান থাকুক চাইতে পারেন। সর্বোপরি, আগ্রার লালকেল্লার নিজের শাহিমহল থেকে শাহজাহান যেন সমাধিসৌধটা দেখতে পান। বুরহানপুরের দুর্গ প্রাসাদে তার মহলের জানালা থেকে আনন্দ উদ্যানের যেখানে সাময়িকভাবে মমতাজ মহলকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল সেটা সরাসরি তার দৃষ্টিপথের ভেতরে অবস্থিত ছিল।

আগ্রা দুর্গ থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে এবং রাজা মানসিংহের পৌত্র রাজা জয়সিংহের বাগানবাড়ির প্রান্তে অবস্থিত এবং বাবরের স্থাপিত একটি উদ্যানের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত শাহজাহানের পছন্দের স্থানটা সব মানদণ্ড সিদ্ধ করে। স্থানটা, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আগ্রা দুর্গের কাছে নদীতে একটি মোটামুটি তীক্ষ্ণ ডানহাতি বাঁকের পরে খানিকটা ভাটিতে অবস্থিত, যা একটি জলাধারের মতো সৃষ্টি করে তাজের সম্ভাব্য স্থানের নিকটে যমুনার স্রোতের বেগ অনেক হ্রাস করেছে। স্থানটা আম্বরের (জয়পুর) রাজার, যিনি সানন্দে জমিটা সম্রাটকে দান করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ইসলামি রীতি অনুসারে অবশ্য এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যে মহিলা সন্তান জন্ম দেয়ার সময় মৃত্যুবরণ করেন, যেমন মমতাজ মহল, তাদের শহীদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তাদের সমাধিস্থল তাই তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। শাহজাহান তাই রাজাকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি নয় বরং চারটা আলাদা আলাদা জমি প্রদান করেন। তিনি দ্রুত পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন এবং ১৬৩২ সালের জানুয়ারি মাসে যখন মমতাজের মৃতদেহ আগ্রায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় তত দিনে জমি দখল নেয়া হয়েছে। তাকে তাই এখানেই, তাজমহলের ভবিষ্যৎ নির্মাণস্থানে তাকে আবারও সাময়িকভাবে সমাধিস্থ করা হয়।

শাহজাহানকে এরপর একটি ধারণা কল্পনা করে সেখান থেকে সমাধি কমপ্লেক্সের জন্য বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন করেন। তিনি এটা করার সময় স্বাভাবিক কারণেই তার আব্বাজানের আর তার নিজের পূর্ববর্তী প্রকল্পে কাজ করা অভিজ্ঞ স্থপতিদের তাদের পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠান। রাজদরবারের ঐতিহাসিক লাহোরি তাজমহলের নির্মাণের বিবরণীতে মীর আবুল করিম আর মুকামাত খানের নাম উল্লেখ করেছেন নির্মাণকার্যের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে। তাদের পদবি থেকে বোঝা যায়, তারা প্রকল্পের ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ

পরিচালনা আর সংঘটনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। মীর আবুল করিমকে শাহজাহান যখন নিয়োগ করেন তখনই তার বয়স প্রায় ষাট বছর এবং লাহোরে জাহাঙ্গীরের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্পে তিনি ইতিমধ্যে কাজ করেছেন। মুকামাত খানজাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, পারস্যের দক্ষিণাঞ্চল শিরাজ থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই মুকামাত খানকে তার কর্মসংস্থান মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন এবং তিনি মনে হয় স্থপতি বা প্রকৌশলীর চেয়ে মূলত একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা। শাহজাহান তাকে দ্রুত পদোন্নতি প্রদান করতে থাকেন। ১৬৪১ সালে তাকে তিনি দিল্লির সুবাদান হিসেবে নিয়োগ দেন, যেখানে নতুন শহর শাহজাহানাবাদে তিনি লালকেল্লার নির্মাণকার্য তদারক করেন।

লাহোরি তাজের স্থপতির নাম উল্লেখ করেননি। অন্য কোনো সমসাময়িক রচনাতেও স্থপতির নামের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। কোনো অট্টালিকা নির্মাণকালে দিনপঞ্জির রচয়িতাদের পক্ষে স্থপতির নামের পরিবর্তে তত্ত্বাবধায়কের নাম উল্লেখ করাটা খুব একটি অস্বাভাবিক নয়, কারণ সেই যুগে স্থপতিরা মূলত একটি দল হিসেবে কাজ করতেন এবং নির্মাণকার্যের তত্ত্বাবধায়কদের চেয়ে তাদের মনে হয় নিম্নপদস্থ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পশ্চিমে ঠিক যেমন, হবু স্থপতিদের অধ্যয়নের কোনো স্থান ছিল না। তারা কাজ করতে করতে কাজ শিখতেন এবং প্রধান কারিগর থেকে ধীরে ধীরে কাজ শিখে ওপরে উঠে আসতেন।* লাহোরি অবশ্য তাজমহলের স্থপতি হিসেবে কারো নাম উল্লেখ না করায় তার পরিস্থিতি নিয়ে প্রচুর বিবাদের জন্ম হয়েছে। পর্তুগিজ পাদ্রি সেবাস্তিয়ান ম্যানরিকে যিনি ১৬৪০ সালে আগ্রায় এসেছিলেন পরবর্তী কালে দাবি করেন, তাজের স্থপতি হলেন 'জেরোনিমো ভেরোনিও নামে ভেনিসের এক জহুরি, যিনি পর্তুগিজ জাহাজে করে এই অঞ্চলে এসেছিলেন এবং আমি লাহোরে পৌঁছাবার কিছুদিন পূর্বে শহরেই মৃত্যুবরণ করেন।' পরবর্তী শতকগুলোতে ইউরোপীয়রা অন্ধ স্বদেশপ্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে এই দাবির পক্ষে প্রচুর প্রমাণ উপস্থাপন করে। তাদের এই উৎকট স্বদেশিকতার খানিকটা এসেছে বিশ্বের স্বীকৃত বিস্ময়ের কৃতিত্বে খানিকটা ভাগ বসাবার অভিপ্রায় আর খানিকটা এসেছে উগ্র বর্ণবাদী আবেগ থেকে যেকোনো ইউরোপীয় ছাড়া এমন সুন্দর ভবনের নকশা করা সম্ভব নয়।

ম্যানরিকের দাবিকে অর্বাচিনের উক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। মোগল স্থাপত্যরীতির ওপর ইউরোপীয় প্রভাব খুবই সামান্য। কোনো ইউরোপীয় যদি তাজের নকশা প্রণয়ন করত তাহলে সে নিশ্চিতভাবেই ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য সমাধিসৌধে যুক্ত করত। এমন কোনো কিছুই আমরা দেখতে পাই না।

---

* স্যার ক্রিস্টোফার ওয়ার্নের ক্ষেত্রে বিষয়টা অস্বাভাবিক যে তিনি বিজ্ঞান অধ্যয়ন ছেড়ে স্থপতি হিসেবে পরিচিত হন, বিজ্ঞানের বিষয়েই তিনি কেবল গতানুগতিক প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন।

অন্যান্য সমসাময়িক ইউরোপীয় ভাষ্য বর্তমান থাকলেও ম্যানরিকেই কেবল স্থপতি হিসেবে ভেরোনিওর নাম উল্লেখ করেছেন। তাজের নির্মাণকার্য শুরু হবার সময় ইংলিশ করণিক পিটার মানডি আগ্রায় অবস্থান করছিলেন। ম্যানরিকের মতো নয়, মানডি ভেরোনিওকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন কিন্তু কীভাবে নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল মানডি সেই বর্ণনা দেয়ার সময় কোথাও স্থপতি হিসেবে ভেরোনিওর নাম উল্লেখ করেননি।

আগ্রার খ্রিস্টান কবরস্থানে ভেরোনিওকে সমাধিস্থ করার কারণে বোঝা যায় যে তার মৃতদেহ লাহোর থেকে আগ্রায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তার সমাধির বেশ ভালোভাবেই সংরক্ষিত স্মৃতিফলকে কেবল লেখা রয়েছে, 'এখানে জেরোনিমো ভেরোনিও অন্তিম শয্যায় শায়িত রয়েছেন। মৃত্যু ২ আগস্ট ১৬৪০ সাল, লাহোর।' তিনি যদি আদতেই তাজের স্থপতি হতেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই তার সমাধির স্মৃতিফলকে সেটার উল্লেখ থাকত। তার চেয়েও বড় বিষয়, তার সমাধিস্থল একটি বিষয় নিশ্চিত করে যে, ভেরোনিও একজন খ্রিস্টান এবং শাহজাহান একটি পবিত্র স্থাপনার, যেখানে কেবল মুসলমানদেরই প্রবেশাধিকার রয়েছে, নকশা প্রণয়নের দায়িত্ব কোনো অমুসলিমকে প্রদান করতেন।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ভেরোনিও পেশায় একজন জহুরি ছিলেন, স্থপতি নন। পিটার মানডি তাকে শাহজাহানের বেতনভুক স্বর্ণকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পর্যটকও তাকে ভীষণ একজন দক্ষ মণিকার হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছে। ম্যানরিকের কাহিনীতে, যা সে কেবল লোকমুখে জানতে পেরেছে, যদি কোনো অন্তর্নিহিত সত্য থেকে থাকে সেটা সম্ভবত এই যে শাহজাহান ৪০,০০০ তোলা স্বর্ণের তৈরি কলাই করা আর রত্নখচিত সোনালি তিরস্করণী আর বেষ্টনীর বিষয়ে ভেরোনিওর সাথে পরামর্শ করেছিলেন, যা তিনি মমতাজের সমাধির চারদিক ঘিরে দেয়ার জন্য নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সোনার বেষ্টনীর পরিবর্তে সাদা মার্বেলের তৈরি তিরস্করণী ব্যবহৃত হয়। কোনো চিত্রকর্ম বা সোনার বেষ্টনীর কোনো বিস্তারিত বিবরণ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না আর তাই ইউরোপীয় প্রভাব যদি আদৌ থেকে থাকে সেটা নির্ণয় করা অসম্ভব।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ, কর্নেল ইউলিয়াম স্লিম্যান, যিনি ভারতবর্ষে রক্তপিপাসু ঠগীদের দমন করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার জনপ্রিয় পুস্তকে দাবি করেছেন, একজন ফরাসি অস্টিন বা অগাস্টিন দ্য বোর্দো, তাজের স্থপতি।* অবশ্য ভারতে অগাস্টিনের সম্বন্ধে অন্য আরেকটা

---

* ঠগীরা রাজপথে বিচরণকারী একটি খুনি সম্প্রদায়, যারা বণিক বা পর্যটকদের দলে অনুপ্রবেশ করত এবং দুই কি এক দিন পর একটি হলুদ রেশমের রুমাল দিয়ে তাদের সঙ্গীদের কৃত্যানুষ্ঠান পালন করে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে, হতভাগ্য লোকগুলোর দেহ টুকরো করে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলত আর তাদের সর্বস্ব চুরি করত। ইংরেজিতে 'ঠগী' শব্দের মানে তাই নিষ্ঠুর গুণ্ডামি।

সূত্রে আমরা যা জানতে পারি তার উৎস ১৫০ বছর পূর্বে রচিত তার স্বদেশি আরেক ফরাসি মণিকার জ্যা ব্যাপতিস্ত ত্রেভার্নিয়ের একটি পুস্তক, যেখানে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়েছেন যে শাহজাহান অগাস্টিনকে নিজের ব্যক্তিগত মহলের কিয়দংশ রুপা দিয়ে অলংকৃত করার দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু অগাস্টিন কাজ শুরু করার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই পুস্তক থেকেই সম্ভবত শ্লিম্যান তার ভাষ্যের রসদ সংগ্রহ করেছেন। প্যারিসের ফরাসি জাতীয় পাঠাগারে বর্তমানে রক্ষিত একটি চিঠি এ বিষয়ে যাবতীয় সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে, যেখানে অগাস্টিন দ্য বোর্দো নিজের সম্বন্ধে বর্ণনা করার সময় বলেছেন, তিনি 'নকশা অঙ্কনকারী নন' আর স্থাপত্যের বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই।

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ, আগ্রাসহ বিভিন্ন এলাকায় মোগল দরবারে প্রচলিত ফার্সি ভাষায় লিখিত এবং তাজমহল নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্যাদির সতেরো শতকের মূল নথির নকল দাবি করে পরস্পর সম্পর্কিত একাধিক পাণ্ডুলিপির আবির্ভাব ঘটে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই পাণ্ডুলিপিগুলোকে সর্বৈব জাল বলে মনে করেন এবং তারা আরো মনে করেন যে, মূলত ব্রিটিশদের স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে এগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিশেষ করে আগ্রার একজন ইংরেজ স্কুলশিক্ষক, মূলত এর পেছনে রয়েছেন। এসব নথিপত্রে তাজমহলের স্থপতি হিসেবে ওস্তাদ ঈশা নামে একজন লোকের নাম পাওয়া যায় এবং তার জন্মস্থান হিসেবে আগ্রা, পারস্য, তুরস্ক বিভিন্ন স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সন্দেহ এতটাই প্রবল যে খোদ ওস্তাদের অস্তিত্বই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠত যদি না ভারতের স্থানীয় এক ঐতিহাসিক প্রমাণ খুঁজে পেতেন যে আগ্রায় ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ওস্তাদের বংশধর বলে দাবি করা একটি পরিবার বাস করত, যারা পেশায় ছিল নকশা অঙ্কনকারী। তারা মুসলমান হবার কারণে সে বছরই ভারত ভাগের ফলে পাকিস্তান চলে গেছে। পরিবারটির কাছে নাকি তাজমহলের সতেরো শতকের একটি নকশা রয়েছে যদিও এর কোনো সন্ধান এখন আর পাওয়া যায় না। একই ঐতিহাসিক অবশ্য উল্লেখ করেন যে, ওস্তাদ ঈশার অবস্থান বর্ণনা করতে পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত শব্দের মানে নকশা অঙ্কনকারী, স্থপতি নয়, আর এই কারণে ওস্তাদের অস্তিত্ব থাকলেও তিনি খুব বেশি হলে সম্ভবত অন্যের ভাবনার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত নির্মাতার পরিকল্পনা কাগজে অঙ্কন করেছেন।

তাজমহলের স্থপতি হিসেবে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য যে নামটা আমরা জানতে পারি সেটা ওস্তাদ আহমেদ লাহোরির, যিনি ১৬৪৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৩০-এর দশকে একজন গবেষক ওস্তাদ আহমেদ লাহোরির এক পুত্রের লেখা আঠারো শতকের শুরুর দিকের কবিতার একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন, যেখানে তিনি দাবি করেছেন, তার আব্বাজান ছিলেন লালকেল্লা আর তাজমহল উভয়েরই স্থপতি। সমসাময়িক অন্যান্য নথিপত্র, যার ভেতরে দরবারের এক দিনপঞ্জি রচয়িতার রচনাও রয়েছে, তা থেকে জানা যায়, ওস্তাদ আহমেদ লাহোরি বাস্তবিকই লালকেল্লার স্থপতি কিন্তু তিনিই যে তাজের স্থপতি

এ বিষয়ে কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। বিষয়টি অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয় এ কারণে যে, যদি ওস্তাদ আহমেদ লাহোরি উভয় ভবনের স্থপতি হয়ে থাকেন এবং কেবল লালকেল্লার নন, তাহলে শাহজাহান কি তার দিনপঞ্জির রচয়িতাকে সে রকমই লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিতেন না? ওস্তাদের পুত্র সম্ভবত বোধগম্য কারণেই নিজের পরিবারের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কেবল তার আব্বাজানকে স্থপতি হিসেবে দাবি করেছেন, যিনি সম্ভবত নির্মাণ প্রকল্পে অংশ নিয়েছিলেন, গৌরবের একটি বিরাট অংশ, যা সাথে সাথে তার পুত্রের দ্বারা সাথে সাথে তার সেরা অবদান হিসেবে শনাক্ত করা হয় এবং সেইসাথে ইউরোপীয়রাও একজন ইউরোপীয় স্থপতির কাহিনী ফেঁদে বসেন।

উনিশ শতকের বিতর্কিত পাণ্ডুলিপিগুলোয় বর্ণিত গল্পগুলো ভাববিলাসীরা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে যে শাহজাহান যখন তার সামনে পেশ করা দুর্বল নকশা দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, সমাধিসৌধের একটি সম্পূর্ণ দৃশ্য নাম না জানা কোনো সুফি মরমি সাধকের স্বপ্নে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই সুফি সাধকই নকশাটা শাহজাহানের হাতে তুলে দেন, যাতে তিনি মৃত্যুপথযাত্রী মমতাজের পেশ করা অন্তিম আর্জি 'একটি মকবরা, যা হবে অনন্য আর অসাধারণ সুন্দর, পৃথিবীতে যার তুলনা নেই, যা সম্রাটের মহব্বতের উপযুক্ত।' অন্যরা অবশ্য তার দরবারের ঐতিহাসিক লাহোরি অট্টালিকাগুলোর নকশা প্রণয়নে শাহজাহান কীভাবে সম্পৃক্ত থাকতেন সে সম্বন্ধে যা বলেছে তার ভেতরে সমস্যার একটি সমাধান হয়তো খুঁজতে চেষ্টা করেছে : 'রাজকীয় মস্তিষ্ক, যা সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান, এসব অভিজাত আর মজবুত অট্টালিকার পরিকল্পনা আর নির্মাণে অখণ্ড মনোযোগ প্রদান করেছেন, যা...অস্ফুট ভবিষ্যতে যা তার সৃষ্টিশীলতা, অলংকরণ আর সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রতি চিরন্তন ভালোবাসার স্মারক হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। তিনি নিজে অধিকাংশ অট্টালিকার নকশা নিজে প্রণয়ন করেছেন এবং কুশলী স্থপতিদের দ্বারা প্রণীত পরিকল্পনা দীর্ঘ পর্যালোচনার পরে তিনি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আর পরিবর্ধন করেছেন।' অট্টালিকাসমূহের বৃহত্তর অংশের জন্য এই বক্তব্য হয়তো একজন পৃষ্টপোষক বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তির কোনো প্রকল্পে নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভাত হতে পারে। এমনকি জাহাঙ্গীরও তার যৌবনকালে তার দক্ষতার প্রশংসা করেছে। শোকার্ত শাহজাহান নিশ্চিতভাবেই অন্য অট্টালিকার চেয়ে নিজের স্ত্রীর মকবরার নকশা প্রণয়নে অনেক বাড়তি প্রয়াস কামনা করবেন। তিনি বাস্তবিকই হয়তো নির্মাণের প্রাথমিক ধারণা গঠন করার কালে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন বা অন্যদের দাখিল করা নকশায় প্রচুর পরিবর্তন করেছিলেন বা এমনকি সেগুলোকে পুনরায় অঙ্কন করিয়েছিলেন। তিনি চাননি স্থপতিদের যে দলগুলোর সাথে তিনি পরামর্শ করেছেন তাদের ভেতরে কোনো একটি দল কৃতিত্বের দাবি করুক।

■

১৬৩২ সালের গ্রীষ্মকালে, শাহজাহান আগ্রায় ফিরে আসেন। সেখানে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের সবচেয়ে বড় প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করেন। তার দরবারে নিযুক্ত এক ঐতিহাসিক লিখেছেন, বুরহানপুরে 'তার প্রয়াত সম্রাজ্ঞীর শোকাবহ মৃত্যুর' দৃশ্যপট রচিত হওয়ায় জায়গাটার প্রতি ক্রমেই 'মহামান্য সম্রাটের মন বিশ্রদ্ধ' হয়ে ওঠে। তিনি বস্তুতপক্ষে পরবর্তী বছরগুলোতে সব সময় শহরটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। তা ছাড়া তার দাক্ষিণাত্যের অভিযান সাফল্য লাভ করেনি। দুই বছরের বেশি সময়কালব্যাপী নিষ্ফল যুদ্ধপ্রয়াসে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের পাশাপাশি মহামারি আর দুর্ভিক্ষের কারণেও প্রচুর লোক হারিয়েছেন, মামুলি কয়েকটা দুর্গ দখল ছাড়া আর কোনো লাভ হয়নি আর তার সৈন্যবাহিনীও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তিনি তাই সিদ্ধান্ত নেন তার এই অভিযানের দায়িত্ব তিনি অন্যদের হাতে সমর্পণ করবেন। অবশ্য শাহজাহানের প্রত্যাবর্তনের এই সময়কালের সাথে একটি বিশেষ বিষয় জড়িত রয়েছে, সেটা হলো মমতাজের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত *উরসে*—মৃতদের জন্য আয়োজিত প্রথাগত বার্ষিক অনুষ্ঠান—ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার বাসনা।

পিটার মানডি সম্রাটের সফরসঙ্গীদের এবার তাদের সম্রাজ্ঞীকে ছাড়াই ফিরে আসার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। 'আমাদের চোখ যত দূর দেখতে পায়, তত দূর পর্যন্ত চারপাশের সবটুকু এলাকা অগণিত হাতি, ঘোড়ার পাশাপাশি মানুষে গিজগিজ করার সাথে ছোট-বড় অসংখ্য নিশান পুরো দৃশ্যটাকে একটি কেতাদুরস্ত মাত্রা দান করে।' একটি পেছনে ধূসর ঘোড়ায় আরূঢ় শাহজাহানকে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শুকোহ অনুসরণ করছে। জুনের ১১ তারিখে, স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকীর ছয় দিন পূর্বে, শাহজাহান একটি বদ্ধ পালকিতে চড়ে আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করেন। সময়টা ছিল মধ্যরাত্রি—তার জ্যোতিষীদের দ্বারা অনুমিত সবচেয়ে মাঙ্গলিক প্রহর।

উরসটা ছিল নিরানন্দ কিন্তু অপব্যয়ী একটি আয়োজন। 'রাজকীয় বাজারসরকার প্রয়াত সম্রাজ্ঞীর সমাধিস্থলের চারপাশের উদ্যানে আড়ম্বরপূর্ণ বসার আয়োজন করে, সেখানে চমৎকার গালিচা পেতে দেয় আর প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য, পানীয়, মিষ্টান্ন আর নানা স্বাদের আচার, চাটনির বন্দোবস্ত করে—কল্পনাকেও যা হার মানায়। সাম্রাজ্যের সমস্ত ধর্মপ্রাণ আর বিজ্ঞ শেখ এবং ধর্মোপদেষ্টা তারপর একসাথে সমবেত হয়ে চমকপ্রদ একটি সমাবেশের সৃষ্টি করেন।' শাহজাহান, তার সাদা শোকের আলখাল্লা পরিহিত অবস্থায়, মোনাজাতে অংশ নেন, তারপর প্রস্থান করেন। রাজকীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, 'মহামান্য সম্রাট মানুষের বিশাল ভিড় এড়াতে নিজের ব্যক্তিগত মহলে ফিরে যান।' তিনি নিঃসন্দেহে শোকার্ত মনে একাকী থাকতে চেয়েছিলেন, যা তার নির্মিতব্য বিশাল ইমারতে, একটি চিরস্থায়ী অভিব্যক্তি লাভ করতে শুরু করেছে, যার ভিত্তির জন্য ইতিমধ্যে যমুনার তীরে মাটি খোঁড়ার কাজ আরম্ভ হয়েছে।
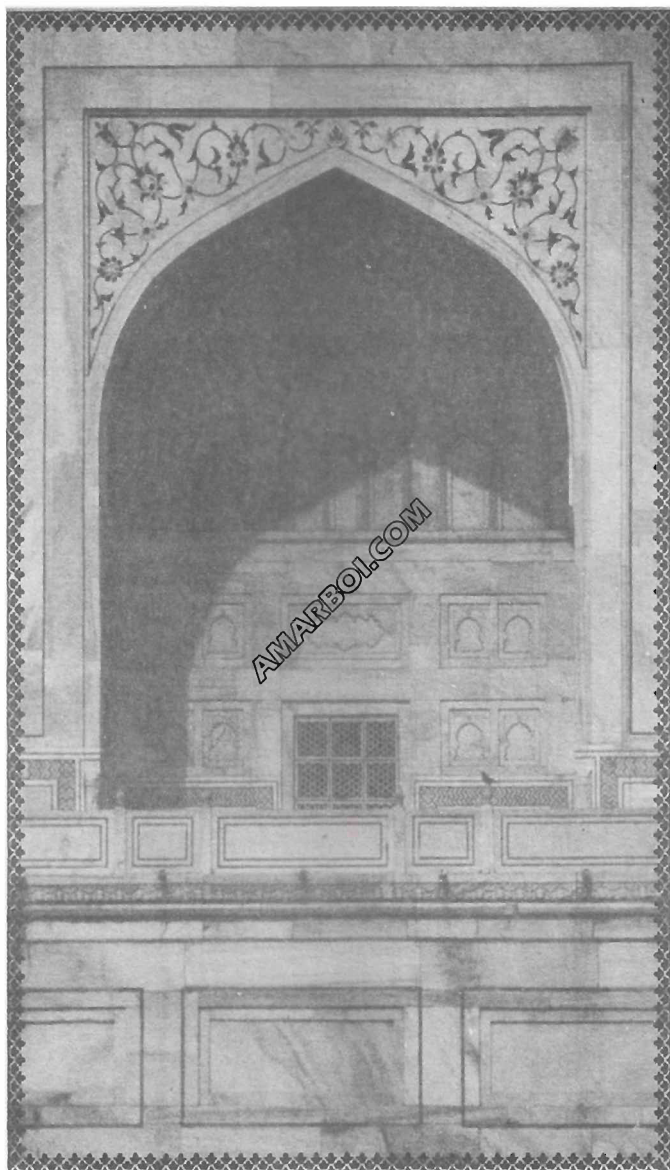
দশম অধ্যায়

নির্মাতা এই পৃথিবীর অধিবাসী নয়

শাহজাহান আর তার স্থপতিরা সিদ্ধান্ত নেন, মমতাজের 'আধ্যাত্মিকভাবে উদ্দীপিত মকবরা' হবে একটি অনেক বিশাল আকৃতির ইমারত কাঠামোর কেন্দ্রস্থল। মকবরাটা, যার কেন্দ্রস্থলে তাকে ইসলামি রীতি অনুসারে—পশ্চিমে মক্কার দিকে তার মুখ ঘুরিয়ে রেখে, উত্তর-দক্ষিণে শায়িত করা হবে—নদীর তীরে একটি প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের মাঝে একটি মঞ্চ বা চত্বরের ওপরে নির্মিত হবে। সমাধিতে মমতাজের দেহ যেভাবে শায়িত রয়েছে ঠিক সেই সরলরেখা বরাবর উত্তর-দক্ষিণে, কেন্দ্রীয় অক্ষরেখা হিসেবে পানির একটি নহর প্রবাহিত হবে, যার উভয় পার্শ্বে সম্মিতরূপে মানানসই আনুষঙ্গিক ইমারত আর স্থাপণাসমূহ নির্মিত হবে।

মকবরার সরাসরি পশ্চিম পার্শ্বে, চত্বরের ওপরে তারা তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন, যেখানে জিয়ারত করতে আসা মুসল্লিরা নামাজ আদায় করবে। নামাজ পড়ার জন্য মুসলমানদের মসজিদে যেতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা কোরআন শরিফে বলা হয়নি তবে তারা যেখানেই নামাজ আদায় করুক তাদের অবশ্যই মক্কার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে। মসজিদে নামাজের দিক নির্দেশের জন্য পেছনের দেয়ালে একটি বর্ধিতাংশ নির্মিত হয়, যাকে *মেহরাব* বলে। মসজিদের বিপরীত দিকে নকশায় ভারসাম্য আনয়নের জন্য, মোগলরা নিজেরা যেভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে থাকে, এর *জবাব* বা 'প্রতিধ্বনি' হিসেবে, পরিকল্পনাকারীরা অবিকল মসজিদের ন্যায় একটি ইমারত সরাসরি মকবরার পূর্ব পার্শ্বে যোগ করেন। এই ভবনের পেছনের দেয়াল যেহেতু মক্কার বিপরীতমুখী, এটাকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়—এবং এটা সম্ভবত মুসল্লিদের জন্য অতিথিশালা হিসেবে ব্যবহৃত হতো—কিন্তু এটা নির্মাণের প্রধান উপলক্ষ ছিল একেবারেই নান্দনিক।

মকবরার মুখোমুখি বিপরীত প্রান্তে, প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের শেষ সীমানায় পরিকল্পনাকারীরা একটি অলংকৃত তোরণগৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। এই তোরণদ্বারের দক্ষিণে, বাইরের এলাকাটা *জিলাউ খানা*, পরিচারকদের আবাসস্থল আর এর চারপাশে বাজার বসার জন্য, সমাবেশস্থল বা আঙিনা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সবশেষে এসব কিছুর পরে নির্মিত হবে অতিথিদের জন্য সরাইখানা এবং আরো বাজারের স্থান, প্রধান পানিবাহী নহরের দ্বারা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত কেন্দ্রীয় সংসরণ হিসেবে ব্যবহৃত অক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে সম্মিতরূপে এসব কিছু নির্মিত হবে। তোরণদ্বারের ও পাশের এলাকা মকবরা প্রাঙ্গণের লোকায়ত প্রতিরূপ সৃষ্টি করবে, যা শ্রমিক আর পর্যটকদের পার্থিব চাহিদা আহার আর বাসস্থানের বন্দোবস্ত করার পাশাপাশি মকবরা প্রাঙ্গণ তাদের আত্মার পুষ্টি জোগাবে। মকবরা আর উদ্যানকে ঘিরে থাকা প্রাচীরবেষ্টিত অংশের আয়তনই হবে ১০০০ ফিট প্রস্থ আর ১৮০০ ফিট দৈর্ঘ্যের একটি এলাকা এবং বাস্তবিকই সেটা, লাহোরির শব্দচয়ন করে বলা যায়, 'বেহেশতের পবিত্র বাসস্থানের প্রতিনিধিত্ব করতে...বেহেশতের উদ্যানের একটি দৃষ্টিকল্প জন্ম দেয়ার জন্যই নির্মিত।'

কোনো ধারণাকে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনায় পরিবর্তিত করতে, মোগল স্থপতিদের কাছে কোনো পূর্ববর্তী নকশার মুসাবিদা বা পাঠ্যবই ছিল না, যেখান থেকে তারা সাহায্য লাভ করতে পারেন। মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থপতির ন্যায় তারা আচরণবিধির চেয়ে উদাহরণ দ্বারাই পরিচালিত হতেন, তারা নকশা প্রণয়নের সময় পারস্য আর মধ্য এশিয়ার সুনির্দিষ্ট প্রভাবযুক্ত মোগলদের মকবরা নির্মাণের প্রথা সব সময় মাথায় রেখেছেন। তারা এই প্রথার সাথে দিল্লির সুলতানদের তিনশ বছরব্যাপী শাসন আর গুজরাট এবং মানডুর অন্যান্য মুসলমান শাসকের দ্বারা ভারতবর্ষে প্রবর্তিত মুসলমান স্থাপত্যের প্রয়াস অঙ্গীভূত করতে চেষ্টা করেছেন। ইমারতের শ্রমিকদের অনেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তারা হিন্দু স্থাপত্য রীতি থেকেও আশ্লেষে গ্রহণ করেছে, পাথরের ওপরে জটিল নকশা খোদাই করা এবং *ছত্রী* বা গম্বুজযুক্ত ছোট ঘর সেই বে-দাগ লক্ষণসমূহ।

অন্যদিকে হিন্দু স্থপতিদের ছিল মাটির গন্ধ, ঘ্রাণ এবং রং দ্বারা মাটির প্রকৃতি শনাক্তকরণ, চুন-সুরকি দিয়ে নির্মাণ কৌশল, ইমারতের আপেক্ষিক অবস্থান এবং ইমারত নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায় শুরু করার সবচেয়ে মাঙ্গলিক সময়ের মতো বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে গবেষণামূলক আলোচনা-গ্রন্থ। আকবর আর তার উত্তরসূরিদের আদেশে হিন্দুদের নানা শাস্ত্রের যে বিপুল পরিমাণ পাণ্ডুলিপি ফার্সি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল তার ভেতরে স্থাপত্যবিদ্যার এই গ্রন্থসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং এমন কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই যে মোগল স্থপতিরা কখনো এসব

গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছিলেন। ইমারত নির্মাতাদের ভেতরে যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন তারা নিশ্চিতভাবেই স্থপতিদের দ্বারা তাদের কাছে প্রেরিত নকশা অনুধাবন আর বাস্তবায়নে এসব গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন।

মোগল স্থপতিদের নকশাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন নজির অন্বেষণ করার সময়, তারা নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে পারস্য আর মধ্য এশিয়ায় এবং দিল্লির সুলতানদের রাজত্বকালে তাদের পূর্বসূরিরা সুলতানিয়ার স্থাপত্যের ন্যায়, মকবরা আর প্রাসাদসহ, অনেক ইমারতের নকশা করার সময় ইমারতের সর্বনিম্ন তলের নকশার জন্য অষ্টভুজাকৃতি ভূমি ব্যবহার করেছেন। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে পারস্যের তাবরিজ ভ্রমণকারী ইতালির এক বণিক অধুনালুপ্ত এক প্রাসাদের বর্ণনা দিয়েছেন, যাকে 'অস্থিবিস্তি' বলা হতো, প্রাসাদটির আটটি মহল থাকায় আমাদের ভাষায় যা আটটি অংশের নিদর্শন বর্ণনা করে। জেরুজালেমের ডোম অব দ্য রক, দামেস্কের হাম্মামখানা এবং কনস্তান্তিনোপলের প্রাসাদের প্রতি ইঙ্গিত করে স্থাপত্যবিদ্যার ঐতিহাসিকরা নিম্নতলের নকশার এ বিষয়টির প্রতি সহমত পোষণ করেছেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, এই নকশার মূল প্রাক-ইসলামিক সময়ের সাথে সম্পর্কিত, যদিও মোগল আর তাদের মুসলমান পূর্বপুরুষদের কাছে অষ্টভুজ, যা বৃত্তের বর্গকরণের দ্বারা সৃষ্ট, অনন্ত বৃত্তের সাথে বর্গের অবস্থান দ্বারা মানুষের পার্থিব নানা বিষয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের একটি রূপক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

আবুল ফজল বর্ণনা করেছেন হুমায়ুন কীভাবে যমুনার বুকে একটি ভাসমান প্রাসাদ নির্মাণের সময় অষ্টভুজ নকশা ব্যবহার করেছিলেন। তার নির্মাণশ্রমিকরা একটি অষ্টভুজাকৃতি কেন্দ্রীয় জলাধার গঠন করতে ভেলার ওপর ভাসমান দ্বিতলবিশিষ্ট চারটি ভবনকে ধনুকাকৃতি খিলান দ্বারা যুক্ত করেছিল। (হুমায়ুন এমনকি তার এই ভাসমান প্রাসাদের জন্য উদ্যানের একটি আবহ সৃষ্টি করার উদ্দেশে অন্য ভেলার ওপর গাছপালা পর্যন্ত রোপণ করেছিলেন।) ১৫৩০ থেকে ১৫৫০ সালের ভেতরে দিল্লিতে নির্মিত দুটো সমাধিসৌধ সম্ভবত মোগল ভারতে অষ্টভুজ নকশা ব্যবহারের টিকে থাকা সবচেয়ে প্রাচীন উদাহরণ। সমাধি দুটোতে কাদের সমাহিত করা হয়েছে সেটা অজ্ঞাত থাকার ফলে সমাধিসৌধ দুটি নির্মাণের সময় ব্যবহৃত মূল টালির রঙের কারণে তাদের কেবল সবুজ বুর্জ এবং নীল বুর্জ নামে অভিহিত করা হয়। (তাজমহলের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত সমাধিসৌধ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা অনভিপ্রেতভাবে বর্তমানে নীল রঙের টালি দ্বারা আবৃত রয়েছে। একটি ব্যস্ত গোলচক্করের মাঝে সমাধিসৌধটা অবস্থিত।) গম্বুজবিশিষ্ট দুটো ইমারতেই অষ্টভুজাকৃতি কেন্দ্রীয় সমাধি এলাকাকে চারপাশে আটটি ছোট প্রকোষ্ঠ ঘিরে

রেখেছে। কোরআন শরিফের আটটি ভাগকে বলা হয়ে থাকে আটটি প্রকোষ্ঠ উপস্থাপন করে।

১৫৬০ সালে দিল্লিতে নির্মিত হুমায়ুনের মকবরাসহ, মোগলদের নির্মিত অনেক মকবরা আর প্রাসাদের মূল ভিত্তি হিসেবে—কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠসহ আটটি প্রকোষ্ঠের কারণে যাকে বিভ্রান্তিকরভাবে অনেক সময় 'নয়-পাটের নকশা' হিসেবে অভিহিত করা হয়—এই অষ্টভুজাকৃতি নকশার নানা পরিবর্তিত আর পরিবর্ধিত রূপ ব্যবহৃত হয়েছে। তাজমহলের ক্ষেত্রে, মকবরার জন্য স্থপতিরা একটি ঘনকের ধারণা বেছে নিয়েছেন যার, আলম্ব কোণগুলো আড়াআড়ি কেটে মেরে দেয়া হয়েছে অষ্টভুজ তৈরি করতে, যেখানে কেন্দ্রীয় অষ্টভুজাকৃতি ফাঁকা স্থানে অবস্থিত স্মৃতিফলককে দ্বি-স্তরবিশিষ্ট ভবনের ওপর আর নিচের অংশে পরস্পর সংযুক্ত আটটি শূন্যস্থান ঘিরে রেখেছে। স্থপতিরা মকবরার আটটি সম্মুখভাগের জন্য দ্বিতলবিশিষ্ট ধনুকাকৃতি খিলানযুক্ত কুলুঙ্গির পরিকল্পনা করেছেন। মূল চারটি পার্শ্বে খিলানযুক্ত চারটি অতিকায় প্রবেশপথ বা *ইবানের* পাশে এই কুলুঙ্গিগুলো অবস্থান করবে, যার সাথে হুমায়নের মকবরার অনেক সাদৃশ্য রয়েছে, যার ওপরের প্রান্ত অন্য পার্শ্বগুলোর চেয়ে উঁচু হবে।

সবুজ বুর্জ সেইসাথে আবার ভারতে টিকে থাকা সবচেয়ে প্রাচীন মোগল ইমারত যেখানে সমরকন্দে তৈমূরের মকবরায় ব্যবহৃত ডবল ডোম ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও এর কয়েক বছর পূর্বে দিল্লির সুলতানদের জন্য নির্মিত একটি মকবরায় পারস্যে উদ্ভাবিত এই স্থাপত্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছিল। হুমায়ুনের ডবল ডোমযুক্ত মকবরায়, অর্ধেক আঙুরের মতো আকৃতি বিশিষ্ট বাইরের গম্বুজ আর এর ভেতরের নিচু গম্বুজটা অপেক্ষাকৃত নিচু ঢোল সদৃশ ভিতের ওপর অবস্থিত। তাজমহলে, স্থপতিদের অন্যতম অর্জন ছিল, মকবরার জন্য একটি মার্জিত ডবল ডোমের নকশা সৃষ্টি করা। অভ্যন্তরের গম্বুজটা, যা মেঝে থেকে আশি ফিট উঁচুতে অবস্থিত, অভ্যন্তরের বাকি অংশের অনুপাতের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং অনুনাদক একটি প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করেছে। একটি উঁচু ঢোলের মতো কাঠামোর ওপর বাইরের স্ফীত গম্বুজটা অবস্থিত এবং স্থাপনার অবশিষ্ট বহির্ভাগের সাথে নিখুঁত অনুপাতে রয়েছে। শাহজাহানের নিযুক্ত দিনপঞ্জির রচয়িতারা বাইরের গম্বুজকে নির্মাণকাজ শেষ হবার পরে 'স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত' আর 'পেয়ারা আকৃতি বিশিষ্ট'—নতুন পৃথিবী থেকে ফলটা তখন সদ্যই ভারতে এসেছে হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অন্যেরা পাকা নাশপাতি, ডুমুর, জলের বিন্দু, ফুলের কন্দ এমনকি নারীর স্তনের সাথে পর্যন্ত এর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

স্থপতিরা মূল গম্বুজ ঘিরে চারটি গম্বুজবিশিষ্ট কিওস্ক নির্মাণ করেছেন। হুমায়ুনের মকবরায় যদিও এই ধরনের *ছত্রী* ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে তাদের মূল গম্বুজ থেকে বেশ বিচ্ছিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। স্থপতিরা তাজমহলে, মূল

গম্বুজের চারপাশে এদের এমন যূথবদ্ধভাবে নির্মাণ করেছেন যে দৃষ্টিতল থেকে তাদের কেন্দ্রীয় গম্বুজের সাথে সংযুক্ত মনে হবে এবং ঢোল আকৃতির কাঠামোর আকার চিহ্নিতকারী রেখাগুলোকে নমনীয় করে তুলেছে। শাহজাহানের অলংকারপ্রীতির কথা স্মরণে রেখে অনেকে এদের সুলভ রত্নপাথর হিসেবে বা এমনকি অঙ্গুরীয়ের ধারক হিসেবে কল্পনা করেছে, যেখানে প্রধান রত্ন মূল গম্বুজ।

স্থপতিরা নদীর পার্শ্ববর্তী মঞ্চের ওপরে মকবরাকে উঁচু করতে মোকাম-কুর্সি নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন এবং এর চারপাশে সাদা মার্বেলের তৈরি চারটি বৃত্তাকার মিনারিকা যোগ করেছেন। অষ্টভুজাকৃতি ভিতের ওপর নির্মিত, নিচ থেকে ওপরের দিকে ক্রমাগত সরু হয়ে যাওয়া তিন তলা মিনারিকাগুলোর অভ্যন্তরে ওপরে ওঠার জন্য সিঁড়ি রয়েছে আর প্রতি তলায় ব্র্যাকেটের ওপর স্থাপিত ব্যালকনিগুলো সূর্যের আলোয় মিনারিকাগুলোকে একটি বিষণ্ন রূপ দান করে। প্রতিটি মিনারিকা ১৩৯ ফিট উঁচু আর প্রতিটির শীর্ষদেশে অষ্টভুজাকৃতি *ছত্রী* রয়েছে। মসজিদে আজান দেয়ার স্থান হিসেবে মিনারিকার প্রায়োগিক ব্যবহার থাকলেও, তারা মোটেই অনিবার্য নয় এবং বাস্তবিকই ডোম অব দি রকের ন্যায় ইসলাম ধর্মের গোড়ার দিকের মসজিদে এগুলো দেখা যায় না। অষ্টম শতকে দামেস্কের একটি মসজিদে মিনারের ব্যবহার প্রথম শুরু হয় সম্ভবত মসজিদ নির্মাণের স্থানে আগে থেকেই অবস্থিত রোমানদের একটি মন্দিরের কোনায় অবস্থিত একটি মিনারকে নকশায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা থেকে।

সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ, মসজিদে অন্তত একটি মিনার নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে কিন্তু মকবরা বা অন্য ধার্মিক প্রতিষ্ঠানে তখনো মিনার নির্মাণ শুরু হয়নি। স্থপতিরা যেসব ভবনের নকশা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেগুলোর ভেতরে রয়েছে লাহোরে অবস্থিত জাহাঙ্গীরের মকবরার চারপাশে অবস্থিত চারটি মিনার, মমতাজের দাদাজান ইতিমাদ-উদ-দৌলার আগ্রায় অবস্থিত দৃষ্টিনন্দন মকবরার মিনারগুলো আর সিকান্দ্রায় আকবরের মকবরার প্রধান তোরণদ্বারের চারটি মিনার। তাজের মিনারগুলো নির্মিত হবার সময়, শাহজাহানের দিনপঞ্জি রচয়িতার একজন সেগুলোকে বর্ণনা করেছেন ‘বেহেশতের দিকে উঠে যাওয়া সোপানসারি’ এবং আরেকজন ‘একজন ধার্মিক ব্যক্তির আকাশের পানে উত্থিত কবুল হওয়া মোনাজাত।’

স্থাপত্যশিল্পকে বলা হয় প্রকৌশল আর শিল্পকলার সম্মিলিত নান্দনিক রূপ এবং গম্বুজ আর মিনারিকাগুলোর অন্যতম প্রীতিকর দৃশ্যকল্প হলো তাদের সম্মিতরূপ আর মকবরা প্রাঙ্গণের অন্যান্য অংশের সাথে উভয়ের সুষম সম্বন্ধ। প্রযুক্তিগত প্রবর্তনের চেয়ে এসব বিষয়ই মোগলদের নির্মিত অন্যান্য ইমারত থেকে তাজকে অনন্য করে তুলেছে। স্থপতিদের অবশ্যই গণিত আর জ্যামিতি
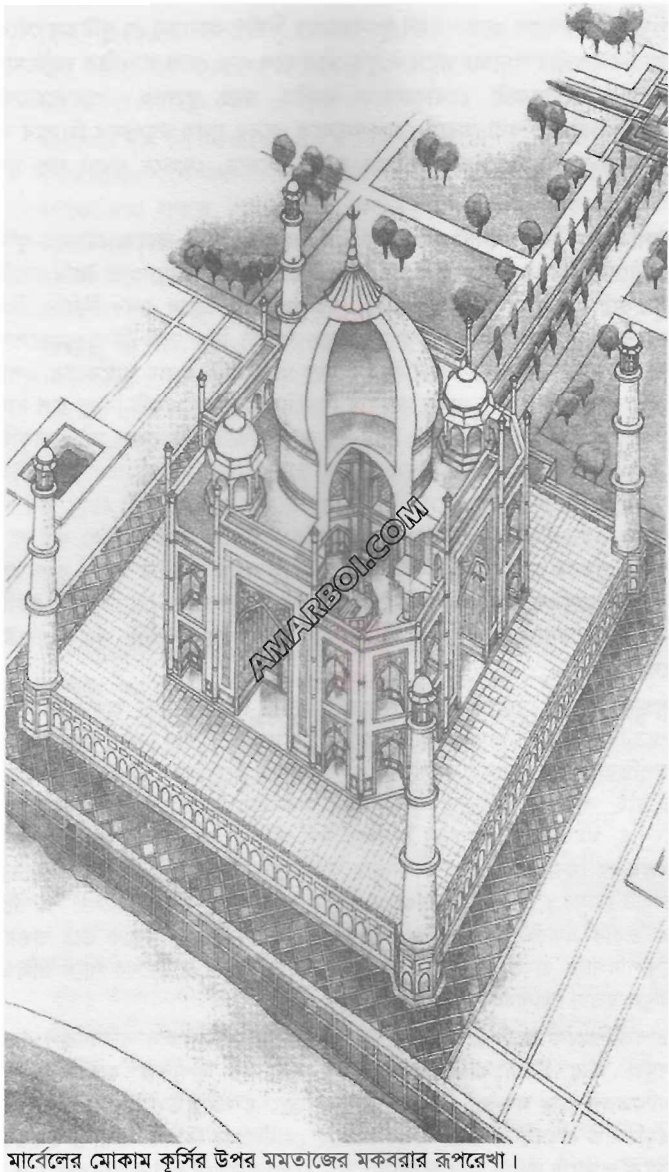
মার্বেলের মোকাম কূর্সির উপর মমতাজের মকবরার রূপরেখা।

সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান থাকতে হবে। আবুল ফজল তাদের 'বৈশিষ্ট্যপূর্ণ-মানসিকতার অধিকারী গণিতবিদ' বর্ণনা করেছেন যাদের নকশা বিজ্ঞানের অনুরাগী হলেই কেবল অনুধাবন করা সম্ভব। মোগল অণুচিত্র এবং বর্তমানকালের সমরকন্দে সংরক্ষিত নিদর্শন থেকে আমরা দেখতে পাই, নকশার বিভিন্ন অনুষঙ্গের মধ্যবর্তী সম্পর্ক গণনা করার জন্য এসব গাণিতিক দক্ষতা তারা ব্যবহার করত আর বর্গজালিবিশিষ্ট বিশাল কাগজে তারা তাদের নকশা অঙ্কন করত। তারা পরবর্তী কালে প্রায়ই নির্মিতব্য ইমারত দেখতে কেমন হবে সেটা প্রদর্শনের জন্য কাঠের নমুনা তৈরি শুরু করে। (তাজমহলের নির্মাণের সময় এমন কাঠের নমুনা ব্যবহারের উল্লেখ পরবর্তী সময়ের কিছু গোলমেলে নথিপত্রে দেখা যায়, কিন্তু, সমসাময়িক নথীপত্রে যদিও বিশ্বাসযোগ্যভাবে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।) স্থপতিরা মকবরার এক তলার প্রান্তদেশ মিনারিকার এক তলার প্রান্তদেশ ছুঁয়ে একই উচ্চতায় নির্মাণ করেছেন, তিন তলার গ্যালারির উচ্চতা ঢোল আকৃতির কাঠামো, যার ওপরে মূল গম্বুজ অবস্থিত, তার শীর্ষবিন্দুর সমান এবং মিনারিকার শীর্ষে অবস্থিত ছোট গম্বুজগুলো মূল গম্বুজের সর্বোচ্চ স্ফীত অংশের সাথে একই তলে অবস্থিত হবার বিষয়গুলো সে কারণে কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়।

তাজমহল প্রাঙ্গণের নিখুঁত ভারসাম্য আর অনুপাত সাম্প্রতিক সময়ে বিস্তারিত গণনা আর অতীত পর্যালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এক লেখক ধারণা করেছেন, প্রধান তোরণদ্বারের কেন্দ্রবিন্দু থেকে পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চি উঁচুতে দৃষ্টিরেখাগুলো মিলিত হয়েছে। শাহজাহানের চোখের দৃষ্টি মাটি থেকে ঠিক এই উচ্চতায় প্রসারিত ছিল যদি শাহজাহানের কাপড় থেকে শাহজাহানের উচ্চতা অনুমানে লেখকের কোনো ভুল না হয়ে থাকে। অন্যরা অনুমান করেছেন, মকবরার অষ্টভুজাকৃতি মূল কক্ষের ব্যাসরেখার সাথে সম্পর্ক রেখে, যা প্রায় আটান্ন ফিট উঁচু, বাকি প্রায় সব কিছুর মাপ নির্ধারিত হয়েছে। অষ্টভুজ, যা প্রতীকীভাবে মানুষের সাথে অনন্তের একটি সামঞ্জস্যবিধান করে, মূল মকবরা প্রাঙ্গণের জ্যামিতিক নকশার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই অন্তর্নিহিত মূলসুর হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, মূল মকবরার সাথে মসজিদ, অতিথিশালা, তোরণদ্বার ও মিনারিকা চতুষ্টয়ের ভিতের পরিকল্পনায় বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে।

তাজের স্থপতিরা পুরো মকবরা প্রাঙ্গণ জুড়ে সমরূপ স্থাপত্য নির্দশনের ব্যবহারের মাধ্যমে পুরো নির্মাণে একটি বাড়তি সাদৃশ্য যোগ করেছেন। স্তম্ভের ক্ষেত্রে তাদের একটি মাত্র মৌলিক নকশার ব্যবহারের বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যদিও অবস্থানের গুরুত্ব অনুসারে পরিবর্তিত অনুপাত

আর অলংকরণের মাত্রায় পরিবর্তন করা হয়েছে। স্তম্ভের এমন একটি ভিন্নরূপ, 'শাহজাহানী স্তম্ভ' নামে পরিচিত, বহু পার্শ্বদেশ বিশিষ্ট এই স্তম্ভের ভিত ধনুকাকৃতি খিলানযুক্ত পার্শ্বদেশের সাহায্যে নির্মাণ করা হয়েছে এবং থামাল সূক্ষ্ম খিলান দ্বারা জালের মতো অলংকৃত, যাকে *মুকারনাস* রীতি বলা হয়। একইভাবে স্তম্ভের দ্বারা আলম্বিত তীক্ষ্ণ অগ্রভাগযুক্ত বা 'পাইক্রাস্ট' ধনুকাকৃতি খিলানে এবং পুরো প্রাঙ্গণে পার্শ্বদেশের অন্তর্যোজনায় একটিই মৌলিক নকশা অনুসরণ করা হয়েছে।*

■

শাহজাহান নকশা অনুমোদন করার সাথে সাথে নির্মাণকাজ শুরু হয়। ঐতিহাসিক লাহোরির ভাষ্য অনুসারে, সেটা ছিল ১৬৩২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকের কোনো একটি দিন। শাহজাহান তখনো বুরহানপুরেই অবস্থান করছিলেন। প্রথমেই নির্মাণস্থল পরিষ্কার করা হয় এবং আশপাশের ছোট টিলাগুলো 'মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল, যাতে দৃষ্টিপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে', পিটার মান্ডি তার ভ্রমণের সময় যতটুকু লক্ষ্য করেছিলেন। তারপর শত-সহস্র শ্রমিক মাটি খুঁড়ে কয়েকটি গভীর কূপ বনিয়াদ খনন করে, যার গভীরতা তদানীন্তন যমুনা নদীর তলদেশের নিচে, যা এর ওপরে নির্মিতব্য বিশালাকৃতি কাঠামোর স্থায়িত্বের মূল কারণ। এই ভিতগুলোকে যমুনা নদীর পানির দ্বারা সৃষ্ট ভাঙন প্রতিরোধ এবং বর্ষার মৌসুমে যেকোনো বন্যার ফলে সৃষ্ট পানির চাপ সহ্য করতে পারে। আগ্রায় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস বর্ষাকাল এবং এক দিনে সর্বোচ্চ এগারো ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত একবার রেকর্ড করা হয়েছিল।

---

* গ্রীষ্মের এক দুপুরবেলা আমরা যখন মকবরা পরিদর্শন করছিলাম, তাজের রক্ষক আকৃতি আর আনুপুঙ্খিক বিষয়ের সযত্ন প্রাধান্য পরম্পরার মাঝে একটি চিত্তহারী, যদিও আপেক্ষিক তুলনায় নগণ্য সমরূপতার অনুপস্থিতির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মকবরার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের বৃত্তাকারে কর্তিত অংশে একটি অর্ধ–স্তম্ভের ভেতরের দিক মার্বেল দিয়ে আবৃত, যা পুরো ভবনের অন্যান্য সমরূপ স্তম্ভ থেকে একেবারেই আলাদা। অন্য স্তম্ভগুলোর ন্যায় এটা পার্শ্বযুক্ত নয় এবং এর স্তম্ভশীর্ষ অন্যদের থেকে আলাদা। আমাদের কাছে এবং মকবরার রক্ষকের কাছেও এটাকে নির্মাতাদের ইচ্ছাকৃতভাবে আরোপিত বিচ্যুতি বলে মনে হয়েছে। তারা এটা করেছে সম্ভবত তাজকে খুঁতযুক্ত হিসেবে উপস্থাপন করতে, যেহেতু ইসলামে আল্লাহতায়ালার নিখুঁত সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করার প্রয়াস নেয়াকে আল্লাহতায়ালার প্রতি কটাক্ষপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পারস্যের সর্বোৎকৃষ্ট গালিচা বোনার সময় এ কারণেই বয়নে বা রঙের নির্বাচনে ধারাবাহিকতার বিচ্যুতি *আবরাস* একই কারণে দেখা যায়।

সমসাময়িক কালের মোগল অণুচিত্রে দেখা যায়, বর্তমান সময়ের ভারতের মতোই শ্রমিকের দল, দাবদাহের প্রচণ্ডতায় ঘামছে, যা মে আর জুন মাসে ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইট অবধি উঠতে পারে। যাদের মাঝে পুরুষের পাশাপাশি হিন্দু রমণীরাও রয়েছে, তাদের সবার কাছে নিজ নিজ কাজের জন্য কেবল হাত দিয়ে ব্যবহার্য হাতিয়ার রয়েছে। চিনে বহু শতাব্দী পূর্বেই যদিও একটি চাকা ও দুটি হাতলযুক্ত ঠেলাগাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং ইউরোপীয়রা তিন শতাব্দী আগে থেকেই এটা ব্যবহার করে আসছে, ভারতে তখন শ্রম সাশ্রয়ী এসব অনুষঙ্গ একেবারেই অপরিচিত। পুরুষ এবং মহিলা শ্রমিকরা তাদের মাথায় স্থাপিত ঝুড়িতে করে খনন করা মাটি বহন করত। একই সাথে জল নিষ্কাষণের জন্য পোড়ামাটির পাইপ স্থাপন করে তারা পরিষ্কার এবং সমান করা পুরো এলাকায় পানি ছড়িয়ে দিতে পুরো এলাকাটা নুড়ি পাথরের একটি স্তর দিয়ে ভরে দিত।

নির্মাণের মূল ভার বহনের জন্য শ্রমিকরা উত্তর প্রান্তে গোলাকার গভীর কূপ খনন করে। তারা এর নিচে ইট আর চুন এবং বালি বা সুরকির গুঁড়া দিয়ে তৈরি সিমেন্ট বিছিয়ে দেয় এবং ওপরের ফাঁকা অংশটা আরো সুরকি আর সিমেন্ট দিয়ে ভরে দেয়। তারা সিমেন্টের শক্তি আর সংসক্তি বৃদ্ধির জন্য এর সাথে চিটাগুড় আর পাটের আঁশের মতো দ্রব্য মিশ্রিত করে। তারা এই কূপগুলোকে—যমুনা নদীর তলদেশের ঢালের প্রভাব নাকচ করতে বিভিন্ন গভীরতায় খনন করা—অসংখ্য ভারবাহী স্তম্ভ দিয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে দিয়ে, মূল কাঠামোর ভার বহন করতে এর ওপরে তারা ধনুকাকৃতি খিলান নির্মাণ করে। তারা এবার নদীর তীর বরাবর অধোমৃত্তিকায় আবলুস কাঠের তৈরি বিশালাকৃতি বাক্স সিমেন্ট দিয়ে ভর্তি করে পুতে দেয় যমুনার পানির হ্রাস-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বাড়তি দৃঢ়তা প্রদান করতে। অবশেষে তারা বনিয়াদ নির্মাণের কাজ আরো পাথর আর সিমেন্ট ব্যবহার করে সমাপ্ত করে। এক মোগল দিনপঞ্জি রচয়িতা উল্লসিত ভঙ্গিতে লিখেছেন, 'এবং যখন স্বাস্থ্যবান বাহু আর ইস্পাতের ন্যায় শক্তিশালী হাতের অধিকারী কোদালধারী শ্রমিকের দল নিরবচ্ছিন্নভাবে মাটি খুঁড়ে পানির স্তরের নিচে পৌঁছায়, প্রতিভাবান রাজমিস্ত্রী আর বিস্ময়কর সাফল্যের অধিকারী স্থপতির দল পাথর আর তাগাড়ের সাহায্যে মাটির উপরিভাগ পর্যন্ত সর্বোচ্চ দৃঢ়তা বিশিষ্ট বনিয়াদ নির্মাণ করে।'

নির্মাণের পরবর্তী পর্যায়ে যমুনার পানির হ্রাস বৃদ্ধির প্রভাবের সাথে লড়াই করার জন্য শক্তিশালী করে তোলা নদীর তীর বরাবর বেলে পাথরের উপরিভাগ বিশিষ্ট একটি বিশাল মঞ্চ তৈরি করা হয়, যা প্রায় ৯৭৫ ফিট লম্বা আর ৩৬৪ ফিট চওড়া, এর ওপরেই পরবর্তী সময়ে মকবরা, মসজিদ আর অতিথিশালা নির্মিত হয়। ইত্যবসরে নির্মাণস্থানে দৈনিক ৫০০০ শ্রমিক (কোনো কোনো সূত্র

অনুসারে ২০,০০০) কাজ করছে, যাদের ভেতরে অদক্ষ শ্রমিকের পাশাপাশি দক্ষ রাজমিস্ত্রী আর কারিগরের দলও ছিল। শ্রমিকদের একটি অংশ স্থানীয়, কিন্তু বাকিরা, শাহজাহানের দিনপঞ্জি রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে 'পুরো সাম্রাজ্য থেকে' এসে হাজির হয়। তারা শাহজাহানের আদেশে মকবরা প্রাঙ্গণের দক্ষিণে নির্মিত লোকায়ত জনপদের আশপাশে এসে সমবেত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এলাকাটা খুব দ্রুত শ্রমিকদের আগমনে একটি জনপদের রূপ লাভ করে এবং 'মমতাজাবাদ' নামে মুখে মুখে পরিচিত হয়ে ওঠে। শ্রমিকদের আবাসস্থলের সাথে সাথে জনপদ প্রাঙ্গণের চারপাশে চারটা সরাইখানা নির্মাণ করা হয়, যা অচিরেই সড়কপথে বা যমুনা নদী দিয়ে নির্মাণস্থলে নির্মাণ সামগ্রী বহনকারী আর অন্য বণিকদের আগমনে মুখরিত হয়ে ওঠে।

স্থানীয় খনি থেকে জোড়া গরুর গাড়িতে করে বেলে পাথর বয়ে আনতে শ্রমিকরা মাটির বস্তা ফেলে দশ মাইল দীর্ঘ একটি উঁচু সড়ক নির্মাণ করে। পাথর নির্মাণস্থলে পৌঁছাবার পর, পাথর কর্তনকারীর দল বড় টুকরোগুলো কাটতে পেরেকের মতো দেখতে ছোট কীলক হাতুড়ি দিয়ে একটি সরলরেখায় পাথরের ভেতরে প্রবিষ্ট করায়। পাথরের টুকরোগুলোকে এরপর তুলে জায়গামতো রাখা হয় এবং সিমেন্ট আর লোহার বন্ধনী ও পেরেকের সাহায্যে জোড়া দেয়া হয়। পাথরের কারিগররা সামনের পাথরগুলো জোড়া দেয়ার সময় এতই যত্নবান ছিল যে, দিনপঞ্জির রচয়িতারা লিপিবদ্ধ করেছেন, পাথরগুলো 'দক্ষ কারিগরদের দ্বারা এত মসৃণভাবে কর্তিত আর জোড়া দেয়া হয়েছে যে, খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেও তাদের মাঝে কোনো ফাটল খুঁজে পাওয়া যাবে না।' এই নির্ভুলতা, পাথরগুলোকে পুনরায় পরিমাপ করে, হাতুড়ি এবং আরো ধারালো ছেনির সাহায্যে পরিমাপের ফলে চিহ্নিত বাড়তি পাথর ছেঁটে পরিপাটি করে, অর্জিত হয়। পাথরের কারিগররা এরপর পাথরগুলোকে লোহার বিশাল আর সমতল কর্ণিকের নিচে একবার ধারালো শক্ত কাকর আর পরবর্তী সময়ে ছোট সূক্ষ্ম কাকর দিয়ে ঘষে মসৃণ করে। পাথরের এই কারিগরদের কেউ কেউ নিজেদের কাজ নিয়ে এতটাই গর্বিত ছিল যে, তারা পাথরে নিজেদের চিহ্ন উৎকীর্ণ করে রেখেছে। তাজমহলে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের আড়াইশ চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। চিহ্নগুলোর কোনোটা হিন্দুদের স্বস্তিকা (এটা বোঝাতে চারদিকে প্রসারিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যবহৃত হয়) বা তারকা আকৃতির। অন্যরা ত্রিভুজ বা বর্গক্ষেত্রের ন্যায় জ্যামিতিক নকশা উৎকীর্ণ করেছে। আরো রয়েছে তীর এবং পদ্মফুলের ন্যায় চিহ্ন।

বেলে পাথরের মঞ্চের উপরিভাগে পাথরের কারিগররা মূল মকবরার জন্য উনিশ ফিট উঁচু আর তিনশ ফিট দৈর্ঘ্যের একটি বিশাল বর্গাকৃতির মোকাম-কুর্সি নির্মাণ করে। সমগ্র মকবরা প্রাঙ্গণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মূল অক্ষরেখায়

এর অবস্থানকে গুরুত্ব দিতে, শাহজাহান আর তার স্থপতিরা রাজি হন যে, মকবরা আর মিনারিকা-চতুষ্টয় এবং মোকাম-কুর্সির পুরো কাঠামো কেবল সাদা মর্মরে পুরোপুরি আবৃত থাকবে। মসজিদ আর তার জবাব অতিথিশালার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইমারতের ক্ষেত্রে, মকবরার বাদবাকি অংশে বেলে পাথর ব্যবহার করা হবে, গম্বুজের ন্যায় মূল অংশগুলো সাদা মর্মরে মোড়া হবে বা অভ্যন্তরে সাদার ওপরে সাদা মর্মরের নকশা থাকবে।

দুইশ মাইল দূরে, আম্বারের (জয়পুর) ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমে, মাকরানায় অবস্থিত খনি থেকে সাদা মার্বেল পাথর নিয়ে আসা হয়। ১৬৩২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জারীকৃত এক শাহী ফরমান অনুসারে খনিগুলোর মালিক আম্বারের রাজাকে শাহজাহান আদেশ দেন : 'আমরা এই মর্মে আদেশ দিচ্ছি যে, পাথর কাটার জন্য যতজন শ্রমিক আর সেগুলো বহন করতে প্রয়োজনীয় মালবাহী শকট ভাড়া করতে...উপরোল্লিখিত ব্যক্তির (মোগল আধিকারিক) প্রয়োজনীয় সব কিছু রাজা অবশ্যই তাকে সরবরাহ করবেন এবং পাথর কাটার শ্রমিকদের মজুরি আর মালবাহী শকটের ভাড়া রাজকীয় কোষাগার থেকে তাকে প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে সমসাময়িক আর অভিজাত অমাত্যবৃন্দ সর্বোতভাবে যে সহায়তা করবেন সেটা না বললেও চলে এবং তিনি নিশ্চিতভাবেই বিষয়টিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করবেন এবং এই আদেশ পালন থেকে এক চুলও বিচ্যুত হবেন না।'

পিটার মান্ডিকে নিশ্চিতভাবেই দুটো বিষয় কাজের গতি আর খরচের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করা অভিভূত করেছিল। তিনি লিখেছেন : 'ইমারতটা...বিপুলসংখ্যক শ্রমিক আর ব্যয় দ্বারা, অসাধারণ অধ্যবসায়ের সাথে, সাধারণভাবে মূল্যবান ধাতু হিসেবে বিবেচিত সোনা আর রুপা এবং সাদা মার্বেলকে মামুলি পাথর হিসেবে বিবেচনা করে নির্মিত হচ্ছে।' আরেকজন ইউরোপীয় পর্যটক মাকরানা থেকে আগ্রা নিয়ে আসার সময় মার্বেল পাথর বহনকারী কিছু মালবাহী শকটের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'পাথরের এই টুকরোগুলোর কোনো কোনোটার আকৃতি আর দৈর্ঘ্য এতই অস্বাভাবিক যে, ভয়ংকর দর্শন আর বড় শিংবিশিষ্ট মহিষ আর শক্তিশালী ষাঁড়ের দল, যারা শক্তভাবে নির্মিত অতিকায় শকটগুলো বিশ বা ত্রিশটা প্রাণীর দলে বিভক্ত হয়ে সেগুলো কোনোমতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

মার্বেল পাথর অতিমাত্রায় ভঙ্গুর, খুব সহজলভ্য নয় বলে এবং সেইসাথে অনেক বেশি মূল্যবান হবার কারণে ফাটল আর পাথরে ছিলকা ওঠা পরিহার করতে বাটালি দিয়ে কাটার সময় অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা হয় এবং কাকরের আনুক্রমিক স্তর দ্বারা পাথরগুলোকে মসৃণ করা হয়, যতক্ষণ না সেগুলো উজ্জ্বলিত দীপ্তি লাভ করে আর যথাযথভাবে সম্পূর্ণ হয়, যা

তাজমহলের বাহ্যিক রূপের প্রতিনিধিত্বকারী। শাহ্জাহানের রাজদরবারের সভাকবি যে সূক্ষ্মতায় আর যথার্থতায় মার্বেল পাথরের টুকরোগুলো জোড়া দেয়া হয়েছে তার প্রশংসা করে লিখেছেন :

দুধের মাঝে নিঃশেষে মিশে যাওয়া শর্করা দানার ন্যায়
চুল পরিমাণ ফাটলও কেউ কখনো কোথায় দেখেনি

কুশলী নির্মাতার দল কেন্দ্র অভিমুখে ক্রমোন্নত তলবিশিষ্ট করে মোকাম-কুর্সি নির্মাণ করেন, চতুরতার সাথে দৃষ্টিরূপ বা পার্সপেক্টিভের বিকৃত প্রভাবের সমতাবিধান করতে, যা অন্যথায় মকবরাটা খানিকটা শূন্যগর্ভে অবস্থান করছে এমন একটি দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ সৃষ্টি করবে। নির্মাতারা মোকাম-কুর্সির নির্মাণ সমাপ্ত করার পরই কেবল মূল মকবরা নির্মাণ শুরু করেন। প্রচলিত ধারণার ঠিক উল্টো, মকবরাটা মোটেই সাদা মার্বেলের টুকরো দিয়ে তৈরি করা হয়নি বরং পনেরো থেকে আঠারো ইঞ্চি পুরু ইটের গাঁথুনি দ্বারা নির্মিত, যার উপরিভাগ মার্বেল পাথরের পুরু, মসৃণ খণ্ড দ্বারা আবৃত। ছোট চ্যাপ্টা ইটগুলো, যা গড়ে সাত ইঞ্চি লম্বা চার ইঞ্চি চওড়া আর দেড় ইঞ্চি পুরু, যা মকবরা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে পরিবহন সমস্যা সীমিত করতে নির্মাণস্থানের কাছেই অবস্থিত ইটের ভাঁটিতে পোড়ানো হয়েছে। তাগাড়ের জন্য কলিচুন তৈরি করতে চুনাপাথর বা 'কঙ্কর', যা মূলত চুনাপাথরের নুড়িমিশ্রিত মাটি, কাছেই অবস্থিত ভাঁটিতে গুঁড়া করা হতো।

কাঠ আর বাঁশ দিয়ে ভারা নির্মাণ করা হয়েছিল, যা আজও সমগ্র এশিয়ায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং তাজমহল নির্মাণের সময় যা ছিল ইমারত নির্মাণের আদর্শ পদ্ধতি। অবশ্য কোনো অজানা কারণে খুব সম্ভবত যা স্থানীয়ভাবে উপকরণের দুস্প্রাপ্যতার সাথে জড়িত বা বিপুল পরিমাণ ওজন জড়িত থাকায়, বলা হয় যে নির্মাতারা তাজমহলের জন্য ইটের ভারা ব্যবহার করেছিলেন। নির্মাণকাজ সমাপ্ত হতে শাহ্জাহানকে আপাতদৃষ্টিতে যখন জানানো হয় যে ইটের ভারা অপসারণ করতে পাঁচ বছর সময় লাগবে, কিন্তু তিনি এই সমস্যার চমৎকার একটি সমাধান বের করে আদেশ দেন, যারা ইটের ভারা খুলে নিতে সাহায্য করবে তারা ইটগুলো রাখতে পারবে। ফলাফল, রাতারাতি ইটের ভারা তাজমহল থেকে গায়েব হয়ে যায়। একটি প্রচলিত কাহিনী অনুসারে ইটের ভারা ব্যবহার করা হয়েছিল নির্মাণের পূর্বে তাজমহলকে দৃষ্টির আড়ালে রাখতে এবং এই কাহিনীর আরেকটা ভাষ্যে এর সাথে যোগ হয়েছে যে, কেউ একজন দেয়ালের ওপর দিয়ে উঁকি দেয়ায় তাকে তার কৌতূহলের জন্য অন্ধ করে দেয়ার আদেশ দেয়া হয়।

মকবরার মূল ইমারতের নির্মাণকাজ অগ্রসর হবার সাথে সাথে, মার্বেল পাথর ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী ভারা দিয়ে আরো ওপরে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। পিরমিডের নির্মাণের সময় ব্যবহৃত, ঢালু পথই সম্ভবত সমাধানের একটি অংশ। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের পরে, পাথরের খণ্ড কপিকলের সাহায্যে উত্তোলন করা হয়। মানুষ, ষাঁড় এমনকি হাতি দিয়ে পরিচালিত দড়ি, কড়িকাঠ, পুলির একটি জটিল ব্যবস্থাই মনে হয় সম্ভবত সমাধান ছিল। উত্তোলনের সময় পাথরের খণ্ডগুলোকে নিরাপদ রাখতে, হয় দড়ি ব্যবহার করা হতো কিংবা অত্যধিক ভারী টুকরোগুলোর ক্ষেত্রে মার্বেলে টুকরোয় পূর্বে কাটা গর্তের ভেতরে নখরের ন্যায় ধাতব উত্তোলক যন্ত্র প্রবিষ্ট করানো হতো। পাথরের খণ্ডগুলো প্রয়োজনীয় উচ্চতায় পৌঁছাবার পর, পাথরের কারিগররা বাঁকা প্রান্ত বিশিষ্ট লৌহদণ্ড ব্যবহার করে সেগুলোকে জায়গামতো স্থাপন করে তারপর পরবর্তী পরিমার্জনের কাজ সমাপ্ত করত।

মার্বেলের সামনের দিকের খণ্ডগুলোকে মূল ইটের গাঁথুনিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে স্থাপন করা হয় বা ইটের আরো গভীরে এমনভাবে প্রবিষ্ট করানো হয়, যাতে ক্ষুদ্রতম আড়াআড়ি অংশ উন্মুক্ত থাকে। রাজমিস্ত্রিদের কাছে 'স্ট্রেচার/হেডার' হিসেবে পরিচিত এই কৌশলে, এর সাথে লোহার ধাতব-বন্ধনী ব্যবহার করে অধিকতর শক্তি আর অনুলগ্নতা প্রদান করা হয়। (লোহার বন্ধনীগুলো পরবর্তী সময়ে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মরিচা পড়ার কারণে এবং তাপঘটিত সংকোচন-প্রসারণের ফলে পাথরে ফাটল সৃষ্টি হয়ে মূল কাঠামোর অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ করেছে।)

মূল গম্বুজের প্রাক্কলিত ওজন ১২,০০০ টনের বেশি এই একটি তথ্য থেকেই বোঝা যাবে যে নির্মাণকার্য কতটা শ্রমসাধ্য আর কঠিন ছিল। গম্বুজ থেকে পরস্পর সম্পর্কিত ধনুকাকৃতি খিলানের দ্বারা যা অপেক্ষক হিসেবে ক্রীড়াশীল, ভারবাহী দেয়ালে স্থানান্তরিত লোড ফ্যাক্টর প্রতি বর্গ ফুটে প্রায় ৭৫০ টন। এক দিনপঞ্জি রচয়িতা বর্ণনা করেছেন কীভাবে নির্মাতারা 'বেহেশত স্পর্শ করা গম্বুজ'-এর ওপর পদ্ম ফুলের পাপড়ি থেকে উত্থিত, যা ভারতবর্ষ এবং অন্যত্র উর্বরতার একটি সাধারণ প্রতীক, ত্রিশ ফিটের অধিক উঁচু 'সূর্যের মতো উজ্জ্বল' স্বর্ণের তৈরি পঞ্জের কারুকাজ স্থাপন করেছিলেন।

মকবরার অভ্যন্তরে শ্রমিকরা মেঝের প্রায় তিন ফিট ওপর পর্যন্ত মার্বেলের খণ্ড দিয়ে আবৃত করে। তারা এই উচ্চতার ওপরের অংশ মকবরা প্রাঙ্গণের অন্যান্য ইমারতের অভ্যন্তরের মতো একইভাবে ইটের ওপর পলেস্তারা করেছে। দুই ইঞ্চি পুরু এই পলেস্তারা, যা অনেক সময় কাদা আর খড়ের একটি প্রাথমিক মিশ্রণের ওপর প্রয়োগ করা হতো, প্রধান উপাদান ছিল সাদা চুন আর মার্বেল পাথরের গুঁড়া। কিন্তু প্রয়োজনীয় অনুলগ্নতা আর সমাপ্তির পর্যায়ের ওপর নির্ভর

করে পলেস্তারায় ডিমের সাদা অংশ, আঠা এবং শর্করার জন্য অন্যান্য উপাদান যোগ করা হতো এবং একের পর এক মিহি প্রলেপ প্রয়োগ করে, যা উজ্জ্বলিত করে তারা হুবহু মার্বেলের ন্যায় একটি শুভ্র জেল্লা সৃষ্টি করত। মকবরার বহির্ভাগের কিছু অংশেও তারা এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে। দক্ষিণ প্রান্তের তোরণদ্বারের নিম্নভাগের কিছু অংশ, যা মার্বেল বলে প্রতীয়মান হলেও আসলে সেটা উজ্জ্বলিত সাদা পলেস্তারা। তাজমহলের কিউরেটরেরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন, *ইবানের* পেছনের অংশেও, মকবরার সম্মুখ ভাগ বা সদরের বহির্ভাগের ওপর যেখানে তারা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, লাল বেলে পাথরের পৃষ্ঠযুক্ত সাদা চুনের পলেস্তারা রয়েছে।

ইমারতসমূহের মূল কাঠামোর নির্মাণকার্য একবার শেষ হলে তারপর শুরু হয় সেগুলোর অলংকরণ আর শোভাবর্ধনের কাজ। মকবরাটা দূর থেকে যদিও একেবারে শুভ্র দেখালেও, বস্তুতপক্ষে মকবরার ভেতরে আর বাইরে পাথরের ওপর খোদাই করে কোরআন শরিফের আয়াত, ফুল-লতা-পাতার নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সাদার ওপরে সাদা। ক্যালিগ্রাফিকে—অলংকৃত লিপিকলা—মুসলিম দুনিয়ার শিল্পরীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেমনটা চীনে আর জাপানে করা হয়ে থাকে। তাজমহলের ক্যালিগ্রাফিতে ব্যবহৃত আরবি আর ফারসি উভয় প্রকার লিপি, তাদের সাবলীল ছন্দময় পঙ্‌ক্তি আর পুনঃপুন ব্যবহৃত নোকতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই নান্দনিক রূপের অধিকারী। বোদ্ধাদের কাছে চিত্রকলার চেয়ে দক্ষ হাতের ক্যালিগ্রাফির কদর অনেক বেশি। শাহজাহানের দরবারের সভাকবিদের একজন বর্ণনা করেছেন সুন্দর ক্যালিগ্রাফির 'প্রতিটি পঙ্‌ক্তি' কীভাবে 'কাশ্মীরের সৌন্দর্যের মতো হৃদয়গ্রাহী।' ইসলামি রীতি অনুসারে, কোরআন শরিফের শব্দগুলো—আরবি ভাষায় আমাদের জানা মতে প্রথম গ্রন্থ—তাদের আকার আর বিষয়বস্তু উভয় কারণেই ঐশ্বরিক, অনুপম। অষ্টম শতকে মানুষের দ্বারা আল্লাহতায়ালার সৃষ্টিশীল কাজের অনুমান বা প্রতিমা পূজার ভয়ে—অঙ্কিত বা খোদাই করা এবং তাদের উদ্দেশ্য যতই ধার্মিক হোক—মানুষ বা অন্য জীবজন্তুর অবয়বের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে, কোরআনের লিপি উৎকীর্ণ করা ইমারতসমূহকে বিশেষ করে মসজিদকে অলংকৃত করার প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়।* তাজমহলে ক্যালিগ্রাফি কেবল দর্শনার্থীদের অবহিত করতে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পিত হয়নি সেইসাথে অলংকরণের বিষয়টিও খেয়াল করা হয়েছে।

---

* দক্ষিণ স্পেনের গ্রানাডায় অবস্থিত আলহামরা এই ক্যালিগ্রাফির সবচেয়ে বিখ্যাত নিদর্শন।
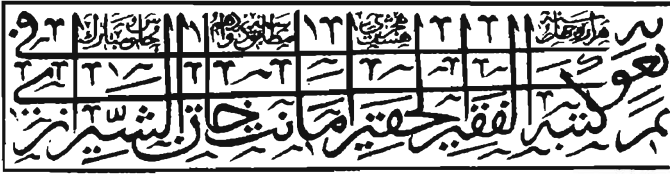
মকবরার দক্ষিণ খিলানের নিম্নপ্রান্তে আমানত খানের স্বাক্ষর।

পার্সি চারুলিপিকররা আরবি লিপি এবং তাদের নিজেদের কল্পনার সংমিশ্রণে ভিন্ন ধারার চারুলিপি সৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং শাহজাহান আমানত খান নামে এক পার্সিকে তাজমহলের প্রধান চারুলিপিকর হিসেবে নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন সিরাজ, ইসলাম শিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র, থেকে আগত একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং সতেরো শতকের গোড়ার দিকে তার ভাই, আফজাল খানের, যিনি পরবর্তীকালে শাহজাহানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন, সাথে মোগল দরবারে এসেছিলেন। আমানত খান চারুলিপিকর হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করায়, ১৬১০ সাল নাগাদ জাহাঙ্গীর তাকে আকবরের মকবরার চারুলিপির দায়িত্ব প্রদান করেন, যা পাথরে তার অভিলিখন অনুযায়ী ১০২২ হিজরি সাল (পশ্চিমের বর্ষপঞ্জি অনুসারে ১৬১২/১৩ সাল) থেকে শুরু হয়েছিল। আমানত সেইসাথে সম্রাটের মনোনীত সফরসঙ্গী হিসেবে রাষ্ট্রদূতদের সাথেও সরকারি দায়িত্ব পালন করেন। শাহি মহাফেজখানা থেকে তার নিরীক্ষণ সিলমোহরযুক্ত বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, যেখানে নিশ্চিতভাবেই তিনি কোনো দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

শাহজাহান তাজমহলে আমানত খানকেই কেবল তার কাজে নিজের নাম অভিলিখনের অনুমতি দিয়েছিলেন, দুটো স্থানে তার কৃত চারুলিপিতে তুঘরা হরফে সাক্ষর আর তারিখ রয়েছে। একটি অভিলিখন রয়েছে মকবরার অভ্যন্তরে দক্ষিণের ধনুকাকৃতি খিলানের ওপর তারিখ ১০৪৫ হিজরি (১৬৩৫/৩৬ খ্রিস্টাব্দ) এবং অন্যটা একই অভ্যন্তরের খিলানের পাদদেশে, তারিখ ১০৪৮ হিজরি (১৬৩৬/৩৭ খ্রিস্টাব্দ)। মকবরার পশ্চিম প্রান্তের বহির্ভাগে ধনুকাকৃতি খিলানের পাদদেশের বাম প্রান্তে আরেকটা স্বাক্ষরবিহীন অভিলিখনে কেবল কাজের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে, ১০৪৬ হিজরি (১৬৩৬/৩৭ খ্রিস্টাব্দ)। এই তিনটি অভিলিখন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, আমানত খানই চারুলিপিকর ছিলেন। এই অভিলিখনগুলো থেকে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, নির্মাণকার্য শুরু হবার, বড় জোর, চার বছরের ভেতরে মকবরার মূল কাঠামো অভ্যন্তরের শোভাবর্ধনের কাজ শুরু করার মতো সমাপ্ত হয়েছিল এবং বহির্ভাগের শোভাবর্ধনের কাজ এক বছর পরই প্রাগ্রসর পর্যায়ে ছিল। দ্বিতীয়

বিষয়, অভ্যন্তরের উৎকীর্ণ দুটো তারিখ প্রতিপন্ন করে যে আমানত খান এবং তার সহকারীরা মকবরার কাঠামোর ওপর থেকে চারুলিপি অঙ্কিত করতে করতে নিচের দিকে নেমে এসেছেন।

আমানত খান নিশ্চিতভাবেই প্রথমে নির্মাণ আর স্থাপত্যকৌশলের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকজনের সাথে আলোচনা করে চারুলিপির আকার, অভিলিখনের স্থান আর পরিকাঠামো সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মমতাজের স্মৃতিস্তম্ভের ওপরের অভিলিখন এবং ফার্সিতে চারুলিপিকরের সাক্ষর আর তারিখ ব্যাতীত অভিলিখিত চারুলিপির পুরোটাই মূল আরবিতে কোরআন শরিফের আয়াতের সাহায্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরো মকবরায় এমন প্রায় পঁচিশটা অনুচ্ছেদ রয়েছে, যা অন্য যেকোনো ইমারতের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক, এমনকি শাহজাহানের রাজত্বকালে নির্মিত মসজিদেও এত বেশি সংখ্যক চারুলিপি ব্যবহৃত হয়নি। একজন আলেমকে সাধারণত কোরআন শরিফ থেকে আয়াত নির্বাচনের দায়িত্ব প্রদান করা হতো, কিন্তু আমানত খান নিজে একজন আলেম এবং মোগল দরবারের একজন সম্মানিত সদস্য হবার পাশাপাশি অভিজ্ঞ চারুলিপিকর হবার কারণে খুব সম্ভবত নিজেই আয়াতগুলো নির্বাচন করেছিলেন, এমনও হতে পারে শাহজাহানের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আয়াত আর স্থান নির্বাচন শেষ হলে, আমানত খান নিজের কর্মশালায়, বিশালাকৃতি কাগজে চারুলিপির নকশা সমমাপে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি কাজটা করার সময় আকৃতি আর বিষয়বস্তুর মেলবন্ধন ঘটিয়ে একটি একক বৌদ্ধিক সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস নিয়েছেন। তার এই প্রয়াসের ফলে সৃষ্ট নকশার রূপরেখা এরপর মার্বেলের ওপর তৈরি করা হয়েছে এবং পাথর খোদাইকারীরা সাদা মার্বেলের ওপর বাটালি দিয়ে চেছে অগভীর রেখার জন্ম দিয়েছেন, তারা পরবর্তীকালে এই অগভীর রেখায় কালো পাথর প্রবিষ্ট করিয়ে চারুলিপির আকৃতি দৃশ্যমান করেছেন। আরবি লেখা যারা পড়তে পারে না, বিশেষ করে তাদের জন্য মকবরা প্রাঙ্গণের দক্ষিণের প্রবেশপথ এবং মকবরায় প্রবেশের ধনুকাকৃতি খিলানের চারপাশে উৎকীর্ণ চারুলিপি বিশেষভাবে চিত্তহারী। আমানত খান এই উভয় স্থানে লিপির আকৃতি, মাত্রা এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব সতর্কতার সাথে আনুপুঙ্খকভাবে পরিবর্তিত করেছেন উচ্চতার জন্য সৃষ্ট বিকৃতকারী প্রভাব নাকচ করতে এবং সেইসাথে নিশ্চিত করেছেন যে, দর্শকের চোখে, উচ্চতা হ্রাসের সাথে সাথে লিপিগুলো ছোট-বড় না হয়ে, সমান কৌণিক মাপ উৎপন্ন করে সমরূপে দৃশ্যমান হয়।

তাজমহল প্রাঙ্গণের প্রধান প্রবেশ-তোরণ, দক্ষিণের তোরণদ্বার স্থপতিরা এমনভাবে নির্মাণ করেছেন, খিলান ঘোমটার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে

দর্শনার্থীরা তাজ প্রথম দর্শনের রোমাঞ্চ-শিহরণ অনুভব করতে পারে। প্রধান প্রবেশ-তোরণ বস্তুতপক্ষে একটি বিশালাকৃতি ইমারত। মূল মকবরার মতো এর মেঝেও অষ্টভুজাকৃতি, যা একটি বর্গক্ষেত্রের সমকোণী ধারগুলোকে বৃত্তাকারে কর্তন করে তৈরি করা হয়েছে। অষ্টভুজ মিনারগুলো প্রান্তদেশে অবস্থিত যার শীর্ষদেশে একটি গম্বুজাকৃতি অষ্টভুজ *ছেত্রি* রয়েছে। ইমারতটার বহির্ভাগ লাল বেলে পাথর দিয়ে আবৃত কিন্তু মকবরা প্রাঙ্গণের মূল বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অকৃপণভাবে সাদা মার্বেল দিয়ে কারুকাজ করা হয়েছে, বিশেষ করে উত্তর আর দক্ষিণ পাশের প্রবেশপথে যেখানে আকাশজোড়া *ইবানের* সৃষ্টি করা হয়েছে। উভয় *ইবানের* কাঠামোর শীর্ষে এক সারিতে পাশাপাশি এগারোটা মার্বেলের অষ্টভুজ *ছেত্রি* অবস্থান করছে। প্রবেশপথ দর্শনার্থীদের দৃষ্টি থেকে তাজমহলকে আড়াল করে রাখে, যতক্ষণ না তারা ভেতরে প্রবেশ করছে। তাদের দৃষ্টি বরং দক্ষিণের *ইবানের* কাঠামোয় উৎকীর্ণ চারুলিপির দিকে আকৃষ্ট হয়। অনেক শক্তিশালী উক্তি সেখানে রয়েছে কিন্তু নিম্নোক্ত উক্তিটা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, দর্শনার্থীকে একটি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করতে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে—বেহেশতের পার্থিব সমরূপ :

শান্তিতে এসো সমাগত প্রাণ,
তারপরে, প্রীত আর পরিতৃপ্ত তোমার প্রভুর কাছে, তার কাছে ফিরে যাও,
প্রবেশ করো তোমাদের মাঝে যারা আমার অনুগত,
এবং প্রবেশ করো আমার বেহেশতে।

আমানত খানের দক্ষতা দেখে দর্শনার্থীরা মুগ্ধ হয়। শাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিকদের একজন বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'কোরআন থেকে নির্বাচিত ঐশ্বরিক অনুগ্রহের আয়াতসমূহ—সর্বোচ্চ শিল্পদক্ষতা আর অপরিমিত ব্যয়ের সাথে সূক্ষ্ম সৃজনশীলতার মাধ্যমে...এবং পাথর খোদাইকারী বাটালির ধারালো অগ্রভাগ আকাশের শৈল্পিক দক্ষতাকে ছাপিয়ে যায় এমন রং আর কমনীয় সজীবতা ফুটিয়ে তুলেছে এবং (অন্যদের) চারুলিপির সাথে বাতিলকরণের ছাপ আর অসিদ্ধকরণের সীমারেখা টেনে দিয়েছে।'

১৬৩২ সালে, তাজমহলের নির্মাণকাজ শুরু হবার ঠিক পর পরই, শাহজাহান আমানতের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেন, যা বেতন বৃদ্ধির দ্বারা সূচিত হয় এবং এক বছর পরই তাকে আবারও পদোন্নতি প্রদান করেন, এইবার ১০০০ মনসবদারের পদ। দুটো পদোন্নতিই তাজমহলের চারুলিপিকার হিসেবে তার অবস্থানকে সম্মান প্রদর্শন করতেই সম্ভবত করা হয়েছিল। ১৬৩৭ সালের ডিসেম্বরে, মূল মকবরার চারুলিপির কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে,

শাহ্জাহান আমানত খানকে তখন সমাধির অভ্যন্তরে তার অভিলেখের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে একটি হাতি উপহার দেন। শাহ্জাহানের রাজত্বকালের অষ্টাদশ বর্ষের (১৬৪৪/৪৫ খ্রিস্টাব্দে) কোনো এক সময়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সমাধিতে কত দিন কর্মরত ছিলেন সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, কিন্তু তাজমহলের প্রবেশপথে যেহেতু ১০৫৭ হিজরির (১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ) সাক্ষরবিহীন একটি অভিলেখ উৎকীর্ণ রয়েছে, আরেকজন নিশ্চিতভাবেই এই সময়ে চারুলিপিকার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

'মকবরার অভ্যন্তর আর বহির্ভাগের সর্বত্র, বিশেষ করে প্রদ্যোতিত সমাধিস্তম্ভ ধারণকারী মঞ্চে, বিরল কর্মদক্ষতার অধিকারী ভাস্করের দল কোমনীয় কারিগরি দক্ষতায় নানা রঙের মূল্যবান মণিমুক্তা দিয়ে মার্বেলের ওপর প্যাটার্ন তৈরি করে—সেসব মূল্যবান রত্নের বর্ণনা বাণীর অপরিসীম বিশালতার মাঝে ধারণ করা সম্ভব নয়, এমনকি বাক্য আর নিবন্ধের ক্ষমতা নেই তাদের নিতান্ত সাধারণ একটি বর্ণনা প্রদান করার। আর তাদের মনোহর পরিকল্পিত

তাজমহলের তোরণদ্বারে অস্বাক্ষরিত কিন্তু তারিখযুক্ত অভিলিখন।

সম্পাদনার সাথে, যা অনাদ্যন্ত সৌন্দর্যের অধিকারী, আজরাঙের সেরা শিল্পকর্মগুলো এবং চিন আর ইউরোপের চিত্রশালায় রক্ষিত চিত্রকর্মগুলোর, তুলনা করার মতো কোনো ধৃতিসত্ত্ব বা বাস্তবতা নেই, আর সেগুলোকে পানির ওপর নিছক প্রতিবিম্বের মতো মনে হয়।' শাহ্জাহানের ঐতিহাসিক শালিহ সমগ্র তাজমহলের অসামান্য অলংকরণ সম্বন্ধে অন্তত এমনই লিখে গেছেন।

১৬৬৩ সালে ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের যখন তাজমহল পরিদর্শন করেন, তিনি বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'চারপাশে ইয়াশ্‌ব্‌ আর ইয়াশ্‌ম্‌ পাথরের ছড়াছড়ি সেইসাথে ফ্লোরেন্সের গ্রান্ড ডিউকের চ্যাপেলের দেয়াল সমৃদ্ধকারী পাথরের মতো অন্যান্য পাথরও রয়েছে এবং অনেকগুলো পাথরই বিরল আর বহুমূল্যবান, দেয়ালের সম্পূর্ণ অংশে সন্নিবেশিত মার্বেল পাথরের খণ্ডের ওপর অগণিত রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে মণিমুক্তাগুলো বসান হয়েছে। সাদা আর কালো বর্গাকার মার্বেল দিয়ে তৈরি করা মেঝেতেও এমনকি এসব মূল্যবান মণিমুক্তা দিয়ে সূক্ষ্ম আর সুন্দর কারুকাজ সৃষ্টি করা হয়েছে।'

আজও তাজমহলের অলংকরণ কেবল রুচিশীলতা আর সংযমের কারণেই, যা স্থাপত্যশৈলীর কাঠামোকে এর সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন করা থেকে বিরত রেখেছে, কেবল দর্শনার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না, সেইসাথে অলংকরণের দক্ষতা আর আবেদনপূর্ণ কমনীয়তাও তাদের নজর এড়িয়ে যায় না। অভিলিখিত চারুলিপি ছাড়াও তাজমহলের নির্মাতা অলংকরণের জন্য তিনটি ভিন্ন ধারার আশ্রয় নিয়েছেন : পাথরে উৎকীর্ণ জটিল, সূক্ষ্ম নকশা, উদগত শিল্পকর্ম এবং অতিথিশালা আর মসজিদে খোদাই করা আর চিত্রিত অলংকরণ। প্রতিটি ক্ষেত্রে, ফুল-লতা-পাতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। মোগল চিত্রকররা পদ্মফুল, আইরিস, লিলি এবং টিউলিপের মতো ফুল চিত্রিত করতে বিরামহীনভাবে বাটালির সাহায্যে অথবা পাথরের ওপর প্রণিহিত করেছেন।

সপ্তদশ শতকে ইউরোপ আর এশিয়া উভয় স্থানে, প্রতীক হিসেবে গাছ এবং লতাপাতার ব্যবহার, বর্তমানকালের পশ্চিমের চেয়ে, অনেক বেশি পরিমাণে স্বীকৃত ছিল, যেখানে লাল গোলাপই সম্ভবত একমাত্র ফুল, যার ব্যাপকভাবে স্বীকৃত প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে। মুসলিম শিল্পকলায় এবং বিশেষ করে পারস্যের চিত্রকলা আর নকশায় বেহেশতের প্রতীক হিসেবে ফুল প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। ফুলের বর্ণনা করতে গিয়ে পারস্যের কবিরা বলেছেন, বেহেশতের পানির নহর থেকে ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাজমহল অলংকরণে ফুলের ব্যবহার একটি বার্তাকেই আরো জোরাল করে তোলে যে মকবরাটাকে পৃথিবীর বুকে বেহেশতের একটি প্রতিরূপ হিসেবেই নির্মিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অবশ্য প্রতীকীত্বকে ছাপিয়ে গিয়ে, অবশ্য বাবর থেকে শুরু করে পরবর্তী সব মোগল সম্রাটদের ভেতরেই উদ্যানে প্রস্ফুটিত ফুলের পার্থিব প্রকাশভঙ্গির মাঝে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি একটি বিশেষ অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়েছে। জাহাঙ্গীর বাগান তৈরির পাশাপাশি ভৌতবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হবার কারণে মূলত ভারতের 'সুগন্ধি ফুল' নিয়ে গবেষণা করেছেন, তার ধারণা অনুযায়ী যা

পৃথিবীর অন্যান্য সব ফুলকেই সৌন্দর্যের দিক দিয়ে টেক্কা দিয়েছে। তিনি চিত্রকলার প্রতি আগ্রহী হবার কারণে গাছপালা এবং ফুটন্ত ফুলের অনেক পাশ্চাত্যরীতির চিত্রকর্ম উপহার হিসেবে পেয়েছিল, যার ভেতরে রয়েছে ইউরোপে সেই সময়ে সদ্য প্রবর্তিত লতাগুল্মের আনুপুঙ্খিক সচিত্রীকরণ। এসব চিত্রকর্ম সব ধরনের মোগল অলংকরিষ্ণু চিত্রকর্মে ফুলের আরো অধিকতর প্রাকৃতিক উপস্থাপনের সূচনা করে। প্রথমবারের মতো, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফুলদানিতে রক্ষিত অবস্থায় বা মাটিতে কিংবা পাত্রে বেড়ে ওঠা লতাপাতা প্রদর্শিত হয়, যেমনটা ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিতে দেখতে পাওয়া যায়। নবায়িত ইউরোপীয় প্রভাবের আরেকটা লক্ষণ সহসাই বাসকগোত্রীয় বৃক্ষের পত্রসম্ভারের সহসা পুনরাবির্ভাব, যা গ্রেকো-রোমান দুনিয়ার সাথে ভারতবর্ষের প্রথমদিকের যোগাযোগের পরেই বিলুপ্ত হয়েছিল।

শাহজাহান আরেকটা বাড়তি উপাদান এই প্রয়াসের সাথে যোগ করেন—মণিমুক্তার প্রতি তার ভালোবাসা আর জ্ঞান। ফরাসি মণিকার জ্যা-ব্যাপতিস্ট ত্রেভার্নিয়ের ভাষ্য অনুসারে, 'বিশাল মোগল সাম্রাজ্যে মণিমুক্তা সম্বন্ধে আর কারো শাহজাহানের চেয়ে ব্যুৎপত্তি ছিল না।' তাজমহলে মার্বেলে খোদাই করে বসানো মণিমুক্তার মূল্য আর বৈশিষ্ট্যের মাঝে এবং আনুপুঙ্খিক অলংকরণ আর চূড়ান্ত কারিকুরির প্রতি প্রদত্ত মনোযোগ খেয়াল করলে রত্নপাথরের প্রতি তার আগ্রহের বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়। বস্তুতপক্ষে উনিশ শতকে কলকাতার বিশপ হেবার এই অসাধারণ কারিগরি দক্ষতার কারণে বহুল উদ্ধৃত একটি মন্তব্য করেছিলেন যে, তাজমহল নির্মাণ করেছে দানবেরা আর মণিকারেরা একে পূর্ণাঙ্গ করেছে। অন্যদের কাছে তাজমহলের মূল মকবরা সাদা মার্বেলের একটি রত্নপাথর, যা বেলে পাথরে নির্মিত পুরো প্রাঙ্গণ দ্বারা সৃষ্ট একটি ধারকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বার্নিয়ের এবং সালিহর মন্তব্যের দ্বারা পরবর্তী সময়ে মার্বেলের ওপর প্রণিহিত কর্মের উৎস আর প্রভাব সম্বন্ধে এক ধরনের উৎকট স্বাদেশিকতাপূর্ণ আর নিষ্ফল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। একদল দাবি করে যে, শ্বেত পাথর খোদাই করে ভিন্ন রঙের পাথর-বসানোর কাজ শক্ত পাথর প্রণিহিত করার ইতালিয়ান রীতি, যা *pietra dura* নামে পরিচিত, যা বিশেষ করে ফ্লোরেন্সে মেদিচিদের পৃষ্ঠপোষকতায় চর্চিত হতো, সেখান থেকেই কেবল গৃহীত হয়েছে এবং পর্যটকরা এই পদ্ধতি ভারতে নিয়ে এসেছে। অন্যদের দাবি অনুসারে, ইউরোপীয়দের আগমনের অনেক পূর্বেই, ভারতীয়রা পাথরে প্রণিহিত করার কৌশল রপ্ত করেছিল, যা *panchi kura* , যার অর্থ 'সজোরে প্রবিষ্টকারী কর্ম', অলংকরণ আর চারুলিপি উভয় ক্ষেত্রেই এ কৌশলের প্রয়োগ তারা জানত।

চারুলিপির ক্ষেত্রে বক্তব্যটা সত্যি হলেও, অকুলীন রত্নপাথর, যা ভারতে প্রচলিত প্রণিহিত কর্মের পাথরের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন বলে ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে এই রীতির প্রয়োগ কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। মোগল চিত্রকলার ওপর যেমন ইউরোপীয় চিত্রকলার একটি প্রভাব রয়েছে ঠিক সে রকম এমনটা হওয়া মোটেই বিচিত্র নয় যে হয় ইউরোপীয়রা বা দরবারে তারা যেসব বস্তু উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছিল সেগুলো শাহজাহানকে প্রভাবিত করেছিল এবং তার কারিগররা সম্রাটের প্রিয় রত্নপাথরে *panchi kura* সন্নিবেশিত করার কৌশল রপ্ত করেছিল।

শ্বেতপাথরে প্রণিহিত কর্মের বিস্ময়াবহ সৌন্দর্যের কাছে এমন একটি বিতর্ক একেবারেই অকিঞ্চিৎকর, এক সভাকবি এ জন্য লিখতে বাধ্য হয়েছেন :

শ্বেতপাথরে তাদের প্রণিহিত করা পাষাণ পুষ্প
তাদের সুগন্ধি নয়, বরং তাদের রঙের বর্ণালির দ্বারা
সত্যি ফুলের মাত্রা লাভ করেছে

উনিশ শতকে এক রুশ প্রমীলা পর্যটক মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেন, কিছু কিছু ফুল 'দেখতে এতটাই জীবন্ত মনে হয়, ভাস্কর ভীষণ দক্ষতার সাথে প্রকৃতিকে অনুকরণ করেছে, নিজেকে আশ্বস্ত করতে যে ফুলগুলো আসলেই সত্যি নয় নিজের অজান্তেই তোমার হাত সেগুলো স্পর্শ করবে। লাল কর্নেলিয়নে মূর্ত করে তোলা ডালিম ফুলের চারপাশে মাদার অব পার্লে তৈরি সাদা জুঁই ফুলের বাকানো লতা...গাঢ় সবুজ রঙের লতাগুল্মের নিচে থেকে যখন সূক্ষ্ম কবরী ফুল উঁকি দিচ্ছে...আলাদা আলাদা মুক্তা, পান্না বা পোখরাজ দিয়ে তৈরি প্রতিটি পাতা, প্রতিটি পাপড়ি।'*

তাজমহলে প্রায় চল্লিশ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন মণিমুক্তা ব্যবহৃত হয়েছে। শাহজাহান সমগ্র এশিয়া থেকে রত্নপাথরগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। পণ্যবাহী কাফেলা চিনের কাশগর থেকে সিল্ক রুট দিয়ে নিয়ে আসা হয় ইয়াশ্‌ম্; উত্তর-

---

* রুশ প্রমীলা পর্যটকের নাম মাদাম ব্লাভাতস্কি (১৮৩১–১৮৯১), একজন প্রথাবিরোধী রমণী যিনি ১৮৭৫ সালে থিওসফি, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর দর্শনের অভিপ্রায়ে গঠিত দর্শনের একটি শাখা, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা সম্ভবত 'নতুন যুগের' প্রথম দর্শনশাস্ত্র। আকবরের নতুন ধর্মমতের সাথে থিওসফির কিছু মিল রয়েছে। এই শাস্ত্র সব ধর্মের মাঝেই সত্য খুঁজে পায় এবং হিন্দু আর বৌদ্ধ অনুষঙ্গকে একত্র করে এমন একটি দর্শন সৃষ্টি করেছে যেখানে প্রতিটি মানুষের চাহিদাকে তার আপন কর্ম অনুধাবনে এবং সেই সাথে দিব্যসত্তার সাথে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ, অন্ত র্জ্ঞানলব্ধ যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

পূর্ব আফগানিস্তানের উঁচু পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত খনি থেকে সংগ্রহ করা হয় গাঢ় নীলের মাঝে সবুজ ছোপযুক্ত লাজবর্ত (লাপিস্ লাজুলি); তিব্বতের উপরিভাগ থেকে ইয়াকের দল তাদের যাত্রার প্রথম পর্যায়ে বৈদূর্য বা ফিরোজা বয়ে নিয়ে আসে; লোহিত সাগর আর আরব থেকে আসে প্রবাল বা মুক্ত; বার্মার উপরিভাগ থেকে আসে হলুদাভ অম্বর; রাশিয়া থেকে গাঢ় সবুজ রঙের ম্যালাকাইট এবং সাগর অতিক্রম করে সিংহল দ্বীপ থেকে নিয়ে আসা হয় পদ্মরাগমণি। লাসুনিয়া, বৈদূর্যমণি বলা হয়ে থাকে যে, সুদূর মিশরের নীল নদের অববাহিকা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। কোনো বিশেষ স্থান বা নির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট রত্নপাথরের রং আর স্বচ্ছতাই কেবল বিবেচনা করা হয়নি সেইসাথে সম্ভাব্য রত্নপাথরের জ্যোতিষতত্ত্ব সম্পর্কিত সম্পৃক্ততাও বিচার করা হয়েছে। নীলা বা মরকৎ যেমন অনেক কিছুর ক্ষেত্রে অকল্যাণসূচক দ্যোতনা রয়েছে বলে বিবেচিত হওয়ায় খুব অল্পই ব্যবহৃত হয়েছে।

আগ্রায় যখন রত্নপাথরগুলো এসে পৌঁছায়, 'বিস্ময় সৃষ্টিকারী...জাদুকরী' কারিগররা সেগুলোকে উজ্জ্বলিত করে এবং একটি ছোট বাঁকানো করাতের সাহায্যে নির্দিষ্ট আকৃতিকে কাটে। এই বিশেষ ধরনের করাতে পাঁচটা পর্যন্ত তামার তৈরি তার বিভিন্ন দূরত্বে যুক্ত করা হতো রত্নপাথরগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন পুরুত্বযুক্ত পরতে পৃথক করতে। পাথর কর্তনকারীর দল, সম্ভবত তাদের সহায়তা করতে শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত নকশা ব্যবহার করে, শ্বেত মর্মরে বাটালি দিয়ে খাঁজ কেটেছে, যার মাঝে তারা করম্ব প্রবিষ্ট করিয়ে সেটাকে তেল, লেড-অক্সাইড এবং মোমের সাহায্যে প্রস্তুত পুটিং দিয়ে আটকে দিয়েছে। মণিকাররা এক ইঞ্চি একটি ফুলের আকৃতি নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করতে ষাটটা পর্যন্ত পাথরের টুকরো, প্রতিটি আলাদা করে কেটে তারপর মিলান হয়েছে, গণনা করেছেন। অন্যত্র কারিগররা একটি পাপড়ির মাঝে বিদ্যমান রঙের মাত্রা বোঝাতে একটি পাথরের নানা রঙের ছটা দারুণ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছে। তারা প্রধান ইমারতসমূহে কেবল *panchi kura* কৌশলের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখেনি। তারা পুরো মকবরা প্রাঙ্গণে এই কৌশল ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে, পুরো স্থাপত্যে একটি একতা সৃষ্টি করতে। তারা মকবরার কেন্দ্রীয়-রেখায় অবস্থিত মমতাজের সমাধিস্তম্ভ এবং মূল মকবরার জন্য তাদের সেরা কাজটা সংরক্ষিত রেখেছিল, কিন্তু তার পরও মকবরা প্রাঙ্গণের বেলে পাথরের দেয়ালের ওপর প্রাকারবেষ্টিত সমতল ছাদে কামানের গোলা নিক্ষেপের জন্য সৃষ্ট ছিদ্রগুলো শ্বেত মর্মরে তৈরি ফুলের নকশা প্রণিহিত করেছে, যার কেন্দ্রে তারা এক টুকরো কালো মর্মর যোগ করেছে।

মূল মকবরা ভবনের দেয়ালের ভেতরের আর বাইরের অংশের নিম্ন ভাগের পুরোটা জুড়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত খোদাই করা ড্যাডো প্যানেল

বসান রয়েছে। নকশা করা প্যানেলগুলোতে রয়েছে লতাপাতায় শোভিত আইসিস আর টিউলিপের মতো ফুল, যা শ্বেত মর্মরে অধোৎকীর্ণ নকশার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে।* প্রতিটি প্যানেলে কালো মার্বেলের একটি আভ্যন্তর পরিকাঠামো রয়েছে এবং তারপর শৈলীভূত ফুলের নকশার পাথরের চওড়া পরিকাঠামোর বোর্ড প্রণিহিত করা হয়েছে। সূর্যরশ্মি যখন তিরস্করণীর ভেতর দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে, আলোকচ্ছটায় ফুলগুলোকে তখন আরো গভীরভাবে উদগত মনে হয়, একটি ত্রৈমাত্রিক প্রতীতির সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষে উদগত ভাস্কর্য সৃষ্টির কৌশল *manabbat kari* নামে পরিচিত, যেখানে ভাস্কর শ্বেত মর্মরে মেহেদি দিয়ে নকশার ছাপ বসায়। ভাস্কর এরপর ক্রমেই সূক্ষ্ম হতে থাকা এক প্রস্থ বাটালির সাহায্যে নকশার চারপাশ থেকে পরতের পর পরত পাথর পর্যায়ক্রমে অপসারণ করে, ফুল আর লতাপাতাগুলোকে তাদের আপন সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করে তোলে।

অলংকরণের জন্য শেষ যে রীতির আশ্রয় নেয়া হয়, সেটা মূলত মসজিদ আর অতিথিশালায় দৃশ্যমান খোদাই করা চিত্রকর্ম, করম্ব এবং ভাস্কর্যের চেয়ে সহজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে, যার স্থায়িত্বকাল অনেক কম। মসজিদ আর অতিথিশালার দেয়াল আর ছাদে অবশ্য এখনো চিত্রকর্মে ফুটিয়ে তোলা লতাপাতা আর জ্যামিতিক নকশার সৌন্দর্য পরিষ্কার বোঝা যায়। খোদাই করা চিত্রকর্ম তৈরির পদ্ধতি খুবই সহজ এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানের লোকায়ত চিত্রকলায় এখনো এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। চিত্রকর প্রথমে সাদা পলেস্তারার ওপর লাল মাটির একটি আস্তরণ প্রয়োগ করে। তারা দেয়ালে এরপর নানা নকশা আঁকে। তারা সবশেষে নকশার ওপর থেকে খুব সাবধানে লাল মাটি চেঁছে তুলে ফেলে নিচের সাদা পলেস্তারা পুনরায় দৃশ্যমান করে তোলে এবং লাল প্রেক্ষাপটে ফুল আর জ্যামিতিক নকশা আপাতভাবে অভিলম্বিত হয়।

---

* টিউলিপ ফুল মধ্য এশিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। ফার্সি *দুলবন্ধ*, যার মানে 'পাগড়ি' বা পাগড়ি-আকৃতি', শব্দ থেকে 'টিউলিপ' শব্দটার জন্ম হয়েছে। বর্তমান ইরানে এই ফুলটা শহীদত্বের প্রতীক এবং ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় যারা নিহত হয়েছে তাদের সমাধিতে এই ফুলটা অঙ্কিত করা হয়। তাজমহলে ভাস্কর যখন টিউলিপ ফুল খোদাই করছে ঠিক সেই সময় ইউরোপ জুড়ে টিউলিপ ফুলের জন্য সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ততা। ১৬৩৭ সালের গোড়ার দিকে হল্যান্ডে যা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায়, যখন এক ডাচ বণিক, ফুল গাছ রোপণ করার জন্য না বরং বিনিয়োগ হিসেবে, কয়েক ডজন কন্দের জন্য ৬,৬৫০ গিল্ডার (একজন সূত্রধরের বার্ষিক মজুরির বিশ গুণ) প্রদান করে। কয়েক দিন পর কন্দ ফেটে গেলে, সে যে মূল্য প্রদান করেছিল সেটা দশ ভাগের এক ভাগেরও নিচে নেমে আসে।

তাজমহল প্রাঙ্গণ, রত্নপাথর দিয়ে এত চমৎকারভাবে অলংকৃত, খোদাই করা এবং শিল্পীর হাতে নৈপুণ্যের সাথে সেখানে ফুল লতাপাতার ছবি অঙ্কিত হয়েছে যে, প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটের মাঝে একটি সংগতিপূর্ণ সুন্দর উদ্যান ব্যতীত—বেহেশতের উদ্যান—পুরো বিষয়টি যেন সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

একাদশ অধ্যায়

এই বেহেশত-তুল্য উদ্যান

১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে একটি মিডিল ইংলিশ পাঠে ইংরেজি প্যারাডাইজ শব্দটা প্রথমবারের মতো আবির্ভূত হয়, যা ছিল একটি প্রাচীন ফার্সি শব্দ *pairidaeza*-এর সাধারণ প্রতিবর্ণীকরণ, যার মানে প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান। কিন্তু চিরন্তন স্বপ্নাসুখচ্ছন্ন সময়ের সাথে উদ্যানকে আরো অনেক পরে সম্পর্কিত করা হয়েছে এবং ইসলাম আর খ্রিস্টানধর্ম ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং শুষ্ক, আকর্ষণহীন মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় উভয় ধর্মে এটা দেখতে পাওয়া যায়। বাবা আদম আর বিবি হাওয়ার কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়া নন্দন-কাননের সাথে বেহেশতের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। জন মিল্টন, শাহজাহানের জীবদ্দশার শেষ সময় লেখা তার *প্যারাডাইজ লস্ট* মহাকাব্যে বর্ণনা করেছেন কীভাবে নন্দন-কাননে :

একটি স্বচ্ছ-তোয়া জলের ফল্গুধারা উত্থিত হয়েছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারায় প্রবাহিত হয়ে
জল সিঞ্চন করছে; সেখান থেকে সম্মিলিত জলধারা
উদ্যানের মধ্যবর্তী ফাঁকা ঢাল বেয়ে নিচে নেমে আসছে...
এবং এখন সেই জলধারা, চারটি প্রধান স্রোতে বিভক্ত হয়ে,
দিগ্বিদিক ধেয়ে চলেছে...

মরুভূমির অধিবাসীদের কাছে পানি সব সময় জীবনের দ্যোতনা বহন করে। আরব মরুভূমিতে অবস্থিত মরূদ্যান সম্ভবত এই বেহেশত-তুল্য উদ্যানের পূর্ব লক্ষণ এবং আরবদের কাছে মরূদ্যানের সুশ্যামল গাছপালার উজ্জ্বল সবুজ ক্রমেই পবিত্র রঙে পরিণত হয়, যা পরবর্তী সময়ে ইসলাম ধর্মের পবিত্র বর্ণ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। হজরত মুহাম্মদ (সা.) যখন ইসলাম ধর্ম প্রচার

করেন, ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরিফে উল্লেখ করা হয় যে, ইসলামের চিরন্তন বাসস্থান বা বেহেশত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত চত্বরের সমষ্টি, প্রতিটি চত্বরে রয়েছে পূর্ববর্তী চত্বরের থেকে অনেক বেশি জমকালো উদ্যান, যেখানে প্রাণের নদীকে উপস্থাপনকারী চারটি আলাদা পানির নহর দ্বারা অবসেচনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কোরআনে যার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

উভয় (বাগিচা) ঘন শাখা-প্রশাখায় ভরা।
সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
সেখানে উপচে পড়বে দুটো ঝরনা।
সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
সেখানে প্রত্যেক ফল থাকবে দুই রকম।
সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
সেখানে ওরা হেলান দিয়ে বসবে রেশমের আস্তর-দেয়া পুরু ফরাশে। দুই বাগিচার ফল ঝুলবে তাদের নাগালের ভেতর।
সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
তথায় থাকবে আনতনয়না তরুণীরা, যাদেরকে পূর্বে মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি।
সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
(তারা) প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ।
সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কী হতে পারে?
সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
এ দুটো ছাড়া আরো দুটো বাগিচা থাকবে।
সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
ঘন সুবজ দুটো বাগিচা।
সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
সেখানে আছে দুটো উচ্ছলিত ঝরনা।
সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
সেখানে আছে ফলমুল, খেজুর ও ডালিম।
সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

আরবরা যখন পারস্য-দেশে অধিক্রম পরিচালনা করে, তারা তাদের সাথে কোরআন শরিফ সেখানে নিয়ে যায়, তারা সেখানে সহস্র বছরের পুরনো উদ্যানের আরেকটা সমৃদ্ধিশালী ঐতিহ্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। জেনোফোন

লিখে গেছেন খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহান পারসিক শাসক সাইরাস কীভাবে নিজের হাতে একটি উদ্যান রচনা করেছিলেন। সাইরাসের উত্তরসূরিদের একজন, জারজেস, একটি বৃক্ষের সৌন্দর্যে এতটাই বিমুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি এর প্রতিটি শাখা সোনার মন্ত্রপূত কবচ দিয়ে অলংকৃত করেছিলেন। আরব আর পারস্য সংস্কৃতি তাদের নিজ নিজ উদ্যানকর্ষণ নিয়ে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে এমন উদ্যানের বিন্যাস ঘটায়, যা তাদের স্রষ্টারা বেহেশতের ঐশ্বরিক মহিমার পার্থিব প্রতিরূপ হিসেবে আলেখন করেছেন।

আলেখকদের সবাই একটি সাধারণ মৌলিক পরিলেখের সাহায্য নিয়েছেন। বেহেশতের উদ্যানসমূহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রাচীরবেষ্টিত, ভেতরের শান্তিপ্রিয় সম্প্রদায়কে নির্জনতা এবং বাইরের ধূলিমলিন বিশৃঙ্খলা আর ঘূর্ণিত মতানৈক্যের হাত থেকে সুরক্ষা প্রদান করতে। উদ্যানের কেন্দ্রে বিপরীতমুখী পানির নহর পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে এবং প্রাণের চারটা ধারাকে উপস্থাপন করেছে আর একই সাথে সম্ভবত মরুভূমিতে প্রাণের বিকাশের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় অবসেচনকে প্রতীকায়িত করেছে। অনেকে পানির বিপরীতমুখী ধারা যেখানে মিলিত হয়েছে সেই মিলনস্থলকে মানবের সাথে দিব্যের মিলিত হওয়াকে উপস্থাপনকারী হিসেবে বিবেচনা করেছেন, কিন্তু পারসিকরা কোনো প্রকার প্রতীকী দ্যোতনা ব্যতিরেকে উদ্যানের চার অংশে অবসেচনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্যেই পানি ব্যবহার করেছে, যেখানে তারা পুষ্পবীথি আর পল্লবিত বৃক্ষের সমাবেশ ঘটিয়েছে। উদ্যানগুলো সে কারণেই *চাহর বাগ*, 'চার-খণ্ডে প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। (ফার্সি *বাগ* শব্দের অর্থ উদ্যান।)

তৈমূর যখন পারস্যে অধিক্রম করেন, তিনি সেই দেশ এবং সেখানের অধিবাসীদের দ্বারা প্রতিপালিত সাংস্কৃতিক আধার থেকে অনেক কিছুই মধ্য এশিয়ায় নিয়ে এসেছিলেন। তিনি 'বেহেশতি উদ্যান'-এর ধারণা গ্রহণ করার পাশাপাশি সেখান থেকে কারিগরদেরও নিয়ে এসেছিলেন এবং তার সাম্রাজ্যের রাজধানী সমরকন্দের চারপাশে তিনি যে উদ্যান রচনা করেছিলেন সেখানে এই ধারণাটা একত্রীভূত করেছিলেন। তাদের রাজ্যসমূহ পর্বতসঙ্কুল হবার কারণে এবং প্রায়ই পানির উত্তম সংস্থান থাকার কারণে তৈমুর আর তার অভিজাত সম্প্রদায় চত্বরযুক্ত উদ্যানের ভেতর দিয়ে ঝালরের মতো বহমান জলপ্রপাত আর ঝরনা নির্মাণে প্রবাহিত জলধারার ব্যাপক ব্যবহার করেন। সামান্য সংখ্যক চিত্রকলা আর বিদ্যমান বস্তুনিষ্ঠ ভাষ্য থেকে যতটুকু জানতে পারা যায়, তারা মনে হয় তাদের সৃষ্ট উদ্যানে আনার, চেরি, নাশপাতি আর জাম জাতীয় ফলের সাথে চিনার আর সফেদারের মতো অন্যান্য বৃক্ষও রোপণ করেছিলেন। তারা ফুলের বীথিগুলো গোলাপ, আইরিস, নার্সিসাস এবং ভায়োলেটের মতো

ফুল দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, তারা আপাতদৃষ্টিতে স্থানীয় ভূপ্রকৃতি আর আবহাওয়ার কারণে ভূতলের আচ্ছাদন হিসেবে ঘাসের পরিবর্তে ত্রিপত্রবিশিষ্ট গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত এক প্রকার গুল্ম ব্যবহার করেছিলেন। তৈমূর বৃত্তাকারে সমরকন্দকে ঘিরে রাখা তার সুবিস্তৃত উদ্যানগুলোর নানা কাল্পনিক নামকরণ করেছিলেন যেমন 'পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি' এবং 'শান্ত জলাশয়ের তৃণভূমি।' তৈমূর যখন তার যাযাবর অনুসারীদের নিয়ে উদ্যান থেকে উদ্যানে শিবির স্থানান্তর করতেন, যিনি ছিলেন লম্বা শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত এবং দীর্ঘদেহী আর চওড়া একজন নৃপতি, তিনি তার সিংহাসন প্রাণের চারটা নদীকে উপস্থাপনকারী বিপরীতমুখী স্রোতধারা পরস্পর যেখানে মিলিত হয়েছে সেই স্থানের ওপর একটি বেদিতে স্থাপন করে, এভাবেই পৃথিবীর চার প্রান্তের ওপর নিজের আধিপত্যকে বিশেষায়িত করে তুলতেন।

বাবর যখন হিন্দুস্তান বাহুবলে জয় করেন তিনি তার সাথে করে উদ্যানের ঐতিহ্য ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। আগ্রায় তার নিদাঘতপ্ত নতুন রাজধানীতে তিনি প্রথম যে কাজটা করেছিলেন সেটা হলো শীতল বায়ু সৃজনকারী উদ্যান রচনা করা। এসব উদ্যান ছিল মূলত প্রমোদকানন—তার উত্তরসূরিরা তাদের নিজেদের মকবরার জন্য নিজেদের সৃষ্ট উদ্যানকে অধিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের উদ্ভাবন কুশলতার সবচেয়ে বড় স্বাক্ষর রেখেছিলেন। সম্রাট আর তার অভিজাত সম্প্রদায় সবাই *চাহার বাগ* নির্মাণ করতেন যেখানে জীবিত অবস্থায় তারা বাস করতেন এবং সেখানের সৌন্দর্য উপভোগ করতেন আর তারা যখন ইন্তেকাল করতেন, তখন সেখানেই তাদের সমাধিস্থ করা হতো। মোগলরা উদ্যান সৃষ্টির ঐতিহ্যে প্রশস্ত পানির নহর এবং দুটি বিপরীতমুখী জলস্রোতের মিলনস্থলে নির্মিত মকবরার প্রতিবিম্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্থির জলরাশির বিশাল বিস্তারের ব্যাপক ব্যবহারের মতো আরো অনেক উন্নতি সাধন করেছিল। শাহজাহান সাদা মার্বেল দিয়ে মূলত কারুকার্যময় চত্বর নির্মাণ করতেন এবং কখনো কখনো জবাব হিসেবে কালো পাথরে আরেকটা চত্বর নির্মাণ করতেন যেমন কাশ্মীরের শালিমার উদ্যানে ১৬৩০ সালে তার আদেশে নির্মিত কালো পাথরের চত্বর।

মোগলরা তাদের তৈমূরীয় পূর্বপুরুষদের তুলনায় বহমান জলস্রোত আরো বেশি পরিমাণে তাদের সৃষ্ট উদ্যানে ব্যবহার করেছে। তারা শূন্যে পানি নিক্ষেপকারী ঝরনা উদ্যানে একত্রীভূত করেছিলেন এবং সেইসাথে কাল্পনিক আর শীতল কুহা, যা সূর্য রশ্মির আঘাতে উজ্জ্বল বর্ণিল রংধনুতে পরিণত হতো। তারা ঘূর্ণি আর প্রতিবিম্ব সৃষ্টির জন্য উদ্যানে মাছের আঁশের আকৃতিতে মার্বেল খোদাই করে তার ওপর দিয়ে পানির স্রোত প্রবাহিত করত, যা অলংকৃত পানির নহর আর জলজ লতাঙ্কুরের মাঝ দিয়ে বয়ে যেত। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আর বাদুড়ের

দল পানি পান করার উদ্দেশ্যে পানিতে ঝাপ দেয়া শুরু করলে পরিচারকরা পড়ন্ত পানির পেছনে অবস্থিত শুকনো কুলঙ্গিতে রক্ষিত তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিত রাতের মখমলি সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে তুলতে।

মোগলদের কাছে উদ্যান এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তারা হরহামেশাই রাজ্যের রূপক হিসেবে একে ব্যবহার করত। আবুল ফজল লিখেছেন, পৃথিবীকে সবার বাসযোগ্য করে তোলার আকাঙ্ক্ষাই ছিল অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেয়ার পেছনে আকবরের প্রণোদনা : 'মালি যেমন উদ্যানকে গাছ দিয়ে সজ্জিত করে এবং তাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করে এবং অনেক গাছ পরিহার করে আর অন্যদের অবসেচন এবং প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে তাদের সন্তানের মতো দেখাশোনা করে যথাযথ আকার দিতে আর বাজে গাছ উন্মূলিত করে এবং পচা ডালপালা ছেঁটে দেয় এবং যে গাছগুলো আকারে বেশি বড় হয়ে গেছে তাদের সরিয়ে দেয়...এবং নিজের রোপণ করা গাছের ফুল আর ফল সংগ্রহ করে এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে গাছের ছায়া উপভোগ করে এবং অন্য আরো অনেক কিছু করে, যা উদ্যান কর্ষণের বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, ন্যায়পরায়ণ আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজাও প্রবিধান দ্বারা প্রজ্ঞার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন এবং তার অনুগত প্রজাদের নির্দেশ দেন এবং এভাবেই নেতৃত্বের আর্দশ আবির্ভূত হয়।'

তারা তাদের উদ্যানের আলেখনে যে প্রতীকীত্বই আরোপ করুন না কেন এবং রূপক হিসেবে উদ্যানকে যত চাতুর্যের সাথেই তারা কাজে লাগান না কেন, বাবর আর তার উত্তরসূরিরা বর্তমান কালের একজন উদ্যানপালকের ন্যায়ই তাদের নিজেদের সৃষ্ট উদ্যানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করেছেন। তারা উদ্যানের আলেখন এমনভাবে করতেন, যেন পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কেই—চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ (পানির ঝিরঝির শব্দ, ফলের আর পরাগের আকর্ষণে আগত পাখির আর কীটপতঙ্গের আওয়াজ), ত্বক (পল্লবের বিন্যাস, মার্বেলের মসৃণতা এবং পানির শীতলতা) আর জিহ্বা (ফল ভক্ষণের দ্বারা প্রাপ্ত), তারা আকর্ষণ করতে পারেন।

তৈমূরের মতো, মোগলরাও প্রায়ই উন্মুক্ত বাতাসে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করত। একটি অণুচিত্রে আমরা বাবরকে দেখতে পাই রাষ্ট্রদূতদের স্বাগত জানাতে ফলন্ত বৃক্ষ আর ফুলবীথি দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় একটি চাঁদোয়ার নিচে তার নিজের উদ্যানে সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। অন্যান্য অণুচিত্রে সম্রাট আর তার অভিজাতবৃন্দকে তাদের স্বল্পবসনা রক্ষিতাদের সাথে তাদের নিজ নিজ উদ্যানের নির্জন ছায়াঘেরা স্থানে আমোদে লিপ্ত, চারপাশে উজ্জ্বল পূর্ণ বিকশিত ফুলের সমারোহ, পাকা ফলের ভারে অবনত ফলবান বৃক্ষ থেকে

এখনই বুঝি ফল খসে পড়বে আর সমুত্তেজিত পুরুষ লিঙ্গের ন্যায় ঝরনা থেকে পানির ঝাপটা আকাশমুখে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।
শাহজাহানের সবচেয়ে পরিচিত প্রতিকৃতিগুলোর একটি, তাকে আমরা নার্গিস, টিউলিপ, খাতামি, ড্যাফডিল, আইসিস ফুল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখতে পাই। তাজমহলের উদ্যানের আলেখন তার কাছে মূল মকবরার মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং চমকপ্রদ আর সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পূর্ণতা সৃষ্টির জন্য তাদের মধ্যবর্তী সম্মিলন ছিল জরুরি। এক রাজকবি লিখেছেন সম্রাটের অভিপ্রায় ছিল তাজমহল প্রাঙ্গণে একটি চূড়ান্ত উৎকর্ষ সৃষ্টি করা, যা চিরস্থায়ী হবে

যত দিন কানন আর পুষ্প শব্দগুলো প্রচলিত থাকবে
যত দিন মেঘ আর বৃষ্টির মাঝে সম্পর্ক বিরাজিবে

■

শাহজাহান আর তার পরিকল্পনাবিদের দল তাজমহলের উদ্যান প্রাচীরবেষ্টিত ধ্রুপদী *চাহর বাগী* বা চারখণ্ডের সামূহিক বিন্যাস ছন্দে সৃজনের পরিকল্পনা করেছেন। দুটো মর্মরের কৃত্রিম জলপথ—যার একটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত, যা পুরো মকবরা প্রাঙ্গণের কেন্দ্রীয় অক্ষরেখা সৃষ্টি করেছে—সমকোণে পরস্পরের সাথে প্রধান সৌধ আর তোরণদ্বার থেকে সমদূরত্বে বর্গাকৃতি বাগিচার কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয়েছে এবং পুরো বাগিচাকে চারটি বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করেছে। অধিকাংশ মোগল বাগিচার ন্যায় এখানেও জলের কৃত্রিম নহর উঁচু করা হয়েছে চারপাশের বৃক্ষরাজিতে অবসেচনের জন্য, যাতে সেগুলোকে ব্যবহার করা যায়। স্থপতিরা, দ্বিপার্শ্বিক প্রতিসাম্য পুনর্ব্যক্ত করতে, পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত মর্মরের নহরের দুই প্রান্তে সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরে লাল বেলে পাথরের অনন্য রূপ চত্বর নির্মিত করেছেন। তারা দুটো চত্বরের উপরিভাগে, বলা হয় যে এখানে বসে বাদ্যযন্ত্রীর দল বাজনা পরিবেশন করত, অষ্টভুজাকৃতি *ছত্রী* নির্মাণ করেছেন। তারা বিপরীতমুখী নহরের মিলনস্থলের কেন্দ্রবিন্দুতে বর্গক্ষেত্র-আকারের একটি কৃত্রিম মর্মরের জলাধার স্থাপন করেছেন। জলাধার তার আকার, আয়তন আর সংস্থাপন-চাতুর্যের কারণে তাজমহলকে প্রতিফলিত করার অধিকার লাভ করেছে। নামাজের পূর্বে মসজিদে মুসল্লিরা নিজেদের পবিত্র করতে যে জলাধার থেকে পানি নিয়ে অজু করে সেই জলাধারই আপাতদৃষ্টিতে, মোগল বাগিচার বৈশিষ্ট্য এসব জলাধারের আদি উৎস।*

* স্থাপত্যবিদ্যার কিছু ঐতিহাসিক দাবি করেন, মসজিদের অজুর জলাধারের অবস্থান জরথুস্টীয় মন্দিরের আগুনের আগ্নেয় গহ্বরের অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত, পারস্যের

চৌষট্টি ফিট বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গাকৃতি মর্মরের বেদিতে জলাধারটা অবস্থিত, যা পদ্মফুলের নকশা দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে জলাধারে অবস্থিত পাঁচটি ফোয়ারা আকাশের দিকে সজোরে পানির ধারা বর্ষণ করে। জলাধারের প্রান্তদেশের চারদিকে আরো চব্বিশটি ফোয়ারা রয়েছে এবং জলাধারের উভয় পার্শ্বে মূল মকবরা আর তোরণদ্বারের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত প্রশস্ত কেন্দ্রীয় নহরের তলদেশে আরো চব্বিশটি করে ফোয়ারা রয়েছে। উদ্যানরক্ষকরা পদ্মফুল, যা উর্বরতার প্রতীক, আর সোনালি মাছ দিয়ে জলাধার পূর্ণ করে রেখেছে। (আজকাল, গাইডদের অনেকেই আমতা আমতা করে দাবি করে যে, জলাধারের কিছু মাছ আসলেই শাহজাহানের সময়কালের মাছেদের বংশধর।)

স্থপতিরা পরবর্তী সময়ে বাগিচার প্রতিটি খণ্ডকে জলের নহর দ্বারা পুনরায় চারটি সমান খণ্ডে বিভক্ত করে, সর্বমোট ষোলোটি বর্গক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। তাজের বাগিচায় মোগলরা ঠিক কি গাছ রোপণ করেছিল সেটা আজ আর স্পষ্ট করে জানার কোনো উপায় নেই। বর্তমান পাদপসজ্জাটি মাত্র এক শতাব্দী পূর্বে ব্রিটিশদের সংস্কার পরিকল্পনা দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোগলরা যদিও ভারতবর্ষে সাইপ্রেস গাছ আমদানি করেছিল, যা মূলত এশিয়া মাইনর আর পারস্য থেকে এসেছে—পরকালের স্মারক হিসেবে, মৃত ব্যক্তির নিয়তিতে যে পরকাল রয়েছে সেটাও এরই অন্তর্ভুক্ত, স্থাপত্যের সাথে এক সুরে বাঁধা সাইপ্রেস গাছের সারি, এখন যা তোরণদ্বার থেকে মকবরা অভিমুখে প্রসারিত সেগুলোর সপ্তদশ শতকের হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। সাইপ্রেস গাছগুলো অবশ্য দরবারের ঐতিহাসিক সালিহ্ 'যে বৃক্ষ আর দুর্লভ সুগন্ধি লতাগুল্ম' রোপণের কথা উল্লেখ করেছেন তখনো সম্ভবত ছিল। মোগলরা প্রায়ই তাদের বাগিচায় যা করত, সম্ভবত সেটাই করেছে, সাইপ্রেস গাছগুলোর স্থানে তারা ফলবান বৃক্ষ রোপণ করেছে। শেষোক্ত প্রজাতির বৃক্ষগুলো সুনিবিড় ছায়া দেয়ার পাশাপাশি প্রতিবছর বসন্তকালে নতুন করে পার্থিব জীবনের নবজীবন লাভের বিষয়টিকে প্রতীকায়িত করে, বিপরীতক্রমে সাইপ্রেসগুলোর সম্পৃক্ততা যেখানে অনেক বেশি সংযমী। বাগিচা বিষয়ক ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ মনে করেন যে, তাজমহলের বাগিচাগুলো এখনকার অবস্থানের চেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক নিচু ছিল, এতটাই নিচু যে জলের উঁচু নহর বরাবর যারা হেঁটে যেত তাদের কাছে নহরের প্রাচীর বাগিচার চেয়ে অনেক উঁচু মনে হতো যার ফলে তারা সহজেই সেখান থেকে রসালো ফল ছিঁড়ে নিতে পারে।

প্রথমদিকের অনেক মসজিদই আসলে এই মন্দিরগুলোকে পরিবর্তিত করে তৈরি করা হয়েছিল।

ফরাসি চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের যখন তাজমহল ভ্রমণ করেন তিনি তাজের বাগিচাগুলোকে 'ফুলে ফুলে উদ্বেল' অবস্থায় আবিষ্কার করেন। তিনি কোনো অজানা কারণে ফুলগুলোর নাম কোথাও উল্লেখ করেননি, কিন্তু ফুলের ভেতরে সম্ভবত গোলাপ ছিল (মমতাজের দাদিজান কর্তৃক আবিস্কৃত গোলাপের আতর তৈরিতে ভীষণ প্রয়োজনীয়), সেইসাথে নার্গিস ও মকবরার অভ্যন্তরের দেয়ালে উৎকীর্ণ বসন্তের অন্যান্য নানা ফুল এবং সেইসাথে নার্গিস এবং জাহাঙ্গীর তার প্রিয় পুষ্পবীথির নাম বলতে গিয়ে যুঁইকে তার প্রিয় ফুল হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন—সুগন্ধির আরেকটা উৎস এবং প্যাগোডা গাছের ফুলসমূহ। ফলন্ত বৃক্ষসমূহের ভেতরে নিশ্চিতভাবেই আম আর কমলালেবু ছিল। মোগলরা আবার আপেল আর নাশপাতিও ভীষণ পছন্দ করত। কাশ্মীরের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় যদিও অনেক সহজ ছিল এসব উৎপন্ন করা কিন্তু আগ্রায় এসব ফল উৎপন্ন হতো, যদি কেবল বছরের নয় মাসব্যাপী শুষ্ক মৌসুমে যত্নের সাথে অবসেচন করা যেত।*

কোনো নির্মাণস্থল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা যার হয়েছে তারা সবাই জানে তাজমহলের বাগিচার জন্য আক্ষরিক অর্থে গাছ রোপণ করতে পুরো প্রাঙ্গণের অবশিষ্টাংশের নির্মাণ সমাপ্ত হওয়া এবং সেইসাথে নির্মাণে ব্যবহৃত ভারা এবং অন্যান্য কল-কজা আর ইট-পাথরের সমস্ত ভাঙা টুকরো অপসারণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। স্থপতিরা অবশ্য বাগিচার জন্য বিস্তারিত আকল্প পুরো প্রাঙ্গণের পরিলেখ তৈরির সময়েই সমাপ্ত করেছিলেন, কেবল এ জন্য নয় যে বাগিচাটা পুরো মকবরা প্রাঙ্গণের সার্বিক ধারণার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ কিন্তু একই সাথে বাগিচার নানা অনুষঙ্গ যেমন মঞ্চ আর পায়ে হাঁটার পথ এবং বিশেষ করে যমুনা নদী থেকে বলিবর্দ নিয়োজিত 'পার্শিয়ান হুইল' বা 'পানি-চাক্কি'র সাহায্যে পানি তুলে সেই পানি পুরো বাগিচার বিভিন্ন প্রান্তে আর কেন্দ্রীয় জলাধারে এবং ফোয়ারার আকারে ছড়িয়ে দিতে প্রয়োজনীয় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের জন্য নির্মাতাদের প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ দিতে।

নির্মাণস্থানের পশ্চিম প্রান্তে পানি সরবরাহের জন্য নির্মিত এসব স্থাপনার মাত্রা আর জটিলতা এতই ব্যাপক যে, সম্প্রতি ভূগর্ভ থেকে পোড়ামাটির জলবাহী একটি পাইপ খুঁড়ে বের করে সেটাকে মূলের আদলে পুনর্নির্মাণ করা হলে, আরো একবার স্পষ্ট হয় যে, তাজ শৈল্পিক অর্জনের পাশাপাশি কারিগরি সাফল্যের একটি বিশাল উদাহরণ। তাজের পশ্চিমে, যেখানে মাটি ঢালু হয়ে যমুনার দিকে নেমে গেছে, নির্মাতারা নদীর জলস্রোত একটি সংগ্রাহক

---

* মোগলরা তাদের মাত্রাহীন অপব্যয় আর প্রাচুর্য সত্ত্বেও তারা যখন রাজকীয় বাগিচায় উৎপন্ন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফুল আর ফলসমূহ, যার ভেতরে তাজমহলের বাগিচাও রয়েছে, বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় তখন তারা খানিকটা হলেও অর্থনৈতিক বিচক্ষণতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিল।

জলাধারের দিকে ঘুরিয়ে দেন, যেখানে পানিতে বিদ্যমান পলি আর অন্যান্য আবর্জনা জলাধারের তলদেশে জমা হবে এবং তারপর এই পানি তাজের পশ্চিমের দেয়ালের সমান্তরালে অবস্থিত একটি কৃত্রিম জলবাহী খাতে প্রবাহিত করেন এবং সেটা জলাধার থেকে ২৫০ ফিট দূরে অবস্থিত। এই জলবাহী খাতের পশ্চিম প্রান্তের পার্শ্বদেশে নির্মাতারা ইটের একটি লম্বা ধনুকাকারে বাঁকানো পানি সরবরাহের কৃত্রিম নালা নির্মাণ করেন। তারা এই নালার উপরিভাগ এতটাই চওড়া করেন যে, সেখানে কেবল আরেকটা জলবাহী নালা ছাড়াও পানি সেখান পর্যন্ত তোলার জন্য তেরোটা *পুরের* একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাও সেখানে স্থাপন করা যায়।

প্রতিটি *পুর* পানিবাহী নালার প্রান্তে স্থাপিত এক জোড়া রোলার নিয়ে গঠিত হয়েছে, যেখান থেকে নিচের পানির নালা দেখা যায়। রোলারের চারপাশে পেঁচানো একটি দড়ির সাথে একটি চামড়ার মশক সংযুক্ত রয়েছে এবং একজন তত্ত্বাবধায়ক এক জোড়া ষাঁড়কে রোলার থেকে দূরে একটি মৃদু ঢাল বরাবর হাঁটিয়ে নিয়ে নদী থেকে পানি তুলে আনে। (মশকগুলো ষাঁড়ের চামড়ার চার প্রান্ত একসাথে শক্ত করে বেঁধে তৈরি করা হয়—ষাঁড়ের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা অবশ্য সহজেই অনুমেয়।) ভারতবর্ষে জাত *পারের* এই পদ্ধতিটা মোগলরা ব্যবহার করা অব্যাহত রাখে, যদিও বাবর পদ্ধতিটার তীব্র নিন্দা করে একে অভিহিত করে বলেছেন এটা 'পরিশ্রমসাধ্য আর নোংরা...এখানে একজন লোককে ব্যস্ত থাকতে হয় ষাঁড়গুলো পরিচালনা করতে আর অন্যজন মশকগুলো খালি করে। ষাঁড়গুলোকে প্রতিবার মশক তোলার জন্য হাঁটতে বাধ্য করা হয় এবং তারপর তাকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়, দড়িটাকে ষাঁড়ের চলাচলের পথের ভেতরে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া আর নিয়ে আসায়, সেটা ষাঁড়ের মূত্র আর গোবর লেগে নোংরা হয়ে থাকায়।' তত্ত্বাবধায়ক সম্ভবত ছাদটা নিয়মিতভাবে পানি দিয়ে পরিষ্কার করত।

পানি সরবরাহের জন্য নির্মিত বাঁকানো পথে *পার* দিয়ে একবার পানি তোলা সম্ভব হলে, পানিকে তখন আরেকটা নহর দিয়ে সংরক্ষণ জলাধারে প্রেরণ করা হয় এবং তারপর সামনে আরেকটা জলাধারে। এই শেষোক্ত জলাধারের দক্ষিণের শেষ প্রান্তে নির্মাতারা পানি সরবরাহের জন্য শেষ আরেকটা কৃত্রিম প্রণালী নির্মাণ করেন এটা অন্য প্রণালীর সাথে সমকোণে প্রায় ত্রিশ ফিট উঁচুতে এবং তাজের পশ্চিম প্রান্তের প্রাচীরের সাথে অবস্থান করে। *পারের* আরেকটা ব্যবস্থা যখন পানিকে এই উচ্চতায় তুলে নিয়ে আসে, একটি কৃত্রিম প্রণালী পানিকে তিনটা পরস্পর সংযুক্ত জলাধারে বয়ে নিয়ে আসে যেগুলোকে কৃত্রিম প্রণালীর শেষ প্রান্তে পশ্চিম প্রান্তের চাতালের পাশে তাজ প্রাঙ্গণের দেয়ালের কাছে তাজের পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত পানিবাহী মূল প্রণালীর কাছেই নির্মাণ করা

হয়। তাজের দেয়াল থেকে সব থেকে দূরে অবস্থিত জলাধার—প্রথম জলাধারটা সাড়ে চার ফিট গভীর, পরের জলাধারটা ছয় ফিট গভীর এবং তাজের দেয়ালের সবচেয়ে কাছে অবস্থিত জলাধারটা নয় ফিট গভীর। তাজের পুরো বাগিচায় পানি সরবরাহ করতে ক্রমেই গভীর হতে থাকা জলাধারে নির্দিষ্ট উচ্চতায় রক্ষিত পানিতে আয়তনভিত্তিক চাপ সৃষ্টি করে। পানিবাহী নালি প্রাঙ্গণের তলদেশে পাইপের সাহায্যে পানি পৌঁছে দেয়, নির্মাতারা যেখানে একটি বাঁধানো পায়ে হাঁটা পথের নিচে চাপা পড়া প্রধান পাইপটার স্মৃতি ভুলে যেতে চান।

ফোয়ারাগুলোর, বিচ্ছিন্নভাবে না, প্রতিসমভাবে সক্রিয় হওয়া নিশ্চিত করতে, সেগুলো এলোপাথাড়িভাবে প্রতিসমভাবে সক্রিয় হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে, ফোয়ারাটা শেষ জলাধার থেকে যত দূরেই থাকুক এবং পানির প্রবাহ যতই সমঞ্জস্যহীন হোক, প্রকৌশলবিদরা প্রতিটি ফোয়ারার নিচে তামার পাত্র স্থাপন করে একটি উদ্ভাবনচতুর ব্যবস্থা সৃষ্টি করেন। তারা পানির প্রবাহের সাথে এই পাত্রগুলোকে সংযুক্ত করে, পানির প্রবাহ সরাসরি ফোয়ারার দিকে না পাঠিয়ে, যাতে করে পানি প্রথমে এসে তামার পাত্রে জমা হতে পারে এবং যখন সবগুলো তামার পাত্র পানিপূর্ণ হয় তখনই কেবল ফোয়ারার মুখ দিয়ে সম্মিলিতভাবে জলের ধারা শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

■

১৬৪৩ সাল নাগাদ মূল মকবরার নির্মাণ সমাপ্ত হয়, তাজের বাগিচা তখনো পরিপক্ব হয়নি কিন্তু ইতিমধ্যেই সেখানে ফলবান বৃক্ষ এবং উজ্জ্বল বর্ণের সুগন্ধি ফুলের দারুণ একটি সমাবেশ ঘটেছে। শাহজাহানের ইতিবৃত্তকার সালিহ্র ভাষায় সেগুলো ছিল দেখতে অনেকটা 'পৃথিবীর সব নন্দনকাননের কপালে একটি কালো তিল এবং এখানের প্রতিটি পুষ্পবীথির প্রাচুর্য প্রীতিকর এবং বেহেশতের তত্ত্বাবধায়কের উদ্যানের পুষ্পবীথির মতোই হৃদয়কে তারা বিমোহিত করে। প্রাণদায়ী পানির প্রবাহ এখানের আকর্ষণীয় সবুজ বৃক্ষরাজিকে সারা বছরই সিক্ত রাখে এবং প্রতিটি বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য...দিব্য জল-পদ্মের বৈশিষ্ট্যকে অপ্রতিম করে তুলেছে...আলোকসিঞ্চন ফোয়ারা থেকে মুক্তার মতো দ্যুতিময় জলের ধারা নিঃসৃত হয়...সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই বেহেশততুল্য বাগিচার চমৎকার বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন লাল বেলে পাথর দিয়ে পায়ে হাঁটার পথের পুরোটা তৈরি করা হয়েছে, এখানের পানির নহর নক্ষত্রপুঞ্জের-ইঙ্গিতবহ এবং এখানের অপূর্ববিদিত আলেখনের আধার, যাকে উজ্জ্বলতার দুনিয়ার বিশুদ্ধতা স্ফটিক কণা থেকে বাস্তবে মূর্ত করা হয়েছে, যা এমন একটি মাত্রা লাভ করেছে, যেখানে কল্পনাও পরাভব মানে এবং এর সৌন্দর্যের ক্ষুদ্রতম কণাও বাক্যের প্রাচুর্য দ্বারা পুরোপুরি প্রকাশ করা অসম্ভব।'

দ্বাদশ অধ্যায়
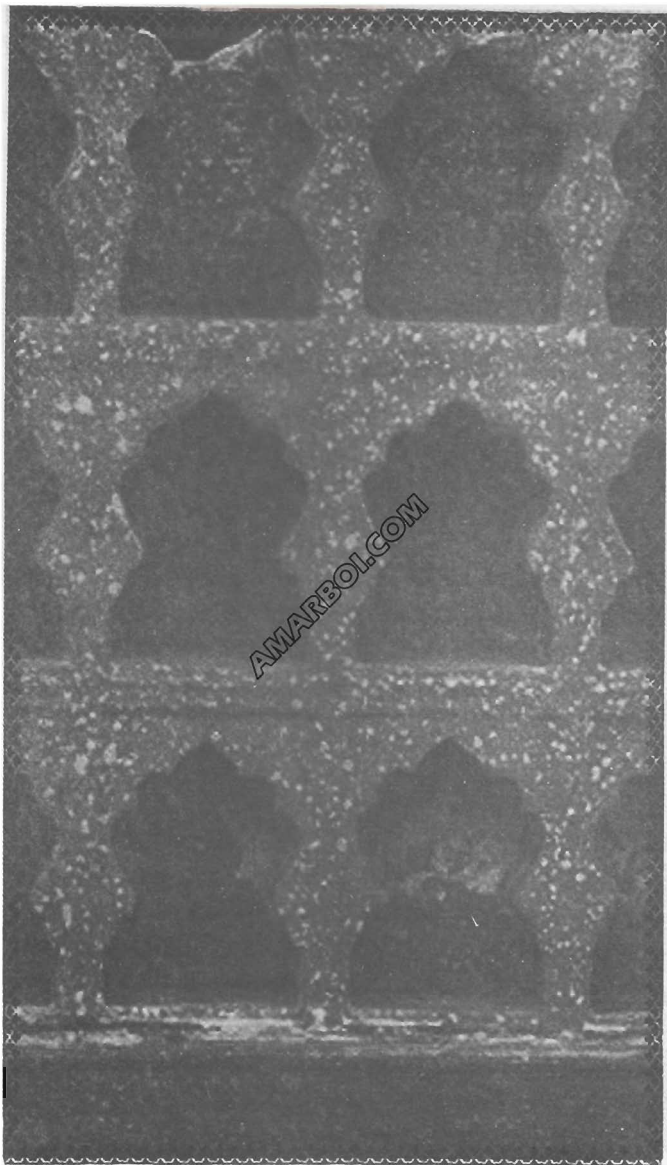
আধ্যাত্মিকতায় উজ্জ্বলিত সমাধি

১৬৪৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারির রাতে, শাহজাহান তার মৃত স্ত্রীর জন্য নিজের সৃষ্টি করা আলোকোজ্জ্বল সমাধিতে শোক প্রকাশ করেন। তাজমহলের নির্মাণ প্রায় শেষ, যদিও ১৬৪৮ সাল পর্যন্ত অলংকরণের কাজ চলে এবং ১৬৫৩ সাল নাগাদ মকবরা প্রাঙ্গণের অন্যান্য সম্পূরক অংশের নির্মাণকাজ শেষ হবে। দ্বাদশ উরস বা 'মৃত্যুবার্ষিকী' উপলক্ষে—তাজে এবারই প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক ভোজের আয়োজন করা হয়েছে।*

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আকাশের প্রেক্ষাপটে ভেসে থাকা গম্বুজযুক্ত মকবরার ঋজু মাত্রা পুষ্পবীথির সুগন্ধে মাতোয়ারা বাগিচার ভেতর দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসা অভ্যাগতদের ভেতরে নিশ্চয়ই একটি সম্ভ্রম জাগানো অনুভূতির জন্ম হয়েছিল। শাহজাহানের দরবারের এক স্তবকবি যেমন লিখেছেন :

পৃথিবীর-ভারবহনকারী বৃষের পৃষ্ঠদেশ থেকে উদর পর্যন্ত আন্দোলিত হয়,
এমন গুরুভার বহন করতে গিয়ে পদচিহ্নে পর্যবসিত হয়েছে।

মকবরাটার বিশাল আকৃতি সত্ত্বেও কিন্তু পুরো কাঠামোটাকে গাগনিক মনে হয়, হয়তো খানিকটা ভুতুড়ে, তাই তো কবির কাছে মনে হয়েছে, 'চোখের দৃষ্টি তাজকে মেঘ ভেবে ভুল করতে পারে।' তিনি একই সাথে কবিতার পঙ্‌ক্তিতে তাজের থিরবিজলির মতো দীপ্তি মূর্ত করে তুলেছেন :

তাজের শুভ্র প্রস্তর হতে ভেসে ওঠে আলোক রশ্মির বিচ্ছুরণ,
স্ফটিক ভৃঙ্গারে যেন মদিরার ছল।

---

* মমতাজের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে উরস অবশ্যই মুসলিম চান্দ্রবৎসর অনুসারে উদযাপিত হয়েছিল এবং পশ্চিমের সৌরবৎসর অনুসারে নয়।

এর মর্মরে নক্ষত্রপুঞ্জের ছায়া আপতিত হতে,
পুরো স্বপ্ন-সৌধ প্রদীপের আলোকিত উৎসবে হয় মাতোয়ারা

মকবরার দক্ষিণ পার্শ্বের অতিকায় প্রতিহারের নিচে দিয়ে শোকার্ত অভ্যাগতের দল অতিক্রম করে, যেখানে আমানত খানের সাবলীল চিত্রলিপি এর পরিকাঠামো জড়িয়ে রেখেছে এবং একটি জালিকরা দরজার ভেতর দিয়ে তারা অষ্টভুজাকৃতি কেন্দ্রীয় সমাধিকক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আজ মর্মরের মেঝে সূক্ষ্ম নকশা করা উজ্জ্বল বর্ণের পুরু গালিচা দিয়ে মোড়া এবং দেয়ালে ঝুলন্ত মূল্যবান মখমল আর রেশমের পর্দা সোনার কালাই করা অলংকৃত বাতির ঝাড়ের কোমল মৃদু আলোয় জ্বলজ্বল করছে—*উরস* অনুষ্ঠানের সময় সমাধিগুলোয় বিদেহী আত্মার 'ভাস্বর গুণাবলি আর নৈতিকতা' প্রতীক রূপে বিশেষভাবে আলোকসজ্জিত করা হয়। 'বেহেশতের বাগিচায় অবস্থানরত মমতাজের আত্মার শান্তির জন্য' মুসলিম ধর্মবেত্তা বা মোল্লাদের সুর করে উচ্চারিত হতে থাকা মোনাজাতের শব্দ ওপরে উঠে গিয়ে, ওপরের গম্বুজের নিচের বিশাল শূন্যস্থানে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে।
সমাধি কক্ষের সন্দৌখ ঘিরে একটি ছয় ফুটের বেশি উঁচু অষ্টভুজাকৃতি শ্বেতপাথরের জালিকাজ-করা প্রাচীর, দরবারের দিনপঞ্জির রচয়িতা লাহোরির ভাষ্য অনুসারে, 'ত্রুটিহীন আর ভীষণভাবে উজ্জ্বলিত করে তোলা...তুর্কি রীতির অনুসরণে প্রাচীরের দুই প্রান্তে ইয়াশব নির্মিত দুটি প্রবেশদ্বার, গিল্টি করা কব্জা দ্বারা সংযোজিত হয়েছে।' *জালি* বা তিরস্করণীটা, শাহজাহান খাঁটি সোনার তৈরি রত্নখচিত যে বেড়া নির্মাণের নির্দেশ শুরুতে দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে চোর আর দস্যুদের অপকর্মের ভয়ে সেটা সরিয়ে ফেলার আদেশ দেন, সেই স্থানেই প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তিরস্করণীটা ভেতরের সাদা মর্মরের ছিমছাম স্মৃতিস্তম্ভ বা সন্দৌখ ঘিরে রেখেছে, যা পূর্ববর্তী সোনার ঝালরের কারুকাজের সাথে দৃশ্যমানতা ফুটিয়ে তুলতে একটি মাত্র মর্মরের খণ্ড খোদাই করে নির্মাণ করা হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভের পুরোটায় মার্বেলের ওপর উজ্জ্বল রত্নখচিত ফুলের নকশা, যার পরিচিত ফুল-লতা-পাতার সংযত খোদাইয়ের নৈপুণ্য দেখে মনে হবে মার্বেলের ওপরেই তারা আক্ষরিক অর্থে জন্ম নিয়েছে, যাদের ভেতরে রয়েছে প্রাণশক্তি আর নবজীবনের ইঙ্গিত, যা ঠিক গম্বুজের একেবারে নিচে স্থাপিত। স্মৃতিস্তম্ভের উপরিভাগ আর পার্শ্বদেশে পরিকাঠামোর আঙ্গিকে কোরআন শরিফের আয়াত ছন্দোময় ভঙ্গিতে মার্জিতভাবে খোদাই করা হয়েছে আর দক্ষিণ পার্শ্বে কালো মার্বেলে উৎকীর্ণ রয়েছে একটি সমাধিলিপি যেখানে দর্শনার্থীদের উদ্দেশে বলা রয়েছে : 'আধ্যাত্মিকতায় উজ্জ্বল এই সমাধিগর্ভে শায়িত আছেন আরজুমান্দ বানু বেগম, যিনি মমতাজ মহল নামেই সুপরিচিত, ১০৪০ হিজরিতে যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।'

সেই রাতে শোকার্ত ব্যক্তিবর্গ সম্ভবত আরো দেখেছিল সেই অসম্ভব সুন্দর 'মুক্তার চাঁদর' যা শাহজাহানের এক ইতিহাসবিদের ভাষ্য অনুসারে, 'মমতাজ মহলের সমাধির জন্য তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং চাঁদরটা মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে আর প্রতি শুক্রবার রাতে সমাধির ওপরে বিছিয়ে দেয়া হতো।' সরাসরি নিচে অবস্থিত, সমাধিগর্ভের মার্বেলের বেদিতে, দ্বিতীয় আরেকটা সাদা মার্বেলের শবাধারে মমতাজের নশ্বর দেহ চিরনিদ্রায় শায়িত ছিল। এটাও একই রকম করে অলংকৃত করা হয়েছে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে একই সমাধিলিপি রয়েছে, সেইসাথে এখানে আল্লাহতায়ালার নিরানব্বইটি নামও উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

শাহজাহান, সেই রাতের প্রধান শোকার্তব্যক্তি, আগ্রা দুর্গ থেকে নৌকায় করে সম্ভবত তাজে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি যেভাবেই সেখানে পৌছান, তাজে স্থাপিত মকবরায় প্রথমবারের মতো মমতাজের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন নিশ্চিতভাবেই অনেক কারণে বিশেষভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ। মধুর সব স্মৃতি জাগরূক হবার পাশাপাশি সেই রাতটা ছিল তার আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের—মমতাজের শেষ বিশ্রামের স্থান হিসেবে একটি নিখুঁত, জান্নাততুল্য মকবরা সৃষ্টি, ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।

এই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। আজ আমাদের কাছে হিসাবপত্রের এমন কোনো নথি নেই যার যথার্থতা সন্দেহাতীত। শাহজাহানের দিনপঞ্জির রচয়িতা ঐতিহাসিক লাহোরি তাজের নির্মাণ ব্যয় বলেছেন 'পঞ্চাশ লক্ষ' তঙ্কা—৫,০০০,০০০ শাহ্ জাহানি তঙ্কা। অবশ্য এই হিসাবের ভেতরে জমির মূল্য, জল সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদিসহ মূল তাজমহল, মসজিদ আর জবাব নির্মাণে শ্রমিকের প্রত্যক্ষ মজুরি বাবদই এই পুরো অর্থ ব্যয় হয়েছে এমনটা ধরে নেয়া হয়। পরবর্তীকালের বিতর্কিত নথিপত্র থেকে কিছু কিছু ঐতিহাসিক অনুমান করেন অর্থের পরিমাণ ৪০,০০০,০০০ শাহ্ জাহানি তঙ্কার মতো হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আগ্রা প্রদেশের কোষাগার আর রাজকীয় কোষাগার থেকে সম্মিলিতভাবে নির্মাণ ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছিল। শাহজাহান একই সাথে ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি চুক্তিপত্রও তৈরি করেন, যার ভেতরে ত্রিশটি মৌজাও চিহ্নিত করে দেন যেখান থেকে আদায় করা খাজনা, ভবিষ্যৎ বছরগুলোতে তার প্রিয়তমার স্মৃতি তাজমহল যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ আর প্রহরার কাজে ব্যয় করা হবে। তিনি আন্ত রিকভাবেই চেয়েছিলেন তার এই সৃষ্টি যেন অনন্তকাল বিরাজ করে। এক সভাকবি সুন্দরভাবে যা ব্যক্ত করেছেন :

অনন্তের ইঙ্গিতে যখন ভিত্তি স্থাপিত হয়,
অনিত্যত সেদিন মরুভূমির বালুকণায় মুখ লুকিয়েছিল

■

মমতাজের মৃত্যুর পরে সুদীর্ঘ বারো বছর শাহজাহানের কাছে সবচেয়ে প্রবোধ ছিলেন জাহানারা, মমতাজের চৌদ্দ সন্তানের ভেতরে জীবিত বয়োজ্যেষ্ঠ সন্তান। জাহানারা, মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান মহিষীর ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি, ছোট ভাইবোনদের যত্ন নিত যাদের নিরাপত্তা আর সুরক্ষার জন্য মৃত্যুশয্যায় মমতাজ তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল। সাহিত্য আর ধর্মতত্ত্ব থেকে শুরু করে স্থাপত্য আর সংগীতকলায় আগ্রহী জাহানারা ছিল ভীষণ বিদূষী একজন মহিলা। তিনি কোরআন শরিফে বিশেষভাবে পারদর্শী হবার সাথে সাথে আরবি আর ফার্সি ভাষায় তার ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি ক্রমে একজন গুণী সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। জাহানারার সাথে তার রূপসী জন্মদাত্রী মায়ের চেহারার বাহ্যিকভাবে কোনো মিল আরোপিত করা না হলেও, আনুমানিক ১৬৩৫ সালে তার ভাই দারা শুকোহ্র জন্য অঙ্কিত চিত্রকলার একটি সংকলনে জাহানারার একটি প্রতিকৃতি আমরা দেখতে পাই। একজন মার্জিত দর্শন তরুণী গোলাপি ফুলে শোভিত একটি গাছের ডালে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার আরেক হাতে রয়েছে ফুল-পাতায় শোভিত একটি ডাল। তার পায়ের কাছে ফুটে রয়েছে নার্গিস আর লিলি।

জাহানারার প্রিয় ভাই ছিল দারা শুকোহ্, বয়সে তার চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট। জাহানারা ভাইয়ের মতোই সুফিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তারা দুজনই সুফিসাধক মোল্লা শাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। জাহানারা লিখেছেন, 'তৈমূরের সব উত্তরপুরুষের ভেতরে আমরা দুই ভাইবোনই সৌভাগ্যবান, যারা এই দজ্জা লাভ করেছে। আল্লাহতায়ালার এবং সত্যের সন্ধানে আমাদের কোনো পূর্বপুরুষ ইতিপূর্বে সাধনা করেননি। আমার আনন্দের কোনো সীমা পরিসীমা নেই, মোল্লা শাহের প্রতি শ্রদ্ধা আমার বেড়েই চলেছে এবং আমি তাকে আমার পথপ্রদর্শক আর আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে মেনে নিয়েছি...।' জাহানারা পরম অনুরাগে তাদের এক আত্মীয় সম্পর্কিত বোনের সাথে দারা শুকোহ্র সম্বন্ধ করেন, যা মূলত ছিল তাদের আম্মিজান মমতাজের অভিপ্রায় এবং তার মৃত্যুর কারণেই যা এত দিন স্থগিত রাখা হয়েছিল—আর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। ইংরেজ পর্যটক পিটার মানডি বিস্ময়কর কিছু আতশবাজির প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করেছিলেন : 'বিশালাকৃতি সব হাতি, যাদের পেটে আতশবাজি আর ছুঁচোবাজি ভর্তি, বিশাল দানব যাদের হাতে রয়েছে চক্র, তারপর একসারি কীম্ভূতজীব, এরপর প্রাসাদশৃঙ্গ, কৃত্রিম গাছ আর অন্যান্য উদ্ভাবনকুশল প্রতিকৃতি যার সবই হাউই পূর্ণ...' মমতাজের মৃত্যুর পরে

জাহানারার একটা কথিত চিত্রকর্ম।

এই প্রথমবারের মতো শাহজাহান দরবারে নৃত্যগীতের আয়োজন করার অনুমতি দিলেন।

জাহানারার প্রতি শাহজাহানের স্নেহ 'তার অন্য সন্তানদের প্রতি তিনি যেমন অনুভব করতেন তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল।' ১৬৪৪ সালে, মমতাজের দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকীর *উরসের* পরের বছর, তার ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুযায়ী একত্রিশ বছর বয়সী রাজকন্যা প্রায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এপ্রিলের চার তারিখ রাতের বেলা, জাহানারা 'যখন ঘুমাবার জন্য তার মহলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন অন্দরমুখী পথের মধ্যে মেঝের ওপর রাখা একটি প্রদীপের জ্বলন্ত শিখা তার বুকের কাচুলির প্রান্তদেশ স্পর্শ করে। প্রাসাদের রমণীদের পরিহিত পোশাকসমূহ যেহেতু সবচেয়ে সূক্ষ্ম কাপড় দিয়ে প্রস্তুত করা হতো আর নানা সুগন্ধি তেলের সাহায্যে সেগুলোকে সুরভিত করে তোলা হতো, তার কাপড়ে সাথে সাথে আগুন ধরে যায় এবং নিমেষের ভেতরে আগুনের লেলিহান শিখা তাকে গ্রাস করে নেয়। তার ব্যক্তিগত পরিচারিকাদের চারজন তখন তার সাথেই ছিল, যারা সাথে সাথে আগুন নেভাতে চেষ্টা করে কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার সাথে সাথে তাদের পরনের কাপড়েও আগুন ধরে যায়। পুরো ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে যায় যে কেউ কিছু বুঝে ওঠা আর পানি আনার আগেই গুণের আধার এই রমণীর পিঠ, দুই হাত আর দেহের দুই পাশ আগুনে ভীষণভাবে পুড়ে যায়।'

আগুন সব সময় ভীতিকর। রাজপরিবারের রমণীদের পরিহিত পোশাকের কাপড় বাস্তবিকই ভীষণ হালকা এবং বাড়াবাড়ি ধরনের স্বচ্ছ আর ভীষণ দাহ্য। জ্যাঁ-ব্যাপতিস্ট তাভার্নিয়ের দারুণ মূল্যবান বিশেষ একপ্রকার মসলিনের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এই কাপড় রপ্তানির অনুমতি বণিকদের ছিল না এবং সুবেদার প্রস্তুতকৃত কাপড়ের পুরো অংশটাই মোগল হারেম এবং প্রধান অমাত্যদের ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করতেন। রাজকন্যা আর প্রধান অমাত্যদের স্ত্রীরা এই কাপড় দিয়েই কটিরেখাবিহীন সরু জামা, যাকে কামিজ বলে এবং গ্রীষ্মকালের উষ্ণ আবহাওয়ার উপযোগী পোশাক প্রস্তুত করতেন এবং সম্রাট আর অভিজাতের দল এই সূক্ষ্ম কাপড়ের পোশাক পরিহিত অবস্থায় মেয়েদের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত এবং যা তাদের সাথে নৃত্যগীতে অংশ নিতে পুরুষদের প্রায় বাধ্যই করত।'

নিদারুণ মনঃকষ্টের কারণে শাহজাহান 'ভীষণ ভারাক্রান্ত' হয়ে পড়েন। পরের দিন তিনি দরবারে উপস্থিত না হয়ে পুরোটা দিন হারেমে অতিবাহিত করেন। তিনি তার কন্যার যন্ত্রণার আশু নিরাময়ের জন্য মসজিদে বিশেষ মোনাজাতের আদেশ দেন, কারাগার থেকে বন্দিদের মুক্তি দেন আর গরিবদের মাঝে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ বিতরণ করেন। তিনি তার সাম্রাজ্যের সেরা হাকিম আর

শল্যচিকিৎসকদের তলব করেন এমনকি ভিনদেশি চিকিৎসকেরাও বাদ যায় না এবং জাহানারার শুশ্রূষার ভার নিজের হাতে তুলে নেন, 'তার ওষুধ আর পথ্যের বিষয় তদারকির পাশাপাশি নিজ হাতে তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার আর সেখানে ওষুধ দিয়ে পট্টি বেঁধে দেন।' তিনি নিজের দায়িত্ব কর্তব্য এতটাই অবহেলা করেন যে, 'মহামান্য সম্রাট আর্ত কন্যার শুশ্রূষায় নিরন্তর ব্যস্ত থাকায়, তিনি দরবারে আর ব্যক্তিগত মন্ত্রণাসভায় দেরিতে উপস্থিত হতে শুরু করেন আর দ্রুত তাদের বিদায় করে দেন।'

পরিচারিকাদের দুজন যারা জাহানারাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিল তারা অগ্নিক্ষতের কারণে মৃত্যুবরণ করে। একজন অগ্নিদগ্ধ হবার সাত দিন পর, আর ঘটনার আট দিন পরে অন্যজন। পারস্যের এক চিকিৎসকের চিকিৎসায় রাজকন্যা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে শুরু করেন এবং কিছুদিনের জন্য তার শারীরিক অবস্থার বেশ উন্নতি হয়। কিছুদিন পরই অবশ্য আবারও শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে শুরু করলে শাহজাহান পুনরায় হতাশায় নিমজ্জিত হন, অবশেষে রাজদরবারের এক বালকভৃত্য ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধা বিশেষ একটি উপায় উদ্ভাবন করলে দুই মাস পরে ধীরে ধীরে 'ক্ষতস্থানগুলো শুকিয়ে যেতে শুরু করে।' কৃতজ্ঞ শাহজাহান রাজকীয় নাকাড়া বাজানোর আদেশ দেন এবং সোনার বিপরীতে জাহানারাকে ওজন করতে বলেন—'এই প্রথাটা এত দিন কেবল ব্যক্তি সম্রাটের জন্যই নির্ধারিত ছিল।' অবশ্য ১৬৪৪ সাল যখন প্রায় শেষের দিকে তখনই কেবল শাহজাহান জাহানারার পূর্ণ রোগমুক্তির ব্যাপারে যথেষ্ট আস্থাবান হয়ে উঠে আট দিনব্যাপী শোকরানা উৎসব বিশাল করে আয়োজন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আদেশ দেন। উৎসবের সময় তিনি তার আরোগ্য লাভ করতে থাকা কন্যাকে দুই হাত খুলে উপহার দেন, যার ভেতরে রয়েছে 'বিরল রত্ন আর অলংকার' থেকে 'শুদ্ধ পানিতে জাত নিষ্কলুষ ১৩০টি মুক্তা' আর 'বিশাল একটি হীরকখচিত কিরীট।' তিনি সেইসাথে সুরাট বন্দরের খাজনা তাকে দান করেন, যার একদা হকদার ছিলেন সম্রাজ্ঞী নূর। সেই সময়ে সুরাট ছিল প্রধান সমুদ্রবন্দর যেখান থেকে ইউরোপীয় বণিকরা তাদের বেশির ভাগ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত আর তাই খাজনার পরিমাণও ছিল কল্পনাতীত। নদীর তীরে দর্শনীয় এক আতশবাজির প্রদর্শনীর মাধ্যমে উৎসব সমাপ্ত হয়, 'বিস্মিত দর্শনার্থীদের দারুণ আনন্দ দান করে।' 'বস্তুত পক্ষে', শাহজাহানের ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করেছেন, 'মহামান্য সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণের মঙ্গলময় তিথিতেও এমন উৎসবের আয়োজন করা হয়নি...।'

জাহানারার প্রতি শাহজাহানের প্রবল, কখনো বা আচ্ছন্ন করা ভালোবাসা এসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। ভিনদেশির দল, নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসেবে

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা আর গুজবের প্রতি ব্যগ্রভাবে আগুগ্রাহী মনোভাব প্রদর্শন করে, এই সম্পর্কের ভেতরে আরো বিশ্রী একটি সম্পর্ক আঁচ করতে চেষ্টা করে : অজাচার। তারা তাদের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে যে, জাহানারা অন্য রাজকন্যাদের মতো বাস না করে আগ্রা দুর্গের বাইরে নিজস্ব প্রাসাদে বাস করেন। তারা সেইসাথে আকবরের প্রবর্তিত প্রথাও লক্ষ্য করে যেখানে রাজকুমারীদের বিয়ে করা থেকে বিরত রাখা হতো। তারা জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে, জাহানারা কি আক্ষরিক অর্থেই মমতাজকে সর্বক্ষেত্রে প্রতিস্থাপিত করেন, শাহজাহানের মাঝে নিজের স্বামীকে খুঁজে নিয়েছেন এবং শাহজাহানও তার মৃত সম্রাজ্ঞীর পুনর্জন্মের একটি উপায় খুঁজে পেয়েছেন।

নেদারল্যান্ডের অধিবাসী জোহানেস ডি লায়েট মমতাজের মৃত্যুবরণের বছরের কথা লিখে গেছেন এবং যিনি, নিজে যদিও ভারতে পর্যটক হিসেবে আসেননি, অন্যদের বিবরণী সংগ্রহ করে দাবি করেছেন যে, 'তিনি (শাহজাহান) তার অসংখ্য আত্মীয়ের রক্তে হাত রঞ্জিত করার পর অগম্যগামীও হয়ে ওঠেন; আর এ কারণে তার প্রিয়তমা স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে...তিনি তার মৃতা স্ত্রীর গর্ভজাত আপন কন্যাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।' পিটার মানডি কয়েক মাস পরেই ধারণাটায় বাতাস দেন : 'প্রাচীন রীতি অনুসারে মোগল রাজকন্যারা (আমি যত দূর জানতে পেরেছি) কখনো বিয়ে করার অনুমতি লাভ করে না। এই শাহজাহান, অন্যদের ভেতর থেকে, চিমিনি বেগম (জাহানারা) নামে একজনের সাথে, শোনা যায় দারুণ রূপসী এক মহিলা, তিনি অজাচারে লিপ্ত হয়েছেন, যার সাথে (আগ্রায় বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে আর ব্যাপকভাবে আলোচনা হয়) বহুবারই তাকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখা গেছে।'

আগ্রা আর সুরাটে অবস্থানরত করণিকের দল ইংল্যান্ডে চিঠি লেখার সময় ব্যগ্রভাবে এসব কাহিনী উত্থাপিত করায়, গল্পগুলোর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হতে থাকে। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের, যিনি শাহজাহানের রাজত্বকালের শেষ পর্বে মোগল সাম্রাজ্যে এসে হাজির হন এবং সম্ভবত গুজবের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন, যা এত বছরেও কিছুই পরিবর্তিত হয়নি, সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি লিখেন, জাহানারা ছিলেন, 'দারুণ সুদর্শনা, আবেদনময়ী দেহসৌষ্টবের অধিকারিণী, এবং 'তার আব্বাজানের ভীষণ প্রিয়তমা ছিলেন। গুজব রয়েছে যে, তার অন্তরঙ্গতা এমন একটি পর্যায়ে উপণীত হয়েছিল, যা বিশ্বাস করা কষ্টকর, সম্রাট শেষ পর্যন্ত মোল্লাদের ডেকে ব্যাপারটার বিচার করে একটি ফয়সালা করতে বলেছিলেন...মোল্লাদের ভাষ্য অনুযায়ী নাকি কন্যার সাথে সম্রাটের এই সম্পর্ক রাখার অধিকার ন্যায়সংগত, কারণ যে বৃক্ষ তিনি রোপণ করেছেন তার ফল আস্বাদনের অধিকারও তার রয়েছে।'

তিনি একই সাথে রাজকুমারী বেগমসাহেবাকে অন্য প্রেমিক গ্রহণের অভিযোগেও অভিযুক্ত করেছেন : 'আমি আশা করি কেউ যেন ভাববেন না যে অকারণে আমি রোমান্স বা রূপকথা রচনা করতে বসেছি', তিনি নির্মোহ ভঙ্গিতে লিখেছেন। 'আমি যা লিখছি তা ইতিহাসের অংশ এবং আমার অভিপ্রায় এখানের অধিবাসীদের রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য একটি বর্ণনা উপস্থাপন করা। প্রথমেই বলি ইউরোপের মতো এশিয়ায় প্রেম করা মোটেই সহজ কাজ নয়। ফ্রান্সে প্রেম করা হলো একটি মজার ব্যাপার। ফরাসিরা হেসে, হৈ-হল্লা করে, হাততালি দিয়ে প্রেম উড়িয়ে দিতে পারে এবং হাসির মতোই প্রেম সেখানে ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু পৃথিবীর এই প্রান্তে প্রেম প্রয়াসের খুব নজিরই আছে, যেখানে এর পেছন পেছন ভয়ংকর আর শোচনীয় বিপর্যয় হাজির হয়নি।' তিনি এরপর প্রহসন আর শোকাবহ প্রতিশোধের মাঝে আরোপিত একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি ইঙ্গিত দেন, জাহানারা, সৌভাগ্যক্রমে সুদর্শন কিন্তু 'খুব উচ্চবংশজাত কেউ নন' এক তরুণের সঙ্গে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন। নিজ কন্যার অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে উদ্বিগ্ন, ঈর্ষান্বিত সম্রাট একদিন অতর্কিতে এসে তার কন্যার গোপন কক্ষে এমন 'এক অপ্রত্যাশিত সময়ে' ঢুকে পড়লেন যে, জাহানারার প্রেমিক কোনো দিশা না পেয়ে স্নানের জন্য পানি গরম করতে ব্যবহৃত বড় কড়াইয়ের ভেতরে আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন। সম্রাট কন্যার সাথে 'সাধারণ বিষয়ে' অনেকক্ষণ আলাপ করার পর, কথার মোড় ঘুরিয়ে তিনি বলেন, 'বেগমসাহেবার ত্বক দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি শরীরের তেমন তোয়াজ করছেন না এবং তার উচিত এখন গোসল করা। তিনি এ কথা বলেই খোজাদের আদেশ দিলেন জলের কড়াইয়ের নিচে আগুন জ্বালাতে এবং পানি টগবগ করে ফুটতে শুরু করলে কড়াইয়ের ভেতর বেগমসাহেবার প্রেমিকও সিদ্ধ হতে থাকে। সম্রাট চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন যতক্ষণ না খোজারা বলে যে তার ভাগ্যপ্রপীড়িত শিকার শেষ হয়ে গেছে।' বার্নিয়ের আরো লিখেছেন, শাহজাহান তার কন্যার আরেক প্রেমিককে হত্যা করেছিলেন বিষ দেয়া পান হাসিমুখে হতভাগ্য যুবকের হাতে তুলে দিয়ে।

বার্নিয়ের গল্প অবশ্য সব ইউরোপীয় বিশ্বাস করেনি। ভেনিসীয় নিক্কোলাও মানুচ্চি বার্নিয়ের বিষ জর্জর আর সিদ্ধ হয়ে যাওয়া প্রেমিকের গল্প বাতিল করে দিয়েছেন সেগুলোকে 'অন্ত্যজ লোকদের মাঝে প্রচলিত গল্প বলে।' তিনি অজাচারের অভিযোগের পেছনের ঘটনার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, জাহানারা তার আব্বাজানের প্রদত্ত দায়িত্ব 'ভীষণ ভালোবাসা আর অধ্যাবসায়ের সাথে তামিল করত এই কারণে যে, তিনি যেন তার আর্জি সব সময় মেনে নেন। আর এ কারণেই সাধারণ লোকেরা ইঙ্গিত করেছে, সে তার

আব্বাজানের সাথে রতিক্রিয়ায় অভ্যস্ত...।' জাহানারার মহলের ভেতরের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে মানুচ্চি দাবি করেছেন, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন কীভাবে '...সুরাপানে আসক্ত রাজকুমারীর জন্য কাশ্মীর, কাবুল আর পারস্য থেকে সুরা আমদানি করা হতো। কিন্তু তার পান করা সর্বোৎকৃষ্ট সুরা তার নিজ বাড়িতেই চোলাই করা হতো। এটা ছিল গোলাপজল আর সুরা থেকে প্রস্তুত উপাদেয় কোহল, নানা ধরনের মূল্যবান মসলা আর সুগন্ধিযুক্ত ঝাঁঝালো মাদকের স্বাদযুক্ত। তার হারেমের লোকজন আমার চিকিৎসার জন্য সুস্থ হয়ে উঠলে তার কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ বহুবারই তিনি এই উপাদেয় সুরার কয়েকটা বোতল আমার বাসায় প্রেরণের আদেশ দিয়েছেন...তিনি রাতের বেলা মূলত পান করতেন যখন তার চারপাশে নৃত্য, গীত, অভিনয় আর নানা আনন্দকর মর্কটক্রীড়া চলছে। পানাহারের মাত্রা মাঝে মাঝে এমন অবস্থায় পৌঁছাত যে, তিনি দাঁড়াতে পর্যন্ত পারতেন না এবং তারা তাকে তার শয্যায় বয়ে নিয়ে যেত।' তিনি যেন সম্ভাব্য প্রশ্ন আঁচ করতে পেরেই এরপর যোগ করেছেন, 'আমি এ কথা বলছি কারণ অন্তরঙ্গতার খাতিরে এই মহলে আমায় প্রায়ই যেতে হয়েছে এবং আমি তার মহলের খেদমতে নিয়োজিত খোজা আর দায়িত্বশীল রমণীদের গভীর আস্থা অর্জন করেছিলাম।'*

মোগল সরকারি দস্তাবেজ অজাচার আচরণ সম্পর্কে একেবারেই মৌনতা পালন করেছে, জাহানারাকে অত্যন্ত পছন্দের রাজকুমারী হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, এর বেশি আর কিছুই বলা হয়নি। দরবারের লিখিত ইতিহাসের প্রতিটি শব্দ যেহেতু শাহজাহানের পূর্ব অনুমোদনপ্রাপ্ত, এতে তাই অবাক হবার মতো কিছু নেই। কালের গর্ভে এতটা পথ উজানে অতিক্রম করে আসার পরে, আজ আর কোনোভাবেই অজাচারের অভিযোগ প্রমাণ করা কিংবা তাকে খারিজ করার কোনো উপায়ই আর নেই। শাহজাহান আর জাহানারার মধ্যকার অন্তরঙ্গ নিকট সম্পর্ক স্পষ্টতই নানা রসাল মন্তব্যের জন্ম দিয়েছে। এটা আপাতগ্রাহ্য যে, মারাত্মক শোকের কারণে বিভ্রান্ত একজন সম্রাট নিজের কন্যার মাঝে শারীরিক সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন, যার সাথে যুবতী মমতাজের দারুণ সাদৃশ্য রয়েছে। এটাও সম্ভব যে, তরুণী রাজকন্যা তার পিতার প্রতি ভীষণভাবে নিবেদিতপ্রাণ, সম্ভবত তার সাথে তর্ক করতে ভয় পেত, সম্মতি দিয়েছে।

---

* জাহানারা আর তার ছোট বোন রৌশনআরা স্পষ্টতই কোহলের প্রতি পারিবারিক দুর্বলতা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল এবং রাজকুমারী হবার কারণে নিজ মহলের অভ্যন্তরে সুরা পান করার বিষয়ে তাদের ওপর কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না।

অবশ্য এটাই বোধ হয় আদতে ঘটেছিল যে, শাহজাহান চেতন বা অবচেতন মনে যৌন অনুভূতি পোষণ করলেও, সেগুলো পূর্ণতা লাভ করেনি। পরবর্তী বছরগুলোতে বিদ্রোহী সন্তানেরা তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেছিল কিন্তু কখনো তাদের বোনের সাথে অজাচার সম্পর্কের জন্য তাকে অভিযুক্ত করেনি।

অবশ্য জাহানারার প্রতি শাহজাহানের মোহাবিষ্টতা একটি ছকে বিশ্লেষণ করা যায়, যা অপরিহার্যভাবে যৌনতা আশ্রয়ী নয়। শাহজাহান তার সারা জীবনে যত রমণীর সংস্পর্শে এসেছিলেন সবার প্রতিই তিনি গভীর অনুভূতি পোষণ করেছেন। তার আম্মিজান যখন ইন্তেকাল করেন শোকের ভারে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন এবং মমতাজের প্রতি তার স্থায়ী আর একচেটিয়া ভালোবাসা যতটা ছিল যৌনতা আশ্রয়ী ঠিক ততটাই তার সাথে আত্মনিবিষ্ট হবার ক্ষমতা আর সাহচর্য-নির্ভর।

তাদের সম্পর্কের বাস্তবতা যাই হোক, শাহজাহানের ওপর জাহানারার প্রভাব ছিল প্রশ্নাতীত। মানুচ্চি ছিলেন অনেকের ভেতরে একজন, যারা এটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, 'জাহানারা তার পিতার কাছে যা চাইতেন, সেটাই পেতেন।' ১৬৪৪ সালে, প্রায় প্রাণঘাতী অগ্নিকাণ্ড থেকে তার আরোগ্য লাভের বছর, জাহানারা তার ভাই আওরঙ্গজেবের হয়ে মধ্যস্থতা করেন, তিনি দুর্ঘটনা কবলিত হবার কিছুদিনের ভেতরেই যিনি শাহজাহানের সাথে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিলেন।

আওরঙ্গজেব তখন পর্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় মোগল নৃপপুঙ্গবের একটি আর্দশ প্রতিমূর্তি। ১৬৩৫ সালে, শাহজাহান তখনকার ষোলো বছরের আওরঙ্গজেবকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে তার প্রতিপক্ষ ছিল অর্চ্চার সমৃদ্ধশালী রাজা, ঝুঝর সিং, আগ্রা থেকে প্রায় একশ মাইল দক্ষিণে একটি নিবিড় অরণ্যাবৃত অঞ্চলে যার রাজত্ব অবস্থিত। শাহজাহানের রাজত্বকালের সূচনা পর্বে রাজা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু ১৬২৯ সালে দাক্ষিণাত্যে শাহজাহান আর মমতাজের পরিচালিত বিশাল যুদ্ধাভিযানের কিছুকাল পূর্বেই তাকে প্রশমিত করা সম্ভব হয়েছিল। রাজা অবশ্য পরবর্তীকালে স্বাধীনতার অনাকাঙ্ক্ষিত ইঙ্গিত প্রদর্শন করতে থাকলে, শাহজাহান বাধ্য হন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। আওরঙ্গজেবের সৈন্যবাহিনী রাজার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে, আতঙ্কিত রাজা জঙ্গলে আশ্রয় নিলে সেখানে গণ্ড উপজাতির লোকদের হাতে নিহত হন। আওরঙ্গজেব তার পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যদের পিছু ধাওয়া করেন এবং রমণীরা জওহরব্রতের, একত্রে বিষপান করে আত্মহত্যা, কৃত্যানুষ্ঠান পালন করার পূর্বেই তাদের বন্দি করতে সক্ষম হন, দরবারের একজন ঐতিহাসিক এ প্রথার প্রতি বিরাগ প্রদর্শনপূর্বক মন্তব্য করেছেন, 'হিন্দুস্তানের নৈতিকতা বিবর্জিত রীতির অন্যতম।'

শাহজাহানের আদেশেই কার্যত ঝুঝর সিংয়ের পিতার নির্মিত হিন্দু মন্দির—সেই ব্যক্তি যিনি জাহাঙ্গীরের অনুরোধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আকবরের বন্ধু আর দিনপঞ্জির রচয়িতা আবুল ফজলকে হত্যা করেছিল—ভেঙে ফেলে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। বিষয়টি পিতা আর পিতামহের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা থেকে শাহজাহানের আপাত বিচ্যুতির ইঙ্গিত বহন করে। যৌবনে তার যে প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার স্থলাভিষিক্ত হতে থাকে রাজনৈতিক শৃঙ্খলাবদ্ধ, কঠোর অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি। মমতাজের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যার প্রথম লক্ষণ প্রতিভাত হয়। ১৬৩২ সালের গোড়ার দিকে, তিনি সদ্য নির্মিত সমস্ত হিন্দু মন্দির ভেঙে ফেলার আদেশ দেন এবং তার আদেশ 'অবিশ্বাসীদের শক্ত ঘাঁটি' হিন্দুদের পবিত্র শহর বেনারসে যেন পালিত হয় সে বিষয়ে কোনো কারণ ছাড়াই কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। তিনি সেইসাথে নতুন মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। প্রবল শোক আর অবিশ্বাসীদের প্রতি তার পক্ষপাতিত্বের কারণেই শাস্তিস্বরূপ মমতাজের মৃত্যু হয়েছে এমন একটি ধারণার বশবর্তী হয়ে সম্ভবত তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ধর্মান্ধ গোড়া মোল্লাদের চাপের কারণেই এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। নিজে একজন সুন্নি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও শাহজাহান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বেশ কয়েকজন কঠোরপন্থি সুন্নি মোল্লাদের বরখাস্ত করেছিলেন এবং সম্ভবত তাদের শমিত করতে এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হয়েছিল।

১৬৩২ সালেই, শাহজাহান মোগল সাম্রাজ্যে বসবাসরত খ্রিস্টানদের ওপর প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গমাত্রার সামরিক আক্রমণের আদেশ দেন। তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল, সুবে বাংলার হুগলি নদীর তীরে, বর্তমানে কলকাতা শহর যেখানে অবস্থিত তার উত্তর-পশ্চিমে, বহু বছর পূর্বে পর্তুগিজদের স্থাপিত বাণিজ্য কুঠি। ইংরেজ রাজদূত স্যার টমাস রো যেমন তিক্তভাবে অভিযোগ করেছেন, শাহজাহান তার পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের চেয়ে ভিনদেশিদের সম্বন্ধে বরাবরই সন্দিগ্ধ মনোভাব পোষণ করেছেন। শাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুযায়ী, পর্তুগিজরা একই সাথে 'অবিশ্বাসী' হবার কারণে, নিজেদের শহর 'কামান, ম্যাচলক বন্দুক আর যুদ্ধের অন্যান্য অনুষঙ্গ' দ্বারা সুরক্ষিত করায় তাদের পাপের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে এবং আশপাশের গ্রামে হামলা চালিয়ে সেখানে বসবাসরত লোকজনকে জোর করে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে আর অন্যদের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়।

এই বিশেষ 'খারিজি সম্প্রদায়'কে আক্রমণের পেছনে, যদি এসব কারণ যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান মনে না হয়, তাহলে শাহজাহানের ব্যক্তিগত প্রণোদনাও আক্রমণের পেছনে কাজ করেছে। পিতার বিরুদ্ধে শাহজাহান যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, সেই সময়ে পর্তুগিজরা তাকে সহায়তা প্রদান করতে

অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং বস্তুতপক্ষে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রাজকীয় বাহিনীকে সহায়তা প্রদান করেছিল। শাহজাহানের রাজ্যাভিষেকের মুহূর্তে রীতি অনুযায়ী শুভেচ্ছা আর উপঢৌকন প্রেরণ করতে তারা দৃষ্টিকটুভাবে ব্যর্থ হয়। কিছু নথীপত্রে অবশ্য পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে শাহজাহানের প্রতিহিংসা আর মমতাজের মাঝে একটি সম্ভাব্য যোগসূত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে, শাহজাহান আর মমতাজ বাংলার ভেতর দিয়ে পলায়ন করার সময় তারা যখন হুগলির নিকটবর্তী এলাকা অতিক্রম করছিলেন তখন পর্তুগিজরা কীভাবে তাদের দুর্দশার সুযোগ নিয়েছিল। নিকোলাও মানুচ্চির ভাষ্য অনুসারে, 'কতিপয় পর্তুগিজ হার্মাদ সহসা অভিনিষ্ক্রমণে প্রবৃত্ত হয় আর (মমতাজ মহলের) সবচেয়ে প্রিয় দুজন পরিচারিকাকে অপহরণ করে। তিনি তখন তাদের ভদ্র ভাষায় সতর্ক করে বলেন, আশ্রয় সন্ধানী একজন পলাতক যুবরাজের সর্বস্ব হরণের প্রয়াসের পরিবর্তে তাকে সাহায্য করাই তাদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তিনি সে কারণে তার দুই দাসীকে ফেরত দেয়ার জন্য তাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। কিন্তু পর্তুগিজরা তার অনুরোধের প্রতি কোনো রকম কর্ণপাত করে না, পরবর্তীকালে যার জন্য তাদের ভীষণ মূল্য দিতে হয়েছে...।'

প্রায়শ্চিত্তের মূল্য বাস্তবিকই মহার্ঘ ছিল। শাহজাহানের আদেশে বাংলার সুবেদার বসতি অবরোধ করে, পর্তুগিজরা নৌপথে যাতে পালাতে না পারে সে জন্য নদীতে সারিবদ্ধভাবে নৌকা মোতায়েন করে আর তারপরে তাদের সুরক্ষা ব্যবস্থার নিচে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটায়। ঘটনা পরবর্তী নিয়ন্ত্রণহীন আতঙ্কের সুযোগে, 'ইসলামের যোদ্ধারা' পর্তুগিজ বসতির সীমানা অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করে প্রায় ৪,০০০ লোককে বন্দি করে, বেশির ভাগই নারী আর শিশু, যাদের আগ্রার উদ্দেশে এগারো মাস দীর্ঘ একটি যাত্রায় প্রেরণ করা হয়। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের তাদের ভাগ্যের বর্ণনা করেছেন : 'বিবাহিত আর কুমারী নির্বিশেষে, সুন্দরী রমণীরা হারেমের বাসিন্দায় পরিণত হয়; যাদের বয়স বেশি কিংবা অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী তাদের অমাত্যদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হয়; অল্প বয়সী ছেলেদের খৎনা করে তাদের বালক ভৃত্যে পরিণত করা হয় এবং পরিণত বয়স্ক পুরুষদের, প্রলুব্ধ করা হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভালো ভালো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বা কখনো হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করার ভীতি প্রদর্শন করে, আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিস্টান ধর্ম পরিত্যাগ করতে।' সেদিন যারা ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করেছিল, লাহোরির ভাষ্য অনুসারে, 'তাদের পশুর মতো খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়' এবং 'খ্রিস্টান ধর্মের প্রবক্তাদের মতো দেখতে পবিত্র হিসেবে গণ্য মূর্তিগুলোকে যমুনার বুকে নিক্ষেপ করা হয় আর কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়।' শাহজাহান আগ্রা আর লাহোরে তার পিতার

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্মিত গির্জাগুলোও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার আদেশ দেন। আগ্রা গির্জার ক্রমেই সরু হয়ে ওপরের দিকে উঠে যাওয়া গম্বুজে স্থাপিত ঘড়ির সুরে বাঁধা উচ্চৈঃস্বর ঘণ্টাধ্বনি শহরের সর্বত্র শোনা যেত। শাহজাহান সম্ভবত চাননি যে তার প্রিয়তমা স্ত্রীর সমাধিগর্ভে অবিশ্বাসীর ঘণ্টাধ্বনি প্রবেশ করুক।

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শাহজাহানের এই শাস্তিমূলক কর্মকাণ্ড অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। শাহজাহানের রাজত্বকালের গোড়ার দিকে দমন পীড়নের শিকার আগ্রার জেসুইট সম্প্রদায় নিজেদের পুনর্বাসিত করতে সক্ষম হয় এমনকি তারা হুগলি থেকে বন্দি হওয়া পাদ্রিদের কয়েকজনকে মুক্ত করতেও সক্ষম হয়। শাহজাহানের মৌলবাদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য তরুণ আওরঙ্গজেব কর্তৃক সমর্থিত হয়, পৃথিবী সম্বন্ধে যার ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টি তার পূর্ববর্তী যেকোনো মোগলের চেয়ে অনেক বেশি হতাশাব্যঞ্জক অনাড়ম্বর নীতিপরায়ণ এবং পরবর্তীকালে যিনি নিজের এই দৃষ্টিভঙ্গি সতত অনুসরণ করবেন।

আওরঙ্গজের তার জীবনের প্রথম দিকে সম্রাটের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। অর্চ্চার রাজার বিরুদ্ধে তার সফল অভিযান সমাপ্ত হবার পরের বছর, শাহজাহান তাকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদান হিসেবে বহাল করেন, যে পদে সে পরবর্তী আট বছর অধিষ্ঠিত থাকবে। বিশাল এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তখনো সমস্যা সৃষ্টিকারী এই প্রদেশে আওরঙ্গজেবের উপস্থিতি বিজাপুরের শাসককে মোগলদের সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরে প্ররোচিত করতে যথাযথভাবেই হুমকি প্রদর্শনে সক্ষম হয় এবং গোলকুণ্ডার শাসককে একটি স্মারক আত্মসমর্পণ করতে উৎসাহিত করে। পরবর্তী বছরগুলোতে, শাহজাহান দুই দফায় আওরঙ্গজেবকে পদোন্নতি প্রদান করেন, তার ভাতা এবং পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

১৬৪৪ সালের মে মাসে, জাহানারার দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য থেকে তড়িঘড়ি আগ্রায় বোনের শয্যাপার্শ্বে এসে উপস্থিত হন। অবশ্য এই দফা আগ্রায় অবস্থানকালীন সময়ে কিছু একটি ঘটেছিল, যার ফলে শাহজাহানের সাথে আওরঙ্গজেবের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং যার ফলশ্রুতিতে তিনি তার পদমর্যাদা আর সুবেদারের দায়িত্ব দুটোই হারান। ঐতিহাসিক লাহোরির ভাষ্য অনুসারে যুবরাজ 'অদূরদর্শী ইয়ারদোস্ত আর তাদের কুপরামর্শের প্রভাবে' মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং 'পার্থিব ঝকমারি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত করেন।' অবশ্য দশ বছর পর জাহানারার কাছে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে লেখা একটি চিঠি থেকে আরো সুনির্দিষ্ট ধারণা লাভ করা যায়, যেখানে তিনি লিখেছেন : 'আমি জানি (প্রতিপক্ষ) আমায় হত্যার ষড়যন্ত্র করছে...।'

আওরঙ্গজেবের মনে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী এই অজ্ঞাতনামা প্রতিপক্ষ আর কেউ নন তারই বড় ভাই সুফি-সাধক দারা শুকোহ্, যার মাঝে মানুষকে প্রভাবিত করতে পারার একটি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল। দারা, তার আব্বাজানের স্নেহ আর ভালোবাসার নির্ভরযোগ্য প্রতীক অভীষ্ট ব্যক্তি হিসেবে, শাহজাহানের সাহচর্যে সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করেছিলেন এবং ১৬৩৩ সালে শাহজাহান তাকে তার মনোনীত উত্তরসূরি হিসেবে ঘোষণা করেন, হিসার ফিরোজ জেলা তাকে দান করেন, ঐতিহ্যগতভাবে ভাবী উত্তরাধিকারীকে যা প্রদান করা হয়, আর সেইসাথে সম্রাটের জন্য নির্ধারিত টকটকে লাল রঙের তাঁবু স্থাপনের অনুমতি। দারার প্রতি পক্ষপাতিত্বের এসব লক্ষণ আওরঙ্গজেবকে ক্ষুব্ধ করে। ধর্মীয় বিষয়ে দারার উদারতার প্রতি, যার মাঝে আকবর আর জাহাঙ্গীরের ঔৎসুক্য আর সহিষ্ণুতা ফুটে উঠেছে, বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে আওরঙ্গজেবের মাঝে একটি বৈরী মনোভাব জন্ম নেয়, যা তার কাছে ছিল উৎপথগামিতার নামান্তর। দারা আবার সংকীর্ণমনা মৌলবাদী হিসেবে আওরঙ্গজেবকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন।

এক অমাত্যের ভাষ্য অনুসারে, দুই ভাইয়ের মাঝে বিদ্যমান চাপা উত্তেজনা জাহানারা যখন আরোগ্য লাভের পর ধীরে ধীরে ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরে পান তখন আগ্রায় যমুনার তীরে দারার নতুন হাভেলি পরিদর্শনের সময় আওরঙ্গজেব তাদের আব্বাজানের সঙ্গী হিসেবে গমন করলে নাটকীয়ভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ পায়। তারা যখন হাভেলি ঘুরে দেখছিলেন, দারা তখন আওরঙ্গজেবকে ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে প্রবেশ করতে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু আওরঙ্গজেব তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এই ভেবে যে, দারা তাকে সেখানে হত্যা করার বন্দোবস্ত করেছেন। তিনি এমনকি কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার জন্য তার আব্বাজানের আদেশও অমান্য করেন। দরজার চৌকাঠের নিচে একগুঁয়ে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকেন।

গল্পটার মাঝে বড্ড বেশি নাটকীয়তা বিদ্যমান থাকায় যদিও সেটাকে সত্যি বলে মানতে কষ্ট হয় কিন্তু দুজনের মাঝে শক্তি আর অভিপ্রায়ের সমাপাতনের ইঙ্গিত সম্ভবত সত্যি। আওরঙ্গজেব নিশ্চিতভাবেই দারার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন এবং নিজেকে তাদের আব্বাজানের অবজ্ঞার পাত্র মনে করতেন। নিজের অনুভূতিগুলো কোনোমতেই আর নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তিনি সম্ভবত তার আব্বাজানকে এ বিষয়ে অভিযোগ জানান কিন্তু হিতে বিপরীত হয় শাহজাহানের সহানুভূতি লাভের পরিবর্তে তিনি তাকে আরো ক্রুদ্ধ করে তোলেন। শাহজাহান এর ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের জেরে হয় তাকে তার মর্যাদা আর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন বা কোনো কোনো ভাষ্যে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, অহংকারে আঘাত লাগায় আওরঙ্গজেব নিজেই নিজের দায়িত্ব আর মর্যাদা সমর্পণ করেন।
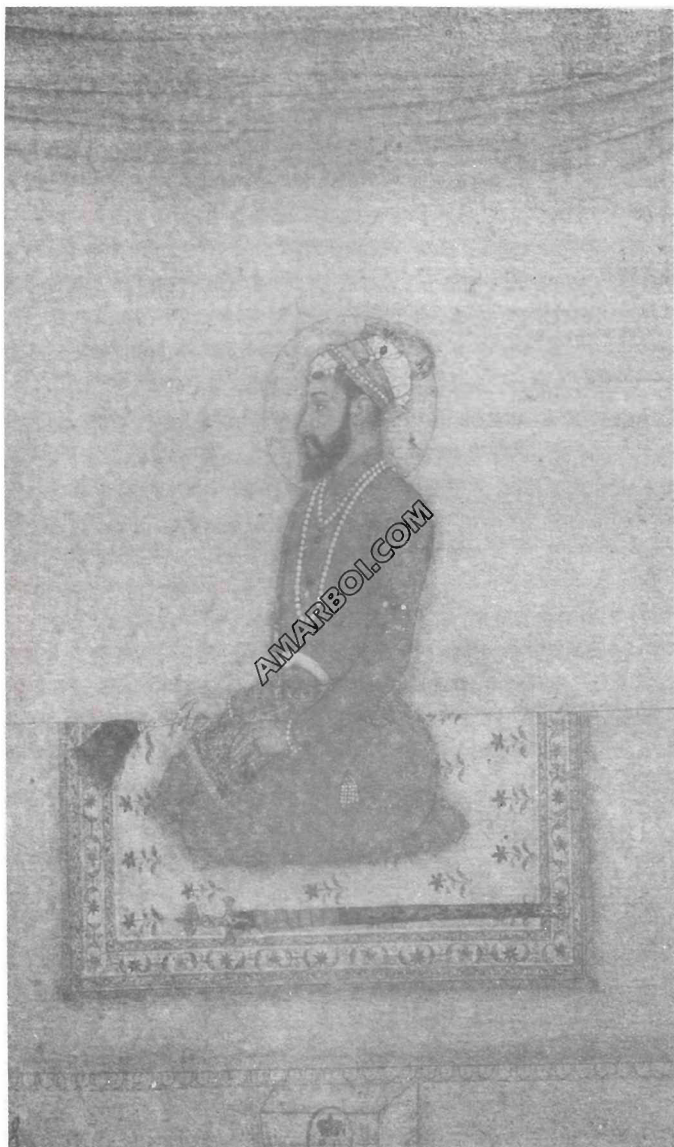
নামাজরত আওরঙ্গজেব।

আসল ঘটনা যা-ই হোক না কেন, আওরঙ্গজেব অচিরেই বিরোধের জন্য অনুতপ্ত হন, কিন্তু শাহজাহানের অনুগ্রহ পুনরায় লাভ করতে তাকে সাত মাস অপেক্ষা করতে হয়। সেটাও এমনকি, দরবারের এক ঐতিহাসিক যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন, কেবল 'তার বড়বোন বেগমসাহেবার সনির্বন্ধ অনুরোধের কারণেই' সম্ভব হয়েছিল। জাহানারা অনুরোধ করার জন্য তার আরোগ্য লাভ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সময়টা বেছে নেন এবং শাহজাহান তার অনুরোধ মেনে নিয়ে আওরঙ্গজেবকে তার পূর্ববর্তী মর্যাদায় পুনরাভিষিক্ত করেন এবং কয়েকমাস পরে ১৬৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে ঐশ্বর্যশালী গুজরাটের সুবেদার হিসেবে নিয়োগ করেন। সব কিছু পুনরায় আবার ছন্দ ফিরে পেয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু এই ঘটনাপ্রবাহ রাজপরিবারের মাঝে অতীত অসূয়ার, বিশেষ করে খসরুর সাথে শাহজাহানের নিজের বৈরিতার, চিত্তবিক্ষেপকারী প্রতিধ্বনি হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। শাহজাহান আর খসরু অবশ্য বৈমাত্রেয় ভাই, যেখানে দারা শুকোহ্ আর আওরঙ্গজেব আপন ভাই, তার পরও পরবর্তী দিনগুলোতে এটা একেবারেই গুরুত্বহীন বলে প্রতিপন্ন হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সেই মহিমাময় মসনদ

১৬৪৫ সালের শেষের দিকে লাহোর থেকে শাহজাহানের কাছে, আটষট্টি-বছরের বৃদ্ধা নূরজাহান, শত্রুতে পরিণত হওয়া তার একসময়ের মিত্রের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছে। শহরের বাজারগুলোতে আরেকটা হত্যাকাণ্ডের জোর গুজব ভেসে বেড়ায় কিন্তু দরবারের ঐতিহাসিকরা যেমন লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাতে মনে হয় সম্ভবত ঘটনাটা তাই হয়েছিল যে, বার্ধক্যজনিত কারণেই তার মৃত্যু হয়েছিল। নূরজাহান তার স্বামীর মৃত্যুর পর নিভৃতে বিধবার জীবন যাপন করেছেন, যেখানে চক্রান্তের কোনো সুযোগই ছিল না। শাহজাহানের তাই তাকে হত্যার আদেশ দেয়ার কোনো কারণ নেই। নূর সম্পর্কে শাহজাহানের নীতি ছিল তাকে ব্যক্তিগতভাবে উপেক্ষা করা এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার একদা বিদ্যমান পরিব্যাপক প্রভাবের সমস্ত নিশানা অপসারণ, তার নাম উৎকীর্ণ করা সকল মুদ্রা বাজার থেকে তুলে নেয়া এবং একদা তার প্রতি অনুগত সমস্ত অমাত্যকে নিজের দরবার থেকে অপসারণ করা। নূর সম্পর্কে মোগল ঐতিহাসিকদের মাঝে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, অবশ্য তাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক আনুগত্যের ওপর সেটা নির্ভর করে। জাহাঙ্গীরের ওপর তার প্রভাবকে অনেকেই নিন্দা করেছে, কিন্তু তার জীবনের অসামান্য অগ্রগতিকে আড়াল করা তাদের কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি, যা জাহাঙ্গীরের দুর্বলতার পাশাপাশি তার নিজের দক্ষতার প্রতি সমানভাবে ঋণী।*

---

* দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে মহিলাদের প্রভাবকে প্রায়শই উনজ্ঞান করা হয়। মহিলাদের ওপর পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক বেশ বিধি-নিষেধ আরোপ করাকে অনেক বিশ্লেষক সমাজনীতি হিসেবে বিবেচনা করা সত্ত্বেও, বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের মতো মুসলিম দেশে, পাশাপাশি ভারত আর শ্রীলঙ্কা, সব দেশেই মহিলারা

মমতাজের মৃত্যুকে স্মরণীয় করতে আয়োজিত নানা আনুষ্ঠানিকতা থেকে একেবারে আলাদা, নূরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দারুণ মিতাচার প্রদর্শন করা হয়। নূর তার স্বামী সম্রাট জাহাঙ্গীরের মকবরার নিকটেই নিজের জন্য যে মকবরা তৈরি করেছিলেন সেখানেই মর্মরের শবাধারে তার নশ্বর দেহ স্থান পায়। ১৬৪১ সালে নূর তার নিজের জন্য মকবরা নির্মাণের কাজ শুরু করেন, তার ভাই এবং একই সাথে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী আসফ খান সে বছরই মৃত্যুবরণ করেন। শাহজাহানের প্রধান উজির আর সেইসাথে শ্বশুর হবার কারণে আসফ খানও কৃতপ্রযত্নে নূরকে উপেক্ষা করতেন। তার কন্যা মমতাজ মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও, জামাতা আর শ্বশুরের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ক সব সময় জোরাল ছিল। পর্তুগিজ খ্রিস্টান ভিক্ষু সেবাস্তিয়েন ম্যানরিকে দাবি করেন, তিনি একটি ভোজসভা প্রত্যক্ষ করেছিলেন যেখানে আসফ খান যে কক্ষে শাহজাহানকে আপ্যায়ন করেছিলেন সেটা সজ্জিত করতে ব্যবহৃত হয়েছিল 'সোনা আর রুপার কারুকাজ করা রেশমের পুরু গালিচা' এবং 'নির্মাণে চমৎকার দক্ষতার ছাপযুক্ত, রুপার ঝুড়িসদৃশ পা-ওয়ালা বহনযোগ্য পাত্র আর বিশাল সুগন্ধি-ধারক, কক্ষের চারপাশের পুরোটা বিস্তার জুড়ে ছড়ান রয়েছে, যেখানে মিষ্ট গন্ধযুক্ত ধূপ পুড়ছে...' একটি সাত মুখবিশিষ্ট ঝর্না থেকে প্রবল বেগে সুগন্ধি পানি উৎসরিত হচ্ছে এবং ধবধবে সাদা সাটিনের টেবিল-চাদরে সুন্দরী মেয়েরা সোনালি রঙের পানির পাত্র নামিয়ে রাখছে, সম্রাট যাতে প্রাক্ষালন করতে পারেন। 'হিন্দুস্তানি রীতিতে, রেশমের নানা রঙের পাতলুন আর স্বচ্ছ সূক্ষ্ম মসলিনের সাদা লম্বা হাতাওয়ালা বুক-খোলা পোশাক পরিহিত, জমকালোভাবে সজ্জিত খোজার দল', খাবার পরিবেশন করছে। শাহজাহান আহারের সময় আসফ খানের স্ত্রী, মমতাজের আম্মিজানকে, তার নিজের 'আম্মিজান' হিসেবে সম্বোধন করে এবং তাকে নিজের ডান পাশের বিশেষ সম্মানিত স্থানে আসন গ্রহণের আহ্বান জানান।

■

তাজমহলের নির্মাণকার্য যদিও অনেকাংশে সমাপ্ত, শাহজাহান নিজেকে অন্যান্য সুনির্মিত, ব্যয়বহুল এবং উচ্চাভিলাষী ইমারত নির্মাণে নিমগ্ন করেন। ১৬৪৭ সালে আগ্রার লালকেল্লায় তিনি অপরূপ সুন্দর মোতি মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করেন। তিনি অবশ্য তার সবচেয়ে অহংকারী পরিকল্পনা দিল্লির জন্য

প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন– এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, সংখ্যাটা একের বেশি, এখানে দুজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। জর্জ বুশ সিনিয়রের সন্তান জর্জ ডাব্লিউ বুশের মতোই তারা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক পরিবারের সাথে জন্ম বা বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কিত।

সংরক্ষিত রাখেন, যমুনার পশ্চিম তীরে—শাহজাহানাবাদ নামে (বর্তমানে যা পুরাতন দিল্লি নামে পরিচিত)—একটি সম্পূর্ণ নতুন রাজধানী নির্মাণ। শাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিক ইনায়েত খান তার অনুসন্ধান প্রয়াস বর্ণনা করেছেন 'একটি মনোরম স্থানের জন্য, মৃদু আবহাওয়ার কারণে জায়গাটা আশপাশের থেকে আলাদা যেখানে তিনি খুঁজে পাবেন একটি দৃষ্টিনন্দন দুর্গ আর পুলক সৃষ্টিকারী প্রাসাদ...যাদের ভেতর দিয়ে পানির ধারাকে প্রবাহিত করা যাবে এবং যাদের চত্বরযুক্ত বারান্দা থেকে নদী দেখা যায়।' শাহজাহান সেইসাথে তার ক্ষমতার পরিচায়ক হবে এমন একটি শহর পত্তন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন, তার পূর্বপুরুষদের মতোই তার কাছেও হিন্দুস্তানের দাবদাহকে অসহনীয় মনে হয়েছে, আগ্রার উষ্ণ, ঝলসে দেয়া বাতাসের হাত থেকে এবং সম্ভবত মমতাজের স্মৃতির কাছ থেকেও পালিয়ে যেতে চেয়েছেন।

১৬৩৯ সালে শাহজাহানাবাদের নির্মাণযজ্ঞ শাহজাহান শুরু করেন এবং তাজের ক্ষেত্রে যেমন দেখা গিয়েছিল, দ্রুত অগ্রগতি হতে থাকে। শ্রমিক, পাথর ছেদনকারী, অলংকরণে সিদ্ধহস্ত ভাস্কর, রাজমিস্ত্রী আর সূত্রধরের একটি বাহিনী সাতাশটা পর্যবেক্ষণ গম্বুজ আর এগারোটা তোরণদ্বারযুক্ত উঁচু বেলে পাথরের নিরাপত্তা প্রাচীর বেষ্টিত একটি অতিকায় দুর্গপ্রাসাদ, লালকেল্লা নির্মাণ করে। এই নতুন দুর্গ-শহর আকারে আগ্রা দুর্গের দ্বিগুণ। প্রশস্ত সড়ক দুর্গের বিভিন্ন অংশগুলোর—মীনাবাজার, দফতরখানা, অমাত্যদের বাসস্থান, শাহি পরিবারের সদস্যদের জন্য মহল আর হারেম, যার বিশালাকৃতি কক্ষগুলোর অলংকরণে সোনা আর মূল্যবান রত্নপাথর ব্যবহৃত হয়েছে—মাঝে সংযোগ স্থাপন করেছে।

ফোয়ারা আর জলের নহর পুরো এলাকায় ঝিলমিল করছে। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের নগর পরিকল্পনা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন : 'প্রায় প্রতিটি কক্ষেই দরজার কাছে বহমান পানির নিজস্ব জলাধার রয়েছে; দুই পাশে মনোরম বাগিচা, দৃষ্টিনন্দন কুঞ্জগলি, ছায়াময় বিশ্রামস্থল, জলের নহর, ফোয়ারা, গভীর করে তৈরি করা কৃত্রিম গুহা, যা দিনের বেলা সূর্যের আলো থেকে বাঁচতে আশ্রয় দেয়, পুরু গদিযুক্ত ডিভান আর চত্বর যেখানে রাতের বেলা শীতলতার স্পর্শ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া যায়। এই মুগ্ধ করা স্থানের প্রাচীরের ভেতর কোনো ধরনের অস্বস্তিকর বা পীড়াদায়ক উষ্ণতা অনুভূত হয় না।' শাহি মহলের পাশ দিয়ে একটি জলের নহর, 'নহর-ই-বেহেশত' বয়ে গেছে। মোগলদের সব জলের নহর যেমন হয়ে থাকে সে রকমই, জলের নহরের নতিমাত্রা যতটা সম্ভব চেটাল রাখা হয়েছে—পানি প্রবাহিত করতে যতটুকু প্রয়োজন কিন্তু খালি চোখে দেখে বোঝা অসম্ভব। রংমহল, মূল হারেম ভবন, সাদা মর্মরে তৈরি একটি চোখ ধাঁধানো

হাভেলি, যার চার কোণে অবস্থিত ছোট কক্ষগুলোর দেয়ালে ছোট ছোট আরসি চকচক করছে; কিন্তু সবচেয়ে চমৎকার শাহজাহানের দেয়ান-ই-আম—মর্মরের তৈরি চারপাশ খোলা একটি বিশাল চত্বর সোনা আর রুপা দিয়ে কারুকাজ করা ছাদের নিচে নানা রঙিন পাথর দিয়ে ইনলে কাজে ফুল-লতা-পাতা তৈরি করে রত্নখচিত একটি উদ্যান তৈরি করা হয়েছে।

শাজাহানাবাদের উদ্বোধন স্মরণীয় করতে দশ দিনব্যাপী জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নতুন দুর্গের মধ্যবর্তী প্রকাণ্ড বাগিচায় গুজরাটের বিখ্যাত তাঁতে বোনা মখমলের দৈত্যাকৃতি শামিয়ানা টাঙাতে তিন হাজার শ্রমিক প্রায় একমাস শক্তিশালী কপিকল আর তার হাতল নিয়ে গলদঘর্ম হয়, সোনার জরি দিয়ে কারুকাজ করা শামিয়ানার নিচে অনায়াসে দশ হাজার অতিথিকে আপ্যায়ন করা সম্ভব। ১৬৪৮ সালের ১৮ এপ্রিল, দরবারের জ্যোতিষীদের বিবেচনায় মাঙ্গলিক হিসেবে বিবেচিত ক্ষণে কাড়া আর নাকাড়ার উদ্দাম ধ্বনিতে চারপাশ মাতিয়ে দিয়ে রাজকীয় বজরা নিয়ে শাহজাহান এসে উপস্থিত হন এবং তার তখন-তাউসে উপবেশন করেন।

সৌভাগ্যবান ইউরোপীয় অভ্যাগতদের ভেতরে যারা এটা নিজের চোখে দেখেছেন তারা সবাই বিকচ-কলাপ ময়ূরের পৃষ্ঠে অধিরোপিত হীরা-মুক্তা-পান্নাখচিত স্বর্ণ নির্মিত সিংহাসন দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। ফ্রায়ার ম্যানরিকের তখত-তাউসের দীপ্তিময় হীরক খণ্ড, অনুরঞ্জিত পান্না আর 'দিব্যসুন্দর' নীলার ঝলক দেখে নিশ্চিতভাবেই আত্মহারা হয়েছিলেন : 'তাই, সবচেয়ে নিখুঁত যা কিছু যদি আমাদের অনুভূতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, ঠিক যেভাবে আমাদের ওপর আপতিত সূর্যের দীপ্তিময় আলোক রশ্মি আমাদের দৃষ্টিপথকে অন্ধকারময় করে; যদি আমাদের শ্রবণশক্তি হতবাক আর বধির হয় সুউচ্চ শিলাখণ্ড থেকে তীব্র বেগে নিচের দিকে ধাবিত জলধারার মন্দ্র গর্জনে; আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় যদি সুগন্ধময় ওষুধি আর প্রাচ্যের মসলার ঘ্রাণে হতবাক হয়ে পড়ে; আমাদের রসনা যদি মধুর মিষ্টত্বের কারণে দুর্বল হয়; আমাদের স্পর্শের অনুভূতি যদি হিমের কারণে অসাড় আর নষ্ট হয়ে যায়;—এতে বিস্ময়ের কি আছে, যে এই সিংহাসনের মতো এত স্মরণীয় আর চমৎকৃত বস্তুর দর্শনে আমার পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে পড়েছিল, আমি সিংহাসন তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণের মূল্যবান প্রকৃতি ভালোভাবে অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছি?'

সপ্তদশ শতাব্দীর সম্ভবত সবচেয়ে ধনাঢ্য, পরাক্রমশালী মোগল সম্রাটের জন্য সিংহাসনটা নিঃসন্দেহে যথার্থ প্রতীক। তার বার্ষিক আয় ছিল ২২০,০০০,০০০ তঙ্কা, তার কোষাগারে স্তূপীকৃত বিরল সব রত্নরাজি আর মূল্যবান ধাতুর মূল্য কোটির হিসাব ছাড়িয়ে বহু দূর এগিয়ে। সিংহাসনটা যদিও, একই সাথে সম্রাটের ক্রমবর্ধমান আর্থিক অনুৎপাদনশীলতার প্রতীক-প্রতিম।

আকবরের সময়ের চেয়ে খাজনার পরিমাণ যদিও তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, নতুন ভূখণ্ড সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করে বা বিদ্যমান মোগল জমিতে কৃষির উন্নত উপকরণ ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি বা বাণিজ্য বিস্তারের মাধ্যমে এটা অর্জিত হয়নি। শাহজাহান অধিকন্তু তার প্রজাদের নিংড়ে এই সমৃদ্ধি সৃষ্টি করেছেন, তিনি রাজকীয় খাজনা সংগ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান ভাবে পীড়াদায়ক হারে খাজনা আদায়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বকাল ক্লান্তিকরভাবে অতিবাহিত হতে থাকলে খাজনা বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে তার প্রজাদের অনেকেই নিজেদের সম্পদ রত্ন আর মূল্যবান ধাতুতে রূপান্তরিত করতে শুরু করে এবং খাজনা আদায়কারীদের কাছে সেগুলো গোপন করতে থাকে—আর্থিক সক্রিয়তার পরিবর্তে এটা আসলে স্থবিরতার নিয়মনির্দেশকারী। খাজনার পরিমাণ যখন তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক সেই সময়েই, আকবরের রাজত্বকালের তুলনায় রাজকীয় ব্যয় চতুর্গুণ হয়েছে।

শাহজাহান তার আব্বাজান জাহাঙ্গীরের ন্যায়, নিজের ওমরাহ আর মনসবদারদের মাঝে খেতাব আর তনখা বা তনখার পরিবর্তে জাগীর বরাদ্দের জন্য আকবরের প্রবর্তিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুসরণ করেন, যা নির্ধারিত হতো তাদের অধীনে নির্দিষ্ট সৈন্যসংখ্যা অনুযায়ী। কৌশলগত আর শক্তিশালী দেশীয় রাজাদের সন্তুষ্ট রাখতে বিদ্যমান রাজনৈতিক চাপের কারণে তিনি অনেকটা বাধ্য হতেন সব সময় তাদের বেশি বেশি খেতাব আর সেই অনুপাতে তনখা বরাদ্দ করতে। তিনি রাজনৈতিক চাপের কারণে বাস্তবতা উপেক্ষা করতে বাধ্য হতেন যে তার সমর্থকরা তাদের খেতাব অনুযায়ী যতজন সৈন্য ভরণপোষণের অধিকারী তারা সেটা কদাচিত অনুসরণ করে। তারা অধিকাংশ সময়েই মূল সৈন্যসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশের ভরণপোষণ করেন। আর রাজকীয় পর্যবেক্ষণের সময় হলে একে অপরের কাছ থেকে ঘোড়া আর সৈন্য ধার করেন। তারা অনেক সময় আবার দুর্নীতিপরায়ণ আধিকারিককে উৎকোচ দেয় ব্যাপারটা গোচরীভূত না করতে আর তারাও এর পরিবর্তে সেই একই আধিকারিক যখন নিজেকে সম্পদশালী করতে প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত খাজনার জন্য জুলম করে সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

শাহজাহান ভালো করেই জানতেন, আয়ের চেয়ে ব্যয় খুব দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। তিনি চেষ্টা করেন খেতাব আর তনখার এই বর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে। বাস্তবে অবশ্য খুব কঠোর অর্থনীতি অনুসরণ করলে তার সমর্থকদের আবার বিরূপ হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে তার গৃহীত সীমিত পদক্ষেপগুলো তহবিলের নির্গমন রোধে সামান্যই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অপ্রতিরোদ্ধ শাহজাহান তার আবেগের বদ্ধ দুয়ার খুলে দেন এবং নিজের মহত্তম স্থাপত্য আলেখনকে বাস্তব রূপ দিতে কোষাগারের সম্পদ উজাড় করে

দেন। ১৬৫০ সালে শাজাহানাবাদে তিনি জাম-ই-মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন, সাম্রাজ্যের বৃহত্তম মসজিদ, যা পরবর্তী ছয় বছরে মোকাম কুর্সি থেকে বেলে পাথর আর মর্মরের তিনটি গম্বুজ আর দুটি গগনস্পর্শী মিনার নিয়ে পূর্ণতা লাভ করে শহরের দৃশ্যপটে জাঁকিয়ে বসে। এ মসজিদই তার বড় মাপের শেষ নির্মাণকার্য হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃতি পাবে।

মহানবী (সা.) একবার স্থাপত্যকলা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'এটা সবচেয়ে অলাভজনক একটি বিষয়, যা মুমিনের সম্পদ গ্রাস করে।' শাহজাহানের রাজত্বকালে তার নির্মিত সমস্ত ইমারতের নির্মাণ ব্যয় নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব কারণ দিনপঞ্জিতে বর্ণিত হিসেবে প্রায়ই উপাদান, উপকরণের মতো অনেক কিছুর খরচই উল্লেখিত হয় না, যেমনটা হয়েছে তাজমহলের ক্ষেত্রে লাহোরি কর্তৃক ৫,০০০,০০০ তঙ্কা উদ্ধৃত করার সময়ে। অবশ্য সতর্ক আর পরিমিত গণনা ইঙ্গিত করে যে, মোগল কোষাগার থেকে প্রদত্ত বার্ষিক খরচের (আরেকটা সংখ্যা, যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুরূহ) ভেতর গড়ে ১০ থেকে ২০ শতাংশ অর্থ ইমারত নির্মাণে ব্যয় করা হতো। মোগল দরবারের রাজকীয় ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করা এবং যোগাযোগ আর সরবরাহ পথ বা সামরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত বা নতুন নির্মাণের চেয়ে ভাবমূর্তির খাতিরে সৌন্দর্যবর্ধন ছিল এসব খরচের উদ্দেশ্য। ইমারত নির্মাণের এই প্রকল্পগুলো তাই কোষাগারের সম্পদ মারাত্মকভাবে হ্রাস করার পাশাপাশি সাম্রাজ্য পরিচালনা, এর সমৃদ্ধি সাধন এবং অভ্যন্তরীণ মতদ্বৈধ ও বহিরাগত শত্রুর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একে শক্তিশালী করার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে সম্রাট আর তার আধিকারিকদের চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। এই ব্যয়বহুল চিত্তবিক্ষেপের পরিণতি পরবর্তী কয়েক বছরের ভেতরেই সম্রাট নিজে ব্যক্তিগতভাবে পরিষ্কার অনুধাবন করেন এবং তার সাম্রাজ্যকে পরবর্তী কয়েক দশক এর জের টানতে হয়।

শাহজাহান প্রায় দুই দশকের সঙ্গী মমতাজকে হারিয়ে নিজেও সব কিছু ভুলে থাকতে গিয়ে সংরব্ধ, পাশব সঙ্গমের মাঝে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে বৃথাই চেষ্টা করে তার মানসিক ক্ষতির জন্য শারীরিক ক্ষতিপূরণের সন্ধান করেন। তার মাত্রাতিরিক্ত যৌন উত্তেজক ব্যবহারের কারণে ভয়ংকর যন্ত্রণার—তার দরবারের ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুসারে, তিনি প্রায় তিন সপ্তাহ এ যন্ত্রণায় কষ্ট পান—সৃষ্টি হয়। তিনি যদিও পরবর্তী সময়ে আর দার পরিগ্রহ করেননি, তার অসংখ্য যৌন সঙ্গীর বিষয়টি ইউরোপীয় অতিথিরা ভীষণ তৎপরতায় প্রকাশ করেছে। অধিকাংশ ভাষ্যই হয়তো অতিরঞ্জিত এবং সুড়সুড়ি দেয়ার

জন্য প্রস্তুত হলেও, সেগুলো প্রকাশিত হবার মাত্রা আর বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, খানিকটা হলেও সত্যের উপাদান রয়েছে। তারা সমানভাবে এটাও বলেন যে, জাহানারার সাথে শাহজাহানের যৌন আবিষ্টতার গুজবটা সম্ভবত সত্যি নয়। জাহানারা যদি শারীরিকভাবে মমতাজের প্রতিভূতে পরিণত হতেন, তিনি তাহলে নিশ্চয়ই এতটা বাছবিচারহীন হতেন না।

ভেনিস থেকে আগত পর্যটক মানুচ্চি মীনা বাজারের মাধ্যমে শাহজাহানকে প্রদত্ত সুযোগ বর্ণনা করেছেন, বলা হয় এখানেই কিশোরী মমতাজকে তিনি প্রথমবারের মতো দেখেছিলেন : 'সেই আট দিন, তাতার রমণীদের দ্বারা বাহিত একটি ছোট সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায়, সম্রাট প্রতিদিন দুইবার প্রতিটি দোকান পরিদর্শন করতেন, তাকে ঘিরে থাকত হারেমের বেশ কয়েকজন বয়স্কা মহিলা, যারা তাদের কলাই করা সোনার লাঠি হাতে নিয়ে হাঁটত, আর উপস্থিত থাকত খোজার দল, সবাই পরবর্তী কেনাবেচার দালাল; সেখানে আরো উপস্থিত থাকত একদল মহিলা সংগীতবিশারদ। শাহজাহান মেলার ভেতর নিবিষ্ট মনে হেঁটে বেড়াতেন এবং তার মনোযোগ আকৃষ্ট করে এমন কোনো বিক্রেতাকে দেখতে পেলে, তিনি সোজা সেই দোকানের দিকে এগিয়ে যেতেন এবং সৌজন্যমূলক আলাপচারিতা শুরু করতেন, তার দোকানের পসরার ভেতর থেকে কিছু জিনিস বাছাই করতেন এবং আদেশ দিতেন দোকানের মালকিন তার পসরার জন্য যে দাম চায় তাই যেন তাকে দেয়া হয়। সম্রাট তারপর পূর্বনির্ধারিত একটি ইশারা করতেন এবং পুনরায় সামনের দিকে এগিয়ে যেতে, হারেমের বয়স্কা মহিলারা, এসব বিষয়ে তারা দারুণ দক্ষ, দোকানি মেয়েটাকে হারেমে আনার ব্যবস্থা করতেন এবং যথাসময়ে তাকে সম্রাটের সামনে হাজির করা হতো। তাদের অনেকেই ভীষণ ধনী আর তৃপ্ত অবস্থায় প্রাসাদ ত্যাগ করলেও, অনেকেই উপপত্নীর মর্যাদায় সেখানেই বাস করতে থাকত।'

মানুচ্চি একই সাথে অবশ্য শাহজাহানের কতিপয় অমাত্যের স্ত্রীর সাথে তার ফষ্টিনষ্টির একটি কর্কশ কিন্তু স্থূলভাবে স্পষ্টভাষী একটি রূপকল্প তৈরি করেছেন। এই মহিলারা যখন সড়ক দিয়ে অগ্রসর হতো, লোকজন উদ্ধত স্বরে তাদের বলত, 'ওহে শাহজাহানের প্রাতঃরাশ! আমাদের কথা মনে আছে! ওহে শাহজাহানের দুপুরের ভোজ! আমাদের উদ্ধার করবে না!'* মানুচ্চি আরো দাবি

---

* রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া লন্ডনে এর মাত্র কয়েক বছর পরেই এখানেও দৃশ্যপট নিয়ে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে দ্বিতীয় চার্লসের অনেক রক্ষিতাই জনগণের কাছে ভীষণভাবে পরিচিত ছিল। নেল গাইনকে, অভিনেত্রী আর প্রাক্তন কমলা-বিক্রেতা, বহনকারী চারদিক বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি উচ্ছৃঙ্খল একদল লোকের

করেন, 'শাহজাহান তার যৌন-কামনার পরম সন্তুষ্টির জন্য বিশ কিউবিট (এক কিউবিট আঠারো থেকে বাইশ ইঞ্চি সমমানের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ) লম্বা আর আট কিউবিট চওড়া একটি বিশাল কামরা নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন, যার ভেতরটা বিশাল সব আয়না দিয়ে সজ্জিত করা। মূল্যবান রত্নপাথর আর কলাইয়ের কাজ ছাড়া, দেড় কোটি তঙ্কা মূল্যের সোনা ব্যবহৃত হয়েছিল, যার কোনো হিসাবই রাখা হয়নি। আলোচিত কামরাটার ছাদে, দুটো আয়নার মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে মুক্তাখচিত সোনার পাত বসানো ছিল। আয়নাগুলোর প্রতিটি কোণে মুক্তার বড় বড় গোছা ঝোলানো ছিল এবং দেয়ালে লাল, হলুদ বা বাদামি রঙের ইয়াশ্‌ব্‌ পাথর ছিল। তিনি তার প্রিয় রমণীর সাথে নিজেকে হয়তো অশ্লীলভাবে দেখতে চেয়েছিলেন তাই হয়তো এত খরচ করা হয়েছিল। সব কিছু দেখে মনে হবে যে, শাহজাহানের কাছে কেবল তাকে আনন্দ দিতে পারবে এমন রমণীর সন্ধান করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

বার্নিয়ের লিখেছেন কীভাবে শাহজাহানের নাচওয়ালি দলের মেয়েরা 'তাদের ভাড়ামি আর বাতুলতা দিয়ে' তার মনোযোগ ভিন্নমুখী করত, যা, তিনি খুঁতখুঁত করে বলেছেন, 'শালিনতার সকল সীমা লঙ্ঘন করেছে।' শাহজাহান অনেক সময়ই এসব নীচু-বংশজাত মেয়েদের কাউকে দেখে এতটাই মুগ্ধ হতেন যে, তিনি হারেমের ভেতর মেয়েটাকে নিয়ে আসার আদেশ দিতেন, নিজের আবেগকে যুক্তিসংগত প্রতিপন্ন করতে অজুহাত হিসেবে বলতেন, 'কোনো দোকান থেকে একটি ভালো দ্রব্য নিয়ে এসো।'

মমতাজের গর্ভে তার যে সন্তানেরা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তার ঔরসে আর কারো গর্ভে কোনো সন্তান জন্ম নেয় না এবং ইউরোপীয়রা অনুমান করে, হারেমের অভ্যন্তরে সম্ভবত গর্ভপাতের কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। মহিমান্বিত যৌন অনুরক্ততার মাঝে বিশ্বাস আর বন্ধুত্বের সংগত, যা মমতাজ আর তার মাঝে বিদ্যমান ছিল তার সমকক্ষ হতে পারে এমন কোনো পরিপূরক সম্পর্ক শাহজাহান নিশ্চিতভাবেই আর খুঁজে পাননি। প্রেমহীন যৌন সম্পর্কের প্রতি তার নিরন্তর পশ্চাদ্ধাবন এবং তার দরবারের অমাত্যদের স্ত্রী আর কন্যাদের প্রতি তার নীতিবিগর্হিত আচরণ সম্ভবত এটাই প্রমাণ করার তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যে, মমতাজ মহল একজন অনন্য রমণী ছিলেন এবং যিনি অনন্য ভালোবাসা লাভের যোগ্য।

দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছিল, যারা ভুলবশত তাকে চার্লসের ঘৃণিত ফরাসি রক্ষিতা, লুসি ডি কেরোআলে বলে মনে করেছিল। নেল গাইন তার গাড়ি থামান এবং নিজের মুখ দেখিয়ে, চিৎকার করে বলেন, 'অনুগ্রহ করে ভদ্রতা বজায় রাখেন। আমি মোটেই সেই ফরাসি নই বরং ইংল্যান্ডেরই বেশ্যা!' জনতা করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে যেতে দেয়।

শাহজাহান তার ইমারত নির্মাণের পরিকল্পনাসমূহ, তার কামনাদগ্ধ শরীরকাণ্ড আর দরবারিক জীবনের প্রতিদিনকার জটিল কৃত্যানুষ্ঠান নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে, সামরিক অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব তিনি বেশি মাত্রায় ক্রমেই নিজের চার ছেলের ওপর ন্যস্ত করতে শুরু করেন। তিনি শুরুর দিকের বছরগুলোতে সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি অবস্থান করতে পছন্দ করতেন, নিজে যদিও প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে আর অবতীর্ণ হতেন না। কিন্তু এখন তিনি দূর থেকে আদেশ জারি করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ১৬৪৮ সাল নাগাদ তিনি যখন শাজাহানাবাদে বাস করতে আরম্ভ করেন, তার চার ছেলেই তখন প্রাপ্তবয়স্ক : দারা শুকোহ্র বয়স তখন তেত্রিশ বছর; শাহ সুজার একত্রিশ; আওরঙ্গজেবের উনত্রিশ এবং মুরাদ বকশের তেইশ। উদারমনের, সৌন্দর্যতাত্ত্বিক আর সংস্কারমুক্ত দারা যতটা না যোদ্ধা তার চেয়ে বেশি বিদ্বজ্জন, নিজের কতিপয় মোগল পূর্বপুরুষদের, বিশেষ করে আকবরের আচরিত ধর্ম সম্বন্ধে যার বৌদ্ধিক ঔৎসুক্য ছিল। তিনি নিজের লেখায় হিন্দু মতবাদের অনুষঙ্গগুলো সুফিবাদের, ইসলামের মরমি ধারা জাহানারার মতো তিনি নিজেও যার একান্ত অনুসারী, সাথে তুলনা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি আবার হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের প্রধান প্রকাশ *উপনিষদ* ফার্সিতে অনুবাদ করেছেন এবং একটি হিন্দু মন্দিরে পাথরের বেড়া নির্মাণ করার জন্য নিজের আব্বাজানকে রাজি করিয়েছেন। দারা কবিতা রচনায় ছিলেন দারুণ দক্ষ আর একজন প্রতিভাবান চারুলিপিকর। তিনি অবশ্য একই সাথে ছিলেন ভীষণ আত্মদর্পী। বার্নিয়ের মনে করেন, ভদ্র আর সংস্কারমুক্ত হলেও, 'দারা নিজের সম্বন্ধে অনেক বেশি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন; আর মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন নিজের মনের আধ্যাত্মিক শক্তির জোরে তার পক্ষে সব কিছু অর্জন করা সম্ভব।'

বার্নিয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, শাহ সুজার চরিত্রের সাথে দারার অনেক দিক দিয়ে সাদৃশ্য থাকলেও রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি বিচক্ষণ। দারা যখন সবার পরামর্শকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অভিজাতদের সাথে সম্পর্ক বিকাশের কোনো তোয়াক্কা করতেন না, দরবারের রাজনীতিকে নিজের চেয়ে অনেক নীচু মনে করতেন, শাহ সুজা সেখানে ছিলেন দক্ষ ষড়যন্ত্রকারী। তিনি জানতেন কীভাবে দরকারি বন্ধুবান্ধব সংগ্রহ করতে হয়। তিনি আবার একই সাথে ছিলেন 'নিজের ভোগসুখের ক্রীতদাস; এবং নিজের পছন্দের স্ত্রীলোকদের দ্বারা একবার পরিবেষ্টিত হলে, যাদের সংখ্যাও নেহাত অল্প নয়, তিনি সারাটা দিন নাচগান-পান-হল্লার মাঝে অতিবাহিত করতে পারতেন।'

আওরঙ্গজেবের মাঝে তার বড় দুই ভাইয়ের মতো ভদ্র, বিনয়ী সভ্যাচারের অভাব ছিল। সমসাময়িক কালের নথিপত্রে বর্ণিত যোগ্য, একাগ্রচিত্ত, কিন্তু কখনো কখনো বিষাদবায়ুগ্রস্ত মানুষ। যিনি বার্নিয়ের ধারণা অনুসারে, 'চাপা স্বভাবের, চতুর, কুশাগ্রবুদ্ধি আর নিজের প্রকৃত মনোভাব গোপন করার বিদ্যায় একজন প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদ।' ফরাসি চিকিৎসক আর পর্যটক তার বিরুদ্ধে 'গোপনে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা করার সময় পার্থিব মহিমার প্রতি বিরাগ' প্রদর্শনের অভিযোগ করেছেন। আওরঙ্গজেব নিশ্চিতভাবে ধূর্ত আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও, একই সাথে ছিলেন সশঙ্ক আর ভ্রমগ্রস্ত—এ কারণে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে দারাকে তিনি যখন অভিযুক্ত করেন তখন দারার সাথে তার সেই অসাধারণ ঝগড়া। দারার মতো তিনিও ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু ভাইয়ের উদার, অনুসন্ধিৎসু, সবাইকে আপন করে নেয়া মরমিবাদের পরিবর্তে, যা তিনি সর্বান্তকরণে ঘৃণা করতেন, আওরঙ্গজেব ছিলেন অনাড়ম্বর, গোঁড়া সুন্নি ইসলাম ধর্মের প্রচণ্ড সমর্থক। গুজরাটের সুবেদার থাকাকালীন তিনি একটি জৈন মন্দিরের সম্পত্তি জবরদখল করার পাঁয়তারা করেছিলেন, যতক্ষণ না দারা তাকে বাধা দেন।

ভাইদের ভেতরে, শাহজাহানের সাথে আওরঙ্গজেবের সম্পর্কই সবচেয়ে জটিল ছিল, যাকে তিনি সব সময় প্রীত করার চেষ্টা করলেও তার কপালে প্রায়ই রূঢ় প্রত্যাখ্যান জুটত। জাহানারার কাছে লেখা তার চিঠিগুলোয় প্রকাশ পায় যে, তার আব্বাজান তাকে 'আস্থা আর ভরসার অযোগ্য' মনে করেন। 'হায়! হায়! আমার রাশিচক্র কত দুর্ভাগা আর অসুখী এবং অমার্জিত', তিনি বিলাপ করেছেন। ভেনিসের পর্যটক মানুচ্চি সঠিকভাবেই আওরঙ্গজেবের বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ নির্দেশ করেন যখন তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে যুবরাজ জানেন তার আব্বাজান 'ভালোবাসেন না।' মোগল পিতা আর পুত্রের মাঝে সম্পর্কের পূর্ববর্তী টানাপড়েন আওরঙ্গজেবের অবস্থানের মাঝে প্রতিভাত হয়েছে। জাহাঙ্গীর তার আব্বাজান আকবর দ্বারা অসমাদৃত আর উপেক্ষিত বলে অনুভব করতেন, যখন শাহজাহান আবার জাহাঙ্গীরের মাঝে অবিশ্বাস আর অসন্তোষের জন্ম দিয়েছেন।

মুরাদ বকশ, শাহজাহান আর মমতাজের সর্বকনিষ্ঠ জীবিত সন্তান, ছিল আকর্ষণীয়, হঠকারী ও দাম্ভিক একজন ব্যসনবিলাসী, যার 'একমাত্র চিন্তা' আবারও বার্নিয়ের ভাষ্য অনুসারে, 'সে কীভাবে নিজেকে আরো আমোদপ্রমোদে মশগুল রাখতে পারে।' সে শিকার করতে পছন্দ করত, রাজনৈতিক চক্রান্তকে অবজ্ঞার চোখে দেখত এবং দাবি করত, 'সে কেবল তার তরবারি আর তার হাতের শক্তির ওপর আস্থাশীল।' ১৬৪৬ সালে শাহজাহান এই মুরাদ বকশের ওপরই অবশ্য নির্ভর করতে চেয়েছিলেন।

শাহজাহান মনে মনে তার পূর্বপুরুষদের মতো, ময়ূরকণ্ঠী-নীল-গম্বুজের শহর সমরকন্দ—'তার মহান পূর্বপুরুষ তৈমূরের রাজধানী আর বাসস্থান' পুনরায় উজবেকদের কাছ থেকে দখলের আকাঙ্ক্ষা বহন করতেন। উজবেকদের ভেতরে মারাত্মক অন্তর্কলহ তাকে সেই সুযোগ প্রদান করে এবং তিনি ৫০,০০০ অশ্বারোহী আর ১০,০০০ তবকি, হাউই-নিক্ষেপক আর তোপচির বিশাল একটি বাহিনীর নেতৃত্ব মুরাদের ওপর দিয়ে তাকে প্রেরণ করেন তার বহুদিনের পুরাতন একটি স্বপ্ন সফল করতে। এমন একটি বাহিনীকে অগ্রসর হতে দেখে স্থানীয় সব শাসক পালিয়ে গেলে, অক্সাস নদী পর্যন্ত পথ উন্মুক্ত হয়। মুরাদ প্রাচীন শহর বালখ দখল করে কিন্তু তারপর সে সেখানেই আটকে থাকে, যদিও সেখান থেকে মাত্র ১৭০ মাইল উত্তরে সমরকন্দের অবস্থান।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটা শাহজাহান তার ছেলেকে সামনের দিকে অগ্রসর হবার জন্য অনুরোধ করেন, তাকে সমরকন্দের সুবেদার নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু আমোদপ্রিয় মুরাদ তার পূর্বপুরুষদের বুনো, অনুর্বর এলাকার প্রতি তার আব্বাজানের মতো কোনো ধরনের আবেগপ্রবণ নৈকট্য অনুভব করে না এবং অগ্রসর হতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, বরং অনাহূতের ন্যায় লাহোরে ফিরে আসে। ক্রুদ্ধ শাহজাহান তার খেতাব কেড়ে নেন এবং রাজদরবারে তার উপস্থিতির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। মধ্য এশিয়ায় অভিযানের বিষয়ে মুরাদের মনোভাব অবশ্য মোগল বাহিনীর অনেকের মাঝেই বিদ্যমান ছিল—রাজপুতদের একটি বাহিনী সিন্ধু নদ পর্যন্ত ফিরে এলে, তাদের ফিরতি পথে পুনরায় ফেরত পাঠানো হয়। লাহোরি যেমন লিখেছেন, পুরো অঞ্চলটাই কেমন যেন অতিমাত্রায় বৈরী : 'স্বদেশের প্রতি স্বাভাবিক টান, ফিরে যাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ এবং হিন্দুস্তানের রীতি, লোকজন অপছন্দ করায়...এবং আবহাওয়ার তীব্রতা' তাদের সংকল্পকে দুর্বল করে তোলে।

আওরঙ্গজেবের মাঝে সংকল্পের কোনো ঘাটতি ছিল না। শাহজাহান তাকে গুজরাট থেকে ডেকে পাঠান এবং তাকে অভিযানের নেতৃত্ব দেন কিন্তু তার পক্ষেও আশানুরূপ ফলাফল আনয়ন করা সম্ভব হয় না। উজবেক আর তুর্কমানদের কাছে নাজেহাল আর নাকাল হয়ে, তিনি কার্যকর কোনো অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হন, যদিও তিনি নিজের সাহসিকতা আর ধার্মিকতার কারণে নিজ বাহিনীর সৈন্যদের বিস্ময়াভিভূত শ্রদ্ধা অর্জন করেন, যখন যুদ্ধের তীব্রতার মাঝে, আসরের নামাজের ওয়াক্তে তিনি কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে জায়নামাজ বিছিয়ে অধোমুখে নিজেকে নামাজে সমর্পিত করেন। ১৬৪৭ সালের গ্রীষ্মকালের শেষদিকে শীতের তুষারপাতে তার ফিরে যাবার পথ রুদ্ধ হবার আগেই তিনি কাবুলের দিকে ফিরে আসতে থাকেন কিন্তু তার পরও পাহাড়ের শীতল আবহাওয়ায় তার হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। এই

ব্যর্থ অভিযানে ব্যয় হয়েছিল ২০,০০০,০০০ তঙ্কা এবং মোগল সাম্রাজ্যে এক ইঞ্চি নতুন এলাকাও যুক্ত হয়নি। এটাই ছিল শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথম মারাত্মক সামরিক বিপর্যয়, একই সাথে সম্রাটের ইমারত নির্মাণের ব্যয়ভারের কারণে ইতিমধ্যে চাপের ভেতরে পড়া কোষাগারের জন্য একটি অপ্রীতিকর বার্তা।

অন্যান্য আরো মারাত্মক আর ব্যয়বহুল ব্যর্থতা পেছন পেছন এসে হাজির হয়ে, শাহজাহানের সম্পদ আরো সংকুচিত করে ফেলে। শাহজাহান এক দশক পূর্বে সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত কান্দাহার পারস্যের কাছ থেকে পুনর্দখল করেছিলেন। পারস্যের শাহ্ অবশ্য কান্দাহার পুনর্দখল করতে মোগলদের সমরকন্দ অভিযানের বিপর্যয়ের সুযোগ নেন। ১৬৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, মাত্র সাতান্ন দিনের অবরোধের পরই, কান্দাহারে মোতায়েন করা ৭০০০ মোগল সৈন্যের শক্তিশালী রক্ষীসেনা দল, দিনপঞ্জির রচয়িতারা যেমনভাবে বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেছেন, 'মনোবলের অভাবের কারণে' নিজেদের জান বকশের বিনিময়ে পারস্যের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

তার কান্দাহার শহররক্ষী দল এত সহজে আত্মসমর্পণ করবে সে সম্বন্ধে অনবহিত, শাহজাহান সেখানে পারস্য বাহিনীর হামলার সংবাদ জানতে পেরে ইতিমধ্যে কান্দাহারের নিরাপত্তা বিধানে ৫০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনীর প্রধান করে আওরঙ্গজেবকে প্রেরণ করেন। তীব্র শীতের কারণে আওরঙ্গজেবের দ্রুত পাহাড় অতিক্রম করা বাধাগ্রস্ত হওয়ায়, তিনি মে মাসের মাঝামাঝি সময়ের আগে কান্দাহার পৌঁছাতে পারেন না, বিজয়ানন্দে উৎফুল্ল পারস্য বাহিনী তিন মাস পূর্বেই শহর দখল করে নেয়। আওরঙ্গজেব কান্দাহার অবরোধ করেন, কিন্তু ভারী কামানের অভাবে শহরের প্রতিরক্ষা প্রাচীরে ফাটল সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন এবং সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকেই অবরোধ তুলে নেন। তিন বছর পর, ১৬৫২ সালে আবারও চেষ্টা করেন এবং সেবারও তিনি ব্যর্থ হলে, শাহজাহানের আদেশে মাত্র দুই মাস পরই তাকে ফিরে আসতে হয়। শাহজাহান ব্যর্থতার জন্য আওরঙ্গজেবকে এককভাবে দায়ী করেন, ক্ষুব্ধ হয়ে ছেলেকে লেখেন, 'এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে, এত আয়োজন সত্ত্বেও দুর্গটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়নি।' আওরঙ্গজেব যখন পুনরায় চেষ্টা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন, তার আব্বাজান পাল্টা খোঁচা দেন যে, তিনি যদি আওরঙ্গজেবকে কান্দাহার দখল করতে সক্ষম বলে বিবেচনা করতেন, 'সৈন্যবাহিনীকে তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন না।'

সেই বছরের ডিসেম্বরে, আগ্রার ওপর দিয়ে অতিক্রম করার সময়, আওরঙ্গজেব তার আম্মিজানের মকবরায় আসেন 'জিয়ারতের নেকি' অর্জন করতে এবং সম্ভবত আম্মিজানকে স্মরণ করতে, যার স্নেহ ছিল শর্তহীন। তিনি তাজমহলের

ভেতরে পানি চুইয়ে প্রবেশ করার বিষয়টি আবিষ্কার করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং সাথে সাথে শাহজাহানকে চিঠি লিখে জানান : 'এই পবিত্র প্রাঙ্গণের ইমারতগুলো সম্রাটের উপস্থিতিতে যখন সমাপ্ত হয়েছিল তখনকার মতোই সুস্থিত অবস্থায় রয়েছে। অবশ্য পবিত্র মকবরার ওপরের গম্বুজটার উত্তর পার্শ্ব দিয়ে বর্ষার মৌসুমে পানি প্রবেশ করে এবং চারটা প্রতিহার, দ্বিতীয় তলার অধিকাংশ চোরকুঠরি, চারটা ছোট গম্বুজ, উত্তর প্রান্তের চারটা উপপ্রকোষ্ঠ...স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। বিশাল গম্বুজটার মর্মর পাথরে আবৃত ছাদের দুটি কি তিনটি স্থান দিয়ে এবারের বর্ষায় পানি প্রবেশ করেছে। স্থানগুলো মেরামত করা হয়েছে, কিন্তু আগামী বর্ষায় কী ঘটবে সেটা দেখার জন্য আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে দেখতে হবে।' তিনি সর্বস্ব হারাবার মতো শোকে অধীর হয়ে যোগ করেন, ইমারত নির্মাতারা 'বড় গম্বুজটা মেরামত করার উপায় বের করতে নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করেছে।' হে পুণ্যাত্মা, তোমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও! কারো কুদৃষ্টির কারণে এমন চমৎকার ইমারতটার এমন দুর্দশা!' তিনি আরো জানান, তাজের বিপরীত দিকে যমুনার তীরে অবস্থিত উদ্যান, যেটা মাহতাব বাগ নামে পরিচিত, বন্যার পানিতে সেটা 'পুরোপুরি প্লাবিত হয়েছে, এবং সে কারণে পুরো উদ্যানটাই শ্রীহীন হয়ে পড়েছে', যদিও অষ্টভুজাকৃতি জলাধার আর তার চারপাশের চত্বর এখনো ভালো অবস্থায় রয়েছে। তিনি শাহজাহানকে দ্রুত কোনো পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ করেন। এই বলে তাড়া দেন যে, 'পরিস্থিতি সংশোধনে সম্রাটের মনোযোগের একটি কিরণ যদি আপতিত হয়, সেটা তাহলে যথার্থ হবে।' গম্বুজকে পানিনিরোধক এবং ভিতকে শক্ত করতে তখন স্পষ্টতই বিশাল আয়োজন শুরু হয়।

১৬৫৩ সালে শাহজাহান তৃতীয়বারের মতো কান্দাহার পুনর্দখলের চেষ্টা করেন। তার সৈন্যবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব এবার তিনি দারা শুকোহ্‌কে দেন। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র, যিনি বেশির ভাগ সময় তার আব্বাজানের সাথেই অতিবাহিত করেছেন, কদাচিৎ যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন কিন্তু অথবা সেই অনভিজ্ঞতার কারণেই হয়তো বড়াই করে বলেন, এক সপ্তাহের ভেতরে তিনি কান্দাহার দখল করবেন। শাহজাহান যুবরাজকে ৭০,০০০ সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী, বিপুলসংখ্যক কামান আর অভিজ্ঞ ইউরোপীয় ভাড়াটে গোলন্দাজ দেন তার দাবিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে। কিন্তু এর পরও এসব কোনো কাজে আসে না। পাঁচ মাসব্যাপী প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করেও দারা শহরের মাটির তৈরি প্রতিরক্ষা প্রাচীরে ফাটল সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন, যা কোনো কোনো স্থানে ত্রিশ ফিট পর্যন্ত চওড়া। মোগলরা কখনো কান্দাহারের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না।

কান্দাহার দখল করার অভিপ্রায়ে পরিচালিত তিনটি ব্যর্থ অভিযানে ব্যয় হয়েছিল ১২০,০০০,০০০ তঙ্কা, পরিমাণে এটা শাহজাহানের বার্ষিক খাজনার অর্ধেকেরও বেশি। কিন্তু অর্থনাশের চেয়ে সম্মানহানি অনুভূতিকে অনেক বেশি আঘাত দেয়। শাহজাহান, যিনি যুবরাজ হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে বহু বিজয়ের নায়ক, ব্যর্থতা তাকে ক্ষুব্ধ করে। সাফল্য লাভে ব্যর্থতাজনিত হতাশার কারণে কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি তার স্নেহে কোনো ধরনের হেলদোল সৃষ্টি করে না এবং তিনি দারাকে আরো বেশি ক্ষমতা প্রদান করেন। ১৬৫৪ সালে নিজের চৌষট্টিতম চান্দ্র জন্মদিন উদ্‌যাপনের সময় শাহজাহান বিশেষ একটি খেতাবে দারাকে অভিষিক্ত করে প্রতীত উত্তরাধিকারী, যুবরাজ হিসেবে তাকে পুর্নব্যক্ত করেন এবং তাকে 'সম্রাটের মহিমাময় মসনদের নিকটে সোনালি একটি চেয়ারে উপবেশনের' আদেশ দেন। দারার এই সময়ের প্রতিকৃতিতে তাকে চিত্রিত করার সময় তার সুদর্শন মুখাবয়বের চারপাশে একটি কোমল জ্যোতিশ্চক্র দেখানো হয়েছে, যা তার মর্যাদাকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

আওরঙ্গজেবকে এসব কিছুই প্রভাবিত করতে পারে না, শাহজাহান ইত্যবসরে যাকে দ্বিতীয়বারের মতো দাক্ষিণাত্যের সুবেদার হিসেবে বহাল করেন এবং দক্ষিণের উদ্দেশ্যে তিনি রওনাও হন। পিতা বা পুত্র কেউই জানতে পারলেন না, যদিও তাদের জীবনে খেরোখাতায় এখনো বহু বছরের হিসাব লেখা বাকি রয়েছে কিন্তু তারা আর কখনো পরস্পরের মুখোমুখি হবেন না। ত্রিশ বছর পূর্বে শাহজাহানের বিদ্রোহের পর মমতাজ আর শাহজাহান বাধ্য হয়েছিলেন নূরজাহানের তত্ত্বাবধায়নে অনিশ্চয়তার হাতে দারা আর আওরঙ্গজেবকে সমর্পণ করতে। সেই সময়ের শোকার্ত দৃশ্যকল্পের সাথে তাদের মধ্যকার সম্পর্কের বর্তমান টানাপড়েনে সুস্পষ্ট ও অরুন্তুদ বৈসাদৃশ্য। জাহাঙ্গীর যখন শাহজাহানকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেছিলনে ঠিক তখনকার মতো, এখন শাহজাহানও আওরঙ্গজেবের প্রতি সামান্যই আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন, তাকে নিয়মিত চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার মতো তাচ্ছিল্য আর উপেক্ষা করেন, এমনকি দাক্ষিণাত্যে তার পছন্দের আমবাগান থেকে বাছাই করা সেরা আমগুলো প্রেরণে ব্যর্থ হয়েছেন বলে দোষারোপ করেন। আওরঙ্গজেব যখন তার দাক্ষিণাত্যের প্রশাসনের জন্য বাড়তি অর্থ প্রেরণের অনুরোধ জানান, তার আব্বাজান অর্থ প্রেরণ করতে অসম্মত হন, তাকে বরং প্রবর্তনা দেন উন্নত চাষাবাদ এবং খাজনা আদায়ে আরো দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে।

আওরঙ্গজেবকে এসব উপায় মোটেই আগ্রহী করতে পারে না। তিনি সিদ্ধান্ত নেন বিজয় অর্জনের মাধ্যমে প্রভুত্ব স্থাপন করে নিজের খালি পেটিকা ধনসম্পদ

দিয়ে আবার পূর্ণ করবেন। সম্পদশালী গোলকুণ্ডা রাজ্য, ১৬৩৬ সালে যারা মোগল অধিরাজত্ব অনিচ্ছার সাথে মেনে নিয়েছিল, সেখানকার সমৃদ্ধ সোনা আর হীরার খনি এবং বিলাসপ্রিয় আর নিরুদ্যম সুলতানের কারণে সম্পদ আহরণের বেশ নধর মক্কেল বলে প্রতীয়মান হয়। আওরঙ্গজেবের আক্রমণের অজুহাত ১৬৩৬ সালের চুক্তি অনুসারে গোলকুণ্ডার কাছ থেকে প্রাপ্য কর প্রদানে বিলম্ব এবং তা ছাড়া আরো আছে মোগলদের অনুমতি ব্যতিরেকে গোলকুণ্ডার কর্ণাটকে—দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণে কৃষ্ণা আর কাবেরী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য—অধিক্রম পরিচালনা করা।

১৬৬৫ সালের গোড়ার দিকে, আওরঙ্গজেব তার ষোলো বছর বয়সী পুত্র মাহমুদ সুলতানের অধীনে একটি বাহিনী গোলকুণ্ডায় প্রেরণ করেন এবং নিজে আরেকটা বিশাল বাহিনী নিয়ে তাকে অনুসরণ করেন। বাস্তবতা হলো, গোলকুণ্ডার সন্ত্রস্ত সুলতান ইতিমধ্যে তার সব দাবি মেনে নিলেও আওরঙ্গজেবের পরিকল্পনাকে সেটা কোনোভাবে প্রভাবিত করে না। আওরঙ্গজেব তার ছেলেকে আদেশ দেন, যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় তবে সুলতানকে হত্যা করতে বা তিনি আরো মার্জিতভাবে নিজের অভিপ্রায় যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'তার (সুলতানের) গ্রীবাকে মস্তিষ্কের বোঝা থেকে মুক্তি দেয়া।' আতঙ্কিত সুলতান তার আকর্ষণীয় নতুন রাজধানী হায়দ্রাবাদ ফেলে পশ্চিমে গোলকুণ্ডার দুর্গের দিকে পালিয়ে যান এবং আওরঙ্গজেবের করুণা ভিক্ষা করতে মূল্যবান উপহার, আপসমূলক বার্তা, এমনকি নিজের মাকে পর্যন্ত পাঠিয়ে দেন। সুলতান দারার কাছেও সাহায্যের জন্য অনুরোধ পাঠান, যিনি শান্তিপ্রিয় আর ক্ষমাশীল স্বভাবের, সেইসাথে যুক্তিবহির্ভূতভাবে অন্ধবিশ্বাসী হবার কারণে আওরঙ্গজেবকে অপছন্দ করায়, ভাইয়ের অভিপ্রায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে তিনি পরিস্থিতির ভেতর হস্তক্ষেপ করেন।

আওরঙ্গজেবও সেই সময়ে গোলকুণ্ডার বিপুল ঐশ্বর্যের কথা এবং সাম্রাজ্যের সাথে রাজ্যটার সংযুক্তির জন্য তাগিদ জানিয়ে প্রলুব্ধকারী ভাষায়, তার আব্বাজানের সমর্থন আদায়ে চিঠি লিখতে ব্যস্ত। 'এই রাজ্যটার সৌন্দর্যের বিষয়ে আমি কী লিখব', তিনি হন্তারকের ছুরি সরিয়ে মিষ্টিভাষী হতে চেষ্টা করেন : 'এখানের পানি আর লোকের অতিপ্রাচুর্যের কথা, চমৎকার বাতাসের কথা, এবং এখানের ব্যাপক চাষাবাদের কথা?...দারুণ অর্থকরী একটি দেশ!' শাহজাহান তার প্রায় তলানিতে গিয়ে পৌছানো কোষাগারের ওপর অনেক চাপ সত্ত্বেও, তিনি অবশ্য মোটেই প্ররোচিত হন না। তিনি বরং দারার পরামর্শ শোনেন, যুক্তি দিয়ে সম্রাটকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, সুলতানের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় পৌছানোটা একাধারে অনেক বেশি ন্যায়ানুগের পাশাপাশি অনেক বেশি দূরদর্শী হবে। শাহজাহান এই আলোচনার ফলস্বরূপ

আওরঙ্গজেবকে গোলকুণ্ডা রাজ্যের সংযুক্তির অনুমতি দিতে অসম্মতি জানান। তিনি বরং তাকে সুলতানের নিরাপত্তা-প্রতিবিধানের প্রস্তাব গ্রহণ এবং কালবিলম্ব না করে গোলকুণ্ডা ত্যাগ করার আদেশ দেন। তিনি আওরঙ্গজেবকে সুলতানের ধনরত্ন অধীকৃত করার অভিযোগ করেন, গোলকুণ্ডার নিরাপত্তা-প্রতিবিধানের অংশ দিতে অস্বীকার করেন এবং তার আদেশের আওতার বাইরে যাবার জন্য তিরস্কার করেন।

আওরঙ্গজেব নিশ্চিতভাবেই তাচ্ছিল্য অনুভব করেছিলেন। তিনি মেনে নেন আব্বাজানের আদেশ পালন করা ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই এবং নিতান্ত অনীহার সাথে ফিরে যান। তিনি অবশ্য ফিরে যাবার পূর্বে সুলতানকে চাপ দিয়ে তার ছেলে, মাহমুদ সুলতানের সাথে সুলতানের এক মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি করান। তিনি সেইসাথে একটি গোপন প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নেন যে, সুলতান তার নতুন জামাতাকে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করবেন। আওরঙ্গজেব নিজের চারপাশে আরেকটা মক্কেলের খোঁজে তাকালে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী দৃষ্টি বিজাপুরের ওপর নিবদ্ধ হয়, যা ১৬৩৬ সালে গোলকুণ্ডার মতোই মোগলদের শান্তি চুক্তি করেছিল এবং রাজ্যটা, গোলকুণ্ডার মতোই, মাঝের বছরগুলোয় অনেক বিত্তশালী হয়। ১৬৫৬ সালে বিজাপুরের রাজা মৃত্যুবরণ করার পরে সেখানে সৃষ্ট আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ছিল এবারের অধিক্রমের অজুহাত।

শাহজাহান এবার আওরঙ্গজেবকে ইচ্ছামতো চলতে দেন। সম্রাটের মনোভাবের এই আকস্মিক পরিবর্তনের পেছনে একটি কারণ ছিল পারস্য থেকে তার দরবারে সম্প্রতি এক ধনবান আর দুঃসাহসিক অভিযাত্রিকের আগমন, মীর জুমলা, যিনি গোলকুণ্ডার সুলতানের সাথে কলহ করে চলে আসার আগে সম্প্রতি তার উজির হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মীর জুমলা গোলকুণ্ডা আর বিজাপুর থেকে নিয়ে আসা হীরকখণ্ড, পোখরাজ আর পদ্মরাগমণি বিশেষ ধূর্ততার সাথে শাহজাহানকে উপহার দেন।* আলো ঝলমলে রত্নপাথরের স্তূপ সম্রাটের মনে দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্ম দেয় যে, অতীতের ন্যায় কেবল মোগল অধিরাজত্ব আরোপ করে খাজনার জন্য তাদের দোহন করার পরিবর্তে রাজ্যগুলোর সংযুক্তি অনেক অর্থবহ। তিনি মীর জুমলাকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে নিয়োগ দেন এবং আওরঙ্গজেবকে বিজাপুরের ওপর সর্বশক্তিতে আক্রমণ পরিচালনার অনুমতি দেন। শাহজাহান তার ছেলেকে চিঠি

* মানুচ্চি লিখেছেন, মীর জুমলা 'একটি বিশাল অকর্তিত হীরক খণ্ড যার ওজন করা হয়েছিল তিনশ ষাট ক্যারাট' শাহজাহানকে উপহার দিয়েছিলেন এবং বার্নিয়ের একটি 'প্রসিদ্ধ হীরক খণ্ড যার সৌন্দর্য আর আকার সাধারণত অনুপম বিবেচনা করা হতো' লিখেছেন। এই হীরক খণ্ডটাই সম্ভবত কোহ-ই-নূর, যা পারস্য থেকে পালিয়ে আসার সময় কোনো একভাবে মীর জুমলার হস্তগত হয়েছিল।

লিখে জানান, তিনি যদি সফল হন তাহলে গোলকুণ্ডা রাজ্য সংযুক্তির রাজকীয় ফরমানও তাকে প্রদান করা হবে।

১৬৫৭ সালের গোড়ার দিকে, মীর জুমলাকে সাথে নিয়ে, বিজাপুরের সেই সব আধিকারিক, যারা ১০০ জন লোক নিয়ে স্বপক্ষ ত্যাগ করবে তাদের প্রত্যেককে ২,০০০ তঙ্কা উৎকোচের প্রস্তাব দিতে দিতে, আওরঙ্গজেব ধীরে এবং সুসংবদ্ধভাবে অগ্রসর হতে থাকেন। আওরঙ্গজেব ঠিক তার আব্বাজানের মতোই নিজেও ব্যক্তিগতভাবে একজন সাহসী যোদ্ধা—তিনি চৌদ্দ বছর বয়সেই তাকে পদদলিত করার ঠিক আগ মুহূর্তে স্থির মস্তিষ্কে আর চমৎকারভাবে একটি ক্রোধোন্মত্ত হাতির মুখোমুখি হয়ে ক্রুদ্ধ প্রাণীটার দিকে তার হাতের বর্শাটা ছুড়ে মেরেছিলেন। তার সমরাভিযান পরিচালনার ধীর, সুসংবদ্ধ প্রয়াস অবশ্য শাহজাহানের বেপরোয়া, ঝটিকা আক্রমণের সামরিক রীতির থেকে আলাদা। বর্ষাকাল শুরু হবার পূর্বে লক্ষ্য অর্জনে আওরঙ্গজেবের সাফল্য নিয়ে শঙ্কিত হয়ে এবং আরো একবার দারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শাহজাহান মত পরিবর্তন করেন এবং তার ছেলেকে বিজাপুরের সাথে সন্ধি করার, যেখানে বিজাপুর মোগলদের বিশাল অঙ্কের নিরাপত্তা-প্রতিবিধান প্রদানে সম্মত হয় এবং তাদের বেশ কিছু দুর্গের কর্তৃত্ব সমর্পণ করে এবং বিজাপুরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে, সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে আসার আদেশ দেন। আওরঙ্গজেব আরো একবার অনীহার সাথে আদেশ পালন করেন।

※

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযান দৃষ্টি আকর্ষক হয়নি কিন্তু এই অভিযানের ফলে পুরো অঞ্চলটা আরো পরাভূত হয় এবং মধ্য এশিয়ায় বরণ করা দুর্ভাগ্য এবং কান্দাহার পুনর্দখল প্রয়াসের বিপর্যয়ের ক্ষতি খানিকটা হলেও পূরণ করে। ভবিষ্যতে আর কোনো সামরিক অভিযান, যার হয়তো প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, পরিচালনার জন্য লড়াকু সন্তানদের একটি ঝাঁক সাথে থাকায়, আর বিশেষ করে তার বয়সও বার্ধক্যের কাছে চলে আসায়, এই সময়টা নিশ্চিতভাবেই শাহজাহানের জীবনের একটি শান্তিময় পর্ব, তাকে তার জীবনের মহত্তম স্থাপত্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ দেয় এবং আগ্রা পরিদর্শনের সময়, তার তৈরি করা মর্মরের মকবরায় মমতাজের জন্য, মোনাজাত করার তৌফিক দেয়। ১৬৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সব হিসাব পাল্টে দিয়ে সাতষট্টি বছরের সম্রাট মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এটা ছিল মহামান্য সম্রাটের নশ্বরতার ইঙ্গিত, যার জন্য তার তিন যুবক ছেলে অপেক্ষা করছিলেন এবং এর সাথেই শেষ হয়ে যায় তার সহজ মাধুর্যময়, পরিতৃপ্ত বার্ধক্য জীবন অতিবাহিত করার আশা।
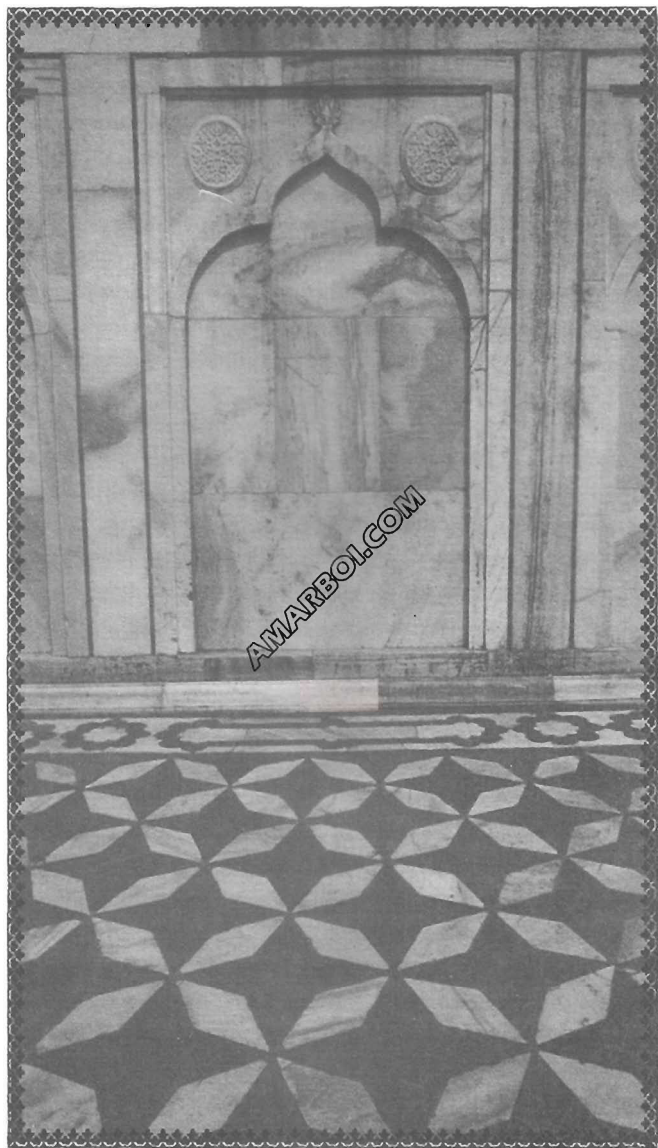
চতুর্দশ অধ্যায়

সাপের দাঁতের চেয়েও শানিত

অগ্নিগর্ভ দৃশ্যকল্প নির্মাণের সব প্রস্তুতি সমাপ্ত হয়েছে। বিয়োগান্ত নাটকের কোনো জ্যাকবীয় রচয়িতা কিং লিয়ারের ন্যায়, প্রৌঢ়, দোষযুক্ত লিয়ারের ন্যায় শাহজাহানের চেয়ে আরো বিশ্বাসযোগ্য কেন্দ্রীয় চরিত্র সৃষ্টি করতে হিমশিম খেয়ে যেতেন। তিন দশক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার পরে তিনি তার সৃষ্টি করা মহিমাময় আর অবেধ্য রাজকীয় ভাবমূর্তি আর শাসন করা তার ঐশ্বরিক অধিকার হিসেবে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন। তিনি অবশ্য রাজ্য পরিচালনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়গুলো অবহেলা করেন, তার অমাত্যদের ওপর সেসব দায়িত্ব অর্পণ করেন, যারা সাম্রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির চেয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত অবস্থান আর সমৃদ্ধির দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি যুদ্ধযাত্রা পরিত্যাগ করে সামরিক অভিযানের দায়িত্ব নিজের ছেলের, বিশেষ করে ছোট তিন সন্তানের ওপর ন্যস্ত করেন। তিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধনে তার পিতামহ আকবরের ন্যায় একনিষ্ঠ বলিষ্ঠতা প্রদর্শন করেননি, যার জীবন দর্শন যে 'একজন সম্রাট সব সময় বিজয় অর্জনে একায়ত থাকবেন, নতুবা তার প্রতিবেশীরা তার বিরুদ্ধে এক জোট হয়ে উঠবে' অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ আর বহিঃশত্রুর হুমকি প্রশমিত করতে দারুণ কার্যকর ছিল।

সর্বোপরি, এক ধরনের মানসিক অবসাদে গুটিয়ে গিয়ে, '*তখত তক্তা?*—'সিংহাসন বা শবাধার?' এই প্রবচনের মধ্যে বিবৃত মোগল ইতিহাসের নির্যাস ক্রমেই তার কাছে অব্যাপ্য হয়ে ওঠে। ক্রমাগতভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম উচ্চাকাঙ্ক্ষী সন্তানেরা তাদের পিতাকে শ্রেষ্ঠত্বর দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছেন : আকবরের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীর বিদ্রোহ করেছিলেন; তিনি নিজেও জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সৎভাই হামেশাই সৎভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন। কামরান, হিন্দাল আর আসকারিকে পরাভূত করতে নম্র আর অমায়িক হুমায়ুনকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। শাহজাহান আরো এক কাঠি

সরেস, সৎভাই খসরু আর পুত্রহীন শাহরিয়ারকে হত্যা করার পর, আপদের বালাই না রাখার সংকল্পে তিনি অন্যান্য আত্মীয়-সম্পর্কিত ভাই আর ভ্রাতুষ্পুত্রদেরও ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন। কিন্তু এই রক্তাক্ত বংশগতির গুণাবলি সত্ত্বেও শাহজাহান মূঢ়োচিত আশায় নিজেকে আশ্বস্ত করেছেন যে, তার ছেলেরা বিশ্বস্ততা আর আনুগত্যের পরিচয় দেবেন। তারা সবাই যে এক মায়ের সন্তান, পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত দম্পতির বংশধর, পরস্পরবিরোধী স্ত্রী আর উপপত্নীদের গর্ভজাত না হবার কারণে নিশ্চিতভাবেই তার এ প্রত্যয় দৃঢ়তা লাভ করেছিল।

মমতাজ যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তার এই প্রত্যয় হয়তো সত্যি হতেও পারত। তিনি তার সন্তানদের জন্য ছিলেন স্নেহময়ী এক মা এবং শুরুর দিনগুলোতে পরিবার হিসেবে তাদের একতা বিপদ দ্বারা গড়ে উঠেছিল এবং দুর্ভোগের মাধ্যমে টিকে থেকেছে। মমতাজ তার পাশে থাকায় সন্তানরা যখন বড় হচ্ছিল, শাহজাহানের তখন শাসন কাজে অনেক বেশি আগ্রহ এবং দীর্ঘস্থায়ী আর অবক্ষয়কারী কোনো শোক থেকে সান্ত্বনা খুঁজতে গিয়ে স্থাপত্যবিদ্যা সিদ্ধ কোনো ইমারত নির্মাণ বা অন্য কোনো কিছুর ভেতরে তাকে নিমগ্ন থাকতে হয়নি। তিনি তার পরও হয়তো নিজের প্রিয় পুত্র বেছে নিতেন কিন্তু মমতাজের স্নেহ আর সন্তানদের আবেগের সাথে একাত্ম হবার মাতৃসুলভ ক্ষমতা নিশ্চিতভাবেই আওরঙ্গজেবের বিচ্ছিন্নতাবোধের মনোভাব আর শাহ সুজা এবং মুরাদ বকশের অসন্তোষকে লাঘব করত। জীবিত তিন বোনের মাঝেও সম্পর্ক অনেক আন্তরিক হতো। কিন্তু বস্তুতপক্ষে, সাম্রাজ্যের প্রধান মহীয়সী হিসেবে মমতাজের স্থানে জাহানারার আপাত আরোহণ তার চেয়ে তিন বছরের ছোট রৌশনআরাকে বিশেষ করে ঈর্ষান্বিত করে তোলে। ভেসিনীয় পর্যটক নিকোলাই মানুচ্চির ভাষ্য অনুসারে রৌশনআরা, যে সদ্যই দারার অধীনে প্রশাসনিক কাজে যোগ দিয়েছেন, দেখতে খুব রূপসী না হলেও 'ভীষণ চতুর, নিজের প্রকৃত মনোভাব গোপনে পারদর্শী, বুদ্ধিমান, আনন্দোচ্ছল, কৌতুক আর রঙ্গপ্রিয়।' তিনি আরো দাবি করেছেন, রৌশনআরা ছিলেন ভীষণ 'কামুক প্রকৃতি।' আসন্ন শোকাবহ পারিবারিক ঘটনাবলির সময় তিনি আওরঙ্গজেবের একান্ত অনুগত থাকেন, গোঁড়া মনোভাবের কৌতূহলী একজন মিত্র, কিন্তু অন্যান্য সাধারণ ঐক্যমতের স্থানও ছিল। তারা উভয়েই বহু বছর নিজেদের নিষ্প্রভ অনুভব করেছেন—আওরঙ্গজেব বড় ভাই দারার কারণে আর রৌশনআরার নিজেকে হীন মনে করার কারণ জাহানারা। কনিষ্ঠ কন্যা গওহরআরা, যার জন্মের সাথে মমতাজের মৃত্যুর বিষয়টি সম্পর্কিত, ছোট ভাই মুরাদের সাথে একাত্মতা অনুভব করার মতো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

মমতাজ যদি সে সময় জীবিত থাকতেন, পারিবারিক সন্ধিক্ষণের এই মুহূর্তে মধ্যস্থতা করার শক্তিও তার থাকত। মোগলদের এমন শক্তিশালী পরিবারে কর্তৃত্বকারিণী মহিলার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, যারা যদিও পর্দার অন্তরালেই বাস করতেন কিন্তু অনেক সময় সাফল্যের সাথে হস্তক্ষেপ করেছেন আর তাদের মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হতো। বাবরের পিতামহী তাকে তার রাজত্বকালের শুরুর বছরগুলোতে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, অন্যদিকে হামিদা, জাহাঙ্গীরের পিতামহী জাহাঙ্গীরের আব্বাজান আকবরের সাথে তার বিরোধের মিটমাট করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মমতাজের পূর্ববর্তী পারস্যের পূর্বপুরুষদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝের প্রেমময় নিকট সম্পর্কও—তার পিতামহ ইতিমাদ-উদ-দৌলা এবং তার স্ত্রী, তার আব্বাজান আসফ খান আর তার আম্মিজান আর বলার অপেক্ষা রাখে না জাহাঙ্গীরের ওপর তার ফুপিজান নূরের কর্তৃত্ব—পারিবারিক বিষয়ে বয়স্ক মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের অনুমতি দিয়েছে। জাহানারারও, অবশ্য সেই অর্থে প্রভাব ছিল। আওরঙ্গজেব বিগত বছরগুলোতে তাকে চিঠি লেখার সময় বহুবার তাকে তার 'পৃষ্ঠপোষক' হিসেবে সম্বোধন করেছেন এবং তাদের আব্বাজানের সাথে তার পক্ষ নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু একজন বোনের পক্ষে মায়ের মতো সম্মান আর আনুগত্য দাবি করা সম্ভব নয়। শাহজাহানের নিজের মা এবং মমতাজ উভয়েই ইন্তেকাল করায় এবং অন্য কোনো স্ত্রী বা বয়স্ক মহিলা তার আশপাশে না থাকায় তাকে ভালো হোক বা মন্দ হোক, একাই নিজের বিশাল, প্রতিভাবান এবং প্রাণবন্ত পরিবারকে সামলাতে হয়েছে। তিনি অচিরেই আবিষ্কার করেন, তার ঔরসে মমতাজের গর্ভে জন্ম নেয়া এই সাত জীবিত সন্তান—জাহানারা এবং দারা শুকোহ্ থেকে, তাদের রুচি আর মেজাজের প্রকৃতি একই রকম হবার পাশাপাশি তাদের বয়সের পার্থক্যও সামান্য হওয়ায়, কনিষ্ঠজন পর্যন্ত, অনেক বেশি অবাধ্য, বৈরী ভাইবোন—তাদের নিজেদের ভেতর আপন আপন মৈত্রীর সম্বন্ধ গড়ে তুলেছে। তিনি আরো আবিষ্কার করেন, কিং লিয়ারের মতোই, তাকে কি আসলেই তাদের কেউ সত্যিই ভালোবাসে?

১৬৫৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, দিল্লিতে সংকটের সূচনা হয়, যখন তার দিনপঞ্জির রচয়িতা যেমন লিখেছেন, 'সম্রাট কোষ্ঠকাঠিন্য আর মূত্রথলির জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন।'* ফরাসি চিকিৎসক

* মূত্রনালি অসম্ভব যন্ত্রণাদায়ক প্রদাহ। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রস্রাব খুব ধীরে, জ্বালাময়ী ফোঁটায় হয়।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের লিখেছেন, শাহজাহান 'এমন একপ্রকার পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন, যার প্রকৃতি বর্ণনা করাটা রীতিমতো অশোভন। এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, তার বয়সের একজন লোকের পক্ষে ব্যাপারটা লজ্জাজনক, যিনি তার জীবনের অবশিষ্ট প্রাণশক্তি সতর্কতার সাথে সংরক্ষণের পরিবর্তে অসহায়ভাবে তা ব্যয় করতে থাকেন।' মানুচ্চি আরো প্রাঞ্জলভাবে বলেছেন : 'শাহজাহান এখনো একজন তরুণের ন্যায় জীবনকে উপভোগ করতে এবং সেটা করতে গিয়ে নানা উত্তেজন ওষুধ সেবনের ফলেই নিজেকে এই অসুস্থতায় সোপর্দ করেছেন'—অন্য কথায়, কাম-উদ্দীপক বস্তু।

শাহজাহান তিন দিন প্রস্রাব করতে পারেন না এবং সামান্য সময়ের জন্যও *ঝরোকা* বারান্দায় দর্শন দিতে ব্যর্থ হন, তিনি তার প্রজাদের দৃষ্টির সামনে থেকে আড়ালে চলে যান। দারা, তার তিন ভাই শাহজাহানের শারীরিক অবস্থার অবনতির সংবাদ জানতে পারার পর কী প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করবেন সে সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের শাসনাধীন দূরবর্তী প্রদেশে, পিতার অসুস্থতার সংবাদ জানিয়ে বিবরণী পাঠাতে নিষেধ করেন—শাহ্ সুজা তখন বাংলার সুবাদার, মুরাদ বকশ গুজরাটের আর আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের। পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট শূন্যতার ফলে নানা ধরনের গুজবের জন্ম হতে শুরু করে যে, সম্রাট মৃত, এমনকি এটাও শোনা যেতে থাকে যে, দারাই অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন আর তাকে হত্যা করেছেন। বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ায় দিল্লির বণিকরা তাদের দোকান দাঙ্গা আর লুটপাটের আশঙ্কায় বন্ধ করে দেয়। বাস্তবতা হলো, জাহানারার শুশ্রূষায় শাহজাহান ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে শুরু করেছিলেন এবং পুদিনা আর মানার সুপের সাহায্যে নিজের হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করছিলেন এবং উদ্বিগ্ন জনগণের সামনে সামান্য সময়ের জন্য দর্শনও দিতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু তার দরবারের একজন ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেছেন কীভাবে দুর্বল আর মৃত্যু নিকটবর্তী আশঙ্কা করে শাহজাহান 'সাম্রাজ্যের শাসনভার সামলাবার অধিকাংশ দায়িত্ব' দারাকে দিয়েছিলেন, 'প্রতীত উত্তরাধিকারী হিসেবে দারার প্রতি তার অভিজাতদের আনুগত্য প্রদর্শন করতে অনুরোধ করেছিলেন।' নিয়তির বিড়ম্বনা এই যে, সব ভাইদের ভেতরে দারাই একমাত্র সিংহাসনের জন্য লালায়িত ছিলেন না। শাহজাহানের প্রিয় উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি তার প্রিয় আব্বাজানের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু পরিস্থিতি তার ওপর জোর করে দায়িত্ব অর্পণ করে। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে শাহজাহান রাজকীয় বজরায় করে আগ্রার উদ্দেশে দিল্লি ত্যাগ করে যেখানে তাজমহল আর বহুদিন পূর্বে গত, কিন্তু তখনো প্রিয় মমতাজের কাছাকাছি অবস্থান করে নিয়তির মুখোমুখি হবার জন্য তিনি নিজের মনকে শান্ত করেন।

রাজকীয় বিবরণীর অনুপস্থিতিতে, শাহজাহানের তিন পুত্র তাদের সমর্থকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বার্তার ওপর তথ্যের জন্য নির্ভর করেন, আওরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে তাদের বোন রৌশনআরা আর মুরাদ বকশের ক্ষেত্রে তাদের বোন গওহরআরাও এ খেলায় জড়িয়ে যান। তিন ভাইই নিশ্চিত হন যে, তাদের আব্বাজান ইন্তেকাল করেছেন এবং তার উত্তরাধিকারী হিসেবে দারার অধিকার তারা প্রত্যাখ্যান করেন এবং সিংহাসন দখলের জন্য সবাই ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তাদের কেউই শাহজাহানের জীবিত থাকার ব্যাপারে প্রাপ্ত প্রমাণ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেননি, নিজেদের উদ্যোগ পাছে হতোদ্যম হয়ে পড়ে এই ভয়ে। মানুচ্চির ভাষ্য অনুসারে, যিনি দারার প্রতি নিজের পক্ষপাতের কথা খোলাখুলি স্বীকার করেছেন, আওরঙ্গজেব আদেশ দিয়েছিলেন শাহজাহানের তখনো জীবিত থাকার সংবাদ বহনকারী সব চিঠি যেন পুড়িয়ে ফেলা হয় আর তাদের বার্তাবাহকের মাথা কেটে ফেলা হয়।

শাহ সুজাই প্রথম প্রকাশ্যে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে তার নামে মসজিদে *খুতবা*পাঠের এবং তার রাজত্বকালের সূচনা উৎকীর্ণকারী মুদ্রা প্রবর্তন করতে আদেশ দেন। শাহজাহানের প্রতি অনুগত অর্থমন্ত্রীকে হত্যা করে মুরাদ বকশও নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন এবং সুরাট শহর লুণ্ঠন করে নিজের অভিপ্রায় উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ করেন। আওরঙ্গজেব তাদের মতোই উচ্চাভিলাষী কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক ধূর্ত, নীরবে কালক্ষেপণ করতে থাকেন। অবশ্য তার প্রিয়তমা স্ত্রী সন্তান জন্ম দেয়ার সময় মৃত্যুবরণ করায় তিনি তখন অবশ্য শোকগ্রস্তও ছিলেন। তিনি তার জন্য একটি মকবরা নির্মাণ করেন, যা তাজকে নকল করার প্রয়াসে তার একটি ম্লান, কৃশকায় আর হতশ্রী প্রতিচ্ছায়ায় পরিণত হয়।

দারা ঠিকই অনুমান করেন, আওরঙ্গজেবই যে ভাইকে 'গোঁড়া আর ভণ্ড-নামাজি' বলে অবজ্ঞা করেন, তিনিই আসল হুমকির কারণ হবেন আর তাই তার নামমাত্র অধীনস্ত সমস্ত মোগল সেনাপতিদের তিনি অবিলম্বে দিল্লি ফিরে আসার আদেশ দেন। মীর জুমলা, শক্তিশালী পার্সি অভিযাত্রিকও ছিলেন, তাদের ভেতর যিনি আওরঙ্গজেবের সাথে দাক্ষিণাত্যের অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন এবং যার বাহিনী দারা বিশেষভাবে আওরঙ্গজেবের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখতে আগ্রহী।

দারার অভিপ্রায় নির্ভুলভাবে অনুধাবন করে, আওরঙ্গজেব মীর জুমলার সাথে আঁতাত করে তাকে মিথ্যা অভিযোগে কারারুদ্ধ করে তার প্রত্যাবর্তনে বাধা দেন। আওরঙ্গজেব গোপনে মুরাদ বকশের সাথেও যোগাযোগ করেন। কতিপয় মোগল ভাষ্য অনুসারে, আওরঙ্গজেব তার একমাত্র অভিপ্রায় আল্লাহতায়ালার ইবাদত করে জীবনের বাকি দিনগুলো শান্তিতে কাটান এই নিশ্চয়তা দিয়ে তার সমর্থন আদায় করে তাকে উল্টো বোঝান যে, দারার

উৎগামিতার কারণে এটা অচিন্তনীয় যে তিনি সম্রাট হবেন এবং মুরাদকে, যাকে তিনি ধর্মপ্রাণ সাচ্চা মুসলমান হিসেবে প্রশংসা করেন, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার জন্য সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দেন। পুরো ব্যাপারটা সত্যি হতেও পারে—যেহেতু আওরঙ্গজেব এমন শঠতার কৌশলে ভীষণ পারদর্শী—তিনি এবং মুরাদ একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন, সাম্রাজ্য নিজেদের ভেতরে বিভক্ত করে নেন, দুই-তৃতীয়াংশ লাভ করেন আওরঙ্গজেব আর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সাম্রাজ্য—আফগানিস্তান, কাশ্মীর, প্রাচুর্যময় পাঞ্জাব আর সিন্ধ যায় মুরাদের ভাগ্যে। আরো প্রমাণ রয়েছে যে, কয়েক বছর পূর্বে এই দুই ভাই শাহ সুজার সাথে সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করতে সম্মত হয়েছিলেন এবং আরো প্রমাণ রয়েছে যে, সংকট শুরু হবার পর থেকেই তারা উভয়ে তার সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহী ছিলেন। ঘটনা যা-ই হোক না কেন, তিনজনের কেউই তাদের আব্বাজানের প্রিয়পাত্র, অহংকারী দারার প্রতি ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতি প্রদর্শন করেননি, যাকে তারা সবাই অনেক দিন থেকেই ঈর্ষা করেন এবং যার মৃত্যু তাদের পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

শাহ সুজা ইতিমধ্যে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা শুরু করায় দারা তার ছেলে সুলেমান শুকোহ্‌র নেতৃত্বে বিশাল এক রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করেন, যিনি ১৬৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেনারসের কাছে খুব ভোরের দিকে তার অলস চাচাজানের বাহিনীকে আচমকা আক্রমণ করেন এবং পুরোদস্তুর পরাজিত করেন। শাহজাহান নিজের পরিবারের ভেতরে প্রকাশ্যে, সশস্ত্র বিরোধের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে এবং তাদের মধ্যকার মারাত্মক বিরোধের মাত্রা সম্বন্ধে অজ্ঞাত থাকায় তিনি তখনো বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আশাবাদী ছিলেন; তিনি তাই আদেশ দেন, শাহ সুজার সাথে যেন সহানুভূতিশীল আচরণ করা হয়। সুলেমান আদেশ মেনে তার চাচাজানকে পলায়নের সুযোগ দেন কিন্তু পিছু ধাওয়া করার লোভ সংবরণ করতে ব্যর্থ হন—একটি সিদ্ধান্ত, যা বির্পযয়কর বলে প্রতিপন্ন হয়। দারা ইত্যবসরে দক্ষিণে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন আওরঙ্গজেব আর মুরাদের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করতে, কিন্তু এই যুদ্ধে তার বাহিনী পরাজিত হয়। সমূহ বিপদ অনুধাবন করে দারা তড়িঘড়ি সুলেমানকে ডেকে পাঠান, কিন্তু তার ছেলে তখন আগ্রা থেকে কয়েকশ মাইল দূরে অবস্থান করছিলেন।

বিদ্রোহী তিন যুবরাজই ইতিমধ্যে তাদের আব্বাজানের কাছে, তার প্রতি নিজেদের আনুগত্য আর তার সাম্প্রতিক অসুস্থতার পর তার সাথে দেখা করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে সুললিত ভাষায় স্তবকতাপূর্ণ চিঠি প্রেরণ করা অব্যাহত রাখেন। তারা তাকে স্মরণ করিয়ে দেন, জাহানারা যখন অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন তখন এই একই পারিবারিক ভালোবাসার কারণে তারা তড়িঘড়ি করে দরবারে

ছুটে এসেছিলেন। তাদের সাথে নিজ নিজ বাহিনী রয়েছে, কেবল দারাকে তারা নিজেদের শত্রু বলে মনে করেন বিধায়।

শাহজাহান শেষ পর্যন্ত যা ঘটছে সেসব ঘটনার সঙিন পরিস্থিতি হতবুদ্ধি হয়ে অনুধাবন করেন এবং ছেলেদের ভেতরে আপসের চেষ্টা করে অনুরোধ করেন, তাদের বিরোধ রাজকীয় মন্ত্রণা পরিষদে আলোচিত হবে, এমনকি আওরঙ্গজেব আর মুরাদ আগ্রা দুর্গে এসে তার সাথে দেখা করতে পারেন, যাতে তিনি শান্তি স্থাপনে মধ্যস্থতা করতে পারেন। শাহজাহানের অনুরোধে জাহানারা আসন্ন শোচনীয় পরিস্থিতি এড়াতে মরিয়া হয়ে আওরঙ্গজেবকে লেখেন : 'সম্রাট আরোগ্য লাভ করেছেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য তদারকি করছেন। তোমার সশস্ত্র অগ্রযাত্রা তাই তোমার আব্বাজানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার শামিল। এমনকি যদি এই অগ্রযাত্রা দারাকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ও, সেটাও কম অন্যায় নয়...।' আওরঙ্গজেব অবশ্য জোর দিয়ে জানান, তিনি অস্ত্রধারণ করেছেন কেবল নিজেকে রক্ষা করতে এবং তিনি তার আব্বাজানের প্রতি অনুগত, যার সাথে দেখা করার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন। 'আমি এই প্রেমপূর্ণ আলেখনে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সহ্য করব না' তিনি চিঠিতে যোগ করেন।

দারার বদ্ধমূল ধারণা আওরঙ্গজেবের সাথে সংবিদার একমাত্র উপায় যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে হতগর্ব করা এবং বিষাদগ্রস্ত শাহজাহানকে তিনি যুদ্ধযাত্রায় রাজি করান। ১৬৫৮ সালের ১৮ মে, দারা আগ্রা ত্যাগ করে চম্বল নদীর অগভীর অংশ দখল করতে দক্ষিণে যাত্রা করেন এবং তার পুত্র সুলেমান শিকোহর নেতৃত্বে অতিরিক্ত রাজকীয় এসে শক্তি বৃদ্ধি না করা পর্যন্ত আওরঙ্গজেব আর মুরাদকে নদী অতিক্রম করা থেকে বিরত রাখতে। তার দিনপঞ্জির রচয়িতাদের ভাষ্য অনুসারে শাহজাহান তার সন্তানের কাছ থেকে 'নিতান্ত অনীহার সাথে বিদায় নেন...নিয়তির বিধান সম্বন্ধে অনবহিত যে এটাই তাদের শেষ সাক্ষাৎ বিহ্বল সম্রাট নিজের অজান্তে ছেলেকে শক্ত করে আলিঙ্গন করেন।' তারপর মোনাজাত করতে দুই হাত তুলে, শাহজাহান আল্লাহতায়ালার কাছে দারার বিজয় কামনা করেন।

নিকোলোও মানুচ্চি, দারার বাহিনীর সাথে আসন্ন যুদ্ধে ভাড়াটে গোলন্দাজ সৈন্য হিসেবে অংশ নিতে প্রস্তুতি নেন। তিনি বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'আমরা এমন সুশৃঙ্খল ভঙ্গিতে যাত্রা শুরু করি। মনে হচ্ছিল জল আর স্থল বুঝি একত্র হয়েছে। যুবরাজ দারাকে তার বাহিনীর মাঝে স্ফটিকের স্তম্ভের ন্যায় মনে হতে থাকে। যেন তীব্র উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় সমগ্র ভূখণ্ডের ওপর ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। তার চারপাশে রাজপুত অশ্বারোহী বাহিনীর অসংখ্য দল অগ্রসর হয়, দূর থেকে যাদের বর্ম দীপ্তিময় দেখায় এবং তাদের বর্শার কম্পিত অগ্রভাগ

থেকে চারদিকে আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে...একটি দারুণ দেখার মতো জিনিস, যা চড়াই-উতরাইয়ের ওপর দিয়ে, উপত্যকার মাঝ দিয়ে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অতিক্রম করতে থাকে।' কিন্তু ঝকঝকে ইস্পাতের বর্ম আর শুঁড়ে ধারাল তরবারিযুক্ত রণহস্তির সারির দ্যুতিময়তা এবং কাড়া আর নাকাড়ার সম্মিলিত রণবাদ্য সত্ত্বেও মানুচ্চি স্পষ্ট বুঝতে পারেন সেনাবাহিনী যেমনটা হওয়া উচিত ছিল তেমন অবস্থায় নেই।* রাজকীয় বাহিনীর সেরা দলটা সুলেমানের নেতৃত্বে রয়েছে এবং দারার বাহিনীকে কাছ থেকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায় তারা মোটেই যুদ্ধমনস্ক নয়, কসাই, কামার, সূত্রধর, দর্জি এমন সব লোকজন প্রচুর রয়েছে।'

আওরঙ্গজেব আর মুরাদের অগ্রসর হবার গতি আরেকটা সমস্যা। দারা তাদের বাধা দেয়ার পূর্বেই তারা তাদের নিজ বাহিনী নিয়ে আয়াসসাধ্য যাত্রায় অন্য আরেকটা স্বল্প পরিচিত আর অরক্ষিত প্রতর দিয়ে চম্বল নদী অতিক্রম করে। প্রতর অতিক্রমের ধকলে ক্লান্ত ভাইদের বাহিনীকে আক্রমণ না করে দারা তড়িঘড়ি করে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। সামুগড়ের বিশাল সমভূমিতে শহর থেকে মাত্র আট মাইল দক্ষিণপূর্ব দিকে, তিনি যাত্রা বিরতি করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সুলেমানের বাহিনীর আগমনের কোনো লক্ষণ তখনো পরিলক্ষিত হয় না।

১৬৫৮ সালের ২৯ মে, আক্ষরিক অর্থেই দাবদাহের প্রচণ্ডতার মাঝে ভ্রাতৃঘাতি দুটো বাহিনী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় : যুদ্ধে অংশ নেয়া যোদ্ধাদের দেহের ধাতব বর্মে তাদেরই ত্বক ঝলসে যায়। সেদিনের যুদ্ধের মাত্রা ছিল প্রবল। হাতির পিঠে যুদ্ধমান মুরাদের মুখ তীরবিদ্ধ হয় এবং তার হাওদা তীরে শজারুর কাঁটার মতো দেখায়। তিন ঘণ্টার তীব্র যুদ্ধের পরে দারার সৈন্যরা বিজয়ী হচ্ছে প্রতীয়মান হতে থাকে, কিন্তু সংকটময় এক মুহূর্তে দারা যুদ্ধ থামিয়ে হাতির পিঠ থেকে নিচে নেমে আসেন। 'সেটা ছিল', মানুচ্চি লিখেছেন, 'এমন যেন দারা নিজের আরব্ধ বিজয় ত্যাগ করলেন।' দারা, বস্তুতপক্ষে হাতির পিঠ থেকে নেমে আরো দ্রুত গতিতে সঞ্চারণের অভিপ্রায়ে ঘোড়ায় আরোহণ করছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে যা মানসিক ক্ষতি হবার তা হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের সেনাপতিকে দেখতে না পেয়ে অনভিজ্ঞ যোদ্ধাদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েক মিনিটের ভেতর পুরো রাজকীয় বাহিনী 'বাতাসের তোড়ে ভেসে যাওয়া কালো মেঘের মতো' পালাতে আরম্ভ করে। একজন পরিচারক দ্রুত এগিয়ে এসে দারার ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেয়।

---

* একটি রণহস্তির দেহাবরণী ধাতব শৃঙ্খল নির্মিত বর্ম আর ৮০০০-এর অধিক ইস্পাতের প্রাবরণ টুকরো দিয়ে তৈরি যার ২০০০-এর বেশি টুকরো কেবল মাথার আচ্ছাদন নির্মাণেই প্রয়োজন হয়।

দারা দ্রুত ঘোড়া হাকিয়ে আগ্রায় ফিরে আসেন, যেখানে শাহজাহান উদ্বিগ্ন চিত্তে জাহানারার সাথে সংবাদের প্রতিক্ষা করছিলেন, তিনি পরাজয়ের শোকে অধীর নিজের সন্তানকে অনুরোধ করেন তার কাছে আসতে কিন্তু দারা লজ্জায় তার মুখোমুখি হন না। তিনি ভোর হওয়া পর্যন্ত নিজের মহলে অবস্থান করেন তারপর স্ত্রী, পুত্র আর তাদের সন্তানদের নিয়ে এবং অনুগত কর্মচারীদের একটি ছোট দল নিয়ে হাতি আর অশ্বের পিঠে করে দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করেন। বিক্ষুব্ধ শাহজাহান অনেকগুলো গাধার পিঠে সোনা বোঝাই করে দারার কাছে প্রেরণ করেন এবং দিল্লির সুবেদারকে আদেশ দেন সেখানের রাজকীয় কোষাগার যেন দারার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। জাহানারাও নিজের মূল্যবান অলংকার ভাইয়ের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন।

যুবরাজ ঠিক সময়েই পলায়ন করেছিলেন। মানুচ্চি পরের দিন আগ্রা থেকে ঘোড়ায় চেপে বের হন দারার সঙ্গী সাথীদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য কিন্তু তিনি আওরঙ্গজেবের বিজয়ী বাহিনী দ্বারা নিজের পথ অবরুদ্ধ দেখতে পান, যারা তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করে। তারা তাকে বলে, 'ইতিমধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে', এবং 'আওরঙ্গজেব বিজয়ী হয়েছেন।' তারা ঠিকই বলেছিল, 'আওরঙ্গজেবই মূলত সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছিলেন।' পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রমাণিত করে যে, সামুগড়ের যুদ্ধ ছিল ওয়াটারলু কিংবা কালডেনের যুদ্ধের মতোই নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক, মনীষী, সৌন্দর্যতাত্ত্বিক, ধর্মীয় গোঁড়ামি মুক্ত কিন্তু উদ্ধত দারা আর কখনোই দক্ষ-যোদ্ধা, অসহিষ্ণু, আক্রমণাত্মক, অনেক বেশি নিষ্ঠুর তার ছোট ভাইদের থেকে প্রত্যুপক্রমের অধিকার লাভ করতে পারেন না এবং মোগল সাম্রাজ্য আর ভারতবর্ষের ইতিহাস যার ফলশ্রুতিতে একটি ভিন্ন, বিবাদ সৃষ্টিকারী আর চূড়ান্তভাবে বিপর্যয়কারী একটি বাঁক নেয়।

❋

জুন মাসের ১ তারিখে আওরঙ্গজেব আর মুরাদ আগ্রার বাইরে এসে উপস্থিত হন। জাহানারা তার দুই ভাইয়ের সাথে এসে দেখা করেন এবং শাহজাহান আপসমূলক একটি বার্তা পাঠিয়ে দুর্গে এসে তার সাথে দেখা করার জন্য আওরঙ্গজেবকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি সেইসাথে তাকে দ্যুতিময় আর বিখ্যাত তরবারি 'আলমগীর', 'বিশ্বের দখলদার' উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। আওরঙ্গজেব কাঠখোট্টাভাবে উত্তর দেন, তিনি তখনই দুর্গে প্রবেশ করবেন যদি তার আব্বাজান সেটা তার কাছে সমর্পণ করেন। শাহজাহান, সংগত কারণেই অস্বীকৃতি জানালে নিজের আব্বাজানের ভালোমন্দের তোয়াক্কা না করে তিনি দুর্গ অবরোধ করেন। কামান দিয়ে দুর্গের শক্ত প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস

ব্যর্থ হলে আওরঙ্গজেব আপাত সরল একটি বুদ্ধির আশ্রয় নেন। তিনি যমুনা থেকে দুর্গে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেন। গ্রীষ্মের প্রখর উষ্ণতায় যমুনার 'তুষার গলা' পানির পরিবর্তে দুর্গের তিতকুটে, ঈষৎ লোনা পানি পান করতে বাধ্য হলে, মাত্র তিন দিন পরই শাহজাহান সংকল্পের অভাবের কারণে যা একটি সময় জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে মমতাজকে সঙ্গী করে তার নিজের বিদ্রোহে ইন্ধন জুগিয়েছিল, অপ্রতিবাদী ভঙ্গিতে বশ্যতা স্বীকার করে নেন এবং দুর্গের তোরণদ্বার খুলে দেন।

আওরঙ্গজেব তার আব্বাজান এবং জাহানারাকে হারেমে অন্তরীণ রাখার আদেশ দেয়ন। রৌসনআরাই একমাত্র মহিলা, যাকে দুর্গ ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়। মানুচ্চির ভাষ্য অনুসারে, যিনি 'মহা আড়ম্বরের সাথে' প্রস্থান করেন। আওরঙ্গজেব তিন দিন পর তার আব্বাজানের সাথে দেখা করতে যাবার একটি ভান করেন। তিনি অবশ্য যখন জাঁকজমকের সাথে সজ্জিত হাতির পিঠে আরোহণ করে দুর্গের অভিমুখে বিজয়দীপ্ত ভঙ্গিতে অগ্রসর হন, তার কাছে সুবিধাজনক হুমকি পৌছায় বা তেমনটা তিনি দাবি করেন যে, শাহজাহানের হারেমের তাতার মহিলা প্রহরীরা তাকে হত্যার সংকল্প করেছে। তার পরিচারকরা শাহজাহানের লিখিত একটি জব্দ করা কথিত চিঠিও উপস্থিত করে, যেখানে তিনি তার প্রিয় পুত্র দারাকে তার অব্যাহত সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। আওরঙ্গজেব সাথে সাথে হাতির মুখ ঘুরিয়ে নেন এবং নিজের মহলে ফিরে যান।

ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মাঝে কয়েক বছর পর একটি উদ্ভট গল্প ছড়িয়ে পড়ে এবং সেটা সম্ভবত ঘটনা পরবর্তী সংবোধের ফসল, যেখানে দাবি করা হয়, শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে নিয়ে অনেক আগে থেকেই ভীত ছিলেন। গল্প অনুযায়ী মমতাজের বহুবার গর্ভধারণের সময় একবার যখন আপেলের মৌসুম না তখন তার খুব আপেল খাবার শখ হয়েছিল। শাহজাহান তার জন্য অধীর হয়ে আপেল খুঁজতে গিয়ে একজন ফকিরের দেখা পান, যিনি তাকে দুটো আপেল দেন। তিনি কৃতজ্ঞ শাহজাহানকে বলেন, নিজেকে কখনো যদি তার অসুস্থ মনে হয় তাহলে তিনি যেন তার হাতের ঘ্রাণ নেন। তার হাতে যত দিন আপেলের গন্ধ থাকবে তত দিন তিনি আরোগ্য লাভ করবেন কিন্তু হাত থেকে যখন গন্ধ মিলিয়ে যাবে 'সেটা হবে একটি হুঁশিয়ারি যে, তিনি তার জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে গেছেন।' নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরো কিছু অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে অধীর শাহজাহান ফকিরের কাছে জানতে চান, 'তার কোন ছেলে তার জাতির বিনাশকের ভূমিকা পালন করবে?' ফকির উত্তর দিয়েছিলেন, সেটা সম্ভবত আওরঙ্গজেব।

আওরঙ্গজেবের অব্যবহিত উদ্দেশ্য তখন মুরাদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করা মিত্র হিসেবে যার প্রয়োজনীয়তা তখন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন পর
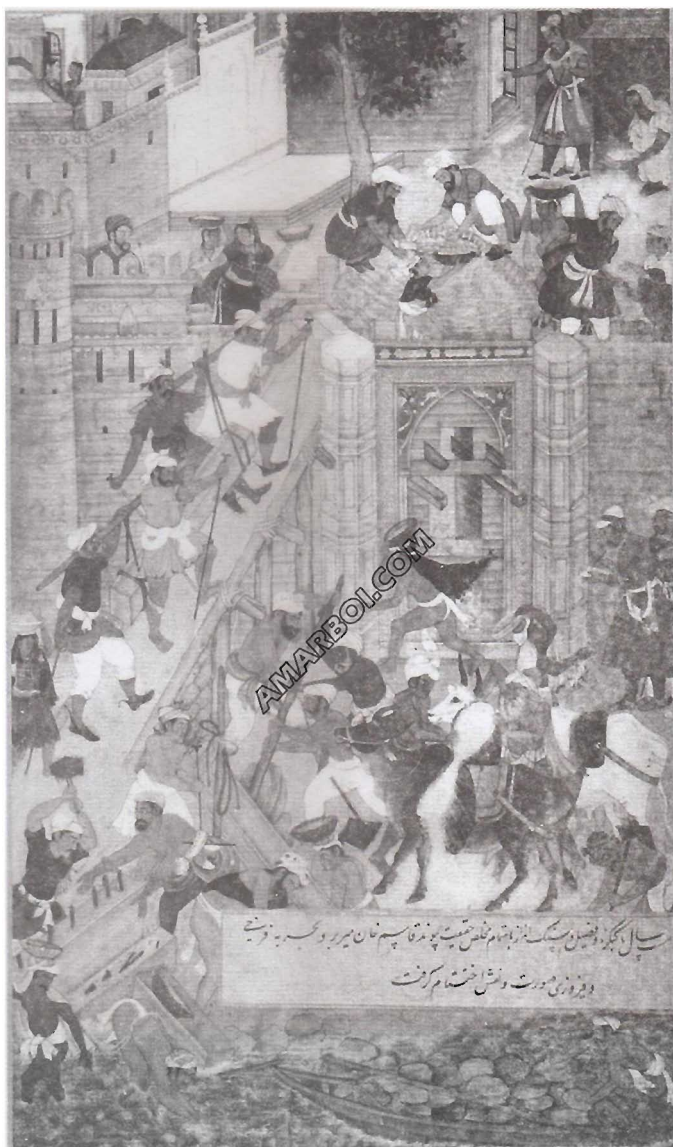
আগ্রায় অবস্থিত লালকেল্লার বিশালাকৃতি তোরণদ্বার নির্মাণ

উপরে বামদিক থেকে ডানদিকে: হুমায়ুনের মকবরা, দিল্লী; আকবরের দরবারের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ, ফতেহপুর সিক্রি। নীচে বাম থেকে ডানে: আকবরের মকবরার তোরণদ্বার, সিকান্দ্রা; রাজকীয় হাভেলী, বুরহানপুর দূর্গ

দারাকে ধাওয়া করে তারা দুই ভাই একসাথে রওনা হলে তিনি তার কাঙ্ক্ষিত সুযোগ লাভ করেন। ২৫ জুনের রাতে, মাথুরায় যখন তাদের সম্মিলিত বাহিনী শিবির স্থাপন করে, আওরঙ্গজেব তার তাঁবুতে মুরাদকে আমন্ত্রণ জানান এবং তার আত্মপ্রশ্রয়ী আর অকপট ভাইয়ের সামনে প্রচুর পরিমাণে কড়া সুরা উপস্থিত করেন, যা তিনি নিজে একজন একনিষ্ঠ মুসলমান হিসেবে সাধারণত স্পর্শ করতে অস্বীকার করেন। মুরাদ মাতাল হয়ে খুশি মনে তাকে 'শ্যাম্পু' (শ্যাম্পু, হিন্দি থেকে উদ্ভব হওয়া একটি শব্দ, যার মানে চুল ধোয়া না চুল মালিশ করা) করতে আসা একজন দক্ষ মেয়ের হাতে সঁপে দেন। নিজের পেশায় দক্ষ অঙ্গসংবাহনকারী রমণী নিজের কাজ শুরু করায় মুরাদ প্রশান্তির নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। অল্প কিছুক্ষণ পর, পেষল দেহের অধিকারী, ব্যাপকভাবে অস্ত্র সজ্জিত খোজা দেহরক্ষী, যাকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন তাকে প্রহরা দেয়ার জন্য তাকে তাঁবুর বাইরে কৌশলে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। মুরাদ অবশেষে নিদ্রা থেকে যখন জেগে ওঠেন, তিনি নিজেকে একজন নিঃশরণ বন্দি হিসেবে দেখতে পান। সে রাতেই পরে একই রকম হাওদা বহনকারী চারটা হাতি অস্থায়ী শিবির থেকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব আর পশ্চিম দিকে রওনা হয়। খুব কম লোকই জানত মন্থর গতিতে উত্তর দিকে গমনকারী হাতির পিঠে দুর্ভাগা মুরাদ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। দিল্লির কাছেই যমুনার মাঝে একটি দ্বীপে বন্দি করে রাখতে হাতিটা তাকে বহন করে নিয়ে চলে।

আওরঙ্গজেব সিদ্ধান্ত নেন তার নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করার এবার সময় হয়েছে। ১৬৫৮ সালের জুলাই মাসের ২১ তারিখে দিল্লির বাইরে অবস্থিত একটি উদ্যানে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানটার আয়োজন করা হয়। এই সংক্ষিপ্ততার কারণ একটিই যে, এখনো আওরঙ্গজেবের দুই ভাই বাকি রয়েছেন, যাদের সাথে তাকে একটি সংবিদা করতে হবে—পশ্চিমে রয়েছেন দারা আর শাহ সুজা পূর্বে। দারার সমস্যা বেশি গুরুতর বিবেচনা করে তিনি তার তীব্র ঘৃণার পাত্র তার বড় ভাই দারার পশ্চাদ্ধাবন শুরু করেন। দিল্লি থেকে তার পক্ষে যা ধনসম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব তা নিয়ে দারা প্রথমে লাহোরে আশ্রয় নেন, তারপর সিন্ধু নদ বরাবর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সিন্ধের দিকে অগ্রসর হন, তার প্রপিতামহের পিতা হুমায়ুন তার সিংহাসনের দখলদার, শের শাহের কাছ থেকে যখন পলায়ন করেছিলেন তখন ঠিক এই পথ দিয়েই গমন করেছিলেন। দারা বেশ কয়েকবারই ঘুরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারতেন কিন্তু তিনি যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যদিও আরেকটা বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করলেও বাহিনীটা তখনো যুদ্ধে অনভিজ্ঞ আর তাদের আনুগত্য নিয়ে তার মনে ব্যাপক সন্দেহ ছিল। আওরঙ্গজেব জাল চিঠির ফাদ সৃষ্টি করে তার এই

সন্দেহকে আরো উসকে দেন, যা তার গুপ্তচররা তার ভাইয়ের শিবিরে গোপনে নিয়ে আসত আর যা তার কোনো সেনাপতিকে দারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনায় জড়িত করে মিথ্যেভাবে প্রতীয়মান হতো। আওরঙ্গজেব একই সময়ে দারার সমর্থকদের উদ্দেশে আসল চিঠি প্রেরণ করতেন, পক্ষ পরিবর্তনের জন্য তাদের উৎকোচের প্রস্তাব দিতেন। দারার বাহিনী এর ফলশ্রুতিতে ভাঙতে আরম্ভ করে। মানুচ্চি যিনি লাহোরের কাছে দারার সাথে যোগ দিয়েছিলেন, একটি জোরাল ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন। দারার স্ত্রী একজন শক্তিশালী রাজার সমর্থন লাভের জন্য তাকে নিশ্চয়তা দেন যে, তাকে তিনি পুত্রবৎ মনে করেন। নিজের কথার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এমন কিছু একটি করেন 'মোগল সাম্রাজ্যে যা পূর্বে কখনো সম্পাদিত হয়নি—তিনি নিজের স্তনস্নাত পানি তাকে পান করতে দেন, স্তনদ্বয়-শূন্য বিধায়।' রাজা পানি পান করেন এবং আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু দারার পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য নিয়োগের নিমিত্তে জনবল সংগ্রহের জন্য অর্থ আদায় করে তিনি নিজের রাজ্যে নীরবে প্রস্থান করেন।

আওরঙ্গজেব তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মনোবল বেশ ভালোভাবেই ভেঙে দেন। তার পক্ষ থেকে শীঘ্র আর কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে তিনি দারার সমস্যার সমাধানের ভার অন্যদের ওপর অর্পণ করেন এবং নিজের মনোযোগ সুজার প্রতি নিবদ্ধ করেন, তিনি ১৬৫৮ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ, তাদের আব্বাজানকে মুক্ত করার অভিপ্রায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করে আগ্রার অভিমুখে নিজের বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আওরঙ্গজেব তার পুরনো মিত্র মীর জুমলাকে পাশে নিয়ে, তত দিনে তিনি তার ভানকৃত 'বন্দিদশা' থেকে মুক্তি লাভ করেছেন, আগ্রা ও বেনারসের মধ্যবর্তী স্থানে গঙ্গার তীরে, খাওয়াজে শাহ সুজার মুখোমুখি হন। ভীষণ তীব্র লড়াই হয়েছিল এবং আওরঙ্গজেবের সেনাপতিদের একজন, মারওয়ারের রাজা, জশয়ন্ত সিং স্বপক্ষ ত্যাগের কারণে আওরঙ্গজেব প্রায় পরাজিত হতে বসেছিলেন। তিনি অবশ্য নিজের স্বভাবজাত স্থিরতা বজায় রাখেন, আরো একবার যুদ্ধের গুরুতর বিশৃঙ্খলার মাঝে, নিজের লোকদের মাঝে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে তাদের বিজয়ের দিকে পরিচালিত করতে পুনরায় ঘোড়ায় আরোহণ করার পূর্বে ঘোড়া থেকে নেমে নামাজের নির্ধারিত ওয়াক্তে নামাজের জন্য নতজানু হন।* শাহ সুজা গঙ্গার ভাটিতে পালিয়ে যেতে মীর জুমলা তার পশ্চাদ্ধাবন করেন।

---

* দারা যখন সমর গড়ের যুদ্ধে হাতি থেকে নেমে আসে এর ভয়ংকর পরিণতি ঘটে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটের ওপর, ফলে আওরঙ্গজেবের বাহিনী দ্রুত যুদ্ধে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

পনেরো মাসব্যাপী ইঁদুর-বিড়াল খেলার সূচনা হয়, যা বাংলার পূর্ব দিকে আরাকানের জলদস্যু রাজার এলাকায় শাহ্ সুজা আর তার পরিবারকে ঠেলে দেয়। সেখানে 'দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর কুমীর ভর্তি অতিকায় নদীর' মাঝে মানুচ্চি জলাভূমি অঞ্চলটা যেভাবে কম্পিত ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন, তারা হারিয়ে যায়, সম্ভবত নিহত হয়।

দারা ইত্যবসরে গুজরাটে নিজের বাহিনী পুনরায় সংগঠিত করেন এবং মারওয়ারের রাজা বার্তা প্রেরণ করে প্রতিশ্রুতি দেন, দারা যদি আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হন তাহলে তিনি আওরঙ্গজেবের সাথে চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার জন্য ২০,০০০ রাজপুত যোদ্ধার বাহিনী নিয়ে তার সাথে মিলিত হবেন। দারা সম্মত হন, কিন্তু তিনি যখন উত্তর অভিমুখে যাত্রা করেন সেখানে রাজার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় না। তাকে আওরঙ্গজেব মিষ্টি কথায়, হুমকি আর উৎকোচ দিয়ে পুনরায় নিজের পক্ষে ফিরিয়ে এনেছিলেন। আগ্রার পশ্চিমে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে আজমিরের শহর অভিমুখে দারা যখন অগ্রসর হন, যেখানে মমতাজ তাকে জন্ম দিয়েছিলেন এবং আওরঙ্গজেবও তার দিকে দ্রুত গতিতে ধেয়ে আসায়, তিনি একটি সংকীর্ণ গিরিপথে টেকসই রক্ষণাত্মক অবস্থান নির্বাচন করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি তিন দিন প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন কিন্তু ১৬৫৯ সালের ১৪ মার্চ আওরঙ্গজেবের বাহিনী তার প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেয়।

দারা আরো একবার পলায়ন করেন, নিজের পনেরো বছর বয়সী পুত্র সিপির শুকোহ্ আর মুষ্টিমেয় কিছু দেহরক্ষী নিয়ে তিনি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। তিনি নিকটেই তার ধনসম্পদ আর মালামাল নিয়ে অপেক্ষমাণ তার স্ত্রী, উপপত্নী আর খোজাদের সাথে বিভ্রান্তির কারণে মিলিত হতে ব্যর্থ হন। দারার সাথে তারা পরের দিন মিলিত হন কিন্তু তার নিজের পরিচারকদের দ্বারা লুণ্ঠিত হবার পরই কেবল সেটা সম্ভব হয় এবং মহিলাদের সমস্ত মূল্যবান রত্নসমূহ কেড়ে নেয়া হয়। অপরিচ্ছন্ন নোংরা ফেরারির দল দক্ষিণে গুজরাটের আমেদাবাদ অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হবার সময় ঘনঘন ডাকাতদের আক্রমণের শিকার হয়, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে সেখানেও কোনো আশ্রয় পাওয়া যায় না। আমেদাবাদের সন্ত্রস্ত নাগরিকরা চিন্তা করে যে, পলাতকদের আশ্রয় দেয়াটা ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। দারার সম্ভবত কয়েক দশক পূর্বের আরেকটা তিক্ত যাত্রার কথা তখন মনে পড়েছিল, যখন তাকে, তার পিতা-মাতা এবং ভাইবোনকে, আওরঙ্গজেবসহ, শেয়ালের মতো তাড়িয়ে অনুসরণ করা হয়েছিল এবং কোথাও কোনো আশ্রয় খুঁজে পাননি। বার্নিয়ের, দারার পলাতক দলটার সাথে যার ভাগ্যচক্রে দেখা হয়েছিল, বর্ণনা করেছেন কীভাবে 'মেয়েদের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে সবার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল।' দারা নিজেও কেমন 'জীবিতের চেয়ে মৃতই বেশি' মনে হয় এবং কী করতে হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্টতই অনিশ্চিত। ভগ্ন

মনোবল আর নিজের পূর্বেকার আত্মবিশ্বাস এবং ঔদ্ধত্য পুরোপুরি অনুপস্থিত, তিনি তখন 'থেমে থেমে সাধারণ সৈন্যের সাথে পর্যন্ত আলোচনা করেন।' তিনি অবশেষে সিদ্ধান্ত নেন, সিন্ধের রান অব কচ্ছের মরুভূমি আর বিশাল লবণাক্ত জলাভূমির মাঝেই তারা কেবল নিরাপদে থাকতে পারবেন। তার সঙ্গের একজন মহিলার পা মারাত্মকভাবে আহত হওয়ায় তিনি চান, বার্নিয়ের তার সাথে থাকুন কিন্তু তিনি ডাক্তারের জন্য কোনো বাহনের বন্দোবস্ত করতে ব্যর্থ হন। বার্নিয়ের নিজের জন্য অজুহাত সৃষ্টি করেন।

দারা রান অব কচ্ছ অতিক্রম করতে সফল হন এবং পারস্যের পশ্চিমে অভয়স্থল খুঁজে পাবার আশা করেন, কিন্তু এমন সময়ে ক্লান্তি আর আমাশয়ের কারণে দুর্বল তার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী নাদিরা বেগম, দৈহিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং মারা যান। তার মৃতদেহ সমাধিস্থ করার জন্য লাহোরে প্রেরণ করেন, বিমূঢ় দারা এক আফগান গোত্রপতির নিকট শরণ খুঁজে পান, যার জন্য কয়েক বছর পূর্বে তিনি শাহজাহানের কাছে তার জন্য অনুগ্রহ লাভ করতে মধ্যবর্তিতা করেছিলেন এবং তাকে হাতির পায়ের নিচে পদদলিত হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। দারা যেমন ভেবেছিলেন গোত্রপতি মোটেই সে রকম কৃতজ্ঞ কিংবা সম্মান্য ছিলেন না এবং কয়েক দিন পরই তিনি দারা এবং তার পরিবারকে বন্দি করেন। তিনি দারা আর সিপিরকে চারদিক ঘেরা হাওদায় করে দিল্লি প্রেরণ করেন, যেখানে মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই আওরঙ্গজেব পূর্বেকার অনুদ্ধত আনুষ্ঠানিকতার ক্ষতি পুষিয়ে নিতেই হয়তো মোগল মানদণ্ডের কাছেও এমনকি অতুলনীয় জাঁকজমকের দৃশপটের মাঝে ময়ূর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৬৫৯ সালের আগস্টের ২৩ তারিখ বন্দিরা শহরে পৌঁছায় এবং ছয় দিন পর দিল্লির সড়কে রোগাক্রান্ত হাতির পিঠে শতচ্ছিন্ন পোশাক পরিয়ে আওরঙ্গজেব তাদের প্রদর্শিত করেন। দারা মাথা নিচু করে নির্বিকারভাবে উপবিষ্ট থাকেন। তিনি জনপ্রিয় ছিলেন এবং ভিড়ের মাঝে লোকজন প্রকাশ্যে অশ্রু বিসর্জন করেন এবং তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যে গোত্রপতি তার প্রতি বিষ্ঠা আর অভিশাপ বর্ষিত হয়। বার্নিয়ের, যিনি ইতিমধ্যে দিল্লি ফিরে এসেছিলেন এবং 'লজ্জাকর শোভাযাত্রা' প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আতঙ্কিত হন যে, ভয়ংকর কোনো ঘটনা ঘটতে চলেছে।

তিনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন। আওরঙ্গজেব বস্তুতপক্ষে হত্যা করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন কিন্তু তাকে সে জন্য সত্যতা প্রতিপাদন করতে হয়। তিনি পরিষদমণ্ডলীর সভা আহ্বান করে নিজের বক্তব্যে অটল থাকেন, ইসলামকে দমন করতেই দারা শাহজাহানকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তার ভাই 'সাম্রাজ্যের সর্বত্র নিরীশ্বরবাদ আর নাস্তিক্যের রীতির পুনঃপ্রচলন'

করেছিলেন এবং 'মুসলমানের কোনো সাদৃশ্যই ছিল না।' দারার ধর্মীয় সারগ্রাহিতার জন্য আওরঙ্গজেবের ক্ষোভ বহু পুরাতন আর অকৃত্রিম। দারার হিন্দুধর্মের প্রতি আগ্রহকে তিনি ঘৃণা করতেন এবং তার ভাইকে ধাওয়া করার বিষয়টি কিছুটা হলেও এক ধরনের *জিহাদ* বা ধর্মযুদ্ধ ছিল। দারার উৎপথগামিতা, অবশ্য ভীষণ সুবিধাজনকও ছিল। পরিষদমণ্ডলীর সভায় আওরঙ্গজেব আলোচনা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন যে, তিনি এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন, ভাইয়ের নির্বাসনই তার একমাত্র কাম্য, যখন তিনি কঠোর সিদ্ধান্তগুলো নেয়ার দায়িত্ব অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে তিনি পরবর্তী সময়ে দাবি করতে সক্ষম হন, প্রথম এলিজাবেথের তার আত্মীয় সম্পর্কিত বোন স্কটল্যান্ডের রানি মেরির মৃত্যুদণ্ডের প্রতি প্রদর্শিত মনোভাবের সদৃশ, যে অন্যেরা দারার মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি জোর করে তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদ প্রায় সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, দারার মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য এবং দারার মৃত্যুদণ্ড যারা সবচেয়ে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে দাবি করেছিল তাদের ভেতরে অন্যতম মমতাজের ভাই, তার চাচাজান, শায়েস্তা খান, যিনি শুরু থেকেই গোপনে আওরঙ্গজেবকে দুষ্কর্মে উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন।

মৃত্যুদণ্ড দ্রুত কার্যকর করা হয়। জনসাধারণের সামনে দারার লজ্জাজনক প্রদর্শনীর পরের দিন, তার কারা কুঠুরিতে ক্রীতদাসের দল প্রবেশ করে তার কিশোর পুত্র সিপির শুকোহ্‌কে তার পাশ থেকে টেনে সরিয়ে নেয় এবং কোনো ধরনের ভনিতার আশ্রয় না নিয়ে দারার তখনো সুদর্শন মস্তককে দেহের আশ্রয় থেকে আলাদা করে দেয়। যুবরাজের তখনো রক্ত নির্গত হতে থাকা কবন্ধ দেহটা বাজারের ভেতর দিয়ে হাতির পিঠে করে হুমায়ুনের মকবরায় সমাধিস্থ করার জন্য প্রেরণ করা হয়। তার ছিন্ন মস্তক আওরঙ্গজেবের কাছে পাঠানো হয়। দ্রুত গল্পের সৃষ্টি হয়। মানুচ্চি, দারা তাকে একটি দুর্গের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে পেছনে রেখে এসেছিলেন এবং তিনি সেই সময়ে দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন না, হলফ করে দাবি করেছেন যে, উল্লসিত আওরঙ্গজেব তার হাতের তরবারি দিয়ে ছিন্ন মস্তকে আঘাত করেছিলেন এবং তারপর সেটাকে একটি রেকাবে সাজিয়ে আগ্রায় শাহজাহানের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। Grand Guignol-এর এই আচরণের চেয়ে আপাতদৃষ্টিতে অনেক বেশি যুক্তিসংগত আওরঙ্গজেবের নাকচ করে দেয়া মন্তব্যের বিষয়ে প্রাপ্ত মোগল ভাষ্য এই যে, তিনি যেহেতু এই নাস্তিকের মুখ বেঁচে থাকতেই যখন দেখার জন্য কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেননি তখন এখন তা দর্শনের কোনো অভিপ্রায় তার নেই।

আওরঙ্গজেব সিংহাসনের সম্ভাব্য অবশিষ্ট দাবিদারদের দ্রুততার সাথে মোকাবিলা করেন। তার কারারুদ্ধ ভাই মুরাদের ক্ষেত্রে, মুরাদ সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত হবার জন্য তার প্রচেষ্টা শুরু করার প্রাথমিক পর্যায়ে নিজের অর্থমন্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন এ বিষয়টি তিনি নির্মমভাবে ব্যবহার করেন। আওরঙ্গজেব নিহত মন্ত্রীর পরিবারকে ন্যায়বিচারের জন্য বিনয়ের সাথে আমন্ত্রণ জানান। মুসলিম শরিয়া আইনের অধীনে যা তাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ অথবা যদি তারা এতই নাছোড়বান্দা হয়, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ দাবি করার অনুমতি তাদের দিয়েছে। নিহত মন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন আর্থিক বা শারীরিক উভয় অর্থেই ক্ষতিপূরণ অন্বেষণ প্রত্যাখ্যান করে, দ্বিতীয় পুত্র, সন্দেহাতীতভাবে উৎকোচ গ্রহণ করেছিল, আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রত্যাখ্যান করলেও মুরাদের মৃত্যু দাবি করে এবং ১৬৬১ সালের ৪ ডিসেম্বর মুরাদের প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়। আওরঙ্গজেব নিজের স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে বড় ভাইকে 'রক্তের জন্য নিজের দাবি প্রয়োগে ব্যর্থতার' জন্য পুরস্কৃত করেছিলেন। দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং শাহজাহানের প্রিয় নাতি, সুলেমান শুকোহ্, পাঞ্জাবে পালিয়ে গিয়েছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। কিন্তু ঠিক তার আব্বাজানের মতোই, তার আশ্রয়দাতাই তাকে আওরঙ্গজেবের উৎসুক হাতে তুলে দেয়। আওরঙ্গজেব তাকে বাধ্য করেন প্রতিদিন নিয়মিতভাবে *পোস্তা*—পপিফুলের একপ্রকার নির্যাস—পান করতে, যা তার শরীর আর মনকে নিঃশেষ করে ফেলে এবং জীবন্মৃত করে তোলে, তাকে হত্যা করা হয়। সুলেমান শুকোহ্র নিজের অল্পবয়সী পুত্রদের আগেই অবশ্য আওরঙ্গজেবের আদেশে হত্যা করা হয়েছিল। দারার আরেক পুত্র, কিশোর সিপির শুকোহ্, কেবল বেঁচে থাকেন, আওরঙ্গজেব তাকে গোয়ালিয়র দুর্গের মজবুত হস্তিদ্বার আর উঁচু বেলে পাথরের নিরাপত্তা প্রাচীরের অন্তরালে অন্তরীণ করে রাখেন। আওরঙ্গজেব, চৌদ্দ বছর পরে, এই বন্দির সাথে নিজের এক কন্যার বিয়ে দেন। আওরঙ্গজেব একই সাথে নিজের পুত্র সুলতান মুহাম্মদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, বেচারা সামান্য সময়ের জন্য আর হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে নিজের আব্বাজানের বাহিনী পরিত্যাগ করে তার চাচাজান শাহ্ সুজার সাথে যোগ দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব তাকে তার যৌবনের অবশিষ্ট চৌদ্দ বছর কারাগারে বন্দি করে রাখেন।

■

দারার মৃত্যু সংবাদে শাহজাহান 'সান্ত্বনাতীত শোকে' আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। মমতাজ আর তার ভেতরে বিদ্যমান পরম, পবিত্র ভালোবাসা তাদের সন্তানদের মাঝে আরোপিত হয়নি এই তিক্ত ভাবনাটা নিশ্চয়ই তাকে জারিত করেছে। পারিবারিক অনুভূতিতে ঘৃণা আর ঈর্ষা এমনভাবে ছাপিয়ে যায় যে, তাদের দুজন সন্তানের নির্মম হত্যাকাণ্ড, তৃতীয়জনের অন্তর্ধান আর প্রিয়তম পৌত্র,

আর প্রপৌত্রদের ধ্বংসের সর্বোচ্চমাত্রা স্পর্শ করে । শাহ্জাহান সম্ভবত দারাকে এককভাবে মনোনীত করে তার অন্য সন্তানদের অবহেলা করার জন্য নিজেকেই দায়ী করেছিলেন। তিনি সম্ভবত বিশ্বাস করতেন, প্রথাটার ভেতরেই খুঁত রয়েছে, যা জ্যেষ্ঠকে স্পষ্টতই আলিঙ্গন করার পরিবর্তে সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে অংশ নেয়ার দক্ষতা আর যোগ্যতাসম্পন্ন রাজবংশের যেকোনো যুবরাজকে নীরবে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। সর্বোপরি তিনি নিজে কি সেটাই করেননি?

আগ্রা দুর্গের ওপর নির্মিত মর্মরের ছাউনি যেখান থেকে যমুনা দেখা যায়, যা তিনি নিজের জন্য তৈরি করেছিলেন, সেখানেই শাহ্জাহান তার জীবনের শেষ বছরগুলো অন্তরীণ ছিলেন। তিনি সেখান থেকে নদীর বাঁকের ওপারে তাজের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। নদীর ওপর ঝুলে থাকা একটি বুরুজে নির্মিত তামার অষ্টভুজাকৃতি গম্বুজযুক্ত দালান থেকে তিনি সেরা দৃশ্যটা অবলোকন করতে পারতেন। রত্ন দিয়ে কারুকাজ করা দেয়াল আর স্তম্ভে দারুণভাবে খোদাই করা আন্দোলিত নার্গিসের ড্যাডো আর মার্জিতভাবে খোদাই করা একটি মর্মরের জলাধারযুক্ত আবাসস্থল, যা তার নির্মিত সব মহলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।

জাহানারা তাকে সান্ত্বনা দিতেন, তার সাথে বন্দিত্ব বরণকারী তার একনিষ্ঠ আর সব সময়ের সঙ্গী, কিন্তু এসব কিছুই আওরঙ্গজেবের ক্ষোভ নমনীয় করতে পারেনি। নতুন সম্রাট নিজের আব্বাজানের ওপর পর্যায়ক্রমে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, কখনো তিনি লেখবার সামগ্রী তার কাছে মহার্ঘ করে তোলেন। তিনি চেয়েছিলেন তার আব্বাজান নিজের প্রিয় রত্নসমূহের ভাণ্ডার তার কাছে সমর্পণ করুন। তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন, একজন বন্দি যিনি অবসর জীবন যাপন করছেন তার এসবের কোনো প্রয়োজন নেই এবং বিশেষ করে শাহ্জাহানের মোতির তসবি তিনি কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন। শাহজাহান প্রত্যুত্তরে জানান, তিনি নিখুঁতভাবে বাছাই করা একশ মোতির তসবি হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবেন কিন্তু কিছুতেই সেটা তার হাতে তুলে দেবেন না। তসবিটা শেষ পর্যন্ত অবশ্য তার কাছেই থাকে।

শাহ্জাহানের কারারুদ্ধ জীবনের প্রথম বছরে, পিতা-পুত্রের মাঝে অবশ্য চিঠির আদান-প্রদান হয়েছিল, শাহ্জাহানের চিঠিগুলো ছিল ভর্ৎসনা আর নিন্দায় ভরা। অন্যদিকে আওরঙ্গজেবের চিঠিতে নিজের শুভ অভিপ্রায়ের সত্যতা প্রতিপাদনের প্রয়াস। একটি চিঠিতে, অবহেলিত সন্তানের গভীর বেদনায় জারিত হয়ে তিনি কাঠখোট্টা ভঙ্গিতে উল্লেখ করেন, 'আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মেছিল যে, মহামান্য সম্রাট আমাকে ভালোবাসেন না।' শাহ্জাহান নিজের ভাইদের হত্যার আদেশ দেয়ায় তিনি একই সাথে নিজের পিতাকে বিদ্রূপাত্মক

ভঙ্গিতে খোঁচা দিয়েছেন : 'মহামান্য সম্রাট খসরুকে এখনো কি কোনো নামে অভিহিত করেন না...সম্রাট হিসেবে আপনার অভিষেককে অনেক পূর্বেই যে অস্তিত্বহীনতার রাজ্যে বিলীন হয়ে গেছে এবং যার কাছ থেকে আপনার কোনো ধরনের অপমান বা ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা ছিল না?'

তার অন্তরীণ জীবনের বছরগুলো সম্পর্কে তিনি কীভাবে সেখানে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন এর পরস্পরবিরোধী ভাষ্য পাওয়া যায়। বার্নিয়েরের ভাষ্য অনুসারে, জাহানারাই কেবল নন, শাহজাহানকে তার 'সমস্ত জেনানাকুল যাদের ভেতরে নতর্কী আর গায়িকা ও রাঁধুনিরাও ছিল', সবাইকে তার সাথে অবস্থানের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। মানুচ্চি অবশ্য দাবি করেছেন, আওরঙ্গজেব নিজের আক্রোশমূলক কর্মকাণ্ড বজায় রেখেছিলেন, যার ভেতরে ছিল একটি বিশেষ গবাক্ষ ইটের দেয়াল গেঁথে বন্ধ করে দেয়া, যেখান থেকে বৃদ্ধ সম্রাট যমুনার জলের শান্ত স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর নিঃসন্দেহে মমতাজের মকবরার কথা নিবিষ্ট মনে ভাবতে পছন্দ করতেন।

১৬৬৬ সালের গোড়ার দিকে, শাহজাহান জ্বর, আমাশয় আর প্রস্রাবের জ্বালাময়ী উপসর্গ—তার সন্তানেরা সিংহসনের জন্য লড়াই শুরু করার অব্যহিত পূর্বের সেই একই উপসর্গে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইউরোপীয় একটি ভাষ্যে রোগের কারণ হিসেবে পুনরায়, কামোদ্দীপক বস্তুর ব্যবহারকে দায়ী করা হয়েছে : 'মহান মোগল সম্রাটের, কৃত্রিম উপায়ে যৌন-কামনাকে উদ্দীপিত করার চেষ্টাই, যা ৭২ বছর বয়স হবার কারণে তার মাঝে প্রাকৃতিকভাবেই হ্রাস পেতে শুরু করেছিল, তার নিজের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে।' মালিশ বা তার মূত্রনালির বাধা অপসারণকারী একটি শল্যচিকিৎসায়ও শাহজাহান কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করতে ব্যর্থ হন। তার জ্বরের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং সেইসাথে প্রবল পানির পিপাসার সৃষ্টি হয়। কিছু ভাষ্য অনুসারে, শাহজাহান যখন অনুধাবন করেন যে তিনি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন, তখন তিনি অনুরোধ করেন তাকে পার্শ্ববর্তী একটি বারান্দায় নিয়ে যেতে, যেখান থেকে তিনি আরেকটু সহজে তাজমহল দেখতে পাবেন। সেখানে সেই বারান্দায়, কোমল কাশ্মিরী কম্বলে আপাদমস্তক আবৃত অবস্থায় এবং পাশে ক্রন্দনরত জাহানারার উপস্থিতিতে, ১৬৬৬ সালের ২২ জানুয়ারি ভোরের কোনো একটি সময় তিনি ইন্তেকাল করেন। পরিচারকরা কর্পূর জলে গোসল করিয়ে, ধূসর একটি কাফনের কাপড় দিয়ে তাকে মুড়ে দেয় এবং চন্দনকাঠের একটি শবাধারে তার শবদেহটা শায়িত করে। পরের দিন সকালবেলা, প্রথা অনুসারে, মাথার দিকটা সামনে রেখে একটি সদ্য খোলা ভূগর্ভস্থ দরজা দিয়ে তাকে নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শোকার্তদের একটি ক্ষুদ্র দল তার শবাধারটা নৌকায় করে যমুনার অপর তীরে নিয়ে যায়।

জাহানারা একটি 'সম্মানজনক আর যথাযোগ্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া'র পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। আওরঙ্গজেব রাষ্ট্রীয়ভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আয়োজনের অনুমতি দেননি। বৃদ্ধ সম্রাটকে, তার পরিবর্তে, মোনাজাতের মৃদু গুঞ্জনের মাঝে তাজমহলের মার্বেলের ভূগর্ভস্থ সমাধিকক্ষে দ্রুত আর নিঃশব্দে মমতাজের পাশে সমাহিত করা হয়।
সময়ের আবর্তের সাথে, একটি সময় এখানে সংক্ষিপ্ত সমাধিলিপি এবং স্বল্পমূল্যের রত্নপাথর দিয়ে উৎকীর্ণ উজ্জ্বল পুষ্পের নকশা করা একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়। স্মৃতিস্তম্ভের সরাসরি ওপরে মূল মকবরা কক্ষে আরেকটা পুষ্পের নকশাখচিত স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়। মুসলিম ঐতিহ্য অনুসারে, উভয় স্মৃতিস্তম্ভের উপরিভাগে গর্বিত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান কলমদানির উপস্থিতি মানে সেটা একজন পুরুষের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত ঠিক একইভাবে মমতাজের স্মৃতিস্তম্ভের ওপর রক্ষিত পাতলা, করম্বিত নকশার ফ্রেমে বাঁধানো লেখার স্লেটের অর্থ সেখানে একজন মহিলা চিরশয্যায় শায়িত রয়েছেন।
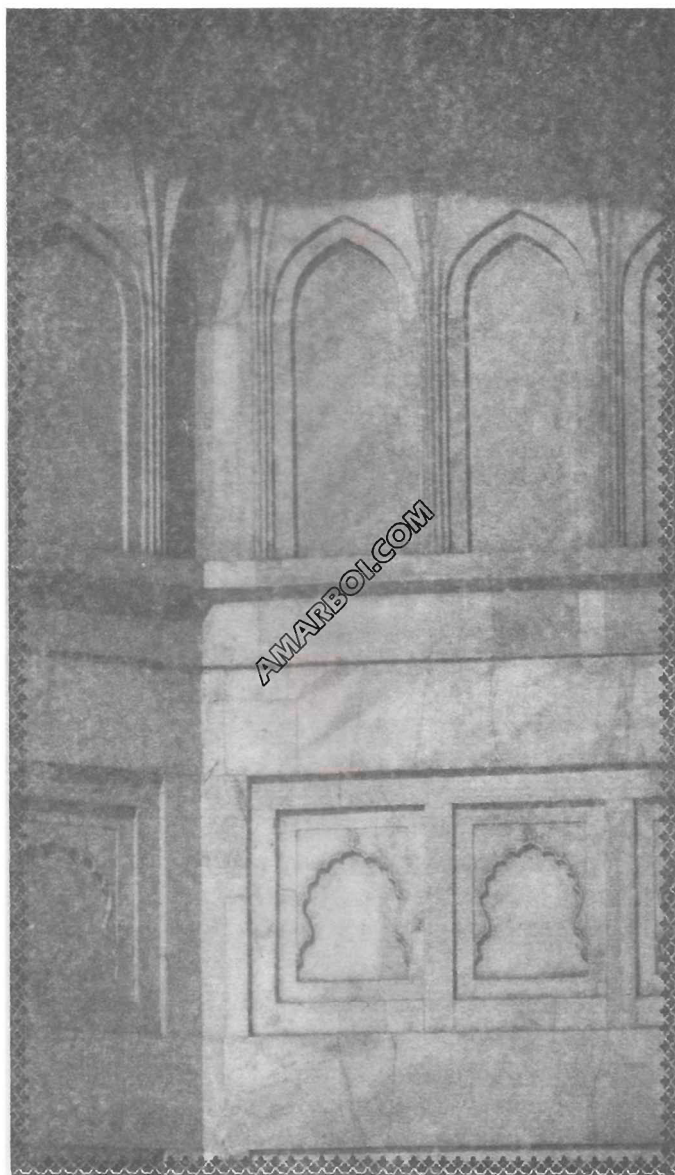
পঞ্চদশ অধ্যায়

তখত-ই-তাউসের নিপতন

আওরঙ্গজেব, যিনি শোকের সাদা আলখাল্লা ধারণ করেছিলেন, তার আব্বাজানের ইন্তেকালের দুই সপ্তাহ কাল অতিবাহিত হবার পরই কেবল দিল্লি থেকে আগ্রায় তার পিতা-মাতার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। তিনি সম্ভবত কোনো ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় কি না দেখতে চেয়েছিলেন। আগ্রায় পৌঁছে, তিনি তাজমহল জিয়ারত করেন, দরিদ্রদের মাঝে দানসামগ্রী বিতরণ করেন এবং শোকের সব ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

তিনি তার বড় বোন জাহানারার সাথে দ্রুত আর পুনরায় মীমাংসা করে নেন। জাহানারা আপাতদৃষ্টিতে তাদের আব্বাজানের প্রতি আওরঙ্গজেবের আচরণ ও মনোভাব ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। একান্ন বছর বয়সী রাজকন্যার ক্ষমতা আর মনোহারিতা এতটাই ছিল যে, রৌশনআরাকে সরিয়ে তিনি নতুন সম্রাটের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। জাহানারা নিজের অবস্থান এতটাই সুরক্ষিত বলে অনুভব করেন যে, তিনি আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় বিশ্বাসের গোঁড়ামির সাথে তাল মিলিয়ে জনসাধারণের জীবনে তার ক্রমাগত কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপকে প্রশ্ন করার মতো সাহস দেখান। আওরঙ্গজেব দরবারে গান-বাজনা, কবিতা চর্চা নিষিদ্ধ করেন এবং তার রাজত্বকালের দিনপঞ্জির রচয়িতাও নিষিদ্ধ করেন এই অজুহাতে যে, সেটা একান্তই আত্মাভিমানী একটি বিষয়। তিনি *ঝরোকা* বারান্দায় প্রত্যুষে প্রজাদের সামনে সম্রাটের দর্শন দানের প্রথার সাথে পৌত্তলিকতার মিল রয়েছে বলে সেটা বাতিল করেন। তিনি গাঁজা, মদ ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধকরণে অন্য শাসকদের মতো, যারা এসব নীতি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছিল তাদের মতোই সাফল্য লাভ করেন।

আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামি আর বিধান অনেকাংশেই অলিভার ক্রমওয়েলের পিউরিটানিজমের সাথে তুলনীয়, যিনি এর কিছুদিন পূর্বেই ইংল্যান্ডে ক্রিসমাসের

সময় আনন্দ-ফুর্তি করা এবং ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি নাটক আর মেপোল নৃত্য নিষিদ্ধ করেছিলেন। ক্রমওয়েলের ন্যায়, পৌত্তলিকতার প্রতি নিজের ঘৃণার কারণে আওরঙ্গজেব অন্য ধর্মের মূর্তি আর ভাস্কর্যের আকৃতিনাশ করেন। হিন্দু মন্দিরের মূর্তিগুলো ছিল তার মূল লক্ষ্য। আগ্রার নিকটে মথুরায়, হিন্দুদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান হিসেবে যা ভীষণ পবিত্র, তিনি আরো কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করে আক্ষরিক অর্থেই হিন্দু তীর্থস্থানের ওপর তিন-গম্বুজবিশিষ্ট দুর্গসদৃশ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র শহর, গঙ্গার তীরবর্তী বেনারসে, তিনি হিন্দু মন্দিরের ভিত্তির ওপর বিশাল একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের ২২৫ ফিট উঁচু মিনার শহর আর সেখানের আনুষ্ঠানিক শবদাহ করার ঘাটের ওপর জাকিয়ে বিরাজ করছিল।

১৬৭৯ সালে আওরঙ্গজেব ১১৫ বছর পূর্বে আকবরের নিষিদ্ধ করা *জিজিয়া* কর বা 'নাস্তিক'দের ওপর আরোপিত খাজনা পুনঃপ্রবর্তন করলে জাহানারা তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে আবেগময় ভাষায় প্রতিবাদ জানান। তিনি তার ভাইয়ের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়কে বিরূপ করে তুলে এই প্রথা তার সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করে ফেলবে। মানুচ্চির ভাষ্য অনুসারে, আওরঙ্গজেব কোরআন শরিফ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের কর্মকাণ্ডের যথার্থতা প্রতিপাদন করেন এবং তারপর 'তাকে বিদায় জানান এবং তার দিকে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়ান, এমন একটি আচরণ যা রাজকন্যাকে দ্রুত নিজের অবস্থান বুঝতে সহায়তা করে।'

সেই একই বছর, আওরঙ্গজেব মোগলদের অন্যতম মিত্র—রাজপুতদের, বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে দিল্লি থেকে রওনা দেন। তিনি এরপর যদিও আরো সাতাশ বছর জীবিত থাকেন কিন্তু নিজের রাজধানীতে তিনি আর ফিরে আসেন না। জাহানারা আঠারো মাস পর, সাতষট্টি বছর বয়সে, ১৬৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মৃত্যুবরণ করেন। আওরঙ্গজেব তাকে মরণোত্তর 'শাহিবাত-উজ-জামানী', 'সময়ের নিয়ন্ত্রক নারী' উপাধিতে ভূষিত করেন। দিল্লিতে এক সুফি সাধকের দরগার নিকটে একটি মামুলি সমাধিতে মমতাজের প্রিয়কন্যাকে সমাধিস্থ করা হয়। জাহানারা ফার্সি ভাষায় লেখা তার একটি কবিতায় যেমন অনুরোধ করেছিলেন ঠিক তেমনই তার মর্মরের শবাধারের ওপর ঘাস রোপণ করা হয় :

আমার সমাধিকে কেবল যেন ঘাসই আবৃত করে রাখে;
ধৈর্যশীলদের সমাধির সেরা আচ্ছাদন কেবলই ঘাস

রাজপুতদের ওপর আরো সরাসরি শাসনব্যবস্থা আরোপের অভিপ্রায়েই আওরঙ্গজেব রাজস্থান অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি মারওয়ারের

(জোধপুর) রাজার মৃত্যুবরণ করার পরে জন্ম নেয়া এক নবজাতককে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে গেলে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতাকে অভিযানের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি দ্রুত মারওয়ার দখল করে নেন এবং সেখানের অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে অধিবাসীদের মাঝে ব্যাপক বিরোধিতার জন্ম দেন। মেওয়ারের (উদয়পুর) প্রতিবেশী রাজ্য তরুণ শাহজাহানের কাছে পরাস্ত হবার পরই কেবল অনীহার সাথে আর নামেমাত্র মোগল অধিরাজত্ব মেনে নিয়েছিল। মারওয়ার দখলের পর মেওয়ারের সাথে আন্তঃসীমান্ত সংঘাতের সূচনা হয় এবং সবচেয়ে স্বাধীন রাজপুত রাজ্য আর মোগলদের মাঝে আরো একবার লড়াই শুরু হয়। মেওয়ারের সাথে যদিও অচিরেই এক প্রকার শান্তি স্থাপিত হয়, কিন্তু ত্রিশ বছর পরও মারওয়ারের বিশৃঙ্খলা আর বিচ্ছিন্ন গেরিলা যুদ্ধ একেবারে স্তিমিত হয় না, যখন আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগলরা মারওয়ারের রাজার মৃত্যুর পর ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তানকে শেষ পর্যন্ত শাসক হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

মেওয়ার আর মারওয়ারের মাঝে সংঘর্ষের একটি অনিবার্য পরিণতি—মাগলদের সাথে হিন্দু রাজপুতদের মৈত্রীতে ভাঙন, যা ছিল আকবর আর তার উত্তরসূরিদের শাসনের প্রধান অবলম্বন, যারা তাদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রতিপাদনের পাশাপাশি তাদের সম্প্রদায়ের চৌকশ সৈন্য আর সেনাপতি মোগলদের সরবরাহ করত। অধিকন্তু রাজপুতদের সাথে চলমান লড়াইয়ের কারণে আওরঙ্গজেবের চতুর্থ পুত্র তেইশ বছর বয়সী আকবরকে বিদ্রোহী হতে অনুপ্রাণিত করে। মানুচ্চির ভাষ্য অনুসারে, আওরঙ্গজেবের পুত্রদের ভেতরে তিনি ছিলেন 'সবচেয়ে সাহসী আর সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল।' তিনি সেইসাথে আবার তার আব্বাজানের প্রিয়পাত্রও বটে। সে যা-ই হোক, আওরঙ্গজেব মেওয়ারে যুদ্ধরত বাহিনীর নেতৃত্ব থেকে আকবরকে অপসারিত করেন, কারণ তার সাফল্য লাভে ব্যর্থতা। আকবর যখন তার আব্বাজানের অসন্তুষ্টির সম্মুখীন, তখনই রাজপুতরা তার সাথে যোগাযোগ করে এবং পরামর্শ দেয় আকবরের পক্ষে তার আব্বাজানকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং তার প্র-প্রপিতামহ আর একনামা সম্রাট আকবরের রাজত্বের অনুকরণে একটি নতুন আরো সহিষ্ণু রাজত্ব প্রতিষ্ঠাই হবে তাদের উভয়ের স্বার্থের জন্য মঙ্গলজনক। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রধান অনাধিকারিক দিনপঞ্জির রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে, 'অনভিজ্ঞ যুবরাজ সততার পথ থেকে বিপথগামী হন এবং যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা আর লোলুপতার কারণে রাজপুতদের ফাঁদে আটকে পড়েন।'

আকবরের বিদ্রোহ প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্য লাভ করবে বলে আপাতভাবে প্রতীয়মান হয়। তার আর রাজপুতদের অধীনে বিশাল শক্তিশালী একটি বাহিনী থাকায়, আকবর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন যে তিনি আরাধ্যবস্তু

ইতিমধ্যে অর্জন করেছেন। তিনি কালক্ষেপণ শুরু করেন। আওরঙ্গজেব তার চিরাচরিত ছলনার আশ্রয় নিয়ে তার ছেলের লেখা একটি চিঠি অনেকটা যেন দৈবাৎ রাজপুতদের হাতে তুলে দেন। আওরঙ্গজেব চিঠিতে আকবরকে মিথ্যাই অভিনন্দন জানান রাজপুতদের সাথে নিজেকে একীভূত করতে সফল হওয়ায় 'যেমনটা তাকে করতে বলা হয়েছিল' এবং আরো যোগ করেন 'যে তার উচিত এই সাফল্যকে পূর্ণতা দিতে রাজপুত বাহিনীকে এমন একটি অবস্থানে নিয়ে আসা, যেখানে তারা' মোগল বাহিনীর 'গোলাবর্ষণের আওতায় অবস্থান করবে।' চিঠিটা তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভে সিদ্ধ হয়, আকবরের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আকবর নিজে দাক্ষিণাত্যের দিকে পালিয়ে যান।

আওরঙ্গজেব নিজের বিপথগামী সন্তানকে বন্দি করতে এবং সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চলকে শেষ পর্যন্ত দমন করার দ্বৈত অভিপ্রায় নিয়ে অগ্রসর হন। নিজের জ্যেষ্ঠ কন্যা, কবি-রত্ন জেবুন্নিসার চিরস্থায়ী কারাদণ্ডের আদেশ দেয়ার জন্য কারণ জেবুন্নিসা গোপনে আকবরকে সমর্থন জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন, পথে সংক্ষিপ্ত যাত্রা বিরতি করার পর তিনি তার বাহিনী নিয়ে সোজা দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানেই তিনি তার জীবনের আর রাজত্বকালের অবশিষ্ট ছাব্বিশ বছর নিরন্তর যুদ্ধ প্রয়াসে অতিবাহিত করেন।

আকবর মারাঠাদের নিকট দাক্ষিণাত্যে তাদের পার্বত্য গুপ্তিস্থানে শরণ প্রার্থনা করেন। আওরঙ্গজেবের জন্য যুদ্ধবাজ মারাঠারা বহুদিন ধরেই একটি সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছিল। মোগলদের বিরুদ্ধে তারা তাদের পূর্ববর্তী গোত্রপতি শিবাজির নেতৃত্বে নিরবচ্ছিন্ন গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। ১৬৬৩ সালে, শিবাজি চালাকি করে পুনায় প্রবেশ করেন, যেখানে মোগল সেনা ছাউনির নেতৃত্বে ছিলেন মমতাজ মহলের ভাই শায়েস্তা খান। স্বয়ং শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠারা রাতের অন্ধকারে শায়েস্তা খানের মহলে গোপনে প্রবেশ করে, ইট দিয়ে আংশিকভাবে বন্ধ করা একটি জানালা ভেঙে হারেমে প্রবেশ করে যেখানে শায়েস্তা খান ঘুমিয়েছিলেন এবং তাকে সেখানেই আক্রমণ করলে তিনি বিছানা থেকেই তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। মারাঠারা পালিয়ে যাবার পূর্বে, তারা শায়েস্তা খানের বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন করে আর তার ছেলেদের একজনকে হত্যা করে যায়। শিবাজি শেষ পর্যন্ত যদিও পরাভব মানতে বাধ্য হন কিন্তু সেটা কেবল একটি শর্ত সাপেক্ষে যে, মোগলদের খাজনা দেয়ার পর তিনি তার ভূখণ্ডের কিছুটা নিজের আয়ত্তে রাখতে পারবেন। ১৬৬৬ সালে শিবাজিকে যখন আওরঙ্গজেবের দরবারে হাজির করা হয়, তার মনে হয় তাকে প্রতিশ্রুত সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি। তিনি সম্রাটের উপস্থিতিতেই জোরালো কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালে তাকে গৃহবন্দি করা হয়। তিনি অচিরেই যেখানে বন্দি ছিলেন সেখান থেকে খাবারের ঝুড়িতে আত্মগোপন করে পলায়ন করেন,

দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ি এলাকায় ফিরে যাবার পূর্বে ছাই মেখে অর্ধ-নগ্ন হিন্দু ফকিরের ছদ্মবেশ ধারণ করেন। পরবর্তী বছরগুলোতে, মারাঠাদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শিবাজির অন্য অভিযানসমূহের কারণে ভারতবর্ষের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম বীরদের অন্যতম হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। আকবর মারাঠা অঞ্চলে পৌছাবার এক বছর পূর্বে শিবাজি মৃত্যুবরণ করেন। তার ছেলে শম্ভুজি, যিনি তখন শিবাজির পরিবর্তে শাসন করছিলেন, তিনি ছিলেন অনেক কম যুদ্ধবাজ। ইউরোপীয় বণিকদের ভাষ্য অনুসারে, যিনি নিজেকে 'মদ আর রমণীর সাহচর্যে ভুলিয়ে রাখতে' পছন্দ করতেন। তিনি সংগত কারণেই আকবরকে অনুসন্ধানী হামলার হাত থেকে, যা আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ি এলাকার গভীরে প্রেরণ করত, সুরক্ষা দেয়া ছাড়া সামরিকভাবে সামান্যই সাহায্য করতে পেরেছিলেন।

আওরঙ্গজেব তার আব্বাজান শাহজাহানের পিতৃসুলভ নিষেধাজ্ঞা, যা প্রায়ই তার হাতকে সংযত রাখতে বাধ্য করত, তা থেকে মুক্তি লাভ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, মারাঠাদের শায়েস্তা করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো মোগলদের দীর্ঘদিনের শত্রু, বিজাপুর আর গোলকুণ্ডার প্রতিবেশী এবং বিশাল মুসলিম রাজ্য দুটি দখল করা। তাদের সমর্থন থেকে একবার বঞ্চিত হলে, হিন্দু মারাঠা আর তাদের মেহমান আকবরকে জব্দ করা সহজ হবে। ১৬৮৫ সালের জুন মাসে আওরঙ্গজেব প্রথমে বিজাপুর আক্রমণ করেন। রাজ্যটা দখল করতে তার পনেরো মাস সময় লাগে এবং এর ফলে গোলকুণ্ডা অভিযানের পথ উন্মুক্ত হয়, যা তত দিনে ব্যভিচারী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। রাজধানী হায়দ্রাবাদেই নাকি কেবল ২০,০০০ গণিকা বাস করত, যাদের অনেকেই প্রতি শুক্রবার শাসকের সামনে প্রকাশ্য স্থানে জাঁকালোভাবে নিজেদের প্রদর্শন করত। মোগল আক্রমণের প্রথম ইঙ্গিতেই, সেখানের শাসক হায়দ্রাবাদে নিজের বিলাসকুঞ্জ ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে অবস্থিত গোলকুণ্ডা দুর্গে পালিয়ে যান। এক দিনপঞ্জি রচয়িতার ভাষ্য অনুসারে 'নিজের অমাত্যদের সাথে কোনো পরামর্শ না করেই এবং নিজের কোনো সম্পত্তি বা তার পরিবার কিংবা হারেমের মেয়েদের কথা না ভেবেই।' দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পরই কেবল তার বোধোদয় হয় এবং সাহসিকতার সাথে তিনি আওরঙ্গজেবের বাহিনীর মোকাবিলা করেন। আট মাস অবরোধের পর, মোগলদের সামরিক বিক্রম নয়, উৎকোচের ফলে দুর্গের তোরণদ্বার অবারিত হয়, ইতিমধ্যে প্লেগের প্রাদুর্ভাবে মোগল শিবিরের অবস্থা সঙিন। তাদের রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হবার সাথে সাথে একটি অনাড়ম্বর কারাগারে তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত গোলকুণ্ডার শাসক বিজাপুরের শাসককে অনুসরণ করেন।

আকবর ইত্যবসরে পারস্যে পালিয়ে যান। মানুচ্চির ভাষ্য মতে, কতিপয় ফরাসি বণিকের সহায়তায়, কিন্তু আওরঙ্গজেব তার বিপথগামী সন্তানের সহযোগী মারাঠাদের পরাস্ত করার সংকল্প বজায় রাখেন। মোগলরা বিলাসপ্রিয়, অলস শম্ভুজি আর তার প্রধানমন্ত্রীকে শেষোক্তজনের বাসস্থান থেকে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে গ্রেপ্তার করে। মন্ত্রীর বাসভবনের মেঝেতে একটি গর্ত খুঁড়ে তারা সেখানে লুকিয়ে ছিল। মোগলরা তাদের দুজনের মাথায় ঘণ্টাযুক্ত গাধার টুপি পরিয়ে, উটের পিঠে চাপিয়ে দাক্ষিণাত্যের সড়কে আর শাহি সেনা ছাউনিতে প্রদক্ষিণ করায়। আওরঙ্গজেবের সামনে যখন শম্ভুজিকে আনা হয়, তিনি তার ধনসম্পদ কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে সেটা জানাতে অস্বীকৃতি জানান, আওরঙ্গজেবকে অভিশাপ দেন এবং তার ধর্মকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেন। আওরঙ্গজেব খুব ধীরে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দান করার মাধ্যমে তাকে পুরস্কৃত করেন। মোগলরা প্রথমে তার ঈশ্বর নিন্দাকারী জিহ্বা কর্তন করে। তারপর তাকে অন্ধ করে দেয়। পরবর্তী দুই সপ্তাহ আরো বিলম্বিত নির্যাতনের পরে তার হাত-পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেনা ছাউনির কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার মাথায় খড় ভরে সেটা উদ্ধত বিদ্রোহীদের ভাগ্যে কী রয়েছে বোঝাতে দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র প্রদর্শিত হয়।

শম্ভুজির নিষ্ঠুর মৃত্যুর ফলে আওরঙ্গজেবের বদলে মারাঠাদের প্রতি মানুষের সহানুভূতি বৃদ্ধি পেলে তাই অবাক হবার কিছু থাকে না। দাক্ষিণাত্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করার অভিপ্রায়ে আওরঙ্গজেব সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন, কিন্তু অচিরেই চোরাগুপ্তা গেরিলা হামলা শুরু হলে আওরঙ্গজেবের ১৭০,০০০ সৈন্যের বাহিনী আর প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ শিবির অনুগমনকারী দুর্বহরূপে অকার্যকর প্রতীয়মান হয়। আওরঙ্গজেব যদিও তার সাম্প্রতিক বিজয়ের ফলে মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্ত তাদের সর্বোচ্চ মাত্রায় বৃদ্ধি করে ভারতের দক্ষিণে অনেক ভেতরে এর সীমারেখা নিয়ে গেলেও, দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ মোগল প্রাচুর্যের জন্য তলাবিহীন পাত্র হয়ে ওঠে, শাহজাহান যখন তার বিশাল আর ব্যয়বহুল নির্মাণ প্রকল্পের কথা বিবেচনা করছিলেন তখনো যা ছিল অফুরন্ত। দাক্ষিণাত্যে, রাজস্থানে আর সাম্রাজ্যের অন্যত্র আওরঙ্গজেব তার হিন্দু প্রজাদের প্রতি যে আচরণ করেন তার ফলে মোগল শাসনের মৌলিক চরিত্র বদলে যায়। এটা তখন আর স্বাধীনতা আর পারস্পরিক বিশ্বাসের দ্বারা একত্রে গ্রন্থিত সম্রাট আকবরের স্থাপিত সহিষ্ণু আর সামগ্রিক সাম্রাজ্য নয়। বাবরের সময়কালের ন্যায় মোগলরা আরো একবার দখলদারী শক্তির রূপ গ্রহণ করে।

১৭০৫ সালের অক্টোবরে, ষোলো বছর পরে আওরঙ্গজেব পুনরায় উত্তর দিকে যাত্রা আরম্ভ করেন। সাতাশি বছর বয়স আর ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে, তিনি মুম্বাইয়ের

(বোম্বে) পূর্বে আহমেদনগরে পৌঁছাবার পর সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। পাশ্চাত্যের দিনপঞ্জি অনুসারে সেদিনটা ছিল ১৭০৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। আওরঙ্গজেব যেমন কামনা করেছিলেন দিনটা ছিল তেমনই শুক্রবার, মুসলমানদের পবিত্র দিন। আহমেদনগর থেকে বিশ মাইল দূরে, খুলদাবাদ বলে একটি স্থানে এক মুসলিম সাধুর মকবরায় তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তার ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, শেষ মহান মোগলের সমাধির ওপর নামবিহীন বেলে পাথরের একটি আয়তাকার টুকরো দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় এবং উপরিভাগ আকাশের দিকে খোলা রাখা হয়—কাবুলে অবস্থিত তার প্র-প্র-প্রপিতামহ বাবরের সমাধির চেয়েও অনাড়ম্বর একটি সমাধি এবং তার পিতা-মাতার চমকপ্রদ মকবরার সম্পূর্ণ বিপরীত। তার শেষ বক্তব্যে নিজের আব্বাজানের প্রতি তার অসন্তোষ স্পষ্টতই উদ্বেলিত : "নিজের সন্তানদের কখনো বিশ্বাস করবে না, নিজের জীবদ্দশায় কখনো তাদের সাথে আন্তরিক আচরণের কথা ভাবতে যেয়ো না; কারণ সম্রাট শাহজাহান যদি দারা শুকোহ্র প্রতি (পক্ষপাতিত্ব) না করতেন, তার কার্যকলাপের তাহলে এমন দুঃখজনক পরিণতি হতো না। সব সময় এ কথাটা স্মরণে রাখবেন 'একজন রাজার প্রতিশ্রুতি সব সময় ঊষর'।"

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত ঘটে। ১৭০৪ সালে নির্বাসিত অবস্থায় আকবর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কিন্তু আওরঙ্গজেবের তিন জীবিত পুত্র, যাদের দুজনকে তিনি বিভিন্ন সময়ে কারারুদ্ধ করেছিলেন—উত্তরাধিকারী হতে লড়াই শুরু করেন। পুত্রদের ভেতর দুজন আর তিনজন পৌত্র এ লড়াইয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মোগল সাম্রাজ্য অচিরেই ভেঙে গিয়ে পরস্পরের সাথে যুদ্ধমান রাজ্যের একটি জটলায় পরিণত হয়, যেখানে আমোদপ্রিয় সম্রাটের পরম্পরা ততোধিক অল্প কর্তৃত্ব ভোগ করে। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহের নেতৃত্বে পার্সিরা দিল্লি আক্রমণ করে শহরটা দখল করে নিলে সেখানকার অধিবাসীরা নিরাপত্তা-প্রতিবিধান হিসেবে বিপুল অর্থ প্রদান করে এবং পার্সিরা তখত-ই-তাউসসহ অন্যান্য ধনসম্পদ সেইসাথে লুট করে নিয়ে যায়। তৈমূরের দিল্লি আক্রমণ আর সেখানের কারিগরদের তার একত্রীকরণের প্রায় ৩৫০ বছর পর এবং বাবর হিন্দুস্তানে যে গুটিকয়েক মূল্যবান অনুষঙ্গ খুঁজে পেয়েছিলেন তাদের ভেতর কারিগরদের অন্যতম জ্ঞান করার ২০০ বছর পর, ভারতীয় কারিগরদের খ্যাতি কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছে। ১৭৩৯ সালে পার্সিরা লুটের ধনসম্পদের সাথে ১০০ রাজমিস্ত্রি আর ২০০ সূত্রধরকে বন্দি করে নিয়ে যায় তাদের বন্দিকর্তার রাজ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য, তখন আসলে তাতে বিস্মিত হবার হবার কিছু থাকে না।

মোগল সম্রাটদের ক্ষমতা হ্রাস পাবার সাথে সাথে আগ্রায় তাদের উপস্থিতিও হ্রাস পায়, যা ইতিমধ্যে একটি প্রাদেশিক শহরের মর্যাদায় আপতিত হয়। তাজমহল এই সময়ে ভালোবাসার প্রতীকের চেয়ে মোগল সাম্রাজ্যের অতীত গৌরবের স্মারক হিসেবেই বিদ্যমান ছিল। দূরের আর কাছের লুটেরাদের কাছে এটা এবং আগ্রার আশপাশে অবস্থিত অন্যান্য মোগল স্মৃতিসৌধ লোভনীয় লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়, যদিও দিল্লিতে নাদির শাহের লুটতরাজের মাত্রার সাথে তাদের ধ্বংসলীলার তুলনাই চলে না। জাঠ সম্প্রদায়, একটি স্থানীয় উঠতি সামরিক শক্তি, মোগলদের বেশির ভাগ ঐশ্বর্য তারা লুট করে নিয়ে গিয়েছিল, বলা হয়ে থাকে যার ভেতরে ছিল তাজমহলের কারুকার্যময় আর রত্নখচিত রুপার তোরণদ্বার। তারা তাদের প্রাসাদের শোভাবর্ধনের জন্য মর্মর আর বেলে পাথর পর্যন্ত খুলে নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আঠারো শতকে যখন মারাঠারা, তখনকার শক্তিশালী জাতি একদা শিবাজি যাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, শহরটা দখল করে, তারা এবং তাদের ফরাসি পরামর্শদাতারা মোগলদের ইমারতসমূহের লুটপাট অব্যাহত রাখে, ইমারতগুলো থেকে তারা আরো অধিক পরিমাণে পাথর আর অল্প মূল্যের রত্নপাথরের করম্বিত নকশা তুলে ফেলে।

১৮০৩ সালে জেনারেল লেকের অধীনে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির সৈন্যবাহিনী আগ্রা দখল করে তত দিনে তাজমহলের দেয়ালের পর্দা, রত্নখচিত শামিয়ানা আর গালিচার সাথে সাথে বেশির ভাগ মূল্যবান সাজ-সরঞ্জাম খোয়া গেছে। তারা যদিও তাজমহল মেরামত করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল এবং ১৮১০ সালে গোড়ার দিকেই পুনর্নির্মাণের প্রথম পদক্ষেপ নিলেও, ব্রিটিশরা মকবরাটার সাথে তার প্রাপ্য মর্যাদা অনুসারে আচরণ করেনি। তারা মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপনের জন্য কটেজ হিসেবে মকবরার দুই পাশে অবস্থিত মসজিদ আর তার জবাব মেহমানখানা ভাড়া দিতে আরম্ভ করে। তারা সেইসাথে সেখানে বলনাচের আয়োজন করা শুরু করে যেখানে মকবরার মোকাম কুর্সি থেকে সামরিক বাদ্যযন্ত্রীর দল যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করত। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ ভাইসরয় যেমন স্বীকার করেছেন, 'শুরুর দিকে যখন তাজমহলের উদ্যানে বনভোজনের আয়োজন করা হতো তখন বনভোজনে আসা লোকেদের কাছে হাতুড়ি আর ছেনি নিয়ে অলস মধ্যাহ্নে সম্রাট আর তার বিরহি সম্রাজ্ঞীর স্মৃতিস্তম্ভ থেকে আকিক আর কার্নেলিয়নের টুকরো খুঁড়ে তোলাটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।'

ব্রিটিশরা উদ্যানের নির্জনতায় সুরা পান করতে পছন্দ করত। ১৮৭২ সালের একটি ইংরেজি ভ্রমণ পঞ্জিকায় অবজ্ঞার সাথে উদ্ধত ভঙ্গিতে বলেছে, 'পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে নিভৃত স্থানে নির্মিত এই স্থানে কখনো কোনো উৎসবের

আয়োজন যদি না করা হতো তাহলে নিশ্চিতভাবে হয়তো সেটা এর চরিত্রের সাথে মানানসই হতো, কিন্তু স্থানীয়রা এর প্রবেশপথে হরদিন বাজার বসানোর ফলে এবং সমস্ত প্রাঙ্গণে কমলার খোসা আর অন্যান্য আবর্জনা ফেলায়, এটা সম্ভবত গুটিকয়েক ইংরেজ লোককে নির্জন কোনো কোণে তাদের সতেজ হবার সুযোগ না দেয়াটা ভণ্ডামি হতো।'

অবশ্য লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং, যিনি ১৮৩০ সালে ব্রিটিশ গভর্নর ছিলেন, তিনি তাজমহল ভেঙে ফেলে এর মর্মর পাথর নিলামে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু লন্ডনে ভারতীয় শিল্পপণ্যের নিলাম কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়েছে জানার পরই কেবল এ বিষয়ে নিরস্ত হয়েছিলেন বলে যে দাবি করা হয় সেটা সর্বৈব মিথ্যা। ভারতবর্ষে তার স্বদেশি শত্রুরা গল্পটা ফেঁদেছিল, যা এমনকি একটি সরকারি নথিতেও খুঁজে পাওয়া যায়। তারা সত্যের যে মামুলি সুতোটাকে ভিত্তি করে এমন গল্প তৈরি করেছিল, সেটা হলো বেন্টিং আগ্রার অন্য আরেকটা স্থাপনার মার্বেলের তৈরি গোসলের জলাধারের অবশিষ্টাংশ বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলেন, যার কিছু অংশ ষোলো বছর পূর্বেই জাহাজে করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।'

লর্ড কার্জন নিজে এতটাই উদ্ধত একজন অভিজাত ছিলেন যে, অক্সফোর্ডে তার সহপাঠীরা নিম্নোক্ত বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিগুলো তৈরি করেছিল, 'আমার নাম জর্জ নাথানিয়েল কার্জন, আমি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি', এবং ডার্বির সপ্তদশ আর্ল পরবর্তী সময়ে স্বীকার করেছেন, কার্জন 'যেকোনো ব্যক্তির মাঝে ভয়ংকর পামরের একটি অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারত।' এটা সম্ভবত প্রথা আর সামাজিক অবস্থানের প্রতি তার শ্রদ্ধার কারণেই সম্ভব হয়েছিল যে, তিনি আগ্রার রাজকীয় মোগল স্থাপত্যের অবহেলাজনিত প্রভাব দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে নিজের কাজের বিষয়ে আর আগ্রার কারিগরদের দক্ষতা সম্বন্ধে যথার্থই গর্বিত বোধ করেছিলেন। তাজে এখন আর 'ঘিঞ্জি বাজার আর ধূলিধূসরিত নোংরা মাড়িয়ে যেতে হয় না। সেখানে একটি সুন্দর উদ্যান তৈরি করা হয়েছে। তাজে প্রবেশের পথে অবস্থিত উদ্যানের প্রতিটি ইমারত বিচক্ষণতার সাথে মেরামত করা হয়েছে এবং মূল পরিকল্পনা খুঁজে পাবার কারণে জলের নহর আর ফুলের বাগিচাগুলোকে তাদের ঠিক মূল অবস্থায় পুনর্নির্মাণের সুযোগ আমাদের দিয়েছে। আগ্রার দক্ষ শ্রমিকরা এ উদ্যোগে ঠিক ততটাই আগ্রহ আর রুচির স্বাক্ষর রেখেছে, যতটা তিনশ বছর পূর্বে তাদের পূর্বসূরিরা রেখেছিল। আমি ভারতবর্ষে আসার পর থেকে আমরা কেবল আগ্রার পুনর্নির্মাণেই ৪০,০০০ পাউন্ড ব্যয় করেছি। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্তে আর পুনরুদ্ধারকৃত সৌন্দর্য ভবিষ্যতের জন্য উপহারস্বরূপ বিবেচনা করেই প্রতিটি রুপি ব্যয় হয়েছে।' তার বক্তব্যের সবচেয়ে কৌতূহলকর বিষয়

সম্ভবত পুরাতন পরিকল্পনার উল্লেখ, কিন্তু হতাশার কথা হলো, ব্রিটিশ বা ভারতীয় কোনো মহাফেজখানায় সেগুলো এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।*

তাজমহলের প্রতি কার্জনের বিশেষ একটি পক্ষপাত ছিল। মর্মরের মোকাম কুর্সিতে দাঁড়িয়ে একবার একটি বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'তাজমহলের মাঝের গম্বুজটা আকাশের বুকে বিশাল আকৃতি নিয়ে ভেসে উঠেছে। আমি যদি ভারতবর্ষে আর কোনো কিছুই না করি, আমি সেখানে আমার নাম লিখেছি প্রাণবন্ত এক আনন্দের মাত্রায়।' প্রাচীন এক মিশরীয় মসজিদের ঝাড়বাতির অনুকরণে নির্মিত পিতলের একটি চমৎকার ঝুলন্ত ঝাড়বাতি কার্জন তাজমহলে দান করেছেন। ঝাড়বাতিটা রাজকীয় সমাধিসন্দৌখের শীর্ষে অভ্যন্তরীণ গম্বুজের কেন্দ্রে আজও ঝুলন্ত রয়েছে।**

বিংশ শতাব্দী অতিবাহিত হবার সাথে সাথে ব্রিটিশরা তাজমহল জরিপে আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সব কিছু নথিবদ্ধ করে। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে, ভারতবর্ষের পুরাতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ, যা আসলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্থাপিত হয়েছিল, পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনার একটি বিশদ প্রকল্প গ্রহণ করে। তারা যদিও তাজমহলের মূল কাঠামোতে কোনো খুঁত খুঁজে পায়নি কিন্তু প্রতিবেদন পেশ করে যে, তাজমহলের চারটি মিনারের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমের মিনারটি সাড়ে আট ইঞ্চি বাইরের দিকে হেলে রয়েছে এবং অন্য তিনটিও দেড় ইঞ্চি থেকে সাড়ে চার ইঞ্চির ভেতরে হেলে রয়েছে।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জনের পর, ভারতবর্ষের পুরাতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ তাদের কাজ অব্যাহত রেখেছে এবং তাজমহলের রক্ষণাবেক্ষণ আর যত্নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, যা ১৯৮৩ সালে ইউনেসকো কর্তৃক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়, ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য আগ্রা বিমানঘাঁটি বিমান চলাচলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হতো। পাকিস্তানের বিমান বাহিনী রাতের চন্দ্রালোকিত আকাশে শুভ্র তাজমহলকে দিকনির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করে সেখানে বিমানঘাঁটিতে আক্রমণ করতে পারে আশঙ্কায় ভারত সরকার সাদা মকবরা আর তার মিনারগুলো পুরোপুরি ঢেকে ফেলতে দর্জিদের কালো কাপড়ের অতিকায় কপটবেশ তৈরি করে ঢেকে

---

* বিংশ শতকের প্রথম অর্ধে স্থাপত্যকর্মের নকশা অঙ্কনকারী ওস্তাদ ঈশার উত্তরসূরিরা সম্ভবত এ নকশাগুলোর কথাই বলেছিল।

** কার্জন অবশ্য, হয়তো, মমতাজ মহল আর শাহজাহানের ভালোবাসায় বিদ্যমান ভোগসুখাসক্ত আবেগ ঠিক অনুধাবন করতে পারতেন না তাই নিজের স্ত্রীকে সহবাসের সময় তিনি বারবার তাকে বলতেন, 'মেয়েরা সব সময় নির্জীব পড়ে থাকবে।'

ফেলার আদেশ দেয় আকাশ থেকে তাদের দৃশ্যমানতা হ্রাস করতে। দশ বছর আগেও ইঁদুরের আক্রমণে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত তাজমহলের একটি কক্ষে কপটবেশটা রাখা ছিল।

একবিংশ শতকের প্রথম বছরে সন্ত্রাসবাদ তাজমহলের জন্য আরো ব্যাপক প্রত্যক্ষ হুমকি হিসেবে দেখা দেয় এবং ভারত সরকারও গুরুত্ব অনুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। পুরো মকবরা প্রাঙ্গণের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বালির বস্তা দিয়ে বাঙ্কার তৈরি করা হয়েছে এবং যমুনা আর মকবরার মধ্যবর্তী স্থানে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হয়েছে। সারা বিশ্বে আজ বিমানবন্দর আর গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ইমারতে নিরাপত্তারক্ষীদের লোকজনের দেহ তল্লাশি করতে আর ব্যাগ পরীক্ষা করতে দেখা একটি নৈমত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, দরকারের সময় তাদের সাথে বিস্ফোরক অনুসন্ধানের জন্য বোমা খুঁজতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের পাল যোগ দেয়।

মকবরারটার জন্য সম্ভবত সবচেয়ে বেশি হুমকির হয়ে দেখা দিয়েছে আশপাশের এলাকায় অবস্থিত কলকারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, রেলস্টেশন আর চলমান গাড়ির বহরের ধোঁয়ার ফলে সৃষ্ট মানুষের তৈরি দূষণ। ভারত সরকার বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তারা ২৫০টি কারখানা স্রেফ বন্ধ করে দিয়েছে, যাদের ধোঁয়া নির্গমন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই। এমন পদক্ষেপের ফলে প্রায় ১০০,০০০ লোক চাকরি হারিয়ে বেকার হয়েছে বিধায় আগ্রার সবাই বিষয়টি ভালোভাবে মানতে পারেনি, যেখানের মানুষ প্রকাশ্যেই মন্তব্য করে, 'মকবরাটা রক্ষা করতে আমাদের কি শহরটাকে একটি সমাধিসৌধে পরিণত করতে হবে?'

আগ্রায় কেবল সীসা-মুক্ত পেট্রল বিক্রির অনুমতি রয়েছে এবং সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মিত হচ্ছে, যাতে করে সেই অঞ্চলের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় সবচেয়ে ন্যূনতম দূষণ ঘটে। তাজ প্রঙ্গণের ৫৫০ গজের ভেতরে কেবল ব্যাটারিচালিত গাড়ি আর পশু বা মানুষে টানা গাড়ি প্রবেশের অধিকার পায়। মকবরার উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত মিনারিকায় ভারতবর্ষের পুরাতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ দূষণ পর্যবেক্ষণের একটি ব্যবস্থা স্থাপণ করেছে, যা আগত দর্শনার্থীদের সালফার-ডাই অক্সাইডের মতো দূষকের মাত্রার পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দিতে সক্ষম। সাদা মর্মরের ওপর থেকে পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ অনেক পরিশ্রম সহ্য করে হলুদ ছোপ দূর করতে পেরেছে। তারা কয়েক বছর পূর্বে আবিষ্কার করে যে কাদা, শস্যকণা, দুধ, আর চুনের মিশ্রণ, আকবরের দিনপঞ্জির রচয়িতা আবুল ফজল যাকে মহিলাদের মুখের সর্বোৎকৃষ্ট প্রসাধন বলে উল্লেখ করেছেন, আদতে অনেক সফল একটি বিশোধক। সংরক্ষণকারীরা এক ইঞ্চি পুরু করে এই লেইটা পাথরে প্রয়োগ করেন এবং এর ব্যবহারের

ফলে মকবরার অভ্যন্তরভাগ আর মিনারিকার রঙে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। ২০০৩ সালে ভারত সরকার তাজমহল থেকে মাত্র ৩০০ গজ দূরে ছয় মাস পূর্বে আরম্ভ হওয়া একটি বিনোদন কমপ্লেক্সের নির্মাণ স্থগিত করে দেয়, ইউনেসকোর কাছ থেকে এই মর্মে একটি হুঁশিয়ারি পাবার পরে যে নতুবা তারা তাজমহলের নাম ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারে।

যমুনার পানির স্তর আর পানির প্রকৃতি আরেকটা অন্যতম উৎকণ্ঠার বিষয়। যমুনা প্রথমদিকে তাজমহলের গা ঘেঁষে বয়ে যেত, যাতে শাহজাহান আগ্রা দুর্গ থেকে নৌকা করে সরাসরি মকবরার নিচে অবস্থিত বারান্দার অবতরণ স্থানে এসে নামতে পারেন। যমুনা বর্তমানে অনেক শীর্ণকায়া, ভীষণ দূষিত একটি নদী, যা বারান্দার অবতরণস্থল থেকে বেশ খানিকটা দূর দিয়ে বয়ে চলেছে। ২০০৩ সালের জুনে, তাজমহলের কাছেই রাসায়নিক দূষণ আর নর্দমার অপরিশোধিত ময়লার কারণে হাজার হাজার মাছ মৃত অবস্থায় ভেসে উঠেছিল। ২০০৪ সালে দুজন ভারতীয় ঐতিহাসিক, ইউনেসকোর জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে হুঁশিয়ার করেন যে, ১৯৪০ সালের জরিপের পর মিনারিকার নতি আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ অবশ্য আরো অনুসন্ধানের পর মিনারিকার ভিত বা মোকাম কুর্সিতে কোনো ধরনের ফাটলের চিহ্ন দেখতে পায়নি এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে, নতিটা মূল পরিকল্পনারই অংশ যা সম্ভবত ভূমিকম্পের সময় মিনারিকাগুলোকে মকবরা অভিমুখে ভেতরের দিকে বিধ্বস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখতে বা শতাব্দী প্রাচীন ভূগর্ভস্থ বনিয়াদ বসে যাবার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তারা পরামর্শ দেয় যে, নতির পরিমাপের পার্থক্য পরিসংখ্যানের ভ্রান্তিজনিক মাত্রার ভেতরেই অবস্থান করছে। ঐতিহাসিকরা দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বিশ্বাস করেন, যমুনার পানির ভারসাম্য রক্ষাকারী চাপের অনুপস্থিতির কারণে তাজমহল আর এর মোকাম কুর্সি ধীরে ধীরে উত্তর দিকে বসে যেতে শুরু করেছে এবং মিনারিকার চতুষ্টয়ের নতি এই প্রক্রিয়ার প্রথম ইঙ্গিত। তারা তাজমহলের ভাটিতে যমুনার ওপর বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব দেন, যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ধরে রেখে পানির আদি স্তর আর চাপ ফিরিয়ে আনা যায়।

সে যাই হোক, তাজমহল এখন প্রত্যেক সপ্তাহের শুক্রবার রক্ষণাবেক্ষণের আর অন্যান্য কর্মকাণ্ডের কারণে দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ থাকায় পর্যটন ব্যবস্থা নানা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিবছর তাজমহলে দেখতে আসা ৩,০০০,০০০ জন পর্যটকের মকবরার অভ্যন্তরে নিঃশ্বাসের ঘনীভবন আরেকটা বিশাল সমস্যার জন্ম দিয়েছে। পর্যটকের এই বিপুল সংখ্যার মানে নিভৃতে তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগ করা, যা একে সবচেয়ে আকর্ষক করে তুলে

বর্তমানে অসম্ভব। অবশ্য এটাও ঠিক যে, পর্যটকের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করাও পুরোপুরি অনৈতিক একটি কাজ হবে আর সেটা অসম্ভবও বটে। বিদেশি পর্যটকদের প্রদত্ত প্রবেশ মূল্যের সাথে সংগতি রেখে ভারতীয়দের জন্য মূল্য বৃদ্ধি করা হলে বিপুলসংখ্যক ভারতীয় তাদের জাতীয় উত্তরাধিকার দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে। ভারতীয় জাতীয়তার দ্বারা নিষেধাজ্ঞা আরোপের অর্থ হবে বিদেশিরা সত্যিকারের অতুলনীয় একটি কীর্তি হিসেবে বহুদিন ধরে স্বীকৃত নিদর্শন আর দর্শন করতে পারবে না। শাহজাহানের রাজ কবিদের একজন যেমন লিখেছেন :

বেহেশতের সমুন্নত খিলানের নিচে, এমন একটি স্বপ্ন-সৌধ
আকাশের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিপ্রায়ে মাথা উঁচু করেনি।
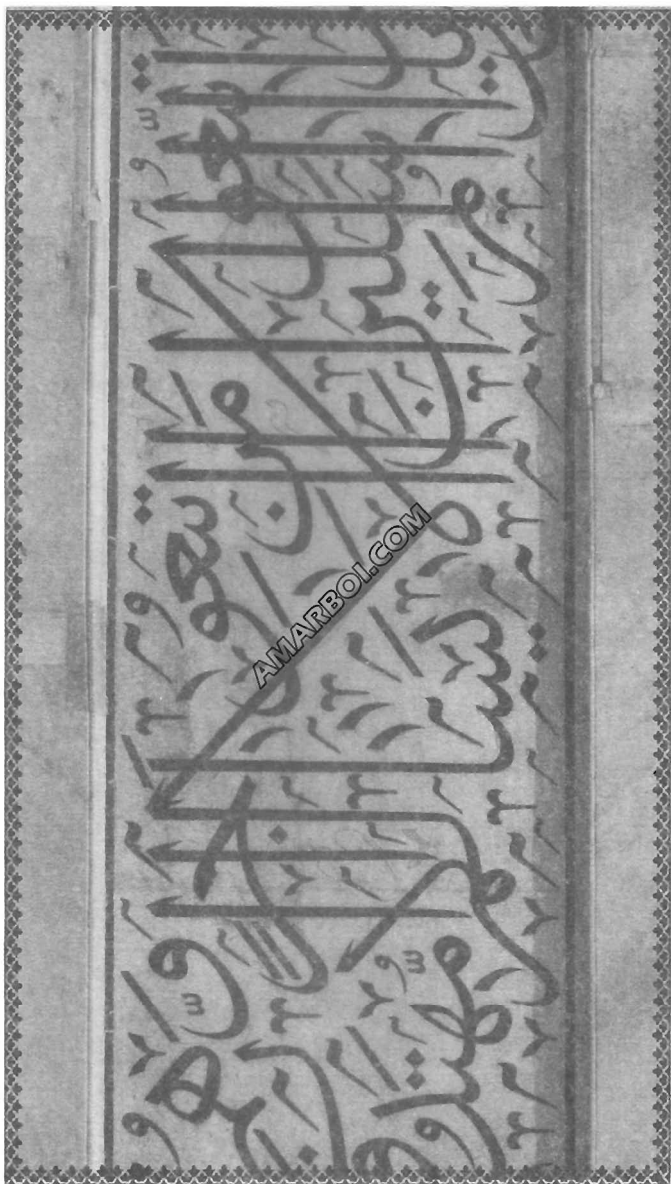
ষোড়শ অধ্যায়

নদীর অপর তীরে তার আপন মকবরা

মোনালিসার রহস্যময় হাসির আড়ালে কী লুকিয়ে আছে আমরা যেমন কখনো জানতে পারব না ঠিক তেমনি তাজমহল সম্বন্ধে অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়েছে। কিছু প্রশ্ন হয়তো আরো প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দ্বারা সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু অন্যগুলো শাহজাহান যখন তাজমহল নির্মাণের পরিকল্পনা করছিলেন তখন শোকার্ত সম্রাট তার মানসপটে কী দেখেছিলেন তার সাথে সম্পর্কিত।

শাহজাহান আর তার স্থপতিরা কী কারণে তাজমহলের মূল মকবরা উদ্যানের মধ্যে নির্মাণ না করে, যা মকবরার জন্য রীতিসম্মত, শেষ প্রান্তে নির্মাণ করেছেন, তা সবচেয়ে বেশি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ১৯৭০ সালে আমেরিকার এক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক ব্যাপকভাবে স্বীকৃত মতবাদের ওপর ভিত্তি করে বলেন, তাজের মকবরা প্রাঙ্গণ পৃথিবীতে বেহেশতের অনুভূতি জন্ম দেয়ার অভিপ্রায়ে নির্মিত হয়েছিল, এটা বোঝাতে যে মূল মকবরাটা আল্লাহর আরশের প্রতীকি উপস্থাপন, যা সরাসরি বেহেশতের ওপর অবস্থিত এবং পুরো প্রাঙ্গণটা পুনরুত্থানের দিনের হাশরের ময়দানের একটি রূপকাশ্রয়ী ব্যাখ্যা যেমনটা মরমি সুফি-সাধকদের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। তাজমহলের নিচে অবস্থিত বাগিচা পুনরুত্থিত মানুষের সমবেত হবার ময়দানের প্রতীক সৃষ্টিকর্তা নিজের সাদা মর্মরের সিংহাসন তাজমহল দ্বারা উপস্থাপিত উপবিষ্ট অবস্থায় যেদিকে তাকিয়ে থাকবেন। শাহজাহানের প্রিয় পুত্র এবং কন্যা দারা শুকোহ্ আর জাহানারা সুফি ভাবাদর্শের প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যয়বহুল সিংহাসন নির্মাণে তার চিন্তাকুলতার খানিকটা হলেও এ বিষয়ের প্রতি সাফাই দেয়। অন্যরা আগ্রায় নদীর তীরবর্তী উদ্যানে অনুসৃত রীতি অনুসারে পানির পাশে মূল হাভেলি নির্মাণের ফলে যমুনার পানিতে প্রতিফলন, শীতল বাতাস আর দৃষ্টির আড়াল প্রাপ্তির সুবিধার কথা ভেবেই মূল মকবরার অবস্থানের বিষয়টিকে বিবেচনা করেন।

অবশ্য প্রায় দশ বছর পূর্বে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া আর আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের স্যাকলার গ্যালারি, যমুনার উত্তর তীরেতাজমহলের ঠিক বিপরীত পাশে অবস্থিত বাগিচার অবশিষ্টাংশে যা 'মাহতাব বাগ' বা 'চন্দ্রালোকিত বাগিচা' নামে পরিচিত এবং বাবর কর্তৃক প্রথমে নির্মিত স্থানে অবস্থিত বলে ধারণা করা হতো, পর্যবেক্ষণ করা আরম্ভ করে। আগ্রার পরিকল্পনা আর পুরাতন নকশা তুলনা করে আবিষ্কার করে যে, এই বাগিচাগুলোতে সম্ভবত হাভেলি ছিল এবং তাজমহলের সাথে একই রেখায় অবস্থিত। তারা যখন তাদের খননকার্য শুরু করে, মাহতাব বাগ এলাকাটা যমুনায় বন্যার ফলে জমা হওয়া পলিমাটির নিচে চাপা পড়ে ছিল এবং পুরো এলাকাটা ছিল ঘাস আর অন্যান্য গাছপালায় আচ্ছাদিত। আশপাশের গ্রামে বাড়ি নির্মাণের জন্য এখান থেকেই পাথর আর অন্যান্য উপকরণ সংগৃহীত হয়েছিল। যমুনার তীরবর্তী ইটের কাঠামোর কিছুটা অংশ নদীর পানিতে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

প্রত্নতত্ত্ববিদদের সযত্ন খননকার্য নিশ্চিত করে যে চব্বিশ একর জমিতে অবস্থিত মাহতাব বাগ বাস্তবিকই একটি নিশাচর প্রমোদকানন। মোগলরা চন্দ্রালোকিত বাগিচার প্রবর্তক নয়, হিন্দু শাসকরা তাদের আগমনের অনেক আগেই এমন বাগিচা ভারতবর্ষে নির্মাণ করেছেন। দিনের উষ্ণতা হ্রাস পাবার পর তারা সন্ধ্যার স্নিগ্ধ শীতলতা, বিশেষ করে জ্যোৎস্নার রাত্রিগুলো উপভোগ করতে পারতেন। মালিরা বাগিচাগুলো সাদা বা ধুসর রঙের ফুলের গাছ দিয়ে সজ্জিত করত, যা ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রেক্ষাপটে ফুটে থাকবে এবং জুঁই বা কলম করা মিষ্টি গন্ধযুক্ত ফুল রাতের নিশ্চল বাতাসকে সুরভিত করতে তাদের প্রথম পছন্দ ছিল। তাদের আরেকটা পছন্দের ফুল ছিল চম্পা। ম্যাগনোলিয়া পরিবারের সদস্য তীব্র সুগন্ধযুক্ত এই দুধ সাদা ফুলটা রাতের বেলা ফোটে। জাহাঙ্গীর বর্ণনা করেছেন কীভাবে ফুলের মাঝে কখন 'পুরো একটি বাগিচার সুরভি পাবে।'*

মোগলরা প্রবাহিত পানির ধারা আর শূন্যে পানি ছিটাতে থাকা ঝরনা যোগ করে হিন্দুদের মূল ধারণাটা আরো উন্নত করে। তারা সেইসাথে বাগিচার পথগুলো তেলের প্রদীপ দিয়ে আলোকিত করে এবং হাভেলি আর পানির প্রবাহের পেছনে স্থাপিত কুলঙ্গিতে প্রদীপের ব্যবস্থা করে। মোগলরা প্রায়ই তাদের বাগিচায় আতশবাজির প্রদর্শনীর আয়োজন করত। মোগল অণুচিত্রে দেখা যায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন বাগিচায় রমণীরা তাদের হাতে আতশবাজি ধরে রেখেছে, যা থেকে সোনালি স্ফুলিঙ্গের ধারা ঝরে পড়ছে।

---

* হিন্দু মন্দিরে চম্পা ফুল পূজার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ভারতীয় রমণীরা আজও এই ফুল শোধন করে তৈরি করা তেল মাথায় ব্যবহার করে।

১২০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি তাপমাত্রায় মাহতাব বাগে কাজ করার সময় প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্ভিদবিদ মোগল আমলের হাঁটাপথ, জলের নহর আর ফুলের কেয়ারি পর্যন্ত খনন করে প্রমাণ পেয়েছেন যে, একটি সময় এখানে সত্যিই চম্পা গাছ ছিল। তারা সেইসাথে আরেকটা মিষ্টি গন্ধযুক্ত রাতের বেলা প্রস্ফুটিত সাদা ফুলের গাছ লাল সিডার (নাম যাই হোক মেহগনি পরিবারের সদস্য) সেইসাথে কাজুবাদাম, আম, তাল আর ডুমুর গাছের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। তারা এ ছাড়া লাল ফুলবিশিষ্ট মোরগচূড়া ফুল গাছের কার্বনে পরিণত হওয়া বীজের সন্ধান পেয়েছেন, যা থেকে গানের পাখির কাছে আকর্ষণীয় বীজ উৎপন্ন হতো।*

তাজের জন্য মাহতাব বাগের অবশ্য এর চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্ব রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে যে উদ্যানটা বর্গাকৃতি, যার চার কোণে চারটি মিনার রয়েছে, যার একটি এখন কেবল টিকে আছে। তারা উদ্যানের উত্তর প্রান্তের দেয়ালের মধ্যখানে একটি তোরণের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো, উদ্যানের দক্ষিণ প্রান্তে তারা একটি উঁচু অষ্টভুজাকৃতি বারান্দার ধ্বংসাবশেষ মাটি খুঁড়ে বের করেছেন, যেখান থেকে নদীর বিপরীত তীরে অবস্থিত মকবরা দেখা যায়। বারান্দায় একটি বিশাল অষ্টভুজাকৃতি জলাধার রয়েছে এবং এর উত্তর প্রান্তে একটি ছোট হাভেলির ভিত্তি রয়েছে। জলাধারে পঁচিশটা ঝরনা রয়েছে এবং সেটা তাজমহল আর অন্যান্য মোগল উদ্যানের জলাধারের চারপাশে ব্যবহৃত পদ্মফুলের পাপড়ির মতো নকশা দিয়ে ঘেরা রয়েছে। জলাধার যখন পানি পূর্ণ থাকে তখন এর উত্তরে অবস্থিত অগভীর নহর দিয়ে পানি প্রবাহিত হতো, বেলে পাথরের একটি কিনারার ওপর দিয়ে এবং এক সারি কুলঙ্গি অতিক্রম করে, যেখানে রাতের বেলা প্রদীপ আর দিনের বেলা ফুলের পাপড়ি রাখা থাকত, একটি ছোট জলপ্রপাতের মাধ্যমে নিচে এসে পড়ত, যেখানে তলদেশে বেলে পাথরের একটি ছোট জলাধার রয়েছে।

জলের কোনো নহর এই সীমার পরে বিদ্যমান না থাকলেও উদ্যানের মধ্যস্থলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা আরেকটা উঁচু বর্গাকার জলাধার মাটি খুঁড়ে বের করেছেন, যার একেকটা বাহু প্রায় বিশ ফিট দীর্ঘ এবং প্রায় পাঁচ ফিট গভীর। তারা খুব সংগত কারণেই এ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, উদ্যানটা খুব সম্ভবত

---

* বর্তমানে মাহতাব বাগ সংস্কার করে জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ফুলের কেয়ারিতে পুনরায় ফুল ফুটেছে যা অসংখ্য মৌমাছি আর প্রজাপতিকে আকর্ষণ করেছে। এএসআই প্রায় ১০,০০০ গাছের আর গুল্মের চারা রোপণ করেছে যার ভেতর রয়েছে মোরগচূড়া, আম আর সুগন্ধি চম্পা ফুলের চারা।

ঐতিহ্যবাহী *চারবাগ* নকশায় নির্মিত, যেখানে পরস্পরছেদী পানির নহরগুলোর একটি বেলে পাথরের অষ্টভুজাকৃতি জলাধার হয়ে উদ্যানের মধ্যেখানে অবস্থিত জলাধার পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। আরেকটা নহর যেখানে একে সমকোণে পরিচ্ছিন্ন করতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা উদ্যানের বাইরের দেয়ালে এখানের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষও খুঁজে পেয়েছেন, বিশেষ করে তারা স্তম্ভের ওপর উঁচুতে স্থাপিত একটি জলাধার পেয়েছেন এবং অন্যান্য স্তম্ভের অবশিষ্টাংশ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তাজমহলের সাথে এখানের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নির্মাণ কৌশলের সাদৃশ্য রয়েছে।
গবেষকদের সতর্ক পরিমাপের ফলে দেখা গেছে, মাহতাব বাগের পানির সন্নিহিত দেয়ালের শেষ প্রান্ত চিহ্নিতকারী গম্বুজগুলোর চিহ্ন অপর তীরে তাজের শেষ প্রান্তে অবস্থিত গম্বুজগুলোর সাথে নিখুঁতভাবে এক রেখায় অবস্থিত এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত পানির নহর তাজের কেন্দ্রীয় অক্ষরেখা—মাহতাব বাগের বিদ্যমান কেন্দ্রীয় জলাধার এবং অনুমিত সম্ভাব্য নহরের সাথে একই রেখায় অবস্থিত। আরো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, পানিতে এটা যখন পরিপূর্ণ থাকে, অষ্টভুজাকৃতি জলাধারে তাজের প্রতিবিম্ব নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেন, মাহতাব বাগ তাজমহলের সামগ্রিক ধারণার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং জ্যোৎস্না অবলোকনের জন্য একটি বাগিচার সৃষ্টি করেছে। বারান্দার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত একটি ছোট হাভেলির ওপর থেকে শাহজাহান মাহতাব বাগের ঝরনা থেকে উত্থিত বাষ্পের ওপর তাজমহলকে ভাসমান অবস্থায় অবলোকন করতে পারতেন।

তারা সিদ্ধান্ত নেন, শাহজাহান আর তার স্থপতির দল তাজমহল প্রাঙ্গণের তাদের সামগ্রিক পরিলেখের মাঝে মাহতাব বাগকে সংশ্লিষ্ট করেছিলেন এবং এ জন্য তারা উদ্যানের ব্যাপক পরিবর্তন আর পরিবর্ধন সাধন করেছিলেন এবং অষ্টভুজাকৃতি জলাধার এবং হাভেলির মতো বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছিলেন, ১৬৫২ সালের ৯ ডিসেম্বর আওরঙ্গজেবের চিঠিতে তাজমহল আর মাহতাব বাগ সম্বন্ধে তার পছন্দের বিষয়টি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি চিঠিতে শাহজাহানকে ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে বন্যার কারণে 'উদ্যানের সৌন্দর্য' নষ্ট হচ্ছে একই সময় তাজমহলের প্রধান গম্বুজ দিয়ে পানি চোয়ানোর বিষয়টিও তিনি তাকে জানিয়েছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সাম্প্রতিক গবেষণা এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে যে, শাহজাহান বিশাল একটি উদ্যানের মধ্যস্থলে তাজমহল অবস্থান করবে এটাই চেয়েছিলেন, যা প্রথাগত *চারবাগ* নকশার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাজমহল আর মাহতাব বাগের উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত পানির নহর মমতাজের দেহের সাথে একই রেখায় অবস্থান করে প্রধান অক্ষ সৃষ্টি করেছে
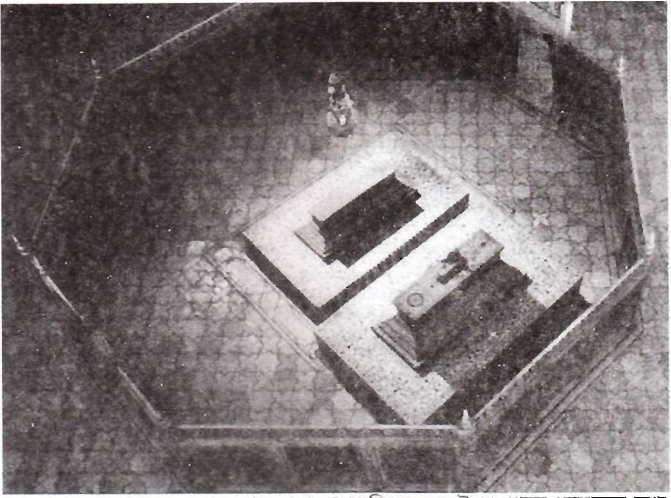
মূল কক্ষে মমতাজ মহল আর শাহজাহানের স্মৃতিস্তম্ভের উপর থেকে ধারণকরা দৃশ্য।

কিন্তু সেইসাথে যমুনা নদীর পূর্ব-পশ্চিমে নহর হিসেবে বিরাজ করা আক্ষরিক অর্থেই সম্ভ্রম উদ্রেককারী বিশাল মাপের একটি ধারণা।

শাহজাহানের এমন একটি উদ্যান বিন্যাসের সাথে একটি চিরস্থায়ী ধারণা জড়িয়ে রয়েছে যে, মমতাজের জন্যই তিনি কেবল তাজমহল নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এবং তাজ থেকে দূরে যমুনার ওপাশে নিজের জন্য পৃথক একটি মকবরা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। ফরাসি পর্যটক আর রত্ন ব্যবসায়ী ফ্রাঁসোয়া ত্রেভার্নিয়ের ১৬৪০ সালে প্রথমবার ভারতবর্ষ ভ্রমণ এবং পরবর্তীকালে ১৬৫৫ সালে (আওরঙ্গজেব তার পরবর্তী ভ্রমণের সময় শাহজাহানকে বন্দি করে রেখেছেন) তার আগ্রায় অবস্থানের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : 'শাহজাহান নদীর অপর তীরে নিজের জন্য একটি মকবরা নির্মাণ শুরু করেছিলেন কিন্তু নিজের পুত্রদের সাথে যুদ্ধের কারণে তার পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটে।' ত্রেভার্নিয়ের নিজের ভাষ্য সংকলনের কালে নিশ্চিতভাবেই আগ্রার অমাত্যদের আর অন্যদের সাথে আলোচনা করেছিলেন। স্থানীয় মৌখিক ইতিহাস ত্রেভার্নিয়ের বক্তব্য সমর্থন করে, সেইসাথে এটাও বলে যে, দ্বিতীয় তাজ কালো মর্মর দিয়ে নির্মিত হবার কথা ছিল এবং আরো বলা হয় যে শাহজাহানের দুটো মকবরাকে একটি সেতুর সাহায্যে, খুব সম্ভবত রৌপ্য নির্মিত, সংযুক্ত করার ইচ্ছা ছিল। অনেক গাইড বইয়ে এই তথ্য কঠোর বাস্তবতা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং অধিকাংশ গাইড নিদেনপক্ষে দ্বিতীয় কৃষ্ণ তাজের কথা খুব সামান্য করে হলেও উল্লেখ করবে।

দ্বিতীয় তাজের ধারণা অনেক ঐতিহাসিক নাকচ করে দিয়েছে কারণ ত্রেভার্নিয়ের ছাড়া সমসাময়িক অন্য আর কারো লেখায় বিষয়টি উল্লেখিত হয়নি এবং প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাহতাব বাগে তাদের সাম্প্রতিক খননকার্যের সময় এমন কোনো ইমারতের ভিত্তিপ্রস্থর খুঁজে পাননি। (অষ্টভুজাকৃতি প্রতিবিম্ব জলাধার কালো তাজ যেখানে অবস্থিত হবার কথা ছিল সম্ভবত সেখানেই নির্মিত হয়েছে।) শাহজাহানের অন্য কোথাও নিজের মকবরা নির্মাণের কোনো প্রস্তুতির বিষয়ে কোনো প্রমাণ বিদ্যমান না থাকায় তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে তার ভেতর সব সময় তাজেই সমাধিস্থ হবার অভিপ্রায় ছিল, একটি পূর্ব দৃষ্টান্ত—যে মমতাজের পার্সি পিতামহ ইতিমাদ-উদ-দৌলাকে তার স্ত্রীর সাথে একই মকবরায় সমাধিস্থ করা হয়েছে—উল্লেখ করে তাকে জোর করে তাজমহলে সমাধিস্থ করা তার ক্ষমতা জবরদখলকারী সন্তানের এই অনুচিন্তন তারা নাকচ করে দিয়েছে, তারা দেখিয়েছেন যে উভয় ক্ষেত্রে মহিলা, যিনি প্রথমে মৃত্যুবরণ করেছেন মকবরার কেন্দ্রে শায়িত তার সামান্য পাশে পরবর্তী সময়ে তার স্বামীকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

'কালো তাজ'-এর বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনার আগে অবশ্য যুক্তিটা অন্য দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে যে, শাহজাহান তাজমহলে সমাধিস্থ হবার অভিপ্রায় কখনো ব্যক্ত করেছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোনো প্রমাণ কি আদৌ রয়েছে? শাহজাহানের সত্যিকারের অন্তর্ধানের পর পর্যন্ত দরবারের কোনো দিনপঞ্জি রচয়িতা কোনো ইউরোপীয় পর্যটক, কেউই তাজমহলকে মমতাজের মকবরা ভিন্ন অন্য কিছু হিসেবে উল্লেখ করেনি। মকবরার নাম 'তাজমহল' সবাই একবাক্যে স্বীকার করে যে, মমতাজ মহলের নামের সংক্ষিপ্তরূপ, যা শাহজাহানের মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে এবং এ থেকে একটি বিষয়ই স্পষ্ট হয় যে, মকবরাটা তখন তার কথা ভেবেই নির্মাণ করা হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও কেবল তারই থাকবে। এ বিষয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই যে, মমতাজ মহলের স্মৃতিস্তম্ভ মমতাজাবাদ থেকে মাহতাব বাগ পর্যন্ত প্রসারিত সমগ্র প্রাঙ্গণের মূল অক্ষরেখা বরাবর একই রেখায় অবস্থিত হওয়ায় মকবরার সেরা স্থানটা দখল করে রেখেছে। সমগ্র মকবরা প্রাঙ্গণে শাহজাহানের স্মৃতিস্তম্ভের অবস্থানই একমাত্র অপ্রতিসম উপাদান। তার যদি তাজমহলে নিজেকে সমাধিস্থ করার অভিপ্রায় থাকত তাহলে তিনি কি নিজের জন্য সেরা স্থানটা সংরক্ষিত রাখতেন না বা অক্ষ রেখার উভয় পাশে প্রতিসমভাবে নিজের আর মমতাজ মহলের সমাধির কথা বিবেচনা করতেন না?

আরো রয়েছে, শাহজাহানের স্মৃতিস্তম্ভ নিচের সমাধিগর্ভ এবং মকবরার মূল সমাধিসন্দৌখে জোর করে স্থাপিত হয়েছে এটা দৃশ্যতই প্রতীয়মান হয়ে

মাহতাব বাগ (চন্দ্রালোকিত বাগিচা) থেকে দৃশ্যমান তাজমহল।
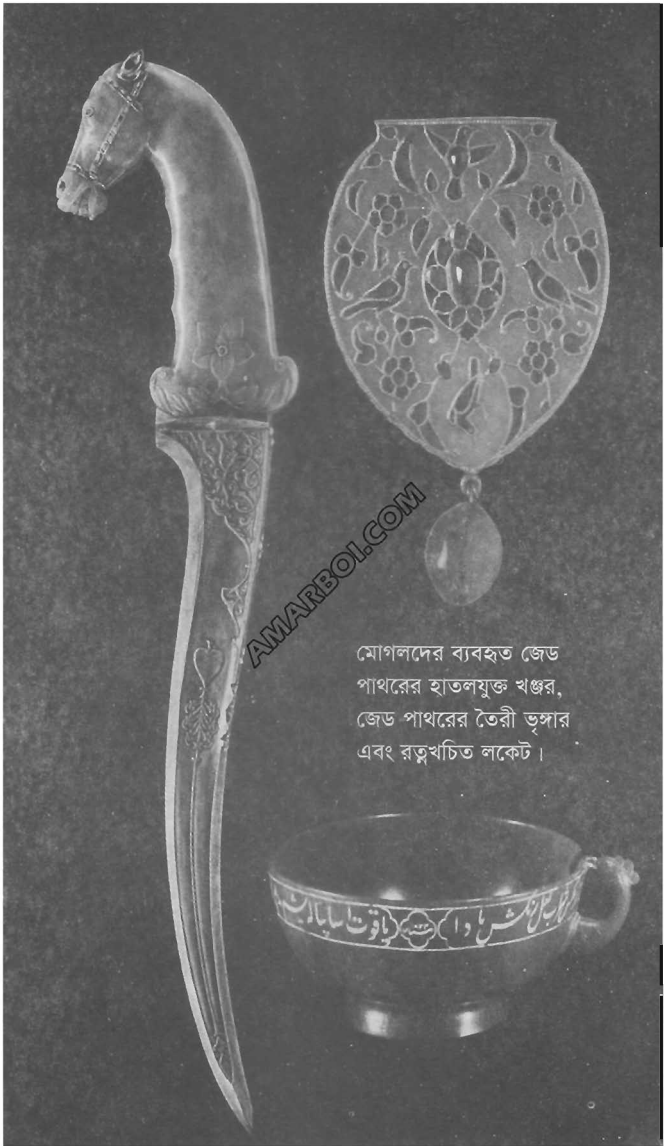
মোগলদের ব্যবহৃত জেড পাথরের হাতলযুক্ত খঞ্জর, জেড পাথরের তৈরী ভৃঙ্গার এবং রত্নখচিত লকেট।

রয়েছে। মূল সমাধিসন্দৌখে বিশেষ করে ওপর থেকে যখন দেখা হয় মমতাজের স্মৃতিস্তম্ভ আর চারপাশের জাফরির তিরস্করণীর মাঝে তার স্মৃতিস্তম্ভের জন্য সামান্যই স্থান রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, মমতাজের পাশেই যদি শাহজাহানের সমাধিস্থ হবার অভিপ্রায় থাকত তিনি আরো বড় এলাকা অলংকৃত জাফরির তিরস্করণী দ্বারা ঘিরে রাখতেন, যা করার মতো স্থান মকবরায় ছিল। তা ছাড়া মমতাজের স্মৃতিস্তম্ভের চারপাশে কিনারার মেঝের সাদা কালো টালির অনেকটাই শাহজাহানের স্মৃতিস্তম্ভ অনভিপ্রেতভাবে দখল করেছে যখন তার নিজের স্মৃতিস্তম্ভের চারপাশের কিনারায় এমনকোন সীমারেখা নেই। সমাধিগর্ভে শাহজাহানের সমাধি আর দেয়ালের মাঝে বিদ্যমান ফাঁকা স্থান দিয়ে কোনোমতে একজন লোক হেঁটে যেতে পারে অন্যদিকে মমতাজের সমাধি আর বিপরীত দিকের দেয়ালের মাঝে প্রায় আট ফিট ফাকা জায়গা বিদ্যমান। মমতাজের পাশেই যদি সমাধিস্থ হবার অভিপ্রায় থাকত তাহলে কি শাহজাহান আরো বড় করে সমাধিগর্ভ নির্মাণ করতেন না?
ইতিমাদ-উদ-দৌলার মকবরার সাথে তুলনাটা প্রথম দৃষ্টিতে যতটা বোধগম্য মনে হয় আসলে ততটা নয়। ইতিমাদ-উদ-দৌলা আর স্ত্রীর নিচু মকবরার সমাধি দুটো যারা তিন মাসের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন মমতাজ মহল আর শাহজাহানের মতো নয়, একই আকৃতি আর নকশার এবং দুটোই মেঝেতে একটি টালির সীমানাযুক্ত এলাকার ভেতর অবস্থিত। জাফরি কাটা কোনো তিরস্করণী সেখানে নেই এবং স্মৃতিস্তম্ভের চারপাশে প্রচুর ফাঁকা জায়গা রয়েছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে এ সিদ্ধান্ত নেয়াটা নিতান্তই যুক্তিসংগত যে, আওরঙ্গজেব যখন তার আব্বাজানের জন্য একটি সমাধিস্থল সন্ধান করছিলেন তার প্রপিতামহ আর প্রপিতামহীর স্মৃতিস্তম্ভের অবস্থান দরকারি সাশ্রয় আর অপ্রত্যক্ষ একটি পূর্ব দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখেছিলেন, যা ইঙ্গিত দেয় যে, ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধির বিন্যাস এই যুক্তি সমর্থন করে যে, শাহজাহানের বরাবরই তার স্ত্রীর পাশে সমাধিস্থ হবার অভিপ্রায় ছিল।
এসব প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এটা ধারণা করাটা সংগত হবে যে, শাহজাহানের তাজমহলে সমাধিস্থ হবার কোনো অভিপ্রায় ছিল না। সে ক্ষেত্রে আরো একটি প্রশ্ন সামনে এসে যায়, তিনি তবে কোথায় সমাধিস্থ হতে চেয়েছিলেন? আমরা নিশ্চিতভাবে এ প্রশ্নের উত্তর জানি না। অবশ্য অনেক সময় যেমনটা বলা হয়ে থাকে তার চেয়ে জোরাল বস্তুনিষ্ঠতা কালো তাজমহলের জন্য সৃষ্টি করা যায় এবং এর স্বপক্ষে কিছু সমর্থনও রয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল এম. সি জোশির সাম্প্রতিক বক্তব্য, যিনি মনে করেন, এটা নিশ্চিতভাবে অন্ততপক্ষে পরিকল্পনা স্তরের একটি অংশ ছিল, সেইসাথে হাতে রয়েছে ত্রেভার্নিয়ের মন্তব্য এবং শক্তিশালী জোরাল স্থানীয় উপকথা।
শাহজাহান, যিনি শিল্পকলাকে বিশাল পরিমাপে অবলোকনের ক্ষেত্রে একজন পৃষ্টপোষক ছিলেন এবং যমুনার উত্তর তীরে বিপরীত পাশে আরেকটা মকবরা নির্মাণের বিষয়টি তার কাছে মোটেই কল্পনাতীত নয়। মাহতাব বাগের

অষ্টভুজাকৃতি জলাধারে দীপ্তিময় যেকোনো প্রতিবিম্বের চেয়ে দ্বিতীয় মকবরাটা তাজমহলের অনেক বেশি নিখুঁত প্রতিফলনে সক্ষম হতো। সাদা মার্বেলের সাথে কালো মার্বেলের প্রতিতুলনা শাহজাহান পছন্দ করতেন। ১৬৩০ সালে কাশ্মীরের শ্রীনগরে শালিমার উদ্যানে মমতাজের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে কালো মার্বেলের একটি মহলের মিশ্র নির্মাণ রীতি তার এই পছন্দের উদাহরণ হিসেবে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাজমহলের প্রচুর কালো মার্বেল সংযুক্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চারটা মিনারিকার প্রতিটি সাদা মার্বেলের খণ্ডের মাঝে কালো মার্বেল প্রণিহিত করা হয়েছে। সমাধিসৌধের চারপাশের নিচু দেয়ালে একই উপাদান দিয়ে করম্ব করা হয়েছে এবং মূল মকবরার চিত্রলিপি এবং তার চারপাশের সীমানা অঙ্কনে কালো মার্বেল ব্যবহৃত হয়েছে। পানির ও পাশে কালো তাজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রূপান্তর আর কী হতে পারে?
মাহতাব বাগ প্রচলিত ধারণা অনুসারে মূলত একটি প্রমোদকানন। তৈমূরীয় আর মোগল রীতি অনুসারে শাসক আর অভিজাতদের প্রায়ই জীবিত অবস্থায় তাদের মনোরঞ্জনের জন্য নির্মিত উদ্যানে সমাধিস্থ করা হতো। নূর যেমন শাহজাহানের পিতা জাহাঙ্গীরের মকবরা লাহোরে তার প্রিয় প্রমোদকাননে নির্মাণ করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের পিতা আকবরকে যেমন তার জীবদ্দশায় নির্বাচিত উদ্যানের বিন্যাসের মাঝে সমাধিস্থ করা হয়েছে। জীবিত থাকাকালীন সময়ে শাহজাহান যখন নিজের মকবরার কাজ শুরু করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, ত্রেভার্নিয়ের ভাষ্য অনুসারে তাকে তখনই ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছিল। কালো তাজমহল নির্মাণ বা মাহতাব বাগে যেকোনো মকবরা নির্মাণ তখন আর তার ক্ষমতার ভেতরে ছিল না।
কালো তাজমহলের নির্মাণ পরিকল্পিত হয়েছিল এমন কোনো নিষ্পত্তিমূলক প্রমাণ ওপরের যুক্তিতর্কের মাধ্যমে পাওয়া না গেলেও জানা বিষয় আর প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বের সমন্বয়ের সুযোগ এখানে গৃহীত হয়েছে। সেইসাথে প্রত্যেক মানুষের গভীরে যে রোমান্টিক সত্তা লুকিয়ে রয়েছে তার কাছে এটা ভীষণ আবেদন সৃষ্টিকারী।
মকবরার সাদা মার্বেলের সমাধিসৌধের ভারবহনকারী নদীর উত্তর প্রান্ত বরাবর যে বেলে পাথরের চত্বর রয়েছে সেখানের পরস্পর সম্পর্কিত একাধিক ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলো কী উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল সেটা আরেকটা বিতর্কের বিষয়বস্তু। সেখানে পরস্পরের সাথে সংক্ষিপ্ত গলিপথ দ্বারা সংযুক্ত সতেরোটা কক্ষ রয়েছে। দুটো সিঁড়ি দ্বারা সতেরো ফিট ওপরের বেলে পাথরের চত্বরের সাথে ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলোর সংযোগ সাধিত হয়েছে। প্রতিটি কক্ষ উঁচু ছাদবিশিষ্ট প্রতিটি আবার খিলানাকারে বেঁকে গিয়ে ছাদের শীর্ষবিন্দুতে এক প্রকার গম্বুজের আকার ধারণ করেছে। ছাদগুলো পলেস্তারা করা আর হীরকাকৃতি নকশা দ্বারা অলংকৃত। দেয়ালের নিচের অংশে ড্যাডো পর্যন্ত লাল-সবুজের সীমারেখা দ্বারা ঠিক অনেকটা বুরহানপুরের রাজকীয় হাভেলির শাহজাহানের

---

* যারা মনে করেন শাহজাহানের অভিপ্রায় ছিল মাহতাব বাগে সমাধিস্থ হওয়া তাদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক আ. সি আগরওয়াল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার বর্তমান জয়েন্ট ডিরেক্টর জেনারেল।

ইমারতগুলোতে যেমন রয়েছে। ড্যাডোর ওপর দেয়ালের ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে আছে খিলানাকৃতি প্যানেল এবং যার সীমানা লাল আর সবুজ দিয়ে চিহ্নিত করা রয়েছে। কক্ষগুলো নদীর প্রান্তের দেয়ালগুলোর এসব খিলান মনে হয় মোগল ইমারতের অন্যত্র ব্যবহৃত ছোট ছোট ইটের সাহায্যে পরবর্তী সময়ে যুক্ত করা হয়েছে। (নদী থেকে দেখলে কক্ষগুলোর অস্তিত্বের একমাত্র বাহ্যিক লক্ষণ হলো পূর্ব প্রান্তের সিঁড়ি যেখানে নিচে নেমেছে তার কাছে বায়ু চলাচলের জন্য জাফরি করা তিরস্করণীর উপস্থিতি।)

দক্ষিণে ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলোর পেছনে যমুনা নদী থেকে দূরবর্তী অংশে একটি পৃথক সংকীর্ণ উঁচু করিডর রয়েছে। পরিমাপ করে দেখা গেছে, কক্ষ আর সুড়ঙ্গের সম্মিলিত প্রস্থ ছাব্বিশ ফিট দুই ইঞ্চি। তার মানে মকবরার ভারবহনকারী সাদা মার্বেলের স্তম্ভপিটের ভেতরে আট ইঞ্চি দূরত্বে তাদের সমাপ্তি হয়েছে।

ইমারতের বাকি অংশের সাথে সমসাময়িক সুড়ঙ্গপথ আর ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলো স্পষ্টতই সমসাময়িক। শাহজাহান যখন তাজমহল পরিদর্শনে আসতেন তিনি নদীপথ ব্যবহার করতেন। (১৯৫৮ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া জেটির ভার বহন করত এমন একটি মঞ্চের অবশিষ্টাংশ চিহ্নিত করেছে।) অনেকে অবশ্য যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করে যে ওপরের ভারী কাঠামোর ভার সমানভাবে ভাগ করে দেয়ার জন্য স্থপতিদের একটি জটিল কিন্তু পরিশীলিত ব্যবস্থার বেশি কিছু না খিলানযুক্ত কক্ষগুলো কিন্তু প্রচলিত ধারণা এই যে, তাজমহল যখন নির্মিত হয়েছিল ভূগর্ভস্থ মূল কক্ষগুলোর নদীর প্রান্তের খিলানগুলো উন্মুক্ত ছিল এবং এর ফলে সতেরোটা কক্ষ পরস্পর সংযুক্ত একটি বারান্দার সৃষ্টি করেছিল সম্রাটের একাকী হাঁটার জন্য যখন জেটি থেকে তিনি তার স্ত্রীর সমাধির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি বারান্দার আচ্ছাদনের নিচে থেকে ওপারের মাহতাব বাগের দিকেও তাকিয়ে থাকতে পারতেন। বারান্দাগুলো কেন ইঁট গেঁথে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তার একটি কারণ সম্ভবত বন্যার বিরুদ্ধে সতর্কতা বা খুব সম্ভবত ফাটল আর পানি চোয়ানর বিষয়ে আওরঙ্গজেবের প্রতিবেদন পাবার পরে ১৬৫২ সালে মকবরার গম্বুজ আর তাজমহলের কাঠামো শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে এটা করা হয়েছিল।

তবে গলিপথ নির্মাণের উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। কোনো কোনো প্রত্নতত্ত্ববিদ যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেন যে, এটা মার্বেলের স্তম্ভপিটের ভিতের চারপাশ দিয়েই ছিল এবং কোনো একটি স্থানে এখান থেকে ওপরে বিদ্যমান সমাধির নিচে অবস্থিত ভূগর্ভস্থ সমাধি গর্ভে প্রবেশ করা যেত, যেখানে তৃতীয় একটি সমাধি সারি অবস্থিত ছিল, মূল সমাধি। তারা তাদের তত্ত্বের স্বপক্ষে একটি বিষয় উদ্ধৃত করে যে, গলিপথটা মার্বেলের স্তম্ভপিটের চেয়ে প্রায় নয় ফিট লম্বা, যা ভিতের চারধারে এখান থেকে উভয় প্রান্তে চার ফিট প্রশস্ত গলি পথের বিস্তারের সুযোগ করে দেয়। উনিশ শতকের বিতর্কিত নথিপত্র, যা বলা হয়ে থাকে হারিয়ে যাওয়া পূর্ববর্তী নথিপত্রের নকল, সেখানে তিন কেতা সমাধিস্তম্ভের পাথরের খরচ উল্লেখ করা হয়েছে। মৌখিক ইতিহাসের কেবল উনিশ শতকে লিপিবদ্ধকরণই যদি এসব নথিপত্রে উল্লেখিত হয়। তার পরও এটা উদ্ভট যে, মৌখিক ইতিহাসে তিন জোড়া সমাধির অস্তিত্ব যদি না থাকে তবু তাদের

বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে। (সেখানে প্রবেশের পথ বন্ধ করে দেয়ার কারণ হতে পারে ১৬৫২ সালের সংস্কারের সময় কাঠামোগত সংস্থিতি বজায় রাখা কিংবা পরবর্তী সময়ে আগ্রার ওপর মোগলদের নিয়ন্ত্রণ শীথিল হতে শুরু করলে লুটপাট কিংবা ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করা।) অবশ্য সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে হলে আরো প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রয়োজন এবং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বলছে তারা বর্তমানে সে রকম কোনো অনুসন্ধান কাজ শুরু করতে আগ্রহী নয়।

তাজমহল মূলত একটি হিন্দু মন্দির এ বিষয়ে অদ্যাবধি একটি বিতর্ক চলে আসছে। ভারতের স্থাপত্য নিদর্শনে হিন্দু মুসলিম রীতির তুলনামূলক অর্জন সম্পর্কিত বিতর্ক নতুন কিছু নয় এবং যা প্রায়ই তাজমহল যে দুটো রীতির সংশ্লেষণ এ বিষয়টি থেকে বিচ্যুত হয়। ১৯২০ সালে অ্যালডাস হাক্সলি যেমন লিখেছেন : 'তাজমহলের অলংকরণের তুলনায় হিন্দু স্থপতিদের নির্মিত ইমারতগুলোর কারুকাজ অনেক বেশি সমৃদ্ধ আর আকর্ষণীয়।' অবশ্য সাম্প্রতিক দশকগুলোতে কোনো কোনো প্রথাবিরোধী হিন্দু ঐতিহাসিক এই বিতর্কে নতুন একটি মাত্রা যোগ করে ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করে যে, শাহজাহান শূন্য থেকে তাজমহল নির্মাণ করেননি, তিনি কেবল পূবেই এখানে অবস্থিত একটি ইমারতের আম্বারের (জয়পুর) রাজার তৈরি একটি রাজপুত প্রাসাদ বা মন্দিরের কেবল পরিমার্জন করেছিলেন।

এসব ঐতিহাসিকদের দাবি, যা আপাতভাবে ভারতীয় স্থাপত্যকলায় মোগল অবদানকে খাটো করে দেখাতে চায়। (কেউ এমনও প্রশ্ন তুলেছে যে, অন্য ইমারতগুলো যেমন হুমায়ুনের মকবরা কি আদতেই মোগলদের তৈরি?) তারা অবশ্য যেকোনো প্রেক্ষাপট থেকে আগত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহাসিকের সমর্থন লাভ করেনি এবং সমসাময়িক, রাজপুত বা মোগল বা ইউরোপীয় তথ্যসূত্র থেকে এবিষয়ের সমর্থনে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন উদ্ভট দাবি মূলত শাহজাহানের দুজন সমসাময়িক দিনপঞ্জি রচয়িতার বক্তব্যের ওপর নির্ভরশীল যে, তাজমহলের নির্মাণ স্থানে, যা আম্বারের রাজা সম্রাটকে উপহার দিয়েছিলেন, সেখানে কোনো একধরনের আউটহাউস জাতীয় মোকাম বা বাগানবাড়ি ছিল এবং যার পরিবর্তে তাকে অন্যত্র চারটা সম্পত্তি দেয়া হয়েছিল। এটা সেই ইমারত, যা ভিন্ন মতাবলম্বী ঐতিহাসিকরা দাবি করেন যে, শাহজাহান পরিবর্তন করেছিলেন হিন্দু বাস্তুরীতির স্পষ্ট নিদর্শন বজায় রেখে। সময়ের সাথে সাথে মূল ইমারতের বর্ণনা সম্বন্ধে হিন্দু লেখকদের বক্তব্য বিতর্কের চাপে পড়ে পরিবর্তিত হয়ে কখনো প্রাসাদ আবার কখনো শিবমন্দির হয়েছে, যার নাম 'তাজো মহালয়া', যা থেকে তাজমহল নামের উৎপত্তি। তারা আরো দাবি করে, ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ ইট গেঁথে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, কারণ সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে শিবের প্রতিমার কাছে পৌছানো যেত।

এসব যুক্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী পাল্টা যুক্তি হলো, মকবরা নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ হয় দরবারের ঐতিহাসিক কর্তৃক প্রণীত বা ইউরোপীয় পর্যবেক্ষক দ্বারা রচিত যেমন পিটার মানডি যিনি নির্মাণ কার্য শুরু হবার সময় উপস্থিত ছিলেন একটি বিষয় সন্দেহাতীতভাবে লিপিবদ্ধ করেছে যে, নির্মাণকার্য ভিত থেকে

আরম্ভ হয়েছিল। দিনপঞ্জি রচয়িতা লাহোরি 'পানির স্তর' পর্যন্ত খনন করে 'ভিত স্থাপনের' বিষয়ে লিখেছেন। পিটার মানডি লিপিবদ্ধ করেছেন যে, 'মকবরা নির্মাণ শুরু হয়েছে...' নির্মাণ স্থানে যদি পূর্ব থেকেই উল্লেখযোগ্য কোনো স্থাপনা থাকত অন্যান্য পর্যবেক্ষক যারা মমতাজের মৃত্যুর পূর্বে আগ্রা এসেছিলেন তারা সেটার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। বাবর প্রথম যখন আগ্রা এসেছিলেন তখন তার এটার কথা উল্লেখ না করার কোনো কারণই থাকতে পারে না এবং তিনি তার চারপাশের পরিবেশ নিয়ে ভীষণ হতাশ ছিলেন। (তার জানবার কথা না যে একশ বছর পরে তার উত্তরসূরি এটাকে একটি মকবরায় রূপান্তরিত করে দাবি করবে যে তারা পুরোটাই শূন্য থেকে নির্মাণ করেছে।) একইভাবে ইউরোপীয়রা যেমন জেসুইট ফাদার মনসারেট যিনি ১৫৮০ ১৫৮২ সালের ভেতর বেশ কয়েকবার আগ্রা ভ্রমণ করেছেন বা স্যার টমাস রো, যিনি আগ্রার বিস্তারিত বর্ণনা এবং সপ্তদশ শতকের আগ্রার দরবার জীবনের কথা লিখে গেছেন এবং প্লেসার্ত ডাচ ব্যবসায়ী যিনি ১৬২০ থেকে ১৬২৭ সালের ভেতর আগ্রায় এসেছিলেন এবং যমুনার তীরে অবস্থিত উদ্যান এবং প্রাসাদের বর্ণনা দিয়েছেন, পূর্ব থেকেই অবস্থিত কোনো ইমারতের কথা উল্লেখ করেননি। আম্বারের রাজা, যিনি নির্মাণের জন্য জমি উপহার দিয়েছিলেন তার রাজকীয় মহাফেজখানায় অন্যত্র নির্মাণ প্রকল্পের—মন্দিরসহ—উল্লেখ রয়েছে আগ্রায় এমন কোনো নির্মাণের কথা সেখানে উল্লেখ করা হয়নি। তা ছাড়া তাজের হিন্দু স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য যেমন *ছত্রী* মূলত আকবরের সময়কাল থেকেই মোগল স্থাপত্যে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যা হিন্দু আর মুসলিম রীতির সংশ্লেষের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতীয় শিব মন্দিরের বিষয়টি বিশেষভাবে বিভ্রান্ত করেছে, কারণ মন্দির নির্মাণের পর বিক্রি করা যায় না আর শাহজাহান জমি অধিগ্রহণ করতে এমন অমঙ্গলজনক কাজ কখনো করবেন না এবং আরেকটা কারণ আম্বারের রাজা হিন্দু ধর্মের একটি বিশেষ শাখার অনুসারী, যারা কখনো শিব মন্দিরে উপাসনা করবে না। সম্ভবত এসব যুক্তির চেয়ে নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হলো, আমাদের পরিচিত কোনো মন্দির দেখতে তাজমহলের মতো নয়।

ধর্মীয় বিভক্তির আরেক দিক থেকে আগত বিতর্ক ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের বিভক্তির সময় স্থাপিত ওয়াকফ বোর্ড দাতব্য প্রতিষ্ঠান, যা পরিত্যক্ত মুসলমান কবর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থাপিত হয়েছিল। তারা সম্প্রতি তাজমহলের অভিভাবকত্ব দাবি করার চেষ্টা করে, যাতে শরিয়া আইনের কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের ভেতর অবস্থান করে তারা এর রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে। ২০০৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট তাদের দাবি নাকচ করে দেয় এই জন্য যে, মোগল আর ব্রিটিশ উভয় আমলে তাজমহল রাষ্ট্র বা রাজার সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং যা আইনত স্বাধীন ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

এমন গোড়া মতবিরোধ আর মতানৈক্য কোনো সন্দেহ নেই অব্যাহত থাকবে। ঠিক যেমন তাজ ৩৫০ বছর পূর্বে বার্নিয়ের যা বলেছেন সবার সেভাবেই ভাস্বর হয়ে থাকবে—বিশ্বের বিস্ময়—হিসেবেই যদিও শাহজাহানের মানসপটের মূল দৃশ্যপট সব সময় খানিকটা রহস্যাবৃত থেকেই যাবে।
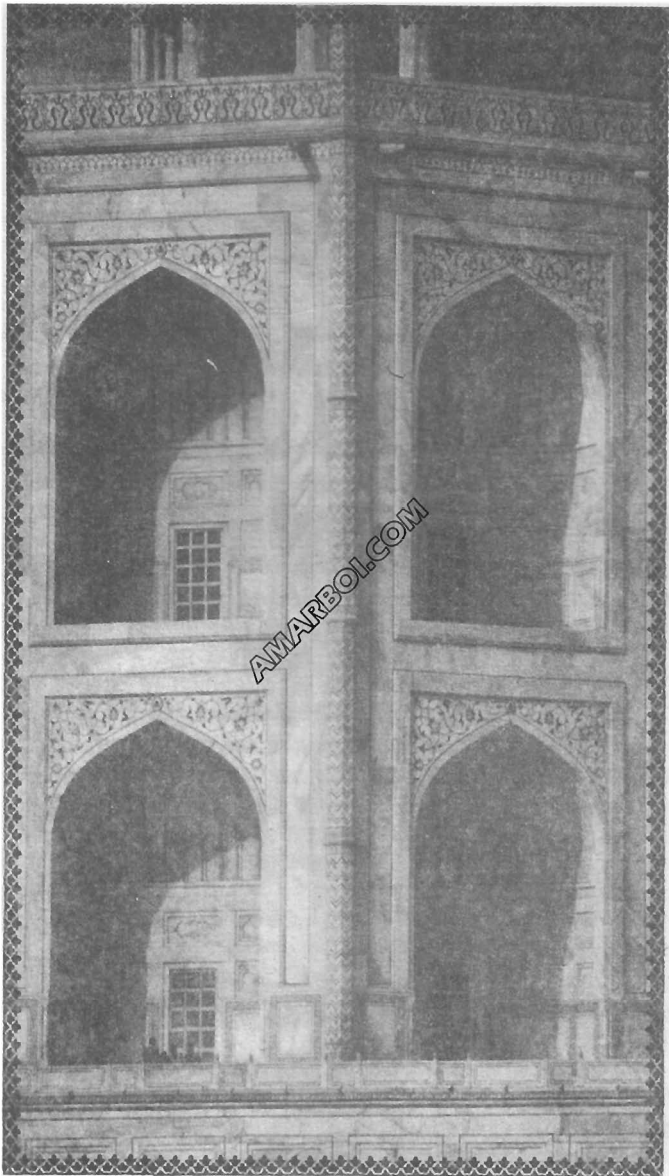
পুনশ্চ : শেষকথার আড় কথা

আমাদের এ বইটা লেখার সময় প্যানেল দেয়া অক্সফোর্ডের নীরব গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে ইস্পাহানের চিনামাটির সূক্ষ্ম কারুকাজ করা মসজিদ উজবেকিস্তানের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলা অক্সাস নদীর বালুকণাময় তীর আর অবশ্যই ভারতবর্ষে যেতে হয়েছিল। আমরা সেখানে তাজমহলের শুভ্র মকবরা থেকে বুরহানপুরের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে যেখানে মমতাজ মৃত্যুবরণ করেছিলেন, শাহজাহন আর মমতাজের জীবনকালে ফিরে যেতে চেষ্টা করেছি। অতীতে আমরা যদিও বহুবার তাজমহল দর্শন করেছি প্রতিবারই একে আমাদের নিখুঁত আর চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রতীক মনে হয়েছে, এইবার অবশ্য আমাদের কখনো কখনো মনে হয়েছে যে, আমাদের নব্যপ্রাপ্ত জ্ঞান কি কোনোভাবে এর আবেদন আমাদের কাছে হ্রাস করবে? আমাদের দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ ছিল না তাজমহল যেকোনো স্মৃতিকথা, যেকোনো প্রতিসাম্যের বিস্তারিত পরিমাপ, যেকোনো পরিকল্পনার আবেক্ষণ, যেকোনো রূপকের বাড়াবাড়ি উত্তেজনার সাথে নিজের আবিষ্ট করার চেষ্টা সব কিছুকে অনায়াসে ছাপিয়ে যেতে পারে। আমরা যখন অগ্রসর হচ্ছি তখন তোরণগৃহের লাল বেলে পাথরের খিলানের মাঝে মরীচিকার মতো কাঠামোবিশিষ্ট ভাসমান সাদা মকবরার সহসা আবির্ভাব আবারও আমাদের থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করে এবং নিজেদের অজান্তেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়।

অষ্টম এডওয়ার্ড, যিনি ১৮৭৫ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস থাকা অবস্থায় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন, বিষণ্ন হয়ে পর্যবেক্ষণ করেন, তাজমহল সব লেখকের একটি সাধারণ গন্তব্যে পরিণত হয়েছে, যারা তাজ দর্শন করে 'তাজমহলকে বর্ণনা করা অসম্ভব বলে স্বীকার করে নিয়ে তারপর তাজ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন।' শেকসপিয়রের সাথে যদিও একজন একমত হন যে, সৌন্দর্য নিজেই নিজের বোদ্ধা কোনো প্রচারক বক্তব্যই মানুষের চোখকে মুগ্ধ করে এবং সৌন্দর্য ভীষণভাবে আত্মমগ্ন ভীষণভাবে স্বজ্ঞাত ভীষণভাবে দর্শনার্থীর চোখে অবস্থান করে যে কেউ কোনো কিছু সুন্দর বলে মনে করলেই কেবল সেটা সুন্দর হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে এটা

আসলেই একটি অপ্রতিরোধ্য অভিপ্রায় কিছু উপাদানকে আলাদা করে শনাক্ত করা, যা সারা পৃথিবীর নানা সংস্কৃতি আর উভয় লিঙ্গের মানুষকে তাজমহল সুন্দর বলে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে।

আমাদের প্রায় সবার কাঠামো আর প্রতিসাম্যকে সাংসিদ্ধিকরূপে আকর্ষণীয় বলে মনে করি। গবেষকরা একই মানুষের দুটো ছবি যখন একটি আমাদের সবার মাঝে বিদ্যমান প্রাকৃতিক অপ্রতিসমতা যুক্ত আসল মুখের ছবি আর অন্যটা তাদের মুখের অর্ধেক এবং তার হুবহু প্রতিরূপের ছবি হিসেবে দেখায়, যার ফলে প্রতিসাম্য বৃদ্ধি পেয়েছে, বেশির ভাগ লোকই প্রতিসাম্য বিশিষ্ট ছবিটা পছন্দ করে। সংগীত আর অন্যান্য শিল্পের রস উপভোগ করতে সৌন্দর্যের জন্য মনে হয় কাঠামোর প্রয়োজন, যদিও প্রথমটা কোনোমতেই দ্বিতীয়টার নিশ্চিয়তা দেয় না। তাজমহলের ক্ষেত্রে আমাদের সাথে ঠিক এটাই হয়েছে, যার প্রতিসাম্য আর কাঠামোগত সংগতি আমাদের ভীষণভাবে সন্তুষ্টি দান করেছে। আমরা মকবরা অভিমুখে হেঁটে যাবার সময় আকৃতি আর স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্টতা আর কোমনীয়তার সতত বৃহত্তর মাত্রায় প্রায় প্রাধান্য পরম্পরায় যেভাবে ভেসে ওঠে আমরা তার প্রশংসা করি।

ভারতবর্ষে আমাদের দেখা অন্যান্য ইসলামি বা মোগল ইমারত থেকে একেবারেই আলাদা তাজমহলে ইসলামি এবং হিন্দু বাস্তুশাস্ত্রের উপকরণের কেবল সন্নিবেশই ঘটেনি, তাদের সংশ্লেষণ আর জটিল রূপান্তর ঘটানো হয়েছে এমন একটি ইমারত সৃষ্টিতে, যার এর প্রভাবের সমগ্রতাকে বহুগুণে ছাপিয়ে গেছে। আমাদের কাছে বেশির ভাগ মুসলিম স্থাপত্যের চেয়ে তাজমহল প্রাঙ্গণ অনেক বেশি ছন্দময়, মানবিক আর জাঁকালো আর কিছু হিন্দু মন্দিরের চেয়ে অনেক বেশি সাবলীল আর পরিষ্কার এর সংস্থিতি। আনুপুঙ্খিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আর বিশাল মাত্রার সমাবেশ দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। উনিশ শতকের বিশপ হেবার যখন তাজমহল দানবদের দ্বারা নির্মিত আর রত্নাকরদের দ্বারা সমাপ্ত বলেছেন তখন তার এই অনুভূতিটা নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন।

তাজমহল যখন নির্মিত হচ্ছে ঠিক সেই সময়েই রেভারেন্ড টমাস ফুলার একাধারে যাজক এবং প্রাবন্ধিক লেখেন যে, 'নির্মাণের মূল সৌন্দর্য আসলে আলো (ঈশ্বরের বড় মেয়ে)।' আমরা অনুভব করেছি তাজমহলের অভ্যন্তরে আর বহির্ভাগে উভয় ক্ষেত্রেই এটা চরম অভিভূতকর রূপে সত্য। মূল মকবরার অভ্যন্তরে আলোর পরিবর্তন খোদাই করা ভাস্কর্যগুলোকে আরো প্রবলভাবে উদ্ভাসিত করে এবং বেলা যত বাড়তে থাকে সাথে সাথে এটাও তীব্র বা কোমল হয়, মেজাজের পরিবর্তন ঘটায়। বহির্ভাগে শাহজাহান ঠিক যেমনটা পরিকল্পনা করেছিলেন তাজমহল আজও তার একমাত্র প্রেক্ষাপট হিসেবে আকাশের সান্নিধ্য পাচ্ছে। অন্য কোনো ইমারত এমনকি কোনো গাছও কোনো ধরনের

প্রতিযোগিতা বা কোনো বিক্ষেপ সৃষ্টি করেনি। জলাধার আর নহরের পানিতে সূর্যের আলোয় ইমারতটা প্রতিফলিত হয় প্রহর অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে ইবানের গভীরতার ছায়ার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। প্রেক্ষাপট এবং আলোর পরিবর্তনের প্রতি মাকরানা মর্মরের আশুগ্রাহিতা বর্ণ আর মেজাজের নানান বিভঙ্গ সৃষ্টি করে। সূর্যাস্তের সময় অর্ধেক ইমারত আমরা গোলাপি কোমলতায় ভাস্বর হয়ে উঠতে দেখি। সন্ধ্যাবেলা ইমারতের বাকি অর্ধেক কালচে কমলা রঙের ছোঁয়া পায়। সন্ধ্যার আকাশ কিছুক্ষণ পরেই উজ্জ্বল বেগুনি রঙের প্রচ্ছদপট সৃষ্টি করে তাজমহল বেগুনি পটভূমিতে বিলীন হয়ে যায়। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় কম দামি পাথরগুলো জ্বলজ্বল করে। চাঁদের আলোয় এই পাথরগুলোই জোনাকির মতো নিভু নিভু আর ঝিকমিক করতে থাকলে তাজমহল নিজে মৃদু রূপালি আভার জন্ম দেয়, কখনো বিষণ্ন রহস্যময় কুয়াশায় আধেক অদৃশ্য হয়ে থাকে। মনেটের রেইমস ক্যাথিড্রালের ওপর আলোর পরিবর্তনের ছাপের সৌন্দর্য বা আগ্রার চারপাশের মাঠে যেমন দেখা যায় ঠিক সে রকম ফরাসি খড়ের গাদার ওপর তাজমহলের ওপর আলোর অনন্যক্রিয়া থেকে মনেট কেমন ভেল্কির সৃষ্টি করতেন? উইসলার কেমন ধরনের স্বপ্নীল সংগীতাংশ সৃষ্টি করতেন?

তাজমহলের সৌন্দর্যে যেসব উপকরণ অবদান রেখেছে বলে আমরা মনে করেছি তার সবগুলোর ওপর একসাথে মনোযোগ দেয়া আমাদের কাছে প্রায় অসম্ভব মনে হয়েছে। একটি উপাদানের ওপর বস্তুনিষ্ঠ মনোযোগ দিতে গিয়ে আমরা আবিষ্কার করেছি এটা দ্রুত অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করে অন্য উপাদানের সাথে এর সম্পর্ককে বিকৃত করেছে। যাই হোক না কেন, তাজমহলের সৌন্দর্যের সাঝে সাংসিদ্ধিক রূপে বিস্মৃতিপ্রবণ কিছু একটি রয়েছে। ১৬২৫ সালে ফ্রান্সিস বেকন লিখেছেন, 'চিত্রকর্ম যা প্রকাশ করতে পারে না সেটাই সৌন্দর্যের সেরা অংশ।' প্রত্যেকের তাজমহলকে কল্পনা করার বাস্তবিকই স্পর্শাতীত একটি মাত্রা রয়েছে, কিটসের দৃঢ়োক্তি দ্বারা সম্ভবত প্রকাশিত যে, সুন্দরই সত্য আর সত্যই সুন্দর বা সম্ভবত এমনভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে যে, তাজ নিজে সব ধরনের পুনরাবৃত্তি, সব ধরনের পুরাতন উৎসাহকে ছাপিয়ে মূর্ত হয়ে আছে। মুসলিম দর্শনার্থীদের কাছে কোরআনের আয়াতের বর্ণিত সত্যের জ্ঞান এটা একটি দারুণ উপলব্ধি যে, মকবরা প্রাঙ্গণের নকশায় পৃথিবীর বুকে বেহেশতকে উপস্থাপনের অভিপ্রায়ে করা হয়েছে, কেবল তাদের সৌন্দর্যবোধ বৃদ্ধি করতে পারে। আমাদের মতো আরো অনেকের কাছে আরেকটা কেন্দ্রীয় সত্য সম্পর্কে জ্ঞান যে, মমতাজ মহলের জন্য শাহজাহানের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশই আসলে তাজমহলের সারকথা। তাকে কোনোভাবেই পুরোপুরি প্রশংসনীয় একজন মানুষ বলার অবকাশ নেই কিন্তু তার ভালোবাসার গভীরতা এবং ক্ষতির মাত্রা তাজমহলের মাঝে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তা

সত্যিই আচ্ছন্ন করে দেয়। ১৮৮৬ সালে কবি স্যার এডউইন আর্নল্ড লিখেছেন:

কোনো স্থাপত্যকীর্তি নয় অন্যদের মতো
কেবলই একজন সম্রাটের ভালোবাসার
গর্বিত আবেগ
জীবন্ত পাথরের মাঝে প্রোথিত যা দীপ্তিময় আর ভাসমান
উজ্জ্বল আত্মা এবং ভাবনার সাথে সৌন্দর্যের দেহ।

স্মৃতিস্মম্ভের প্রতি সবার প্রতিক্রিয়া প্রেমের এই উপলব্ধিকে রঙিন করে তুলে কারো মাঝে ইন্দ্রিয়পরায়ণ অনুভূতি সঞ্চারিত করে ভাবতে বাধ্য করে যে, মর্মরের মাঝে মাংসের মতো দীপ্তি দেখা যায় এবং গম্বুজটা আসলে স্তনের প্রতীক। আবার অন্যদের মাঝে এমন ধারণার জন্ম হয়েছে যে, তাজমহল আসলে বাতাসে ভাসমান একটি মায়াবি দুর্গ। শাহজাহান আর মমতাজের পাশাপাশি শায়িত ফুলের নকশা করা স্মৃতিস্তম্ভের পাশে একত্রে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি তাজমহল আসলে গভীর আবেগের বহিঃপ্রকাশ। সব মহিমাময় চমৎকারিত্বের কেন্দ্রস্থলে শায়িত রয়েছেন দুজন মানব-মানবী, যারা পরস্পকে সত্যিই ভালোবাসতেন।

প্রামাণিকতার পঠন-পাঠন
অন্বেষক পাঠকের জন্য অতিরিক্ত গ্রন্থপঞ্জি

মূল তথ্যসূত্র (অনুবাদসহ)
মোগল ও ভারতীয় তথ্যসূত্র

Abul Fazal, *The Ain-i- Akbari,* 3 vols, translated by H. Blochmann and H. S. Jarrett, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1873-94.

- *The Akbarnama,* 3 vols, translated by H. Beveridge, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1907-39.

Adab-i-Alamgiri, (Aurangzeb's letters), extracts translated by J. Scott, contained in *Tales, Anecdots and Letters,* London, Cadell and Devis, 1800.

Baburnama, 2 vols, translated by A. S. Beveridge, London, Luzac, 1921.

Baburnama, translated by W. M. Thackston, New York, The Modern Library, 2002.

Ferishta, *History of Hindustan,* translated by A. Dow, 3 vols, London, J. Walker, 1812.

Gulbadan, *The Humayan-Nama,* translated by A. S. Beveridge, London, Royal Asiatic Society, 1902.

Haider, *Tarikh-i-Rashidi,* translated by E. D. Ross as *A History of the Moguls of Central Asia,* London, Sampson, 1895.

The History of India as Told by its Own Historians, 7 vols, compiled and edited by H. M. Elliot and J. Dowson, London, Trubner and Co., 1867-77.

Inayat Khan, *The Shah Jahan Nama,* edited by W. E. Begley and Z. A. Desai, Delhi, Oxford University Press, 1990.

Jahangirnama, translated by W. M. Thackston, Oxford, Oxford University Press, 1999.

Taj Mahal – The Illumined Tomb. An Anthology of Seventeenth Century Mughal and European Documentary Sources, compiled and edited by W. E. Begley and Z. A. Desai, Cambridge, MA, The Aga Khan Programme for Islamic Architecture, 1989.

Tirmizi, S. A. I., *Mughal Documents,* Delhi, Manohar Books, 1995.

The Tuzuk-i-Jahangiri, (Memoirs of Jahangir), edited by H. Beveridge, translated by A. Rogers, London, Royal Asiatic Society, 1909.

মোগল সাম্রাজ্যে ইউরোপীয় পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত
ব্যক্তিগত বিবরণী

Bernier, F., *Travels in the Mogul Empire,* Delhi, Low Price Publications, 1999.

Van den Broecke, *A Contemporary Dutch Chronicle of Mughal India,* Calcutta, Susil Gupta (India) Ltd, 1957.

De Clavijo, R. G., *Embassy to the Court of Timur at Samarcand, A.d. 1403-6,* translated by C. R. Markham, London, Hakluyt Society, 1899.

Floris, P., *Voyage of Peter Floris to the East Indies,* London, Hakluyt Society, 1934.

Jourdain, J., *The Journal of John Jourdain,* edited by W. Foster, London, Hakluyt Society, 1905.

Manrique, F. S., *Travels of F. S. Manrique,* London, Hakluyt Society, 1927.

Manucci, N., *Storia do Mogor,* vols 1-4, Delhi, Low Price Publications, 1996.

Monserrate, A., *The Commentary of Father Monserrate on his Journey to the Court of Akbar,* translated by J. Hoyland, Oxford, Oxford University Press, 1922.

Mundy, P., *The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia,* vols 1-5, Hakluyt Society, 1914.

Pelsaert, F., *Remonstranite,* translated by W. H. Moreland as *Lahangir's India,* Cambridge, W. Heffer, 1925.

Roe, Sir T., *The Embassy of Sir Thomas Roe to India,* edited by W. Foster, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, 1990.

Tavernier, J.-B., *Travels in India,* vols 1& 2, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, 1995.

Della Valle, P., *The Travels of Pietro della Valle, edited by E. Grey* (from a translation of 1664 by G. Havers), 2 vols, London, Hakluyt Society, 1892.

সংকলনসমূহ

Early Travels in India- 1583-1619 (contains the accounts of Ralph Fitch, John Mildenhall, William Hawkins, Nicholas Withington, Thomas Coryat and Edward Terry), edited by W. Foster, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, 1985.

India in the Seventeenth Century (contains the accounts of John Ovington, Jean de Thevenot and Giovanni Careri), edited by J. P. Gupta, New Delhi, Associated Publishing, 1984.

De Laet, J., *The Empire of the Great Mogol,* translated by J. S. Hoyland, Bombay, D. B. Taraporevala Sons and Co., 1928.

অন্যান্য তথ্যসূত্র

গ্রন্থসমূহ

Ansari, M. A., *The Social Life of the Mughal Emperors (1526-1707),* Allahabad and New Delhi, Shanti Prakasan, 1974.

Asher, C. E., *Architecture of Moghal India,* Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

Berinstin, V., *Mughal India- Splendour of the Peacock Throne,* London, Thames & Hudson, 1998.

Blair, S., & Bloom, J., *The Art and Architecture of Islam 1250-1800,* London, Pelican, 1994.

Byron, R., *The Road to Oxiana,* London, Pimlico, 2004.

Canby, S. (ed.), *Humayun's Garden Party,* Mumbai, India, Marg, 1995.

Carroll, D., *The taj Mahal,* New York, Newsweek, 1978.

Chakrabarti, V., *Indian Architectural Theory,* London, Curzon, 1999.

Craven, R. C., *Indian Art,* London, Thames & Hudson, 1976.

Crowe S., Haywood, S., Jellicoe, S., & Patterson, G., *The Gardens of Mughul India,* London, Thames & Hudson, 1972.

Curzon of Kedleston, Lord, *Speeches* vol. 1 1898-1900 and vol. 3 1902-1904, Calcutta, Office of the Superintendent of Government Printing, India, 1900 and 1904.

Du Jarric, P., *Akbar and the Jesuits,* London, Rout ledge, 1926.

Dutemple, L. A., *The Taj Mahal,* Minneapolis, Minnesota, Lerner Publications, 2003.

Eraly, A., *The Mughal Throne,* London, Phoenix, 2004.

Findly, F. B., *Nur Jahan, Empress of India,* New York, Oxford University Press, 1993.

Footprint *Guide to India,* Bath, Footprint Handbooks, 2004.

Gascoign, B., *The Great Moghuls,* London, Jonathan Cape, 1971.

Godbole, V. S., *Taj Mahal and the Great British Conspiracy,* Thane, India, Itihas Patrika, Prakashan, 1996.

Gommans, J., *Mughal Warfare,* London, Routledge, 2002.

Hambly, G., *Cities of Mughal India,* London, Elek Books, 1968.

Hansen, W., *The Peacock Throne,* Newyork, Holt, Rinehart & Winston, 1972.

Hoag, J. D., *Islamic Architecture,* London, Faber & Faber, 1987.

Huxley, A., *Jesting Pilate,* London, Triad Paladin, 1985.

Jaffrey, M., *A Taste of India,* London, Pavilion Books, 1985.

King, R., *Brunelleschi's Dome,* New York, Walker & Co., 2000.

Koch, E., *Mughal Architecture,* New Delhi, Oxford University Press, 2002.

Krishnan, U., & Kumar, M., *Indian Jewellery,* Bombay, India Book House, 2001.

Lall, J., *The Taj Mahal and the Saga of the Great Mughals,* Delhi, Lustre Press, 1994.

- *The Taj Mahal and Mughal Agra,* New Delhi, Roli Books, 2005.

Lall, K. S., *The Mughal Harem,* New Delhi, Aditya Prakashan, 1988.

Lall, M., *Shah Jahan,* Delhi, Vikas Publishing, 1986.

Lane-Smith, R., *The Taj Mahal of Agra,* Delhi, Stonehenge Publishing, 1999.

Lear, E., ed. R. Murphy, *Indian Journal,* London, Jerrold's, 1953.

Milton, J., *The English Poems,* Ware, Wordsworth Edition, 2004.

Mitford, N., *The Sun King,* London, Hamish Hamilton, 1966.

Moynihan, E. (ed.), *The Moonlight Garden- New Discoveries at the Taj Mahal,* Washington Dc, Smithsonian Institute, 2000.

- *Paradise as a Garden in Persia and Mughal India,* London, Scolar Press, 2004.

Mukhia, H., *The Mughals of India,* Oxford, Blackwell Publishing, 2004.

Nath, R., *Art and Architecture of the Taj Mahal,* Agra, The Historical Research Documentation Programme, 1996.

- *The Private Life of the Mughals of India,* Jaipur, Historical Research Documentation Programme, 1994.

- - *The Taj Mahal and its Incarnation,* Jaipur, Historical Research Documentation Programme, 1985.

Oak, P. N., *Taj Mahal The True Story- The Tale of a Temple Vandalized,* Houston, Texas, A. Ghosh, 1969.

Okada, A., Joshi, M. C. & Nou, J. L., *The Taj Mahal,* New York, Abbeville Press, 1993.

Pal, P., Leoshko, J., Dye, J. M. & Markel, S., *Romance of the Taj Mahal,* Los Angles & London, Los Angles County Museum of Art and Thames & Hudson, 1989.

Peck, L., *Delhi, A Thousand Years of Building,* New Delhi, Roli Books, 2005.

Prawdin, A. J., *The Builders of the Mogul Empire,* London, Allen & Unwin, 1963.

Qaiser, A. J., *Building Construction in Mughal India,* Delhi, Oxford University Press, 1988.

Richards, J. D., *The Mughal Empire,* Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

Roosevelt, E., *India and the Awakening East,* London, Hutchison, 1954.

Savory, R. M. (ed.), *Islamic Civilisation,* Cambridge, Cambridge University Press, 1976.

Bleeman, W. H., *Rambles and Recollections of an Indian Officials,* vols 1 & 2, New Delhi, Asian Educational Series, 1995.

Stronge, S., *Painting for the Mughal Emperor- The Art of the Book, 1560-1660,* London, V & A Publications, 2002.

Tannahill, R., *Sex in History,* London, Hamish Hamilton, 1980.

Tillotson, G. H. R., *Mughal India,* London, Viking, 1990.

Victoria & Albert Museum, *The Indian Heritage,* London, Victoria & Albert Museum, 1982.

Weatherly, M., *The Taj Mahal,* Farmington Hills, MI, Lucent Books, 2003.

Zind, Z., *The Magnificent Moghuls,* Karachi, Oxford University Press, 2002.

জার্নাল এবং ম্যাগাজিনসমূহ

The Art Bulletin
The Indian Historical Quarterly
Islamic Culture
Islamic Quarterly
The Journal of Imperial and Commonwealth History
The Journal of Indian History
The Journal of the Pakistan Society
The Journal of the Royal Asiatic Society
The Journal of the Warburg and Court auld Institutes
Muqarnas
National Geographic Traveler
Oriental Art
South Asian Studies

সংবাদপত্র

Japan Times
Observer (London)
Sydney Morning Herald
The Times (London)

অন্যান্য

India History Congress- Proceedings of the Forty-Sixth Session, Guru Nanak Dev University, Amritsar, 1985.

Internet source- Built Heritage of Agra and Fatehpur Sikri, IGNCA, 2002.

টীকা, টিপ্পনী আর তাদের উৎস

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজিকে ষোড়শ আর সপ্তদশ শতকে লিখিত ভাষ্যে যেখানে প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে সেখানে আমরা পাঠকদের সুবিধার্থে অক্ষর, বানান, বিরামচিহ্নের ব্যবহারের আধুনিকীকরণ করেছি।
মোগল নথিপত্রের নিম্নলিখিত অমূল্য উৎসসমূহ যেহেতু বারংবার উল্লেখিত হয়েছে, আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে তাদের অভিসম্বন্ধের সংক্ষেপকরণ করেছি :

IT আধ্যাত্মিকভাবে উদ্দীপিত মকবরা, তাজমহলের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সপ্তদশ শতকের মোগল আর ইউরোপীয় উৎসের একটি সংকলন, Z. A. Desai এবং W. E. Begley কর্তৃক অনূদিত আর সংকলিত।

ED *ভারতবর্ষের ইতিহাস তার নিজস্ব ঐতিহাসিকদের দ্বারা লিখিত,* H. M. Elliot এবং J. Dowson কর্তৃক অনূদিত আর সংকলিত। সাত খণ্ডের এই অনুবাদে মোগল সময়কালের প্রধান দিনপঞ্জি আর ইতিহাস থেকে বাছাই করা অংশের অনুবাদ সংকলিত করা হয়েছে।

মুসলিম আর পশ্চিমা দিনপঞ্জির মাঝে এবং শেষোক্ততে পরবর্তী সমন্বয় অনুবাদে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে বলে, আমরা আমাদের এই টীকাগুলোতে শাহজাহান আর মমতাজের জন্ম, মৃত্যু আর বিয়ের মতো প্রধান দিবসগুলো মুসলিম দিনপঞ্জি মতে সংযোজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রারম্ভিকা

১৫ : 'যখন...নিঃস্ব করে ফেলেন' : Qazwini, *IT,* পৃষ্ঠা. ১৫।
১৫ : 'তার চোখ...মুক্তাবিন্দু হয়ে ঝরে পড়ে' : প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ১৩।
১৬ : 'বিশ্বের বিস্ময়ের...মিশরের পিরামিডের...হওয়ার দাবিদার' : F. Bernier, *Travels in the Mogul Empire,* p.299.
১৬ : 'তাজমহলের...বয়ে আনে' : Kalim, *IT,* p.84.

১৬ : 'কালের কপোলে একটি অশ্রুবিন্দু' : R.Tagore, quoeted Internet source Built Heritage of Agra and Fatehpur Sikri.

১৬ : 'গজদন্তের তোরণ...পথের উপলব্ধি...মূর্ত প্রকাশ' : R. Kipling, *From Sea to Sea 1887,* quoeted D. Carroll, *The Taj Mahal,* p.156.

১৬ : 'এই অপূর্ব মনোরম...যারা করেননি' : E. Lear, *Indian Journal,* 16 February 1874, p.78.

১৬ : 'আমি তোমায়...নির্মাণ করা হবে' : W. H. Sleeman, *Rambles and Recollections of an Indian Officials,* vol. 1, p.382.

১৭ : 'তাজমহলকে...দর্শন করতে আসেন' : T. Daniell, quoeted P. Pal *et al. Romance of the Taj Mahal,* p.199.

১৮ : 'অত্যধিক শ্রম...নুড়িপাথরে' : P. Mundy, *Travels in Europe and Asia,* vol. 2, p.213.

প্রথম অধ্যায় : মুগ্ধ সম্মোহনের দেশ

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত সমস্ত উদ্ধৃতি যে ক্ষেত্রে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি তার সবই বাবরের স্মৃতিকথা, *বাবরনামা* থেকে নেয়া হয়েছে। আমরা Wheeler Thackston এবং Annette Beveridge দুজনের অনুবাদেরই সাহায্য নিয়েছি। দুটো অনুবাদই চমৎকার।

২৭ : 'ঈশ্বরের চাবুক' : C. Marlow, *Tamburlaine the Great,* pt. 2, line 4641.

২৭ :'ফলের বৃক্ষের...উঁচু মঞ্চ' : R. G. de Clavijo, *Embassy to the Court of Timur at Samarcand,* p.131.

২৮ : 'চারুলিপি...হাতের কাজ' : Haider, *Tarikh-i- Rashidi,* (translated by E. Dennison Ross as *A History of the Moguls of Central Asia*), pp. 3_4.

৩১ :'দীপ্তিহীন মোমের আলো' : quoted E. Moynihan, *Paradise as a Garden in Parsia and Mughal India,* p. 72.

৩১ :'মৃত শবদেহের...দূষিত করে তোলে' : quoted B. Gascoigne, *The Great oghuls,* p.11.

৩১ :'পরবর্তী দুই মাস আকাশে...যায়নি' : ibid., p. 13.

৩১ : 'এত বিপুল সংখ্যা...তাদের স্থান...বাস করত' : R. G. de Clavigo, op.cit., p. 171.

৩৪ : বাবর সেবার যদিও...(হুমায়ুনের) ভেতর জ্বরের আকস্মিক হ্রাস ঘটে' : all quotes in this paragraph are from Abul Fazal, *Akbarnama,* vol.1, p. 276.

৩৫ : 'তোমার ভাইদের...তাদের প্রাপ্যও হয়' : ibid., p. 277.

৩৫ : বাইশ বছর বয়সী হুমায়ুন...কেটে ফেলতে বলেন। : all quotes in this paragraph are from A. Early, *The Mughal Throne,* p. 42.

৩৬ : 'মাত্রাতিরিক্ত' : ibid.

৩৭ : হুমায়ুন পালিয়ে...১৫৪১ সালের ২১ আগস্ট। : all quotes in these two paragraphs are from Gulbadan, *Humayan-Nama,*pp. 144, 146 & 151.

৩৯ : 'শীতের তীব্রতায়...মাংস সিদ্ধ করে' : Gulbadan, op. cit., p. 167.
৩৯ : 'চার গুণের বেশি ছিল' : Abul Fazal, *Akbarnama,* vol.1, p. 439.
৪০ : *'রাজত্ব আর রাজ্য পরিচালনার...সম্রাটের শত্রু!'* : Gulbadan, op. cit., pp. 200-1.
৪০ : 'আমার নিজের দুষ্কর্মের...যা কিছু ঘটেছে' : Badauni, quoted A. Early, op. cit., p. 111.
৪১ : 'তার সম্মানিত...রক্ত নির্গত হয়...'আমার ডাক এসেছে' : Abul Fazal, *Akbarnama,* vol.1, p. 657.

দ্বিতীয় অধ্যায় : আল্লাহু আকবর

এই অধ্যায়ে যেখানে কোনো উদ্ধৃতির জন্য কোনো উৎস উল্লেখ করা হয়নি সে ক্ষেত্রে সেগুলো আকবরের জীবনের সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য আবুল ফজলের আকবর-নামা থেকে গৃহীত হয়েছে বা তার রচিত আইন-ই-আকবরী থেকে গৃহীত হয়েছে, যেখানে তিনি আকবর কীভাবে তার সাম্রাজ্য শাসন করতেন সে সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন, সেইসাথে তার দৈনন্দিন জীবনের কার্যবিবরণীর একটি সমৃদ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন।

৪৬ : 'স্বেচ্ছায় এবং আত্মপ্রশ্রয়...উপায় ছিল না' : quoted A. Early, op. cit., p. 139.
৪৯ : 'দেখতে অনেকটা কবুতরের বাসার মতো' : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 73.
৫২ : 'আগুন, পানি, পাথর...ভক্তি করতে' : Badauni, *Muntakhab al-Tawarikh,* ED, vol. 5, p. 529.
৫২ : 'গভীর শ্রদ্ধার সাথে...নিজের মাথায়...ইঙ্গিতবহ' : P. du Jarric, *Akbar and the Jesuits,* p. 19.
: E. Koch's article 'The Taj Mahal : Architecture, Symbolism and Urban Significance', vol. 22, *Muqarans,* 2005, pp. 128-49, discusses the use of red and white coloured sandstone and the Hindu tradition.
৫৫ : 'পাথর খোদাইয়ের...পিছপা হতেন না।' : A. Monserate, *Commentary* , pp. 200-1.
৫৬ : '(তারা) দুটো বিশাল বড়...অনেক বেশি' : R. Fitch from his account reproduced in *Early Travels in India,* ed. W. Foster, pp. 17-18.
৫৭ : 'যার রাজকীয় মহিমার...দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন' : A. Monserate, *Commentary* ,op. cit., pp. 196-7.
৫৯ : 'অশিক্ষিত'...একেবারেই অশিক্ষিত' : Memoirs of Jahangir, ED, vol. 6, p. 290.
৫৯ : 'বিদেশিদের প্রতি দারুণ প্রসন্ন' : P. du Jarric, op. cit., p. 9.
৬০ : 'অন্য কোনো মেয়ে নৃত্য...প্রথা অনুযায়ী...কঠোরভাবে অনিচ্ছুক' : Ferishta, *History of Hindustan,* vol. 3, p. 21.
: Shah Jahan (Khurram) was born on 30 Rabi II 1000 in the Muslim calendar.

: Mumtaz Mahal (Arjumand Banu) was born on 19 Rajab 1001 in the Muslim calendar.
৬৩ : 'আসল সন্তান' : *Jahangirnama,* translated by W. M. Thackston, p. 30.
৬৪ :'দো-চোয়ানি অ্যালকোহলের বিশটা ছোট শিশি' : ibid., pp. 184-5.
৬৪ :'কোনোভাবেই আমার বন্ধু নন' : Memoirs of Jahangir, ED, vol. 6, p. 3.
৬৭ :'যদি তিনি এই রাজবৈরী...হত্যা করতে পারে' : *Tuzuk-i-Jahangiri* (Memoirs of Jahangir), translated by A. Rogers and edited by H. Beveridge, vol. 1, p. 25.
৬৮ :'শাহ্ বাবার (আকবর) দেহে...সরাতে পারবে না' : quoted M. Weatherly, *The Taj Mahal,* p. 25.
৬৯ :'পৃথিবীর অধিশ্বর...নিয়ন্ত্রণ করা' : *Tuzuk-i-Jahangiri* (Memoirs of Jahangir), translated by A. Rogers and edited by H. Beveridge, vol. 1, p. 3.

তৃতীয় অধ্যায় : অতুলনীয় মোতি আর চিত্তহারী উপচার

এ অধ্যায়ে যেখানে কোনো উৎস উল্লেখ করা হয়নি সেখানে উদ্ধৃতিগুলো জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা থেকে নেয়া হয়েছে। (the translation in *IT,* ED, A. Rogers and W. Thackston).

৭৩ :'রক্তপাতের মাঝে খুব বেশি পুলক' : Sir Thomas Roe, *Embassy to India,* p. 104.
৭৭ :'যিনি প্রায়ই পৃথিবীটাকে...ছোট বলে মনে করতেন' : William Finch's account reproduced in *Early Travels in India,* ed. W. Foster, p. 186.
৭৭ :'তাজমহলের মাঝে এর সমস্ত সৌন্দর্য আরো উৎকৃষ্টরূপে দেখতে পাওয়া যায়' : F. Bernier, op. cit., p. 293.
৭৭ :খুররমের...প্রতিযোগিতা আরম্ভ হতো' : the quotes in this paragraph come from William Hawkin's account reproduced in *Early Travels in India,* ed. W. Foster, p. 118.
৭৮ : 'খেয়ালি প্রকৃতির মেলা : F. Bernier, op. cit., p. 272.
৭ ৮ : 'কৌমার্যের...নিষ্কলঙ্ক বংশানুক্রম...নিষ্পাপ চরিত্রে'র : Qazwini, one of Shah Jahan's official court historians, *IT,* p. 2.
৮০ : 'উৎকোচ গ্রহণের...আপসহীন' : Muhammad Hadi, *Tatimma-i Wakiat-i Jahangiri,* ED, vol. 6, p. 397.
৮১ : 'কোনো প্রকার মনোযোগ...দীর্ঘসময় অবস্থান করেন' : ibid., p. 398.
৮১ : 'তার উপস্থিতি সম্রাটের...অন্তর্ভুক্ত করে নেন' : Mutamid Khan, *Ikbalnama-i Jahangiri,* ED, vol. 6, p. 406.
৮১ : 'তার সৌভাগ্যের তারকা...সুপ্তি থেকে জেগে উঠবার মতো...আরম্ভ করে' : Muhammad Hadi, *Tatimma-i Wakiat-i Jahangiri,* ED, vol. 6, p. 398.
৮৩ : 'এবং বড়, উজ্জ্বল সব মূল্যবান অলংকার...মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে' : Sir Thomas Roe, op. cit., pp. 378-9.

: Shah Jahan (Khurram) and Mumtaz Mahal (Arjumand Banu) married on 9 Rabi I 1021 in the Muslim calendar.\

৮৩ : পরবর্তী...১৬১২ সালের ১০ মে...উৎসব উদ্‌যাপিত হয়' : all quotes in these four paragraphs are from Saha jahan's official court historians Qazwini and Lahori, *IT*, except for 'আমি খুররমের মহলে যাই...আমির ওমরাহদের সম্মানসূচক আলখাল্লা প্রদান করে', which from the Memoirs of Jahangir translated by W. M. Thackston.

৮৫ : 'রতিক্রিয়া সম্পর্কিত অনুসন্ধান...অনেক বেশি অগ্রসর ছিল' : R. Tannahill, *Sex in History*, p. 245.

৮৬ : 'রাজবংশের রত্ন প্রসবিনী আকর' : Inayat Khan, *Shah Jahan Nama*, edited W. E. Begley and Z. A. Desai, p. 71.

৮৬ : খুররমের দিনপঞ্জির রচয়িতারা...আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত' : quotes in this paragraph are from Qazwini, one of Shah Jahan's official court historians, *IT*, pp. 5-6.

৮৬ : শুমারির অতীত জনবহুল' : William Finch's account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, p. 182.

৮৬ : মোগল রাজধানীতে...শব্দ সৃষ্টি করত : quotes in this paragraph come from P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 173.

৮৮ : 'সব লোকের হৃদয় জয়...নিপীড়নের ক্ষত মুছে দেয়া' : Asad Beg's account given in ED, vol. 6, p. 173.

৮৮ : 'পুরো দড়িটার দৈর্ঘ্য বরাবর সোনার গিন্টি...ন্যায়বিচার করবেন' : William Hawkin's account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, p. 113.

৮৮ : 'সম্রাটের ঠিক সামনেই...পালন করতে প্রস্তুত' : ibid., p. 115.

৮৯ : 'তার রাজত্বে এক গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের...জবাবদিহিতা আর বিবেচনার অর্ন্তগত' : P. della Valle, *Travels in India*, vol. 1, p. 30.

৮৯ : 'তার নিজের উদ্ভাবন' : Sir Thomas Roe, op. cit., pp. 270.

৮৯ : 'আলোকিত পথ পরিত্যাগ...অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে ফিরে যায়' : quoted B. Gascoigne, op. cit., p 115.

৯০ : 'চওড়ার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা ছিল' : J. de Laet, *The Empire of the Great Mogol*, p. 37.

৯০ :'এই কীতির্মান রমণীর (মমতাজকে) ...করতেন না...' : Inayat Khan, op. cit., p. 71.

৯০ :'কামোদ্দীপক ইন্দ্রিয়পরায়ণতা...বেপরোয়া আমোদ-প্রমোদ' : F. Pelsaert, *Jahangir's India, Remonstrantic*, p.64.

৯০ : 'পুরুষাঙ্গের আকৃতির যেকোনো কিছু...বিষমধারে পরিণত করা হতো' : Thomas Coryat's account reproduced in *Early Travels in India,* ed. W. Foster, pp. 278-9.

৯১ :'কুমারী রমণীদের...চতুর আর নিবেদিতপ্রাণ লেখক' : Abul Fazal, *Ain-i-Akbari,* vol. 1, pp. 44-5

৯২ :'হাতির পদদলিত করার সাজা' : Sir Thomas Roe, op. cit., pp. 191.

: Richard Burton's observation is quoted in R. Tannahill, op. cit., p. 249.

৯৩ :'অভিজাত লোকেরা...খোজাদের বিশ্বাস...সম্পত্তি পাহারা দেয়াটা...' : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 164.

৯৩ : 'এই পৃথিবীর সর্বোচ্চ অধিগম্য সুখ' : N. Manucci, *Storia do Mogol,* vol. 2, p. 73.

৯৩ : 'আলোচ্য রমণীর সামাজিক মর্যাদা...কিছুর তোয়াক্কা না করে' : N. Manucci, op. cit., vol. 2, p. 328.

৯৩ :'এইসব বেবুনের হাত আর মুখ একই সাথে...আদিরসাত্মক গল্পের দারুণ ভক্ত' : ibid., p. 74.

৯৪ :'আমার পা পর্যন্ত বিশাল একটি...আমি একজন অন্ধ লোক' : F. Bernier, op. cit., p. 267.

৯৪ : (তার স্বামীর) হারেমের আটজন রমণীর গর্ভপাত ঘটিয়েছিল...সন্তানকে বেঁচে থাকতে দেবে না' : J. -B. Tavernier, *Travels in Inian,* vol. 1, p. 313.

৯৪ : 'তিনি চারপাশে প্রচুর ব্যয়বহুল ইমারত নির্মাণ করেছেন—*সরাইখানা* বা বণিক এবং পর্যটকদের জন্য বিশ্রামের স্থান এবং এমন সব প্রমোদ-উদ্যান আর প্রাসাদ যেমনটা পূর্বে কখনো নির্মিত হয়নি' : F. Pelsaert, *Jahangir's India,* p. 50.

৯৫ : 'তিনি কখনো রাজকীয় কামরা...বিদেশে যেখানেই অবস্থান করেন' : Inayat Khan, op. cit., p. 71.

চতুর্থ অধ্যায় : চম্পতি যুবরাজ

এই অধ্যায়ে যেখানে কোনো উৎস উল্লেখ করা হয়নি সেখানে উদ্ধৃতিগুলো জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা থেকে নেয়া হয়েছে (the translation in *IT,* ED, A. Rogers and W. Thackston).

৯৮ :মহলে যখন কোনো কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে আয়োজন করা হয় : N. Manucci, op. cit., vol. 2, p. 320.

১০০ : 'নভোমণ্ডলের মতো জ্বলজ্বল করতে থাকা হীরক খণ্ড আর বিশালাকৃতি মুক্তার কারুকাজ করা রুপালি কাপড়ের আলখাল্লা' : Sir Thomas Roe, op. cit., pp. 282.

১০০ : খুররমের উদীয়মান...নিঃসন্দেহে একটি বিচক্ষণ উপহার : all quotes in these five paragraphs are from Sir Thomas Roe, op. cit., pp. 119, 172, 177, 282, 283 and 324, with the exception of ` ', which is quoted in B. Gascoigne, op. cit., p. 154.

১০৩ :প্রাচ্যের এইসব যুদ্ধ প্রায়ই অবিশ্বাস্য সংখ্যক মানুষের ভেতরে যুদ্ধ শুরু করে : Edward Terry's account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, p. 315.

১০৩ : অর্শের কারণে তখনো...বিশ সপ্তাহ যাবত : Sir Thomas Roe, op. cit., pp. 385-6.

১০৪ : 'রাজনৈতিক বিবেচনায়...সন্তুষ্ট ছিল' : Lahori, *IT*, p. 22.

১০৫ : 'মঙ্গলময় মুহূর্তে যেহেতু...কখনো রাখেননি' : Inayat Khan, op. cit., p. 8.

১০৭ : 'তারা <মনে হয়> সন্তান জন্ম দেয়ার সময় অন্যান্য নশ্বর মানুষ...পুনরায় যাত্রা শুরু করে' : J. de Laet, op. cit., p. 81.

১০৯ : 'একটি তন্দ্রালুতার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হতো...মহামান্য সম্রাটকে সমাবিষ্ট করে রাখত' : Sir Thomas Roe, op. cit., p. 325.

১০৯ : : 'অন্যরা তার মুখে খাবার তুলে দিত' : W. Hawkin's account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, p. 116.

১০৯ : 'এখানে প্রচুর পপির ক্ষেত...*ভাঙ্গি* (মাদকাসক্ত) বলে' : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 247.

১০৯ : 'তিনি যেন একটি বাচ্চা ছেলে ঠিক সেভাবে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন' : F. Pelsaert, op. cit., p. 53.

১১০ : 'তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তার মর্জি অনুযায়ী তিনি তাকে দিয়ে যা খুশি তা-ই করাতে পারেন' : Sir Thomas Roe, op. cit., p.270.

১১০ : 'খোশমেজাজি আর স্বভাবত ইন্দ্রিয়পরায়ণ' : Ferishta, op. cit., vol. 3, p. 32.

১১০ : 'তার প্রাক্তণ আর বর্তমান সমর্থকরা বেশ ভালোভাবেই পুরস্কৃত হয়েছে...তার কাছে ঋণী...অনুমোদন লাভ করছে' : F. Pelsaert, op. cit., p. 50.

১১১ : 'অন্য যেকোনো আরাম-আয়েসের সুবিধা...তার স্বামীর দুর্দশার সঙ্গী হবার' : Thomas Coryat's account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, p. 277.

১১২ : 'যুবরাজদের ভেতরে সবচেয়ে সুদর্শন' : *Intikhab-i Jahangir-Shahi*, ED, vol. 6, p. 450.

১১২ : 'দুর্বলচিত্ত আর জড়বুদ্ধির' : quoted E. B. Findly, op. cit., p. 49.

১১৩ :'একজন মহানুভব যুবরাজ,...একজন ধূর্ত প্রিয়পাত্র' : Sir Thomas Roe, op. cit., p.325.

পঞ্চম অধ্যায় : পর্দার অন্তরালে অপেক্ষমাণ সম্রাট

এ অধ্যায়ে যেখানে কোনো উৎস উল্লেখ করা হয়নি সেখানে উদ্ধৃতিগুলো জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা থেকে নেয়া হয়েছে। (the translation in *IT*, ED, A. Rogers and W. Thackston).

১১৭ : 'এই বর্বরোচিত পরিকল্পনার...শক্ত করে এমনভাবে আটকে দিয়ে যায় যেন তারা কিছুই করেনি' : S. Manrique, *Travels*, p. 301.

১১৮: 'তার স্বামী নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছে...কাঁদতে কাঁদতে বাইরে বের হয়ে আসে' : Van den Broecke, *A Contemporary Dutch Chronicle*, p. 54.

১১৯ : 'খসরু অস্তিত্বের পিঞ্জর...অনস্তিত্বের কারাগারে অন্তরীণ হন' : Inayat Khan, op. cit., p. 10.

১২০ : 'ভাইয়ের রক্তের মাঝে তিনি নিজের সিংহাসনের ভিত রোপণ করেছেন' : Ferishta, op. cit., p. 56.

১২০ : 'সত্যি ঘটনাটা তারা কেন তাকে জানাতে ব্যর্থ হয়েছে সেটা এবং সেইসাথে. . অনুসন্ধান করে দেখেন' : J. de Laet, op. cit., p. 199.

১২১ : 'আদি-অন্তহীন পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে' : Inayat Khan, op. cit., p. 10.

১২২ : 'যাদের সততার মোহরে খাদ...পাঁচ বছর হিন্দুস্তানে জ্বলতে থাকবে' : Inayat Khan, op. cit., pp. 10-11.

১২৬ : 'সম্রাট আর তার অমাত্যরা নিজেদের রমণীদের যত্ন নেন,...এতে খুব সামান্য লাভ হয়' : E. Terry's account reproduced in *Early Travels in India*, ed. W. Foster, p. 329.

১২৮ : 'সহসা অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়' : Muhammad Hadi, *Tatimma-i Wakiat-i Jahangiri*, ED, vol. 6, p. 396.

১২৮-১২৯ : শাহজাহান পরিস্থিতির...অবশ্যই উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন : all quotes in these three paragraphs are from Muhammad Hadi, *Tatimma-i Wakiat-i Jahangiri*, ED, vol. 6, pp. 396-7.

ষষ্ঠ অধ্যায় : প্রাসাদের আরাধ্য মালকিন

যেখানে কোনো সূত্র উল্লেখ করা হয়নি সেখানের উদ্ধৃতিগুলো জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা থেকে গৃহীত, যা তার ব্যক্তিগত করণিক মুতামিদ খান কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বা তার জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল নিয়ে লিখিত ইতিহাস *ইকবলা-নামা-ই-জাহাঙ্গীরী* থেকে গৃহীত হয়েছে। ED, vol. 6 এবং W.M. Thackston আমরা ব্যবহার করেছি।

১৩৫ : 'তারা সবাই আফিম সেবন করে...ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে...সংকারের বন্দোবস্ত করে' : N. Manucci, op. cit., vol. 2, p. 411.

১৩৯ :'নূর মহলের কাছে অল্পবয়সী যুবরাজরা নিরাপদ নন' : Shah Jahan's official chronicler Lahori, translated in ED, vol. 7, p. 6.

১৪০ : 'আশা কিংবা সুযোগ সামান্যই ছিল' : Van den Broecke, op. cit., p. 90.

১৪২ : 'আত্মরক্ষণ, মানবিক মানসিকতার প্রথম নীতি...তাদের আত্মা ঘৃণা করে' : Ferishta, op. cit., p. 103.

১৪৩ : 'তার স্বামীর মৃতদেহ তার আপন...'কালো দিয়ে আবৃত একটি শবাধারে' : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 213.

১৪৩ : 'দুঃখের সমস্ত প্রতীক দিয়ে সাজিয়ে...'কল্পিত পরলোকগত' : N. Manucci, op. cit., vol. 2, p. 174.

১৪৩ : 'নিজেকে উঁচু করে এবং সমবেত বাহিনীর সবার চোখের সামনে আবির্ভূত হন' : J. -B. Tavernier, op. cit., vol. 1, p. 271.

১৪৩ : 'ডানে বামে স্তূপীকৃত মোহর বর্ষিত করে' : Muhammad Hadi's Appendix, *Jahangirnama* (Memoirs of Jahangir), translated and edited by W. M. Thackston, p. 460.

১৪৩ : 'চিরনবীন আগ্রার উঁচু আর নীচু শ্রেণী...শাসককে দেয়া অভ্যর্থনার তুলনা হয় না' : P. Pal *et al., op. cit.*, p. 28.

১৪৪ : 'মহামান্য সম্রাজ্ঞী...আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন' : Inayat Khan, op. cit., p. 21.

১৪৫ : 'নিজের সন্তানদের...গর্ভে ভূমিষ্ঠ হয়েছে' : Ferishta, op. cit., p. 104.

১৪৫ : 'আকাশে মঙ্গলময় এক...এই পৃথিবীর নিয়ামতসমূহ...'অন্য পৃথিবীর শরণে' : Inayat Khan, op. cit., p. 23.

১৪৫ :'বর্তমান শাসকের প্রকৃতি...সেটা নিরাপত্তাহীন প্রতিপন্ন হবে' : J. de Laet, op. cit., p. 246.

সপ্তম অধ্যায় : ময়ূর সিংহাসন

১৪৭ : 'উৎসবের সময় এবং মেঘাচ্ছন্ন দিনে' : *Tuzuk-i-Jahangiri,* (Memoirs of Jahangir), translated by A. Rogers and edited by H. Beveridge, vol. 1, p. 9.

১৪৮ : 'ভ্রমণকালীন সঙ্গী...স্বগৃহে সান্ত্বনা উৎস' : Kalim, *IT,* p. 34.

১৪৮ : 'আকাশস্পর্শী' : Lahori, *IT,* p. 137.

১৪৯ :'ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন বিচক্ষণ, প্রাণবন্ত, উদার আর মার্জিত স্বভাবের' : Ferishta, op. cit., p. 105.

১৪৯ : "'চাচাজান' বলে সাদর সম্ভাষণ করতে শুরু করে, সবাইকে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত করে তোলে" : Inayat Khan, op. cit., p. 21.

১৪৯ :'মহামান্য সম্রাটের পায়ের...মূল্যবান রত্ন, রত্নখচিত...চমৎকার সব উপহার দিতেন' : *Tuzuk-i-Jahangiri,* (Memoirs of Jahangir), translated by A. Rogers and edited by H. Beveridge, vol. 1, p. 26.

১৫১ : 'রাজত্বের শেষার্ধে, প্রিয় সুলতানার (নূর),জৌলুশময় প্রদর্শনী শাহজাহানের দ্বারা প্রদর্শিত মহিমার বিশালতার কাছে হারিয়ে যায়' : Ferishta, op. cit., p. 103.

১৫২ : 'চাঁদোয়ার বহিরাবরণ ছিল...রত্ন দিয়ে সজ্জিত ছিল' : Lahori, *IT,* pp. 45-6.

১৫২-১৫৩ : 'নীলা আর অন্যান্য রঙিন রত্ন...নাশপাতি-আকৃতির একটি মুক্তা ঝুলছে' : J. -B. Tavernier, op. cit., vol. 1, p. 304.

১৫৩ : মোগল ঐশ্বর্য আর প্রতাপ...ইরাকের সোনার জরিযুক্ত কাপড় দিয়ে সজ্জিত' : the information and quotes on this paragraph come from P. A. Andrews's article `The Generous Heart or The Mass of Clouds : The Court Tents of Shah Jahan' in *Muqarans,* vol. 4, pp. 149-65.

১৫৬ : অগাস্টিনিয়ান ফ্রায়ার...অবশ্য শাহজাহানের 'অতোষণীয় ধনপিসাসা' : the quotes in this paragraph are from S. Manrique, op. cit., pp. 201, 202 & 204.

১৫৬ : 'মঙ্গলময় প্রবর্তক', 'পর্বত বিনাশক', 'সদাসাহসী' : N. Manucci, op. cit., vol. 2, pp. 338-9.

১৫৭ : 'প্রতিটি হাতিতে দুজনের...মাহুতরা প্রাণীগুলোকে স্তাবকতাপূর্ণ শব্দ...'মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামির ন্যায় শেষ বিদায় নিয়ে ময়দানে উপস্থিত হতো' : F. Bernier, op. cit., pp. 276-7.

১৫৮ : 'রাতের আকাশে তখনো তারারা দৃশ্যমান'...'প্রয়াত সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রবর্তিত...'ভয়ংকর খুনি বুনো হাতির পালের' : Lahori's account appended to Inayat Khan, op. cit., p. 567.

১৫৮ : 'দেয়ালের মতো' : quoted M. A. Ansari, *Social Life of the Mughal Emperor*, p. 97.

১৫৯ : 'ভগ্নহৃদয় নিপীড়িত ব্যক্তিদের' : Lahori's account appended to Inayat Khan, op. cit., p. 571.

১৫৯ : 'দক্ষ সচিবরা' : ibid., p. 570.

১৫৯ : 'হারেমের সচিবের কাছে বহুল...সম্রাজ্ঞী মুমুতাজ আল-জামানির কাছে রক্ষিত রয়েছে' : Lahori, *IT*, p. 9.

১৫৯-১৬০ : 'মহামান্য সম্রাটের প্রবর্তিত আইন আর প্রবিধানের...যেন অপচয় না হয় বা হারিয়ে না যায়' : ibid., p. 179.

১৬০ : *পরম করুণাময়...সহচর হয়েছেন* : S. A. I. Tirmizi, *Mughal Documents*, p. 32.

১৬০ : 'তার নিজের স্ত্রীর অভিপ্রায়ের প্রতি এতটা অনুবর্তী নয়' : *Intikhab-i Jahangir-Shahi*, ED, vol. 6, p. 452.

১৬০ : 'সম্রাটের মন-মানসিকতার ওপর নূরজাহান...তাদের শব্দচয়ন সম্রাটের মনে কোনো স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারবে না' : ibid.

১৬৩ : *তার আচরণের কারণে কখনো...প্রদর্শন করেছে* : Kalim, *Padsha Nama, IT*, p. 34.

১৬৩ : 'কতিপয় সৌভাগ্যবান রাজপুরুষ আর তার মুষ্টিমেয় পরীক্ষিত....মমতাজের আব্বাজান আসফ খান ছিলেন। : Lahori's account appended to Inayat Khan, op. cit., p. 571.

১৬৫ : 'এতটাই চাতুর্যের সাথে যেখানে মসলা মিশ্রিত অবস্থায়...থাকত একটি সিদ্ধ মুরগি।' : quoted M. Jaffrey, *A Taste of India*, p. 24.

১৬৬ : 'আম যখন ঠিকমতো পাকে সেটা সত্যিই খেতে উপাদেয়', 'অবিশ্বাস্য ধরনের কুৎসিত আর তারচেয়েও বাজে স্বাদ...বাড়াবাড়ি ধরনের মিষ্টি স্বাদ।' : *Baburnama*, translated W. M. Thackston, pp. 344-5.

১৬৬ : 'ফরাসিদের বন্দরে প্রাপ্ত', 'আগ্রায়...প্রতি বছর কয়েক হাজার আনারস উৎপন্ন হয়।'

: *Jahangirnama* (Memoirs of Jahangir), translated and edited by W. M. Thackston, p. 24.

১৬৭ : 'গলিত তুষার' : R. Nath, *Private Life of the Mughal's of India,* p. 70.

১৬৭-১৬৮ : 'মহামান্য সম্রাট—অন্যান্য তুচ্ছ নৃপতিদের মতো ছিলেন না...'তার অভিজাত আদব-কায়দা, বাগ্মিতা, আত্মবিশ্বাস...'তারের মূর্চ্ছনা বা সুন্দর গান', : Lahori's account appended to Inayat Khan, op. cit., p. 572.

১৭০ : 'মাথার পেছনে...বের হয়ে থাকে।' : quoted H. Mukhia, *The Mughals of India,* p. 148.

১৭০ : 'ভারী বালা বা মুক্তার কব্জি বন্ধনীর কারণে,...কব্জিতে পেঁচানো থাকত', : N. Manucci, op. cit., vol. 2, p. 317.

১৭১ :'(সম্রাট) যিনি মোগল শক্তির কাছে কোনো ধরনের অনীহা প্রদর্শন...সৃষ্টি আর ব্যয়বৃদ্ধি করেছে।' : John Ovington's account, *India in the Seventeeth Century,* ed. J. P. Guha, p. 83.

অষ্টম অধ্যায় : আমার জন্য একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করবেন

: all quotes in these two paragraphs are from P. Mundy, op. cit., pp. 193-4.

১৭৪ : 'সেনাবাহিনীর সাথে যদি কোষাগার থাকে,...নিরাপত্তাবোধও জন্ম নেয়।' : quoted J. Gommans, *Mughal Warfare,* p. 105.

১৭৫ : 'বাকি সব হাতির তুলনায় দামি সাজসজ্জায় সজ্জিত' : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 193.

১৭৫ : 'এখন পর্যন্ত সবচেয়ে আকর্ষণীয় আর জমকালো ভ্রমণ রীতি,....নিয়মিত বিরতিতে অব্যাহতি দিত।'

: F. Bernier, op. cit., p. 370.

১৭৬ : '!! রাজকীয় সৈন্য আর দরবার রাজসিক আর নিয়মিতভাবে অগ্রসর হতো, ...করে সে প্রতিবার ঘণ্টার সংখ্যা ঘোষণা করত।' : the quotes in this paragraph are from N. Manucci, op. cit., vol. 2, pp. 64-5.

১৭৭ : 'এক ধরনের সুগন্ধিযুক্ত, শক্ত ঘাসের আঁটি...একটি দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের অবতারণা ঘটত.. .'

: P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 191.

১৭৮ : 'নানা রঙের রেশমের চমৎকার জালি দিয়ে সেটা...আরো দৃষ্টি নন্দন করে তোলা হতো।' : F. Bernier, op. cit., pp. 371-2.

১৭৮-১৭৯ : খোজারা সেইসাথে পায়ে হেঁটে কিংবা ঘোড়ায় চেপে সামনে অবস্থান করে...থেকে দেবীদের আড়াল করতে হাতির অবতারণা করেছে, কল্পনার জগতে হারিয়ে গেছেন।' : all quotes in this paragraph are from F. Bernier, op. cit., pp. 372-3.

১৭৯ : 'শিবিরে নামাজ, রোজা রাখার মতো ইবাদতের পাশাপাশি জুয়াখেলা, মাতলামি, পায়ুকাম আর ব্যভিচারও সমানতালে চলত।' : J. Gommans, *Mughal Warfare,* p. 110.

১৮১ : 'রাতের আঁধারে দূর থেকে তাকালে একটি মহিমান্বিত আর চিত্তচমৎকারী দৃশ্য ভেসে উঠত,....আলোকিত করে তুলেছে...' : F. Bernier, op. cit., p. 361.

১৮১-১৮২ :সম্রাট যদিও তার সভাসদবর্গ নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছেন, শাহজাহান আর...কখনো বা কদাচিৎ শিকার ধরতে ব্যর্থ হয়।' : the quotes in this paragraph come from F. Pelsaert, op. cit., p. 51.

১৮৩ : 'তার বাহিনীর নেতৃত্বদানকারী সেনাপতি....উদ্যোগ ব্যর্থ করতে চেষ্টা করত।' : A. Eraly, op. cit., p. 317.

১৮৪ : দুর্গগুলো শক্তিশালী, সৈন্য শিবিরের মনোভাব কঠোর : Ferishta, op. cit., p. 127.

১৮৪ : 'মানুষ এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে, ...'বিষাদাক্রান্ত দৃশ্যে পরিণত হয়েছিল।' : letters from English merchants named Rastell and Bickford, quoted P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 341.

১৮৪ : 'যারা তাদের সন্তানকে নিতে আগ্রহী... নিজের সন্তানকে তারা দেখতে পাবে না।' : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 42.

১৮৫ : শাহজাহান পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করেন, যা ইতিমধ্যেই বুরহানপুরের....থেকে আলাদা হিসেবে দেখা হয়।' : the quotes in this paragraph come from Lahori, ED, vol. 7, pp. 24-5.

১৮৬-১৮৭ : 'আজ বিদায়ের বেলা সমাগত;....বিচ্ছেদের সময় সমাগত।' disputed nineteenth century Persian manuscript given in R. Nath, *The Taj Mahal and Its Incarnation (Original Persian Data),* pp. 5-6.

১৮৭ : 'সবুজ উদ্যানবেষ্টিত একটি সুন্দর প্রাসাদ দেখেছেন,.... কোনো খুঁজে পাওয়া যাবে না।' : another disputed nineteenth century manuscript, ibid., p. 6.

১৮৭ : : শাহজাহানের দরবারের ঐতিহাসিক সাদামাটা কিন্তু মর্মস্পর্শী কাহিনী লিপিবদ্ধ...'ঘড়িতে যখন সেই কাল রাত্রির আরো তিন ঘণ্টা বাকি রয়েছে ধ্বনিত হয়...: all this in this paragraph come from the account of Shah Jahan's chronicler Salih, *IT*, p. 25.

: Mumtaz Mahal died on 17 Zil-Qada 1040 in the Muslim calendar.

নবম অধ্যায় : যন্ত্রণার রেণুকণা

১৮৯-১৯০ : মমতাজের আকস্মিক মৃত্যু শাহজাহানকে মানসিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত করে...'সৌভাগ্যের সমুদ্রের ঝিনুক, যিনি বছরের বেশির ভাগ সময়েই গর্ভবতী থাকতেন; যাতে করে...পৃথিবীর দায়িত্ব গ্রহণ করতাম।' : which is Lahori, *IT*, p. 22, all quotes in these two paragraphs are Qazwini, *IT*, pp. 11-14.

১৯০ : 'মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ আর রাত্রি আলোকিত করা রত্নপাথর' : Lahori, *IT*, p. 20.

১৯০ : 'ভোরের প্রথম আলোর মতো ধূসর সাদা লেবাস' : Qazwini, *IT*, p. 12.

১৯০ : *ক্রমাগত ঝরতে থাকা অশ্রু...সাদা হল শোকের রং* : Kalim quoted H. Mukhia, op. cit., p. 149.

১৯০ : 'সমস্ত ভাগ্যবান যুবরাজ,...সাম্রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায়'- : Qazwini, *IT*, p. 12.

১৯০ : 'সব ধরনের আমোদ-প্রমোদ আর মনোরঞ্জন, বিশেষ করে সংগীত আর বাদ্যযন্ত্র' : Lahori, *IT*, p. 20.

১৯০ : 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রমাগতভাবে শোক, দুঃখ আর বিপর্যয়ের লক্ষণ আবির্ভূত হতে থাকে', : Qazwini, *IT*, p. 13.

১৯০ : যখন 'সর্বদা অশ্রুসজল থাকার কারণে তিনি চমশা পরিধানে বাধ্য হন।' : Inayat Khan, op. cit., p. 70.

১৯১ : 'তার মাঙ্গলিক শ্মশ্রুরাজিতে... দ্রুত সাদা হয়েছে।' : Qazwini, *IT*, p. 13.

১৯১ : 'অঝোরে দীপ্তিময় মুক্তার মতো অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করেন।' : Salih, *IT*, p. 26.

১৯১ : 'সেদিন থেকে, রাজকীয় অধ্যাদেশে মহান সিলমোহর সংযুক্ত করার দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়।' : Inayat Khan, op. cit., p. 74.

১৯২ : *পৃথিবী তার বাসিন্দাদের চোখে...শোকের নীল রঙে রঞ্জিত করে।* : Qudsi, *IT*, p. 46.

১৯২ : 'সময়ের রানি'র....'একটি উজ্জ্বল সমাধিসৌধ' : Salih, *IT*, p. 43.

: Although the Moghul chroniclers formally referred to the Taj as the *rauza-i-munavvara* or 'Illumined Tomb', Peter Mundy and other contemporary travellers wrote of the 'Taj (sic) Mahal'.

১৯৩ : কতিপয় ঐতিহাসিক সাম্প্রতিক সময়ে মমতাজ মহলের প্রতি শাহজাহানের...আধ্যাত্মিক উপযুক্ততা থেকেই এমন প্রবল ভালোবাসা আর প্রীতি এবং সীমাহীন অনুরাগ আর ঘনিষ্ঠতার জন্ম হয়েছিল।' : all quotes in this paragraph are Qazwini, *IT*, pp. 13-14.

১৯৪ : 'পরাক্রমশালী দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল যা ভীরুকে রক্ষা করবে, বিদ্রোহীদের ভীত করে তুলবে এবং অনুগতকে প্রীত করবে...প্রকাণ্ড মিনারও নির্মিত হয়েছিল...এবং যা মর্যাদার জন্য উপকারী, যা পার্থিব ক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয়।' : quoted G. H. R. Tillotson, *Mughal India*, p. 20.

১৯৪ : "...এইসব প্রমাণ আকৃতির আর চমৎকার ভবনসমূহের...ঐশ্বর্যের কথা নির্বাক বাগ্মিতায় বলে (যাবে)।" : Lahori, *IT*, p. 10.

১৯৪ : 'আকাশস্পর্শী আকাঙ্ক্ষায় সিক্ত একটি স্মৃতিসৌধ।' : Lahori, *IT*, p. 43. (See also E. Koch's article 'The Taj Mahal : Architecture, Symbolism and Urban Significance', vol. 22, *Muqarans*, 2005, pp. 128-49.)

২০১ : 'জেরোনিমো ভেরোনিও নামে ভেনিসের এক জহুরি,...শহরেই মৃত্যুবরণ করেন।' : S. Manrique, op. cit., p. 173.

২০৪ : 'একটি মকবরা, যা হবে অনন্য আর অসাধারণ সুন্দর পৃথিবীতে যার তুলনা নেই, যা সম্রাটের মহব্বতের উপযুক্ত।' : R. Nath, *The Taj Mahal and Its Incarnation*, p. 6.

২০৪ : 'রাজকীয় মস্তিষ্ক, যা সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান,....পরিবর্তন আর পরিবর্ধন করেছেন।' : Lahori's account appended to Inayat Khan, op. cit., p. 570.

২০৫ : 'তার প্রয়াত সম্রাজ্ঞীর শোকাবহ মৃত্যুর'...ক্রমেই 'মহামান্য সম্রাটের মন বিশ্রব্ধ' : Inayat Khan, op. cit., p. 82.

২০৫ : 'আমাদের চোখ যত দূর...দৃশ্যটাকে একটি কেতাদুরস্ত মাত্রা দান করেছে।' : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 192.

২০৫ : 'রাজকীয় বাজারসরকার প্রয়াত সম্রাজ্ঞীর সমাধিস্থলের চারপাশের উদ্যানে আড়ম্বরপূর্ণ বসার আয়োজন করে,...'মহামান্য সম্রাট মানুষের বিশাল ভিড় এড়াতে নিজের ব্যক্তিগত মহলে ফিরে যান।' : ibid., p. 84.

দশম অধ্যায় : নির্মাতা এই পৃথিবীর অধিবাসী নয়

E. Koch's article 'The Taj Mahal : Architecture, Symbolism and Urban Significance', vol. 22, ***Muqarans,*** 2005, pp. 128-49, provides much detailed and valuable information on the architectural theories behind the Taj Mahal and related matters.

২০৮ : 'বেহেশতের পবিত্র বাসস্থানের প্রতিনিধিত্ব করতে...বেহেশতের উদ্যানের একটি দৃষ্টিকল্প জন্ম দেয়ার জন্যই নির্মিত' : Lahori, *IT*, p. 66.

২০৯ : "'অস্থিবিস্তি' বলা হতো, প্রাসাদটির আটটি মহল থাকায় আমাদের ভাষায় যা আটটি অংশের নিদর্শন বর্ণনা করে।" : quoted R. A. Jairazbhoy, 'The Taj Mahal in the Context of the East and West', *Journal of the Warburg and Court auld Institutes,* vol. 24, 1961, p. 75. This article also contains other examples of the use of the nine-fold plan.

২১০ : নির্মাণকাজ শেষ হবার পরে 'স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত' আর 'পেয়ারা আকৃতি বিশিষ্ট'- : Lahori, *IT*, p. 66.

২১১ : 'বেহেশতের দিকে উঠে যাওয়া সোপানসারি' : ibid., p. 67.

২১১ : 'একজন ধার্মিক ব্যক্তির আকাশের পানে উত্থিত কবুল হওয়া মোনাজাত।'

: Salih, *IT*, p. 79.

: The author who has suggested that the sight lines relate to the Shah Jahan's height is R. Lane-Smith.

: H. I. S. Kanwar discusses the significance of the 58-foot diameter of the central chamber in 'Harmonious Proportions of the Taj Mahal', *Islamic Culture,* vol. 49, 1975, pp. 1-17.

: A. J. Qaisar's *Building Construction in Mughal India* gives much useful information on Moghul building practices.

২১৫-২১৬ : নির্মাণের মূল ভার বহনের জন্য শ্রমিকরা...নির্মাণের মূল ভার বহনের জন্য শ্রমিকরা : all quotes in these three paragraphs come from Lahori, *IT*, pp. 65-6.

২১৭ : 'আমরা এই মর্মে আদেশ দিচ্ছি যে,...এই আদেশ পালন থেকে একচুলও বিচ্যুত হবে না' : imperial order quoted, *IT*, p. 163.

২১৭ : 'ইমারতটা...বিপুলসংখ্যক শ্রমিক...মামুলি পাথর হিসেবে বিবেচনা করে নির্মিত হচ্ছে' : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 213.

২১৭ : 'পাথরের এই টুকরোগুলোর...কোনোমতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।' : S. Manrique, op. cit., p. 172.

২১৭৮ : *দুধের মাঝে নিঃশেষে...কখনো কোথায় দেখেনি* : Kalim, *IT*, p. 84.

২১৯ : 'সূর্যের মতো উজ্জ্বল' স্বর্ণের তৈরি পত্রের কারুকাজ স্থাপন করেছিলেন।

: Lahori, *IT*, p. 66.

২২০ : 'প্রতিটি পঙ্‌ক্তি' কীভাবে 'কাশ্মীরের সৌন্দর্যের মতো হৃদয়গ্রাহী।' : quoted S. Stronge, *Painting for the Mughal Emperor*, p. 168.

২২৩ : *শান্তিতে এসো সমাগত প্রাণ,*

এবং প্রবেশ করো আমার বেহেশতে।

: Koranic inscription, *IT*, p. 195.

২২৩ : 'কোরআন থেকে নির্বাচিত ঐশ্বরিক অনুগ্রহের আয়াতসমূহ...ছাপ আর অসিদ্ধকরণের সীমারেখা টেনে দিয়েছে।'

: Salih, *IT*, p. 79.

২২৪ : 'মকবরার অভ্যন্তর আর বহির্ভাগের সর্বত্র,...প্রতিবিম্বের মতো মনে হয়' : ibid.

২২৫ : 'চারপাশে ইয়াশ্‌ব্‌ আর ইয়াশ্‌ম্‌ পাথরের ছড়াছড়ি...সূক্ষ্ম আর সুন্দর কারুকাজ সৃষ্টি করা হয়েছে।' : F. Bernier, op. cit. p. 298.

২২৬ : 'বিশাল মোগল সাম্রাজ্যে মণিমুক্তা সম্বন্ধে আর কারো শাহজাহানের চেয়ে ব্যুৎপত্তি ছিল না' : J. -B. Tavernier, op. cit., vol. 2, p. 101.

২২৭ : *শ্বেতপাথরে তাদের প্রণিহিত করা পাষাণ পুষ্প...*

সত্যি ফুলের মাত্রা লাভ করেছে

: lines from the court poet Kalim, *Padshanama*.

২২৭ : 'দেখতে এতটাই জীবন্ত মনে হয়,...আলাদা আলাদা মুক্তা, পান্না বা পোখরাজ দিয়ে তৈরি প্রতিটি পাতা, প্রতিটি পাপড়ি' : Madame Blavatsky, quoted P. Pal *et al.*, op. cit., p. 130

২২৮ : 'বিস্ময় সৃষ্টিকারী...জাদুকরী' : Lahori, *IT*, p. 67.

একাদশ অধ্যায় : এই বেহেশত-তুল্য উদ্যান

২৩১ : *একটি স্বচ্ছ-তোয়া জলের ফল্গুধারা উত্থিত হয়েছে...দিগ্বিদিক ধেয়ে চলেছে...*: J. Milton, *The English Poem*, p. 211.

২৩২ : উভয় *(বাগিচা) ঘন শাখাপ্রশাখায় ভরা* : The quotes from the Koran comes from S. Crowe *et al. The Gardens of Mughul India*, p. 42.

২৩৫ : 'মালি যেমন উদ্যানকে গাছ দিয়ে সজ্জিত করে...এভাবেই নেতৃত্বের আর্দশ আবির্ভূত : *The Akbarnama*, vol. 2, pp. 486 & 487.

২৩৬ : *যত দিন কানন আর পুষ্প*

মেঘ আর বৃষ্টির মাঝে সম্পর্ক বিরাজিবে : Kalim, *IT*, p. 85.

২৩৭ : 'যে বৃক্ষ আর দুর্লভ সুগন্ধি লতাগুল্ম' : Salih, *IT*, p. 80.

২৩৮ : 'ফুলে ফুলে উদ্বেল' : F. Bernier, op. cit. p. 296.

২৩৯ : এটা 'পরিশ্রমসাধ্য আর নোংরা...ষাঁড়ের মূত্র আর গোবর লেগে নোংরা হয়ে থাকায়' : *The Baburnama*, translated by W. M. Thackston, p. 335.

২৪০ : 'পৃথিবীর সব নন্দন-কাননের কপালে একটি কালো তিল এবং এখানের প্রতিটি পুষ্পবীথির... 'দ্বারা পুরোপুরি প্রকাশ করা অসম্ভব' : Salih, *IT*, p. 80.

দ্বাদশ অধ্যায় : আধ্যাত্মিকতায় উজ্জ্বলিত সমাধি

২৪৩-২৪৪ : সেদিন সন্ধ্যাবেলা আকাশের প্রেক্ষাপটে...*পর আলোকিত উৎসবে হয় মাতোয়ারা* : all quotes in this paragraph come from Kalim, *IT*, pp. 82-4.

২৪৪ : 'ভাস্বর গুণাবলি আর নৈতিকতা' : John Ovington's account, *India in the Seventeenth Century*, ed. J. P. Guha, p. 108.

২৪৪ :'বেহেশতের বাগিচায় অবস্থানরত মমতাজের আত্মার শান্তির জন্য' : Salih, *IT*, p. 77.

২৪৪ : 'ক্রুটিহীন আর ভীষণভাবে উজ্জ্বলিত করে তোলা...তুর্কি রীতির অনুসরণে প্রাচীরের দুই প্রান্তে ইয়াশব নির্মিত দুটি প্রবেশদ্বার, গিল্টি করা কজা দ্বারা সংযোজিত হয়েছে।' : Lahori, *IT*, p. 67.

২৪৫ : 'মমতাজ মহলের সমাধির জন্য তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন...ওপর বিছিয়ে দেয়া হতো।' : *Tarikh-i Khafi*, ED, vol. 7, p. 484.

২৪৬ : *অনন্তের ইঙ্গিতে*

বালুকণায় মুখ লুকিয়েছিল

: Qudsi, *IT*, p. 86.

২৪৬ : 'তৈমূরের সব উত্তরপুরুষের ভেতরে...আত্মীয় সম্পর্কিত বোনের সাথে দারা শুকোহ্‌র : quoted P. Pal, *et al.*, *Romance of the Taj Mahal*, p. 48.

২৪৬ : 'বিশালাকৃতি সব হাতি,... যার সবই হাউই পূর্ণ. : P. Mundy, op. cit., vol. 2, p. 202.

২৪৮ : জাহানারার প্রতি শাহজাহানের...ভীষণভাবে পুড়ে যায়' : all quotes in this paragraph come from Inayat Khan, op. cit., p. 309.

২৪৮ :'এই কাপড় রপ্তানির অনুমতি বণিকদের ছিল না...নৃত্যগীতে অংশ নিতে পুরুষদের প্রায় বাধ্যই করত।'

: J. -B. Tavernier, op. cit., vol. 2, pp. 46-7.

২৪৮-২৪৯ : নিদারুণ মনঃকষ্টের কারণে...সিংহাসনে আরোহণের মঙ্গলময় তিথিতেও এমন উৎসবের আয়োজন করা হয়নি...' : all quotes in these two paragraphs come from Inayat Khan, op. cit., pp. 309-19.

২৫০ : 'তিনি (শাহজাহান) তার অসংখ্য আত্মীয়ের রক্তে হাত রঞ্জিত করার পরে...তিনি তার মৃতা স্ত্রীর গর্ভজাত আপন কন্যাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।' : original Latin text of J. de Laet, quoted in *IT*, p. 306.

২৫০ : 'প্রাচীন রীতি অনুসারে মোগল রাজকন্যারা...বহুবারই তাকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখা গেছে।'

: P. Mundy, op. cit., vol. 2, pp. 202-3.

২৫০-২৫১ : আগ্রা আর সুরাটে অবস্থানরত ...পান হাসিমুখে হতভাগ্য যুবকের হাতে তুলে দিয়ে।

: all quotes in these two paragraphs come from F. Bernier, op. cit. pp. 11-13.

২৫২ : বার্নিয়ের গল্প অবশ্য সব ইউরোপীয়রা...মহলের খেদমতে নিয়োজিত খোজা আর দায়িত্বশীল রমণীদের গভীর আস্থা অর্জন করেছিলাম' : all quotes in this paragraph come from N. Manucci, op. cit., vol. 1, pp. 208-11.

২৫৩ : 'জাহানারা তার পিতার কাছে যা চাইতেন সেটাই পেতেন' : N. Manucci, op. cit., vol. 1, p. 212.

২৫৩ : 'হিন্দুস্তানের নৈতিকতা বিবর্জিত রীতির অন্যতম।'

: Lahori, ED, vol. 7, p. 50.

২৫৪ : 'অবিশ্বাসীদের শক্ত ঘাঁটি' : ibid. p. 36.

২৫৪ : 'কামান, ম্যাচলক বন্দুক আর যুদ্ধের অন্যান্য অনুষঙ্গ' : Inayat Khan, op. cit., p. 85.

২৫৪ : 'খারিজি সম্প্রদায়' : ibid.

২৫৫ :'কতিপয় পর্তুগিজ হার্মাদ সহসা অভিনিক্রমণে প্রবৃত্ত হয়...পরবর্তীকালে যার জন্য তাদের ভীষণ মূল্য দিতে হয়েছে...'

: N. Manucci, op. cit., p. 170.

২৫৫ : 'ইসলামের যোদ্ধারা' : Inayat Khan, op. cit., p. 87.

২৫৫ : 'বিবাহিত আর কুমারী নির্বিশেষে,....আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিস্টান ধর্ম পরিত্যাগ করতে।' : F. Bernier, op. cit. p. 177.

২৫৬ : 'তাদের কুপরামর্শের প্রভাবে' মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং 'পার্থিব ঝকমারি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত করেন' : Lahori, *Badshanama,* ED, vol. 7, p. 43.

২৫৬ : 'অদূরদর্শী ইয়ারদোস্ত আর তাদের কুপরামর্শের প্রভাবে' মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং 'পার্থিব ঝকমারি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত করেন।' : ibid., p. 69.

২৫৬ : 'আমি জানি (প্রতিপক্ষ) আমায় হত্যার ষড়যন্ত্র করছে...'

: quoted W. Hansed, *The Peacock Throne,* p. 128.

২৫৯ : 'তার বড়বোন বেগমসাহেবার সনির্বন্ধ অনুরোধের কারণেই' : Inayat Khan, op. cit., p. 319.

ত্রয়োদশ অধ্যায় : সেই মহিমাময় মসনদ

২৬২ : 'মমতাজের মৃত্যুকে স্মরণীয় করতে...সম্মানিত স্থানে আসন গ্রহণের আহ্বান জানান' : all quotes in this paragraph are from S. Manrique, op. cit., pp. 214-18.

২৬৩ : 'একটি মনোরম স্থানের জন্য,...যাদের চত্বরযুক্ত বারান্দা থেকে নদী দেখা যায়' : Inayat Khan, ED, vol. 7, p. 85.

২৬৩ : 'প্রায় প্রতিটি কক্ষেই দরজার কাছে বহমান...উষ্ণতা অনুভূত হয় না' : F. Bernier, op. cit. p. 267.

২৬৪ : 'সৌভাগ্যবান ইউরোপীয় অভ্যাগতদের ভেতরে যারা...প্রকৃতি ভালোভাবে অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছি' : the quotes in this paragraph are from S. Manrique, op. cit., pp. 197-8.

২৬৬ : 'এটা সবচেয়ে অলাভজনক একটি বিষয়, যা মুমিনের সম্পদ গ্রাস করে।' : quoted G. H. R. Tillotson, *Mughal India*, p. 22 and J. D. Hoag's, *Islamic Architecture*, p. 10.

: for a discussion of the costs of Shah Jahan's building project and of the Taj Mahal see S. Moosvi, `Expenditure on Building Under Shah Jahan- A Chapter of Imperial Financial History', *proceedings of the Forty-Sixth Session of the Indian History Congress*, 1985, abd R. Nath, *Art and Architecture of the Taj Mahal*, pp. 16-17

২৬৭-১৬৮ : 'ভেনিস থেকে আগত পর্যটক মানুচ্চি...করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল' : the quotes in these two paragraphs are from N. Manucci, op. cit., vol. 1, pp. 187-8.

২৬৮ : 'তাদের ভাঁড়ামি আর বাতুলতা দিয়ে' তাঁর মনোযোগ ভিন্নমুখী করত, যা তিনি খুঁতখুঁত করে বলেছেন, 'শালীনতার সকল সীমালঙ্ঘন করেছে' : F. Bernier, op. cit. pp. 273-4.

২৬৮ : কোনো দোকান থেকে একটি ভালো দ্রব্য নিয়ে এসো।' : N. Manucci, op. cit., vol. 1, p. 189.

২৬৯ : শাহজাহান তার ইমারত নির্মাণের...নাচগান-পান-হল্লার মাঝে অতিবাহিত করতে পারত' : the quotes in these two paragraphs are from F. Bernier, op. cit. pp. 6-7.

২৭০ : 'চাপা স্বভাবের, চতুর, কুশাগ্রবুদ্ধি আর নিজের প্রকৃত মনোভাব...প্রচেষ্টা করার সময় পার্থিব মহিমার প্রতি বিরাগ' : ibid., p. 10.

২৭০ : 'আস্থা আর ভরসার অযোগ্য' মনে করেন। 'হায়! হায়! আমার রাশিচক্র কত দুর্ভাগা আর অসুখী এবং অমার্জিত', : *Adab-i-Alamgiri*, Aurangzeb's letter to Jahanara written in the 1650s, translated by J. Scott, p. 424.

২৭০ : 'ভালোবাসে না' : N. Manucci, op. cit., vol. 1, p. 181.

২৭০ : 'একমাত্র চিন্তা' আবারও বার্নিয়ের ভাষ্য অনুসারে, 'সে কীভাবে নিজেকে আরো আমোদ-প্রমোদে মশগুল রাখতে পারে।'....তার হাতের শক্তির ওপর আস্থাশীল' : F. Bernier, op. cit. pp. 10-11.

২৭১ : 'তার মহান পূর্বপুরুষ তৈমূরের রাজধানী আর বাসস্থান' : Lahori, ED, vol. 7, pp. 70-1.

২৭১ : 'স্বদেশের প্রতি স্বাভাবিক টান, ফিরে যাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ এবং হিন্দুস্তানের রীতি, লোকজন অপছন্দ করায়...এবং আবহাওয়ার তীব্রতা' : ibid.

২৭২ : 'মনোবলের অভাবের কারণে' : Inayat Khan, ED, vol. 7, p. 90.

২৭২ : 'এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে এত আয়োজন সত্ত্বেও দুর্গটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়নি'...'সৈন্যবাহিনীকে তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন না' : *Adab-i-Alamgiri,* Aurangzeb recalled his father's words in a letter to Shah Jahan, translated by J. Scott, pp. 432 & 439.

২৭২-২৭৩ : 'সেই বছরের ডিসেম্বরে, ...করতে এবার স্পষ্টতই বিশাল আয়োজন শুরু হয়' : all quotes in this paragraph are from W. M. Thackston's translation given in *The Moonlight Garden,* ed. E. Moynihan, p. 28.

২৭৪ : 'সম্রাটের মহিমাময় মসনদের নিকটে সোনালি একটি চেয়ারে উপবেশনের' : Inayat Khan, ED, vol. 7, p. 105.

২৭৫-১৭৬ : ১৬৬৫ সালের গোড়ার দিকে,...বাইরে যাবার জন্য তিরস্কার করেন : the quotes in these two paragraphs are from A. Eraly, op. cit., p. 327.

চতুর্দশ অধ্যায় : সাপের দাঁতের চেয়েও শানিত

২৭৯ : 'একজন সম্রাট সব সময় বিজয় অর্জনে...একজোট হয়ে উঠবে' : Abul Fazal quoted A. Eraly, op. cit., p. 327.

২৮০ : মমতাজ যদি জীবিত থাকতেন...অনুভব করার মতো কারণ খুঁজে পাবে : the quotes in this paragraph are from N. Manucci, op. cit., vol. 1, p. 230.

২৮১ : 'সম্রাট কোষ্ঠকাঠিন্য আর মূত্রথলির জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন' : Inayat Khan, op. cit. p. 543.

২৮২ : 'এমন একপ্রকার পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন,...অসহায়ভাবে তা ব্যয় করতে থাকেন।' : F. Bernier, op. cit. pp. 24-5.

২৮২ : 'শাহজাহান এখনো একজন তরুণের ন্যায় জীবনকে...অসুস্থতায় সোপর্দ করেছেন' : N. Manucci, op. cit., vol. 1, p. 231.

২৮২ : 'সাম্রাজ্যের শাসনভার সামলাবার অধিকাংশ দায়িত্ব' দারাকে দিয়েছিল, ...অনুরোধ করেছিলেন' : Inayat Khan, op. cit. p. 545.

২৮৩ : 'গোঁড়া আর ভণ্ড-নামাজি' বলে অবজ্ঞা করেন, : ibid., p. 220.

২৮৫ : 'সম্রাট আরোগ্য লাভ করেছেন...' 'আমি এই প্রেমপূর্ণ আলেখনে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সহ্য করব না' : W. Hansen, op. cit., pp. 235-6.

২৮৫ : 'নিতান্ত অনীহার সাথে বিদায় নেন...নিয়তির বিধান সম্বন্ধে অনবহিত যে, এটাই তাদের শেষ সাক্ষাৎ বিহ্বল সম্রাট নিজের অজান্তে ছেলেকে শক্ত করে আলিঙ্গন করেন' : Inayat Khan, op. cit. p. 550.

২৮৫-২৯৩ : নিকোলোও মানুচ্চি, দারার...সম্ভবত নিহত হয় : all quotes in these eleven paragraphs are from N. Manucci, op. cit., vol. 1, pp. 255-7, 269, 276, 282, 295 and 352.

২৯৩-২৯৪ : দারা আরো একবার পলায়ন করেন...। বার্নিয়ের নিজের জন্য অজুহাত সৃষ্টি করেন : the quotes in this paragraph are from F. Bernier, op. cit. pp. 89-90.

২৯৪ : 'লজ্জাকর শোভাযাত্রা' : ibid., p. 98.

২৯৪ : 'সাম্রাজ্যের সর্বত্র নিরীশ্বরবাদ আর নাস্তিক্যের রীতির পুনঃপ্রচলন' : *Adab-i-Alamgiri,* Aurangzeb's letter to Shah Jahan, translated by J. Scott, pp. 358-9.

২৯৬ : 'রক্তের জন্য নিজের দাবি প্রয়োগে ব্যর্থতার' : *Tarikh-i Khafi Khan,* ED, vol. 7, p. 267.

২৯৭-২৯৮ : শাহজাহানের কারারুদ্ধ জীবনের...ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা ছিল না' : the quotes in this paragraph are from *Adab-i-Alamgiri,* translated by J. Scott, pp. 358-9.

২৯৮ : 'সমস্ত জেনানাকুল যাদের ভেতরে নতর্কী আর গায়িকা ও রাঁধুনিরাও ছিল', : F. Bernier, op. cit. p. 166.

২৯৮ : 'মহান মোগল সম্রাটের, কৃত্রিম উপায়ে যৌন-কামনাকে উদ্দীপিত করার চেষ্টাই,....তার নিজের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে' : quoted *IT,* p. 309.

২৯৯ : 'সম্মানজনক আর যথাযোগ্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া'র : Salih, *IT,* p. 144.

: Shah Jahan died on 26 Rajab 1076 in the Muslim calendar.

পঞ্চদশ অধ্যায় : তখত-ই-তাউসের নিপতন

৩০২ : 'তাকে বিদায় জানান এবং তার দিকে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়ান, এমন একটি আচরণ, যা রাজকন্যাকে দ্রুত নিজের অবস্থান বুঝতে সহায়তা করে।' : N. Manucci, op. cit., vol. 3, p. 276.

৩০৩ : 'সবচেয়ে সাহসী আর সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল' : N. Manucci, op. cit., vol. 2, p. 227.

৩০৩ :'অনভিজ্ঞ যুবরাজ সততার পথ থেকে বিপথগামী হন...ফাঁদে আটকে পড়েন।' : the chronicler is Khafi Khan, translated in ED, vol. 7, p. 301.

৩০৪ :'যেমনটা তাকে করতে বলা হয়েছিল'...'গোলাবর্ষণের আওতায় অবস্থান করবে।' : ibid., p. 304.

৩০৫ : 'মদ আর রমণীর সাহচর্যে ভুলিয়ে রাখতে' : quoted W. Hansen, op. cit., p. 465.

৩০৫ : 'নিজের অমাত্যদের সাথে কোনো পরামর্শ না করেই এবং নিজের কোনো সম্পত্তি বা তার পরিবার কিংবা হারেমের মেয়েদের কথা না ভেবেই' : quoted A. Eraly, op. cit., p. 491.

৩০৭ :"নিজের সন্তানদের কখনো বিশ্বাস করবে না,...'একজন রাজার প্রতিশ্রুতি সব সময় উষর'।"

: quoted W. Hansen, op. cit., p. 486.

৩০৮ : 'শুরুর দিকে যখন তাজমহলের উদ্যানে বনভোজনের আয়োজন করা হতো ... টুকরো খুঁড়ে তোলাটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।'

: Lord Curzon, *Speeches*, vol. 1, p. 223.

৩০৮-৩০৯ :'পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিভৃত স্থানে নির্মিত...সতেজ হবার সুযোগ না দেয়াটা ভণ্ডামি হতো।'

: quoted D. Carroll, *The Taj Mahal*, p. 133.

: The question of Lord William Bentinck and the auctioning of the Taj Mahal is discussed in P. Spear, `Bentinck and the Taj', *The journal of the Royal Asiatic Society*, October 1949, pp. 180-7.

৩০৯-৩১০ :লর্ড কার্জন নিজে...আজও ঝুলন্ত রয়েছে : the quotes in these two paragraphs are from Lord Curzon, op. cit., vol. 4, p. 347, except 'আমার নাম জর্জ নাথানিয়েল কার্জন, আমি সবচেয়ে সেরা ব্যক্তি', ...'যেকোনো ব্যক্তির মাঝে ভয়ংকর পামরের একটি অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারত' : which come from the *Oxford Book of Political Anecdotes.*

৩১১ :'মকবরাটা রক্ষা করতে আমাদের কি শহরটাকে একটি সমাধিসৌধে পরিণত করতে হবে'? : B. Gautam, *Japan Times,*11 October, 2004.

৩১৩ : *'বেহেশতের সমুন্নত খিলানের নিচে, ... মাথা উঁচু করেনি।*

: Kalim, *IT,* p. 82.

ষোড়শ অধ্যায় : নদীর অপর তীরে তার আপন মকবরা

The theory that the Taj Was a Symbolic representation of the throne of God is contained in W. E. Begley's paper `The Myth of the Taj Mahal and a new Theory of Its Symbolic Meaning', *The Art Bulletin,* vol. 61, no. 1, ( March 1979), pp. 7-37. E. Koch's article `The Taj Mahal : Architecture, Symbolism and Urban Significance', vol. 22, *Muqarans,* 2005, pp. 128-49, is among those advancing the proposition that the placing of the Taj Mahal derives from the practice in Agra riverside gardens.

E. Moynihan কর্তৃক সম্পাদিত, *The Moonlight Garden,* এর বিষয়বস্তু মাহ্তাব বাগের সাম্প্রতিক খননকার্যের বিবরণ।

The theory that the Taj Mahal was a Hindu temple is advanced in V. S. Godbole's *Taj Mahal and the Great British Conspiracy* and P. N. Oak's *Taj Mahal, The True Story- The Tale of a Temple Vandalised.* G. H. R. Tillotson in *Oriental Art,* autumn 1986, pp. 266-9, discusses politics and the Taj Mahal.

৩১৬ : 'পুরো একটি বাগিচার সুরভি পাবে' : *Jahangirnama,* translated in S. Crowe *et al.*op. cit., p. 192.

৩১৯ : 'শাহ্জাহান নদীর অপর তীরে নিজের জন্য একটি মকবরা...পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটে' : J. -B. Tavernier, op. cit., vol. 2, p. 91.

:The underground chambers are discussed by H. I. S. Kanwar, in `Subterranean Chambers of the TaJ Mahal', *Islamic Quarterly,* vol. 48 (July 1974), pp. 159-75.

৩২৬ :'তাজমহলের অলংকরণের তুলনায়...কারুকাজ অনেক বেশি সমৃদ্ধ আর আকর্ষণীয়' : Aldous Huxley, *Jesting Pilate,*p. 50.

৩২৭ : 'পানির স্তর'...'ভিত স্থাপনের' : Lahori, *IT,* p. 65.

৩২৭ : 'মকবরা নির্মাণ শুরু হয়েছে...' : P. Mundy, op. cit, vol. 2, p. 213.

পুনশ্চ : শেষকথার আড় কথা

৩২৯ : 'তাজমহলকে বর্ণনা...ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবেন' : quoted . Pal *et al.*, op. cit., p. 206.

৩২৯ : *সৌন্দর্য...মুগ্ধ করে* : W. Shakespeare, *The Rape of Lucretia,* line 29.

৩৩০ : **'নির্মাণের মূল...(ঈশ্বরের বড় মেয়ে)'** : Thomas Fuller, *The Holy State and the Profane State,* chapter 7, 'Of Building'.

৩৩১ : **'চিত্রকর্ম...সৌন্দর্যের সেরা অংশ'** : Francis Bacon, Essay No. 43, 'Of Beauty'.

৩৩২ : *কোনো স্থাপত্যকীর্তি...সৌন্দর্যের দেহ* : Edwin Arnold, quoted on Built Heritage of Agra and Fatehpur Sikri website.

চিত্রকর্মের চিত্রভাষ

প্রতিটা অধ্যায়ের সূচনায় দেয়া সাদা-কালো চিত্রকর্মগুলির সবই তাজমহলের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, কেবল ১২ পৃষ্টার ছবিটি হুমায়ুনের মকবরা থেকে নেয়া।

পাঠ অভ্যন্তর চিত্রসূচি

২২: রেমব্রাট ভন রিঝিন **অঙ্কিত শাহজাহানের** প্রতিকৃতি, প্যারিসের ইন্সটিটিউট নিরল্যান্ডিসের ফ্রিটস ল্যুগট সংগ্রহ; **৫৮: বাবরের প্রতিকৃতি**, ১৬০৫, Add. Or. 1039, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, ব্রিটিশ লাইব্রেরী; ৭৫, ৭৯: ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়াম/ ভি এণ্ড এ ইমেজেস; ৮২: *নূর জাহান (?) সুরা পানরত*, রাজস্থান, ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ, লস এ্যাঞ্জেলস কান্ট্রি মিউজিয়াম অব আর্ট, মিঃ এণ্ড মিসেস ডগলাস কর্তৃক দানকৃত (এম.৮১.২১৭.৭); ৮৭: টি. ক্রোয়াটের *ট্রাভেলার ফর দি ইংলিশ উইটস: পেইন্টিংস ফ্রম দি কোর্ট অব দি গ্রেট মোগলস* থেকে সংগৃহীত, ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ; ১৮১: এমএস. ১১এ, নং. ৪, চেস্টার বিয়েট্টি লাইব্রেরী, ডাবলিন; ২১২: কপিরাইট ডরলিং কিনডারসলে; ২৪৭: *ইয়ং লেডী বিনিথ এ ট্রি (জাহানারা?)*, দারা শুকোহর অ্যালবাম থেকে নেয়া, ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ, Add. Or. 3129 f.34, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, ব্রিটিশ লাইব্রেরী; ২৫৮: কপিরাইট বিবলিওথেক ন্যাশনালে, প্যারিস/ দি ব্রিজম্যান আর্ট লাইব্রেরী

চিত্রসূচি

২৯ এবং ৩০ পৃষ্ঠায়

তাজমহলের দৃশ্য: মাইকেল প্রেসটন; *সম্রাট বাবর কর্তৃক ঝর্ণার গতিপথ পরিবর্তন*, অলঙ্করণ মহেশ, ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দ, সম্রাট বাবরের স্মৃতিকথা থেকে সংগৃহীত: ব্রিটিশ লাইব্রেরী

৬৫ এবং ৬৬ পৃষ্টায়

পৃথিবীর শাসক হিসাবে জাহাঙ্গীর, অলঙ্করণ বিচিত্র, ১৬১৫–১৮ খ্রিস্টাব্দ, সেন্ট. পিটার্সবার্গ অ্যালবামঃ ফ্রিয়ার গ্যালারী অব আর্ট, স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউট, ওয়াশিংটন ডি.সি., ক্রয়কৃত, এফ১৯৪২.১৫এ; *জাহাঙ্গীর আর খুররমের (শাহজাহান) জন্য নূরজাহানের আয়োজিত বিজয় উৎসব,* অ্যালবাম পৃষ্ঠা, ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দঃ ফ্রিয়ার গ্যালারী অব আর্ট, স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউট, ওয়াশিংটন ডি.সি., চার্লস ল্যাঙ ফ্রিয়ারের দান, এফ১৯০৭.২৫৮

১৬১ এবং ১৬২ পৃষ্ঠায়

রত্নপ্রেমী শাহজাহান উষ্ণীষে পরিধানযোগ্য একটা অলঙ্কার পর্যবেক্ষণ করছেন, ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ, মৃত শাহজাহানের অ্যালবাম থেকে গৃহীতঃ লস এ্যাঞ্জেলস কান্ট্রি মিউজিয়াম অব আর্ট, নাসলি আর অ্যালিস হিরামানিক সংগ্রহ, মিউজিয়াম কর্তৃত ক্রয়কৃত (এম.৭৮.৯.১৫); মমতাজ মহলের প্রতিকৃতি, সপ্তদশ শতকের মোগল জলরংঃ ব্যক্তিগত সংগ্রহ; *সম্রাট হিসাবে অভিষিক্ত হবার পরে সন্তানদের সাথে শাহজাহান পুনরায় মিলিত হন,* রামদাসের প্রতি উৎসর্গিত, ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দ, *পাদশাহনামা, পৃথিবীর অধিশ্বরের রোজনামচাঃ* দি রয়্যাল কালেকশন কপিরাইট ২০০৬ হার ম্যাজেস্টি কুইন দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

১৯৫ এবং ১৯৬ পৃষ্ঠায়

দারা শুকোহর বিবাহযাত্রা, বিশানদাসের প্রতি উৎসর্গিত, ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ, *পাদশাহনামা, পৃথিবীর অধিশ্বরের রোজনামচাঃ* দি রয়্যাল কালেকশন কপিরাইট ২০০৬ হার ম্যাজেস্টি কুইন দ্বিতীয় এলিজাবেথ; *আতশবাজি উপভোগরত রমণীবৃন্দ,* অজ্ঞাতনামা মোগল চিত্রকরের চিত্রকর্ম, ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দ; গুলিস্তান ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী, তেহরান/ ওয়ার্নার ফোরম্যান আর্কাইভ।

২৮৯ এবং ২৯০ পৃষ্ঠায়

আগ্রা দূর্গ নির্মাণ, তুলসীর মিসকিনা কর্তৃক অঙ্কিত, ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দ, *আকবরনামা* থেকে গৃহীতঃ ভিক্টোরিয়া এণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, ভি এণ্ড এ ইমেজেস; হুমায়ুনের মকবরা, দিল্লী; ফতেহপুর সিক্রির স্তম্ভ; আকবরের মকবরা, সিকান্দ্রা; বুরহানপুর দূর্গঃ সবগুলো মাইকেল প্রেসটন।

৩২১ এবং ৩২২ পৃষ্টায়

তাজমহলের দৃশ্য: মাইকেল প্রেসটন; মোগলদের ব্যবহৃত জেড পাথরের হাতলযুক্ত খঞ্জর: সোথবি'র চিত্রশালা, লন্ডন; জাহাঙ্গীরের জেড পাথরের তৈরি ভৃঙ্গার এবং সপ্তদশ শতকের নেফরাইট জেড রত্নখচিত লকেট, ১৬১৩–১৪: উভয়েই ভিক্টোরিয়া এণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, ভি এণ্ড এ ইমেজেস।